বা

জীবত্ত্বের পথ পরিচয়।

(সৎগুরু প্রসাদী গ্রন্থাবলী—২)

ত্রিদশানাং যথা বিষ্ণুঃ দ্বিপদাম্ ব্রাহ্মণো যথা।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যথা চূড়ামণি র্বরং ॥
যথায়ুধানাং কুলিশ মিন্দ্রিয়ানাং যথা মনঃ।
তথেহ সর্ব্বশাস্ত্রানাং মহাভারত মুত্তমম্ ॥

(মার্কেণ্ডেয় পুরাণ ১অঃ ৪।৫ শ্লোকঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন গুপ্তেন
প্রণিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩৩ সন।

প্রকাশ সাহায্য—১॥০ মাত্র।
উত্তম বাধাই—২৲ মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস
এসোসিয়েটেড্ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিসিং কোং, লিমিটেড্
৪০নং কল্তাবাজার, ঢাকা।

উৎসর্গ পত্রঃ।

পরম ভক্তিভাজন,

দেব চরিত্র, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সরল, উদার, অমানী,

বদান্যবর, মুড়াপারা জমীদার বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন,

স্বর্গীয় ৺তারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

পবিত্র নামে

এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

দেব! তুমিই একজন যথার্থ বড়লোক ছিলে! কেবল জাক জমকে বড় নয়, উত্তম ভোগ বিলাস করিয়াও বড় নয়, সাধারণ লোকগণ যেন নিকটবর্ত্তী হইতে ভয় পায়, সেইজন্য উচ্চ প্রাসাদে প্রহরী আদি বেষ্টিত থাকিয়াও বড় নয়। হিন্দিতে একটী শ্লোক আছে, "বড়বড় যো কহতে হায়, বড়তো তাল খাজুর। যব বঠন কা ছায়া নহি, ফল পাওনকা দূর॥" তুমি সেই তাল ও খাজুর গাছের মত ছায়া ও ফলদানে কুণ্ঠ, কেবল অনেক কষ্টে মস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, এমন বড় ছিলেনা। কত দীন দুঃখী তোমার আশ্রয়-ছায়ায় থাকিয়া দান-ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। কত ধম্ম-পন্থী শ্রান্ত সন্ন্যাসী, ফকির তোমার আশ্রয়ে আসিয়া নববল সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কত দরিদ্র তৈর্থিক তোমারই দয়াদানে তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়াছে। কত বিদ্যার্থী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, শিল্পী, মল্ল, সঙ্গিতজ্ঞ, উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

তোমার গৃহ যে সজ্জন, অতিথি, বিদ্যার্থী ও প্রার্থীগণে পূরিত থাকিয়া, সর্ব্বদাই তীর্থ স্থানের মত উৎসব ময় হইয়া থাকিত। তোমার এই সব মহত্ত্ব ও গুণরাশির কথা শুনিয়াই, তোমায় দর্শন ও পদ-রেণু স্পর্শে পবিত্র হইতে, এই অধম তোমার চরণ সমিপে উপস্থিত হইয়াছিল। সত্যই তোমাতে এই সব মহত্ত্বের সমাবেশ দর্শনে ও তোমার অমানী সরল ব্যবহারে মোহিত হইয়া, এই অধম প্রতি বৎসরই যাইয়া তোমার চরণরেণু স্পর্শ করিয়া আসিত। বড়ই দুঃখের কথা, এমন জুড়াইবার ও অতজনের আশ্রয়-বৃক্ষকে আমাদের দারুণ দুর্ভাগ্য-বাতাসে অকালে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিল! প্রকৃতই হতভাগিনী বঙ্গমাতা ও দুভাগা হিন্দু-সমাজ অকালে একটী মানব-রত্নে বঞ্চিত হইল।

দেব! একদিন কথায় কথায় আমার মুখে এই মহাভারত-রহস্যের কতক অংশ শুনিয়াই বড়ই আনন্দপূর্ণ উৎসাহ ও আদেশ দিয়া, সেই তত্ত্বগুলিকে পূর্ণ গ্রন্থাকারে লিখাইয়া ছিলে। কিন্তু দারুণকাল তাহা শ্রবণ করাইবার সুযোগ আর দান করিল না। তাই অদ্য তোমার সেই স্নেহ ও উৎসাহের স্মৃতিরক্ষণ ও পরলোকে তোমার তৃপ্তির জন্য, এই গ্রন্থকে ভিক্ষা করিয়াই প্রকাশে ব্রতী হইয়া, তোমার পবিত্র নামেই এই গ্রন্থকে উৎসর্গ করিলাম। তোমার উৎসাহে লিখিত গ্রন্থ, যেন তোমারই মঙ্গল-আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে প্রকাশিত হইয়া শ্রোতা ও পাঠকগণকে আনন্দ দানে সক্ষম হয়। ইতি।

কৃপাপ্রার্থী

রাজেন্দ্র সেন।

অনুজ্ঞা গ্রহণ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ইষ্টের দয়ার মূর্ত্তী তাঁহার প্রকাশ।
নাম আর জ্ঞানরূপে যাঁহার বিলাস ॥
অপার করুণা নিয়ে অদ্ভুৎ প্রকাশি।
জীবে মুক্ত করি নেয় পাপমোহ নাশি ॥
এমন গুরুর পদে কোটী নমস্কার।
জন্মে জন্মে তুমি প্রভু ভরসা আমার।
ময়ূর মুকুট বাবা নামটী ধরিয়া।
অকস্মাৎ হিমালয় হইতে আসিয়া ॥
যাচিয়া করিলে কৃপা দেখিয়া অজ্ঞান।
কাকেরে গড়ুর শক্তি করিলেগো দান ॥
আবার প্রসাদ দিলে রামলীলা গান।
ভারত-রহস্য পুনঃ করিলে প্রদান ॥
সাধ হয় ঐ প্রসাদ জগতে বিলাই।
সেই লাগি তব পদে আজ্ঞাশক্তি চাই ॥

অধম
রাজেন্দ্র।

মুক্তিপথ বা রামায়ণ-রহস্য।

(সৎগুরু প্রসাদী প্রথম গ্রন্থ।)

মহাভারত-রহস্য—প্রবৃত্তি-পথি কর্ম্মবীরের জ্ঞাতব্য বিষয় রাজ্যের বিস্তৃত বৈদান্তিক-সংবাদ, আর **রামায়ণ-রহস্য** নিবৃত্ত-পন্থী ভগবৎভক্তের জ্ঞাতব্য সাধন-রাজ্যের বৈদান্তিক-সংবাদ। মাত্র ভক্তিবলে কেমনে জীব অনায়াসে দুর্জ্জয় বিষয়মোহের আক্রমণ হইতে ত্রাণ পাইতে পারে, তাহাই যেন শ্রীরাম চন্দ্র নিজে লীলা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। পাখী জটায়ু, বানর সুগ্রীব ও হনুমান, রাক্ষস বিভীষণ, চণ্ডালিনী শবরীর শ্রীরাম কৃপা লাভ তাহার জীবন্ত-আদর্শ। শ্রীরাম চন্দ্রের জন্ম, জন্মস্থান লীলা-কর্ম্ম সমস্তই কেমন বৈদান্তিক তত্ত্বমাখা, দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইবেন। বাঁধাই ১৷৵০, আবাঁধাই—১৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—(ঢাকা) বাঙ্গলাবাজার, সিটিলাইব্রেরী, কটন-লাইব্রেরী, বিধুভূষণ লাইব্রেরী ও গ্রন্থকারের নিকট।

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত।

পোঃ—বৈদ্যের বাজার, ঢাকা

গ্রাঃ—হামছাদী।

মঙ্গলাচরণ ভূমিকা।

নমস্কার—বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুম্।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ॥
তস্মিণতুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ॥

কলিপাবন অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জয় হউক। তাঁহার তুষ্টিতে জগতের তুষ্টি ও তাঁহার প্রণামেই জগতের প্রণাম হউক। কালপ্রভাবে স্বভাবতই—তামসী নিশার আগমনে প্রভাময় দিবসের অস্ত করিয়া, প্রচণ্ড রবির জ্যোতিও অন্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছে। দিবসের চৈতন্যময় মহৎ জীবগণ ও তাহাদের মহৎলীলা-কর্ম্মকে নিদ্রার কোলে মূর্চ্ছিত করিয়া, রাত্রিচর যত অসৎজীব হিংস্রতা, চৌর্য্য, দস্যুতাদি হীনতা লইয়া কর্ম্মভূমি অধিকার করতঃ, পিশাচের নৃত্য আরম্ভ করিতেছে। এইরূপ বর্ত্তমান তমো-প্রধান কলিযুগের আগমনে কাল-শক্তিতেই, অজ্ঞান-অন্ধকারে আর্য্যধর্ম্ম-রবি ডুবাইয়া দিলে, আর্য্যগণের জ্ঞানরূপ চৈতন্য ও ক্রিয়ারূপ কর্ম্ম-মহত্ত্বরাশি ভয়, আলস্য ও সন্দেহ-নিদ্রায় মোহিত হইয়া গেল। তখন যত অধর্ম্ম, পাপাচার, নির্লজ্জতা ও অত্যাচার সমস্ত আর্য্যভূমি ব্যাপিয়া পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। দেববিগ্রহ চূর্ণ হইল, দেবতার অলঙ্কার বিলাসের সম্ভার হইল, ধর্ম্মাশ্রম লুণ্ঠিত হইল, পুরুষের ধর্ম্মসাধন গেল, রমণীর সতীত্ব গেল। মাত্র কতিপয় অতি সহিষ্ণু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত, সর্ব্ব-আর্য্যজাতি আর্য্যের দশ সংস্কার ও দীক্ষাদি হইতে পরিভ্রষ্ট হইল। কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ, মরণোন্মুখ রোগীকে যত্নে রক্ষা করার মত, এই আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহার ক্রিয়াকাণ্ড টুকুকে রক্ষার জন্য, কত বিধি নিষেধের বেষ্টন দিয়া, জাতির পর

জাতির সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া, অতি গোপনে সাবধানে তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। আর্য্যভূমির এহেন দুর্দ্দিনে, আর্য্য সন্তানগণকে আবার ধর্ম্মপথে জাগাইবার জন্য, তামস-যুগের দারুণ অন্ধকার ভেদ করিয়া মুক্তিপথের সন্ধান ও উপায় বলিয়া দিতে, নিজে আচরণ করিয়া এই কালের আর্য্য কর্ত্তব্য শিখাইতে, অপার করুণারূপ দীপহস্তে, আর্য্যভূমে, গঙ্গাতীরে, পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে ভগবান্ যেইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থারম্ভে সেই করুণাময় অদ্ভুৎবীর্য্য **শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেই** বার বার বন্দনা করি।

যাঁহার আগমন মাত্রে আর্য্যজাতির আলস্যমোহ ও রাজ-শাসনভীতি ডুবাইয়া, কি এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মের স্রোত, সমগ্র আর্য্যভূমি ব্যাপিয়া বহিয়া গিয়াছিল। বঙ্গের চামার, ধাঙ্গর পর্য্যন্তজাতি, আবার আর্য্য-সংস্কার ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়া ছিল। কেবল বঙ্গ নয়, এই স্রোত উড়িষ্যা ডুবাইয়া দক্ষিণ সাগর-তীর রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ছিল। পশ্চিমে বিশ্বেশ্বরের কাশী ভাসাইয়া শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়াছিল। স্রোতের গতিরোধ করিতে যাইয়া, কত দাম্ভিক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, রাজা, জমীদার, অন্যধর্ম্মের সম্রাট পর্য্যন্ত প্রেমের বন্যার ডুবিয়া গিয়াছিল। ভগবৎ-সত্তার আস্বাদে, কত রাজা ও রাজতুল্য ব্যক্তি রাজ-সম্পদের বিনিময়ে, সাধকের কন্থা কৌপিন ক্রয় করিয়াছিল। পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ সর্ব্বাভিমান ছাড়িয়া ভগবৎভক্ত শূদ্রের পায়ে লোটাইয়া পড়িলেন, হিন্দুর সকলজাতিতে সহস্র সহস্র লোক দেব দুর্ল্লভ অমানুষশক্তি ও ভগবৎভক্তি লাভ করিলেন। ঘরে ঘরে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইল, ভগ্নমন্দির আবার সুবর্ণ-চূড়ে মণ্ডিত হইল। ঘরে ঘরে আনন্দের বাজার, কীর্ত্তন ও উৎসবের রোলে, ভোগ বিলাস ও পাষণ্ডতা পলায়ন করিল। শত শত জন্মের কঠোর সাধনা ও পবিত্র-বংশে জন্মাদি দ্বারাও যেই নিষ্কাম-ভক্তির সন্ধান হয় না, শুধু যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে চণ্ডালাদি

হীনজাতি, এমন কি মহাপাপী ও বিধর্ম্মী পর্য্যন্ত তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইল। শূদ্র ব্রাহ্মণের গুরু হইল, চণ্ডাল দীক্ষা দানের অধিকার পাইল, অক্ষর জ্ঞানহীন মহামূর্খও বেদ-গুহ্য ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিল। হীনশক্তি কলি-জীবগণের একমাত্র গতি, সেই অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যপ্রকাশী **শ্রীমন্ মহাপ্রভু** বিনা, আমার মত অধম আর কাহার শরণ গ্রহণ করিবে! এই প্রভুর কৃপাশক্তিই আমার মত অধম মূর্খ দ্বারাও, হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্র-সার ব্যাস-কূট মহাভারতের একটী রহস্য-কনিকা অদ্য প্রকাশ করিলেন। নচেৎ আমার মত ব্যক্তির এই সব তত্ত্বের স্বপ্ন দেখাও যে অসম্ভব ছিল। এই জন্যই গ্রন্থারম্ভে **শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেই** মাত্র বন্দনা করিতেছি; তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক।

এই গ্রন্থ মহাপ্রভুর প্রসাদ-কণিকা বলিয়াই, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও, আমি কেবল প্রসাদ বিতরণ লোভে এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। সামান্য দ্রব্যও ভগবানের প্রসাদ হইলে, যার তার হস্ত হইতেও হিন্দুগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং প্রসাদ-দাতাকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই গ্রন্থও তেমনি গৃহীত হইলেই অধম কৃতার্থ হইবে।

বস্তুবিচার—মহাভারত গ্রন্থকে আধুনিক পণ্ডিতগণ কেহ কেহ কল্পনা প্রসূত কাব্যমাত্র বলিতেছেন। কেহবা সামান্য সত্যের উপর অতিশয়োক্তি-দুষ্ট তৎকালিক ইতিহাসও বলিয়া থাকেন। আবার কেহ বা নানা সময়ে নানাজন-লিখিত বৃহৎ গল্প-পুস্তকও বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ এই গ্রন্থকে পঞ্চমবেদ বলিয়া, বেদের মত ইহার সম্মান ও পূজা করিতেন। তাই তাঁহারা ব্রত ও শ্রাদ্ধকালে, বেদ পাঠ না করিয়াও, শ্রদ্ধার সহিত মহাভারতের অংশ বিশেষ বিরাট-পর্ব্ব ও ভগবদ্গীতা পাঠ করাইয়া থাকেন। এই জন্যই গ্রন্থারম্ভে মহাভারত বস্তুটী কি, সেই বিষয় একটুক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তাহাই গ্রন্থের বস্তুবিচার।

প্রথমতঃ এই গ্রন্থের নামার্থ, গ্রন্থ-রচয়িতা, গ্রন্থের প্রকাশস্থল, প্রকাশ প্রয়োজন, প্রকাশক ও প্রথম শ্রোতাগণের স্বরূপ একটু আলোচনা করিয়া দেখি। নামার্থ—মহা+ভাঃ+রত=মহাভারত। ভাঃ অর্থ আত্মা, তাই আত্মারতদের মহাগ্রন্থ বা মহাআত্মারতদের যে গ্রন্থ তাহাই মহাভারত। গ্রন্থকর্ত্তা—ভগবান বিষ্ণুর অবতার বেদ বিভাগকর্ত্তা ব্যাস দেব। প্রকাশ-স্থান—নৈমিষারণ্য, ঋষিগণের আরধনা-ক্ষেত্র। প্রয়োজন—সর্ব্বপ্রকার বিষয়ত্যাগী, পূর্ণ ভগবৎজ্ঞানী ঋষিগণ কঠোরতা সহিত বহুদিনব্যাপী সাধনে ব্রতী হইয়া, অবসর কালও যাহাতে বৃথা আলাপে নষ্ট না হয়, সর্ব্বদা ভগবানের নাম গুণ লীলার উদ্দিপনা হয় সেইজন্য। প্রকাশক—ব্যাসদেবের প্রধান শিষ্য বেদ পুরানবেত্তা ব্রহ্মদের্শী বৈশ্রবণ ঋষি। শ্রোতা—ষষ্টি সহস্র ব্রহ্মবেত্তা ঋষি ও সাধানপন্থী তাহাদের অসংখ্য শিষ্যবৃন্দ। এমন গ্রন্থকে শুধু চিত্তবিনোদন কাব্য বা গল্প বহি বলিতে, কোনও ধর্ম্মপন্থীই বোধহয় সাহসী হইবেন না। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মপন্থী ঋষিগণ গ্রাম্যকথা কাব্য ও ইতিহাস মাত্র আলোচনা করিবেন কেন?

প্রায় প্রত্যেক পুরাণ ও উপপুরাণেই যেই গ্রন্থের প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার পাঠবিনা হিন্দুর ব্রত ও শ্রাদ্ধাদি পূর্ণফল দানে অক্ষম হয়, আজকালের সিদ্ধ মহাপুরুষগণও যেই গ্রন্থকে আনন্দেসর্ব্বদা আস্বাদন করেন, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ ইত্যাদি হিন্দু-ধর্ম্ম সংস্কারকগণও যাহার বর্ণিত সিদ্ধান্ত বচনকে, বিপক্ষতর্ক্দলনের বিপক্ষে প্রমান স্বরূপ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থকে পূজা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যে আজকালের উপন্যাসের ন্যায় কেবল মনোরঞ্জন কারী কাব্য বা গল্প মাত্রই নয়, তাহা বোধহয় হিন্দুসংস্কারা-পন্ন কোন ব্যক্তিকেই আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

আজকালের মত, পূর্ব্বকালে যে কোনও ব্যক্তিই কোন গ্রন্থ বা ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতে পারিতেন না। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিয়া

সাধনাদ্বারা ব্রহ্মদর্শন করিতে পারিলে এবং তাহাও আবার তৎকালিক মহর্ষিগণ পরীক্ষা করিয়া ব্রহ্মদর্শী বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাই অনন্ত মহর্ষী মধ্যেও মাত্র ষড়বিংশতি ঋষির মত ও শাস্ত্রই, হিন্দু-ধর্ম্মে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মহাভারত সেইরূপ পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত ঋষিগণ সম্মত হইয়া হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রত্ব লাভ করিয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মবাক্য বেদ তিন প্রকার, প্রভু-সম্মত, সুহৃৎ-সম্মত ও কান্তা-সম্মত। প্রভূসম্মত—প্রভুর মত, রাজার মত কেবল বিধি নিষেধ মাত্র বলা, যেমন বেদ ও স্মৃতি। সুহৃদ সম্মত—বন্ধুর মত কর্ম্মের দোষগুণ প্রদর্শন করিয়া বলা, যেমন পুরাণ। কান্তাসম্মত—আদি, বীর, করুণাদি রসের লীলা দ্বারা কাব্যাকারে প্রকাশ, যেমন রামায়ণ ও মহাভারত। যথা—তচ্চাপি বাক্যং ত্রিবিধং ভবেদিতি শ্রুতের্মতম্। প্রভুসম্মতমেকঞ্চ সুহৃৎসম্মতমেবচ॥ কান্তাসম্মতমেবাপি বাক্যংহি ত্রিবিধং বিদুঃ। প্রভুস্বামী যথাভৃত্যমাদিশত্যেতদাচার॥ তথা শ্রুতিস্মৃতি চোভে প্রাহতুঃ প্রভুসম্মতম্। ইতিহাস পুরাণাদি সুহৃৎ সম্মতমুচ্যতে॥ সুহৃদ্বৎ প্রতিবোধ্যেনং প্রবর্ত্তয়তি তত্ত্বতঃ। কাব্যালাপাদিকং যচ্চ কান্তাসম্মত মুচ্যতে॥ স্কন্দপুরাণ কুমারিকাখণ্ডম চত্বারিংশ অধ্যায় ৬৭ হইতে ৭০ শ্লোক। তাই **রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর নিকট বেদ সদৃশ মান্য ও মহাপূজ্য গ্রন্থ।**

শিবপুরাণ বায়বিয় সংহিতা ১ম অধ্যায় ২৯ হইতে ৩২ শ্লোকে বর্ণিত আছে, বেদজ্ঞান বিস্তৃত হইয়া পরিলে, প্রজা তাহা হইতে বিত্তালাভে অসমর্থ হইয়া পরিল। তাই বিশ্বেশ্বরের নিয়োগে, বিশ্বাত্মা জগন্ময়বিষ্ণু দ্বাপরযুগের শেষভাগে ব্যাসনামে মহীতলে অবতীর্ণ হন। বনমধ্যে সত্যবতী হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নামে জন্মিয়া, তাঁহার মতিরূপ মন্থদণ্ডদ্বারা

বেদ-সাগর মন্থন করতঃ মহাভারতরূপ (অমৃত ময়) চন্দ্রমাকে লোকের জন্য প্রকাশ করেন। যথা—(বেদ) যদাস্থ বিস্তরংশক্তা নাহিকস্ত প্রজাভুবি। তদা বিদ্যাসামর্থ সার্থং বিশেশ্বর নিয়োগতঃ॥ দ্বাপরান্তেষু বিশ্বাত্মা বিষ্ণুঃ সর্ব্বজগন্ময়ঃ। ব্যাসনাম্না রচত্যস্মিন্নবতির্য্য মহীতলে॥ সম্পূর্ণ দ্বাবারে চাস্মিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্যায়া। অরন্যামিবংব্যাণী সত্যবত্যামজায়ত॥ মতিমন্থান মাবিধ্য যেন বেদ মহার্ণবাৎ। প্রকাশো জনতোলোকে মহাভরত চন্দ্রমাঃ॥

মার্কেণ্ডেয় পুরাণে প্রথম অধ্যায়ে মহাভারত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—দেবগণ মধ্যে যেমন বিষ্ণু, দ্বিপদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, ভূষণগণের মধ্যে যেমন চূড়ামণি, অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে যেমন মন, সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রগণের মধ্যেও মহাভারতই উত্তম। ব্যাসবাক্যরূপ যে পবিত্র জলস্রোত কুতর্করূপ (দৃঢ় মূল) তরু সকলকে উৎপাটিত করিবার জন্য, বেদরূপ শৈল হইতে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই শ্রুতির ব্যাখ্যা, বহু অর্থ প্রকাশক মহাভারত নামক আখ্যান তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য, আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। যথা—ত্রিদশানাং যথাবিষ্ণু দ্বিপদাম্ ব্রাহ্মণো যথা। ভূষণাঞ্চ সর্ব্বেষাং যথাচূড়ামণি বরং॥ ৪ যথায়ুধানাং কুলিশমিন্দ্রিয়ানাং যথামনঃ। তথেহ সর্ব্বশাস্ত্রানাং মহাভারত মুত্তমম্॥ ৫ ব্যাস বাক্য জলৌঘেন কুতর্কতরু হারিণা। বেদশৈলাবতীর্ণেন নীরজস্কা মহীকৃতা॥ ১০ তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্। তত্ত্বতোজ্ঞাতুকামোঽহং ভগবংস্তামুপস্থিতঃ॥ ১১ এইরূপ বহু ধর্ম্মশাস্ত্রেই মহাভারত দ্বারা যে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব বেদাদি জ্ঞানবোধই কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়াছে, ইহা অধ্যয়নই যে বেদ অধ্যয়নের তুল্য তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এইসব কথা ধরিয়া কেহ কেহ মহাভারতকে আধ্যাত্ম-শাস্ত্রের রূপক-কল্পনা বলিয়া, ইহার ইতিহাস সত্ত্বাকেও অস্বীকার যাইতে চান, কিন্তু তাহা কিছুতেই হইতে পারে না।

ইতিহাস লীলা ও সত্য কি না?—জন্মাষ্টমীরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, ভীষ্মাষ্টমীরূপ ভীষ্মদেবের তর্পণ, ভৌমী-একাদশীরূপ ভীমব্রত, অশ্বত্থামায় তৈলদানরূপ অশ্বত্থামার ক্ষতস্মৃতি ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা, যাহাদের স্মৃতি-উৎসব আজও সমস্ত ভারতবাসী হিন্দুগণ সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছে। কুরুক্ষেত্র, দ্বারকা ইত্যাদি যাহাদের লীলাস্থানসমূহ আজও চিহ্নিত থাকিয়া তাহাদের লীলার স্বাক্ষ্যদান করিতেছে, যাহাদের বংশধরগণ আজও জগতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের গৌরব ভোগ করিতেছেন, বিরাট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, প্রতি তীর্থ-ভূমিতে যাহাদের লীলা ও কর্ম্মস্থান চিহ্নিত থাকিয়া আজও মহাভারত-বর্ণনার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে, সেই ইতিহাস-লীলাকে অস্বীকার যাইব কোন সাহসে? তবে মহাভারতের ব্যক্তিগণের নাম রূপ গুণ লীলাদি, ঠিক উপনিষদীয় আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের সঙ্গে অপূর্ব্ব ভাবে মিলিয়া যায় কেন, পুরাণ ও মহাভারতের লীলাদিকে ঠিক অধ্যাত্মিক-রাজ্যের রূপক-পরিকল্পনা মনে হয় কেন, সেই বিষয় বিচার করা প্রয়োজন বটে।

লীলার আধ্যাত্মিক যোগ হয় কেন?—গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে অবতার প্রয়োজনের পরে ৯ম শ্লোকে বলিয়াছেন, এই সব (অবতারের) জন্মকর্ম্ম দিব্য অর্থাৎ নিত্য। যে এই জন্মকর্ম্মাদি তত্ত্বত অর্থাৎ নিত্য তত্ত্বে মিলাইয়া জ্ঞাত হইতে পারে, হে অর্জ্জুন, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়, দেহত্যাগ করিয়া আর পুনর্জ্জন্ম পায় না! যথা—জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যোবেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নৈতিমামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ভগবান যখন সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য স্বয়ংই দুষ্কৃতির নিধন করিতে আগমন না করিয়া আর পারেন না; তখন সেই নিত্য-তত্ত্বাত্মক পরমব্রহ্ম, তাঁহার নিত্যতত্ত্ব উপনিষদীয়-জ্ঞানের সহিত মিলাইয়াই এবং জগতে মধুর লীলা করিয়া থাকেন। তাহাদের নাম

জন্ম, পিতা, মাতা, লীলাস্থান, পারিষদাদি সমস্তের নাম সংখ্যা ক্রিয়া লীলাদি পর্য্যন্ত সেই নিত্যতত্ত্বের মতই হইয়া থাকেন ; এই মিলন বোধই অবতার-তত্ত্বের স্বরূপ লক্ষণ। তাই ঋষিগণ সেই লীলা-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিয়া, গ্রন্থরূপে লিখিয়া রাখিয়া, আনন্দ আস্বাদন করেন ও শিষ্যগণকে আস্বাদন করান। তাই শ্রীরাম-লীলা রামায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত অক্ষরে অক্ষরে **আধ্যাত্মিক-রাজ্যের** সহিত মিলিয়া যায়! যেমন শ্রীকৃষ্ণ নামটী—সর্ব্বসৃষ্টিকে ক্রীয়াহীন করিয়া আকর্ষণকারী নিবৃত্তব্রহ্ম বোধক। জন্মস্থান—গকুল অর্থাৎ নাহি কুল হীন স্থান। লীলাস্থান—বৃন্দাবন অর্থাৎ ব্রহ্মময় স্থান ইত্যাদি। শ্রীরাম-লীলায়ও নাম শ্রীরাম—আত্মারাম ব্রহ্মবোধক, জন্মস্থান—অযোধ্যা, প্রতিযোদ্ধাহীন বৈকুণ্ঠ জ্ঞাপক, মাতা—কৌশল্যা মঙ্গলময় সত্বগুণ জ্ঞাপক ইত্যাদি।

কেবল বৈদান্তিক নিত্যতত্ত্ব নয়, কর্ম্মীর যজ্ঞতত্ত্ব, যোগীর যোগগম্য নাড়ীচক্রাদি ও আত্মার তত্ত্ব, জ্ঞানীর বেদান্ত, ভক্তের ভক্তিগম্য রসতত্ত্ব, সমস্ত নিত্য তত্ত্বেরই জীবন্তপ্রকাশ ভগবানের অবতার-লীলা। তিনি যে সৃষ্টির মূল সর্ব্বদেবতাদি লইয়া আসিয়া অবতার-লীলা করেন। তাই অধিদৈব —দেবতত্ত্ব, অধ্যাত্ম—স্বভাবতত্ত্ব ও অধিভূত—জীবতত্ত্ব, এই তিনতত্ত্বই অবতার লীলায় পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকে! তাই ভগবানের খণ্ডলীলা বরাহ, নৃসিংহাদির লীলা হইতেও, জীবের মত জন্ম, বাল্য, কৌশোরাদি সমন্বিত পূর্ণ-অবতার-লীলা, জীবগণের ইহ ও পরকাল সর্ব্বদিগেরই অশেষ মঙ্গলকর; বেদবেদান্তের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশক, অতি মধুর **কাব্যাস্মাত বেদ**। এই মহাভারত-বেদের দেবতা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ঋষি—বেদব্যাস, ধর্ম্মবীজ ভগবদ্গীতা, সাধক—পঞ্চপাণ্ডব, সাধনা—মহাভারতীয় পাণ্ডব-লীলা।

অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত মহাভারত—

অভিনয়গ্রন্থে যেই যেই বিষয় বর্ণিত থাকে, তাহাই শিক্ষাকালে শিক্ষা দান

হয়, আবার অভিনয় কালেও তাহাই লীলাকারে অভিনীত হয়। এই তিন তত্ত্বই কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল নামে কর্ম্মের তিনটী নিত্য সত্ত্বা। এই তিন তত্ত্বই যেমন একই সত্ত্বাবান, কর্ম্মেরও অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিন তত্ত্বও তেমনি নিত্য ও এক সত্ত্বাবান। সৃষ্টিরাজ্যের সর্ব্বত্রই এই তিন-তত্ত্ব বিরাজমান, তাই মহাভারতেরও তিন তত্ত্বেই ব্যাখ্যা করা যায়। **অধিদৈব তত্ত্ব** ব্রহ্মদর্শী ঋষিদের আস্বাদনের—মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, পাণ্ডব ধর্ম্মদেব আদি, ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্ব্ব-রাজ আসিয়া জন্মেন বলিয়া যে তত্ত্ব বর্ণিত আছে। **অধ্যাত্ম-তত্ত্ব** জীবের স্বভাব প্রকৃতিবর্গের সহিত মিলাইয়া আস্বাদন, আর **অধিভূত-তত্ত্ব** জীবের লীলার মত আস্বাদনকে বলে। বর্ত্তমান গ্রন্থে অধ্যাত্ম ও অধিভূত তত্ত্ব পাশাপাশিই দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দেখিবেন এই গ্রন্থের উভয় লীলাই কেমন মধুর ও মঙ্গলময় লীলা। অধ্যাত্মতত্ত্বে বেদের উপনিষদিয় তত্ত্বগুলি, কেমন শৃঙ্খলার সহিত পূর্ণরূপে প্রদর্শণ করা হইয়াছে, আবার অধিভূত নরলীলায়ও নরের আচরণীয় মুক্তিপ্রদ সুখকর পথকে কেমন জীবন্ত আদর্শ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। এখন সংক্ষেপতঃ মহাভারতের আধ্যাত্মিক যোগের একটু পরিচয় শ্রবণ করুন, তাহাতেই বুঝিবেন, এই গ্রন্থ কেমন মহাগ্রন্থ, কেন ইহাকে সর্ব্বশাস্ত্র সার বলা হয়। জীবের জানিবার সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানতত্ত্বে এই গ্রন্থ পূর্ণ বলিয়াই বুঝি ইহাকে সর্ব্ব বেদময় বলা হয়, তাই বুঝি এই গ্রন্থ হিন্দুর **কান্তাসম্মত বেদ**।

মহাভারতের আধ্যাত্মিক যোগসূত্র।

প্রত্যেক পর্ব্ব ও অধ্যায়ের প্রথমেই এই আধ্যাত্মিক যোগ সূত্র বিশেষরূপে দেওয়া থাকায় এই স্থানে অতি সংক্ষেপে বলা হইল।

আদিপর্ব্ব—প্রথমতঃ রাজা প্রতীপের গঙ্গা-প্রত্যাখ্যান, শান্তনুর গঙ্গা-গ্রহণ, গঙ্গাদেবীকে হারাইয়া সত্যবতী-গ্রহণ ও পুত্রদ্বয়ের জন্ম পর্য্যন্ত, ভগবান নিবৃত্ত, শান্ত ও প্রবৃত্তগত হইয়া সৃষ্টি ইচ্ছার প্রকাশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইটীই আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায় (২১—৩৬ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয়ে—ভগবান নিজে লীলা করিয়া আনন্দিত হইয়া, সেই লীলা দেখিতে, ঐশ্বর্য্যময় বিচিত্রবীর্য্য-সত্ত্বা দ্বারা জগত সৃষ্টি করিয়া দর্শন করেন। সেই ঐশ্বর্য্য-সত্ত্বা হইতে কিরূপে জীবের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ-ত্রয়, ও সেই তিনদেহ-ভোক্তা তিনটী অহঙ্কারময় জীবের আত্মাপুরুষের জন্ম হয়, সেই পুরুষত্রয়ের সহিত ত্রিগুণীয় প্রকৃতির যোগে কি করিয়া ত্রিবিধ কর্ম্ম প্রবৃত্তি বর্গের জন্ম হয় এবং কিরূপে জীবের জীবাত্মা কর্ম্মরাজ্য-কর্ম্ম কর্ত্তা হইয়া বসে। এইসব বিচিত্র-বীর্য্যের মৃত্যু, তাহার তিন পত্নি হইতে তিন পুত্রের জন্ম, পুত্রের বিবাহ, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদের জন্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য-প্রাপ্তির মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই সবই আদি-পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়।

৪০—৮৯ পৃষ্ঠা—

তৃতীয়ে—কর্ম্মপ্রবৃত্তিসমূহ কেমনে আশ্রয়, অবলম্বন ও উদ্দীপনার ভেদে একই জ্ঞান ও শিক্ষাকে প্রকৃত ও বিকৃতরূপে গ্রহণ করিয়া, কেহ ঈশ্বরনির্ভর-ত্যাগী আত্মচেষ্টারত অসুর ও কেহ বা ঈশ্বরনির্ভরশীল, সর্ব্বদা

শাস্ত্রবিধি মান্যকারী দেবতা হইয়া উঠে, সেইসব ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের শিক্ষা-অধ্যায় মধ্যে প্রদর্শিত হইবে। এই তত্ত্ব আদিপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়। ৭৩—১০০ পৃষ্ঠা।

চতুর্থে—দৈব ও অসুর প্রকৃতি মানবগণের অসুরত্ব ও দেবত্বের জাগরণ ও স্বভাব প্রকাশ হইয়াছে। তখন জীবের লীলাকর্ম্ম ও লাভালাভ কি হয় সংক্ষেপতঃ প্রদর্শন করিয়া, পরে সমস্ত মহাভারতে এই তত্ত্বই বিস্তৃত করিয়া দেখান হইবে।

অসুর—কর্ম্মক্ষেত্রে এক ভ্রাতা কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেই অসুরত্ব ঈর্ষ্যারূপে উপস্থিত হইয়া অজ্ঞ-জীবকে আয়ত্ত করিয়া লয়। পরে কু-যুক্তি ও কুখাদ্য রূপ বিষ দিয়া এবং প্রভুত্ব ও ভোগ বিলাসের জতুগৃহে সত্বগুণ সহিত পঞ্চধর্ম্ম সাধনাকেই ভস্ম করিয়া, জীবকে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর অবিশ্বাসী করিয়া তোলে। তখন সেই অসুর বিষয়-স্বার্থের জন্য ভ্রাতাকে বিষদান ও নিদ্রিতকে দগ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, বিষয়, ধন সম্পদকেই সার-ধন মনে করে, অত্যাচার ও প্রভুত্বই সুখ বোধ করে, ভোগ বিলাসকেই জীবনের স্বার্থকতা মনে করে; শেষে মৃত্যুকালে দেখিতে পায় জীবনের লক্ষ্যভেদ হয় নাই, লাভেরও আর উপায় নাই, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে প্রকৃতরূপে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের পাণ্ডবদ্বেষ, কর্ণকে আশ্রয়, ভীমকে বিষদান, জতুগৃহে পাণ্ডবকে বধ চেষ্টা এবং রাজা হইয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এই সব প্রদর্শিত হইয়াছে।

দেবতা—ঈর্ষ্যার আলোড়নেও সদাচার ও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করেনা, ভগবানের কৃপালাভ উদ্দেশে, সর্ব্ববিধ ভোগাদি ত্যাগ করিয়া, তাঁহার দাস ব্রাহ্মণ-কর্ম্ম গ্রহণ করতঃ বিষকে হজম করে, ভোগের-জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া ভোগ রাক্ষসকে বধ করিয়া ফেলে। ভোগ সুন্দরী দাসী হইতে চাহিলেও

গ্রহণে স্বীকার করে না, তখন তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বদিকে মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হয়। তখন বন ও রাজপ্রাসাদ সমান সুখস্থল হয়, পরের গৃহও আপন গৃহতুল্য হয়, পরের মঙ্গলজন্য প্রাণদানেও কষ্টবোধ হয় না; তখনই জীবের জীবনের লক্ষ্যভেদ হয়। সন্তোষদেবী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের সেবাভার গ্রহণ করেন, স্বয়ং ভগবানও দেখা দিয়া সর্ব্বাবস্থায় রক্ষাভার গ্রহণ করেন। এইসব অবস্থা পাণ্ডবগণের ধার্ত্তরাষ্ট্রদের সকল-অত্যাচার নীরবে সহন, বিষ হজম, জতুগৃহ দগ্ধ করেণ, ব্রাহ্মণবেশে রাজ্যত্যাগ, হিরিম্ব বধ, হিরিম্বা গ্রহণে অস্বীকার, ব্রাহ্মণ রক্ষায় তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া রাক্ষসের নিকট উপস্থিত, লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ ও শ্রীকৃষ্ণ আপনি কুটিরে যাইয়া দর্শন দান, এই সব লীলা দ্বারা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

১১০—১৬২ পৃষ্ঠা।

সভাপর্ব্ব—প্রথমে অসুরের বিষয়-রাজ্য দেব-প্রকৃতির অধিকারে আসিলে, তাহারা কেমনে সেই রাজ্যের আবর্জ্জনা দূর করিয়া, ক্রমে আবার তাহাতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন তাহাই প্রথম অধ্যায়। খাণ্ডব-দাহন তাহার আবর্জ্জনা নাশ, জরাসন্ধ-বধ মার্জ্জনা, রাজাদের উদ্ধার ও রাজসূয়-যজ্ঞ তাহার পূজা, দণ্ডিপর্ব্ব ও অর্জ্জুনের নির্ব্বাসন-গ্রহণ সেই পূজার দক্ষিণাদান। ১৬৬—২০৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয়ে—অসুর সাধন ভজনের কঠোরতা না ভুগিয়া, বুদ্ধি চাতুর্য্য কুটীলতা ইত্যাদি দ্বারা দেবশক্তিধরকে আয়ত্ত করতঃ, তাঁহার সাধনশক্তির সেবাভাগে চেষ্টা করে। এই পথ ধর্ম্ম, লক্ষ্মী ও ভগবানের সত্য পূজা নয়! সেই পথে ধার্ম্মিকের উপর অত্যাচার, লক্ষ্মীর অসম্মাননা, ভগবানের ক্রোধোদ্রেক। আশুবিজয় ও বিষয় সুখ পাইলেও পরিণামে ভীষণ পরাজয়, অসুখ ও ধ্বংস নিশ্চয়; সেটী অধর্ম্মের পূজা। এইসব ধার্ত্তরাষ্ট্রদের কপট পাশাখেলা, পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার, বনবাস দান করিয়া রাজ্যগ্রহণ দ্বারা প্রদর্শন হইয়াছে। ২১০—২৩৮।

বনপর্ব্ব—দৈবপ্রকৃতি বনে বাস করিয়াও সম্রাটের তৃপ্তিসুখ ও যশ সম্মান লাভ করিতে পারেন, পাণ্ডব দ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

অসুর—সম্পদের উচ্চ আসনে থাকিয়াও ঈর্ষ্যার দাহনে জলিয়া দুঃখ ও বিপদকে আপনি বরণ করিয়া আনে। সামান্য ধর্ম্মযুক্ততা থাকিলেই তাহাতে রক্ষা পায়। দুর্য্যোধনের ঘোষ-যাত্রায় গন্ধর্ব্ব হস্তে বন্দী হওয়াই তাহার নিদর্শন। অসুরের ধর্ম্মসাধন যে অসুরত্বের দোষে ফলদান করে না তাহাই দুর্ব্বাসার পারণ। ২২৪—২৭০ পৃষ্ঠা।

বিরাটপর্ব্ব—ধর্ম্মহীন অসুর-সংসারের সকল কর্ম্মক্ষেত্রই স্বস্বরূপ হারা হইয়া কেমন বিশ্রী ও বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া বসে ও কেমনে সেই দেশ মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া আবার ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠিতে পারে, তখন সেই রাজ্যের শোভা ও লাভ কেমন হয়, এইসব অতি সুন্দরভাবে কিচকাধিকৃত অবস্থা, তাহাকে বধ করিয়া পাণ্ডব আদর্শ স্থাপন, কৌরব পরাজয় ও উত্তরার বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ আগমন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৭৬—৩১৯ পৃষ্ঠা।

উদ্যোগ পর্ব্ব—ধর্ম্ম সাধনকে বনবাসের মত সামান্য আচরণ ও অজ্ঞাতবাস রূপে একেবারে ত্যাগ করিলে,জীব আর তাহাকে কেন ফিরিয়া গ্রহণ করিতে পারে না! তখন সমস্ত-প্রবৃত্তি অসুরের আয়ত্ত হইয়া বিপক্ষতা, অবাধ্যতা, অশক্ততা দেখাইয়া কেমন চেষ্টা ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকে! জীব তখন তাহাদের বশীভূত হইয়া ভগবানকে অবিশ্বাস এবং আত্মজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, কেমনে ধর্ম্মের বিপক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসে! এইসব তত্ত্বই উদ্যোগপর্ব্বে দুর্য্যোধনের বিপক্ষতায় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাহাদের মন্ত্রণায় বিরাটরূপ দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার ও বিদুরকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাণ্ডব বিপক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে দেব ও অসুর কাহারা ভগবানের কোন

কোন শক্তির সহায়তা লাভ করে, অসুর ও দেবপক্ষের সহায় শক্তির পরিচয়ও অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। ৩২৩—৩৬০ পৃষ্ঠা।

ভীষ্মপর্ব্ব—অসুরত্ব আবরিত মনের ভীষণ স্বরূপ, তাহার আবরণের পরিচয়, আক্রমণ-পদ্ধতি ও পরাজয়ের উপায়,—ভীষ্মদেবের যুদ্ধ, আক্রমণ ও শরশয্যার মধ্যে প্রদর্শন করা হইয়াছে। মনের প্রথম সমাধি সবিকল্প-সমাধি লাভই তাঁহার শরশয্যায় পতন। ৩৬১—৩৮২ পৃঃ।

দ্রোণপর্ব্ব—মনের বিকল্প থাকার মূলসত্তা, কাম ও ক্রোধের তামস-আবরণ বিষয়-লোভের আক্রমণ, ইহার বিষয়-কামনারূপ চক্রব্যূহের শক্তি ও দ্বাররক্ষকের পরিচয়, তাহা ভেদের উপায় ও বিষয় কামনার নাশ, ক্রোধাক্রমণ রোধ, এই অধ্যায়ে দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার দারুণ আক্রমণ, দারুণ ব্যূহকরণ ও ব্যূহভেদ ও পরাজয় দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩৮৩—৩৯২ পৃঃ।

কর্ণপর্ব্ব—রাজস-কামনা, ঈর্ষ্যাপ্রতিযোগিতা ভাবের আক্রমণ ও পরাজয় উপায়, কর্ণের আক্রমণ ও বধ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৯৩—৩৯৬ পৃঃ।

শৈল্যপর্ব্ব—কামের শেষ-আবরণ সাত্ত্বিক-কামের আক্রমণ ও পরাজয় উপায়, মদ্ররাজ শৈল্যের আক্রমণ ও বধের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩৯৭—৩৯৯ পৃঃ।

সৌপ্তিক-পর্ব্ব—এইবার জীবত্বের শেষ আবরণ অহঙ্কারতত্ত্ব দুর্য্যোধন, কর্ম্মাভিমান—কৃতবর্ম্মা, মমতা—কৃপাচার্য্য ও প্রতিহিংসা—অশ্বত্থামার স্বরূপ আক্রমণ ও পরাজয় উপায় দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও উরুভঙ্গ, অশ্বত্থামাদির আক্রমণ, অশ্বত্থামার মস্তকমণি হরণ, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার পলায়ন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইগুলিকে একেবারেই নষ্ট করিতে নাই, মার্জ্জনা করিয়া দর্পহীন করিয়া যেন ঘুম পাড়াইতে হয়, তাই এই অধ্যায়ের নাম সৌপ্তিক-পর্ব্ব। ৪১০—৪১৮ পৃঃ।

অনুশোচনাপর্ব্ব—বিষয়-মোহ নাশের পরে, এইবার কৃত কর্ম্মের অনুশোচনার বিকল্প আক্রমণ করিবে, তাহার স্বরূপ এই অনুশোচনা বা নারীপর্ব্ব। ৪২১—৪২৮ পৃঃ।

শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্ব—পূর্ণরূপে বিষয়-বিচ্যুত শুদ্ধ-মনের বিকল্পহীন শান্ত-অবস্থায়, মনকে কিরূপে ব্রহ্মে লয় অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিতে হয় তাহার উপায় ভীষ্মদেবের উপদেশ দান ও নির্ব্বাণের মধ্যে প্রদর্শন হইয়াছে। ৪২১—৪২৮ পৃঃ।

অশ্বমেধপর্ব্ব—এইবার জীব গুণাতীত-রাজ্যে উঠিলে কেমনে কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে ভগবান উদ্দেশে বলিদান করিয়া, পূর্ণরূপে কর্ম্মফল বন্ধনের অতীত হয়, পাণ্ডবের অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪৩০—৪৪০ পৃঃ।

আশ্রমিক ও মৌশলপর্ব্ব—কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া গেলে, কেমনে জীবের নিকট হইতে অবিদ্যা মায়া ও বিদ্যামায়া উভয়ই অন্তর্হিত হইয়া শুধু ব্রহ্মরাজ্য মাত্র অবশেষ হয়, এইসব সত্যবতী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কুন্তি দেবী আদির তিরোভাব ও যদুবংশ সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ৪৪৩—৪৪৭ পৃঃ।

মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্ব্ব—বিষয়-নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মপ্রবৃত্তির উদয়ই, শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান শুনিয়া পাণ্ডবের রাজ্যত্যাগ করিয়া স্বর্গ উদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়া। ব্রহ্মরাজ্য আরোহণই, স্বর্গসুখও ত্যাগ করিয়া গুহালোকে প্রস্থান। এইরূপে বিচিত্রবীর্য হইতে কুরুবংশের জন্ম হইয়া আবার তাহাতে যাইয়া লয় হওয়া পর্যন্ত, জীবজীবনের অষ্টাদশ অধ্যায় অষ্টাদশ-পর্ব্বে বর্ণনা করিয়া, মহাভারতের লীলার পরিসমাপ্তি হইল।

৪৪৮— ৪৫৯ পৃঃ।

নিবেদন—এই গ্রন্থের লীলা অংশ সর্ব্ব প্রকারে মূলভারতের অনুরূপ করিয়া লিখা হইয়াছে, কোথাও কল্পনার সহায়তায় কিছুই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পরস্পরের উক্তিগুলিও যথাসাধ্য মূলানুগত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কেবল কিছু সংক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছি মাত্র। তবু মহাভারত বিরাট-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ বলিয়া, সংগ্রহে কোন প্রকার ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। আর ঐ গ্রন্থ আমার মত মূর্খ দ্বারা লিখিত বলিয়া এবং ছাপাইবার কালেও উপযুক্ত সংশোধক না পাওয়ায়, অনেক স্থানেই ভাষার ত্রুটী ও বর্ণ বিপর্য্যয়াদি বহু দোষ রহিয়া গেল, পাঠকগণ নিজগুণে সেই দোষ মার্জ্জনা

করিয়া লইবেন। আশা করি দ্বিতীয়বারে কোন বিজ্ঞ-ব্যক্তি দ্বারা ইহার সংশোধন হইবার সুযোগ হইবে।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়েরই প্রথমে সেই অধ্যায়ের একটী সংক্ষেপ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, অধ্যায়টী পড়িয়া পরে এই পরিচয় পড়িলে সকলেই বিশেষ আনন্দ পাইবেন। প্রথমে এই পরিচয় বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন হইবার কথা। কেননা প্রায় সমস্তই নূতন তত্ত্বের বিষয় বলা হইয়াছে।

এইগ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়ই সৃষ্টির পূর্ব্বের ব্রহ্ম সংবাদ ও তাহা হইতে সৃষ্টির বিকাশ-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই সব বৈদান্তিক জটীল-তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে নিরস ও দুর্ব্বোধ্য বোধ হইবে। আদিপর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া পরে সেই অংশ পড়িলে, সকলেই তাঁহার তত্ত্ব আস্বাদন সহজে বুঝিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের কোন তত্ত্বই প্রথমে কাহারও নিকট শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, সমস্তই সেই অদ্ভুত-বীর্য্য মহাপ্রভুর অযাচিত দান-সম্পদ্। মহাপ্রভুর দান ও হিন্দুদের আদরের ভগবানের ভক্তবৎসল-লীলা, তাতে হিন্দুর আদর্শ ভক্তপ্রধান পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীদেবীর লীলার আলোচনা বলিয়াই, এই গ্রন্থ লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইলাম। অনুগ্রহ করিয়া কেহ এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলেই, অধম কৃতার্থ হইবে। পাঠক ও শ্রোতাগণের আশীর্ব্বাদ ও চরণ রেণু প্রার্থনা করিয়া এই স্থানেই ভূমিকার শেষ করিলাম। ইতি ১৩৩৩ সন, ভাদ্র।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী—
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত।
পোঃ—বৈদ্যেরবাজার
গ্রাঃ—হামছাদী (ঢাকা)

মহাভারত-রহস্য

বা

জীবত্বের পথ পরিচয়।

সূচনা।

নমোব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

শিষ্য।—গুরুদেব! বেদ-বেদান্তের নিত্য ও অনিত্য বিষয়ে কত তত্ত্বই শ্রবণ করিলাম, কিছুই যে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমরা সহজে ধারণা করিয়া রাখিতে পারি, এমন করিয়া বুঝাইবার কি কোনও উপায় নাই?

গুরু।—আছে বই কি বাবা! বেদ উপনিষদাদির তত্ত্বকথা, দৃষ্টান্ত-দ্বারা সহজে বুঝাইবার জন্যই যে পুরাণের সৃষ্টি। বেদকে দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ণ করে বলিয়াই এর নাম 'পুরাণ' রাখা হয়।* বেদ—শুধু রাজাদেশের মত নীরস কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশমাত্র; কেবল 'এইরূপ কর' 'এইরূপ করিও না'

* ষট্ সন্দর্ভ গ্রন্থে রূপগোস্বামীর মীমাংসাকৃত বাক্য।

আদেশ করিয়া রাখিয়াছে; পুরাণ—ভ্রাতার মত কোন্ কার্য্যের কি ফল বা কি লাভালাভ, তাহা জীবনের দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছে। বেদ ও পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় এক বলিয়া উভয়ই বেদ। এস, আজ তোমাদিগকে রহস্যসহ পুরাণ শ্রবণ করাই।

শিষ্য।—প্রভু! পুরাণ যে বহু, কোন্ পুরাণ শ্রবণ করিব?

গুরু।—বৎসগণ! ভাল কথা স্মরণ করাইয়াছ। পুরাণ নয়, অদ্য তোমাদিগকে পুরাণসকল হইতেও অধিকতর জ্ঞানময়, সরল, এবং সর্ব্ব উপনিষদ্, বেদ, বেদান্ত ময় এক অপূর্ব্ব গ্রন্থের রহস্য শ্রবণ করাইব।

শিষ্য।—সেই মহাগ্রন্থের নাম কি প্রভু?

গুরু।—সেই গ্রন্থের নাম মহাভারত।

শিষ্য।—প্রভু! মহাভারতকে ত আমরা ইতিহাস বলিয়াই জানিতাম, উহা এমন ধর্ম্মগ্রন্থ!

গুরু।—মহাভারত ইতিহাসই বটে, কিন্তু তাহা কিসের ইতিহাস জান কি? আজ এই গ্রন্থের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। এক বেদ, উপনিষদীয়, বৈদান্তিক ইত্যাদি জ্ঞানযোগে বৃহৎ হইয়া উঠিলে, এক জীবনে অধ্যয়ন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তাই ব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণেরও চারিটী বিভাগ করিয়া, বেদের এক এক ভাগের আলোচনার ভার এক এক দল ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিলেন। কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মণগণ পৃথক্ পৃথক গণ্ডি করিয়া, নিজ নিজ তত্ত্ব ভিন্ন অন্য তত্ত্বে শ্রদ্ধাহীন ও বাদকারী হইয়া উঠিলে, এই দোষ দূর করিতে এবং সর্ব্বপ্রকার সাধনই যে সত্য ও এক ফল দানকারী তাহা বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মতত্ত্ব সকল দৃষ্টান্ত সহ একত্র করিয়া পুরাণ রচনা করিলেন। ইহাও সুবৃহৎ অষ্টাদশ গ্রন্থে অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিল দেখিয়া, শেষে তিনি পুরাণ সকলের সার কথা একত্র করিয়া এই মহাভারত প্রণয়ন করিলেন। এই

এক গ্রন্থের মধ্যে আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বজ্ঞান একত্র সমাবেশ করিয়া দিলেন বলিয়াই এই মহাভারত গ্রন্থের তুল্য আর কোন গ্রন্থই নাই। তাই লোকে বলিয়া থাকে, 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে'; এই মহাগ্রন্থ সর্ব্ববেদ, বেদান্ত ও পুরাণময়। তাই প্রবাদ আছে যে, সমগ্র শাস্ত্র গ্রন্থ সহ তৌল করিয়াও এই গ্রন্থের ভার অধিক হইয়াছিল। এখন বুঝিলে বৎস, মহাভারত কিসের ইতিহাস?—হিন্দুর সমস্ত জ্ঞান-তত্ত্বের ইতিহাস। কোন্ জ্ঞান কে প্রচার করেন, কে কিভাবে তাহা সাধন করিয়া মুক্ত হন, কত প্রকার সাধন-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই মহাভারত তাহার ইতিহাস। বিশেষতঃ ইহার ঐতিহাসিক লীলার মধ্যে বেদ-বেদান্তের গুহ্য তত্ত্বসমূহ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে বলিয়াও এই গ্রন্থ বেদ-বেদান্তের ইতিহাস। মহাভারত কেবল পরমার্থেরই ইতিহাস নয়, বিষয় রাজ্যেরও অতি মহান্ ইতিহাস; জীবের অতি মঙ্গলকর মহাগ্রন্থ।

শিষ্য।—বিষয়রাজ্যেরও কিসের ইতিহাস, তাহাও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন প্রভু।

গুরু।—বৎসগণ! আর্য্যঋষিদিগের মতে জ্ঞান নিত্য, সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, সূর্য্যদেবের ন্যায় চিরবিকাশ প্রাপ্ত। পৃথিবীর গতির জন্যই যেমন সূর্য্যের উদয়, অস্ত, হ্রাস ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কালের গতিতে জ্ঞানেরও তেমন স্বভাবতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ছিল না এমন নূতন জ্ঞান জগতে হইতেই পারে না। জীবের দেহ যেমন বাল্যহইতে যৌবন পর্য্যন্ত ক্রমে পুষ্ট হইয়া পরে আবার ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া বার্দ্ধক্যের কোলে ঢলিয়া পড়ে, প্রাতের তরুণ সূর্য্য যেমন ক্রমে তেজস্বী হইয়া মধ্যাহ্নের প্রচণ্ডতায় উপস্থিত হইয়া, আবার ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া অপরাহ্নে অস্তাচলে ডুবিয়া যায়; আবার তামসী নিশার অন্তে, নিদ্রাভঙ্গে জীবগণের ন্যায় উঠিয়া, পুনরায় উদয়গিরি হইতে অস্তাচলের পথে গমন করিতে থাকে,

জ্ঞানও সেইরূপ। জীবের লীলা-বৈচিত্র্যের জন্য, জ্ঞানও ক্রমে প্রকাশিত হইয়া আবার অস্তাচলে যাইয়া কিছুকাল অন্ধকারে অবস্থানের পর, পুনঃ তাহার জ্যোতির্ম্ময় দেহ নিয়া আবির্ভূত হয় এবং কতক সময় লীলা করিয়া আবার লুক্কাইত হয়। জগতে কালের এই ধর্ম্ম নিত্য ও সত্য। সমস্ত বস্তুতেই এই স্বভাব ক্রিয়া করিয়া থাকে। জ্ঞানের মধ্যাহ্নে নরগণ কত উচ্চ জ্ঞান ও সভ্যতা লাভ করিতে পারে, কত মহৎশক্তি তত্ত্বজ্ঞান ও ক্রিয়াজ্ঞান, তাহাদের আয়ত্ব হইতে পারে, মহাভারত মনুষ্যের সেই পূর্ণতার ইতিহাস গ্রন্থ। সেইকালে আর্য্যগণ কতদিকে কত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সমস্ত জগতের পূজ্য ও বরণ্য হইয়াছিলেন, এই মহাভারত তাহারই ইতিহাস। আত্মবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, চরিত্রবিজ্ঞান, যুদ্ধবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, কুটনীতি, অর্থনীতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ে তাহারা কত উন্নত হইয়াছিলেন, মহাভারত তাহারই নিদর্শন। বৎসগণ, আজ যে যে যন্ত্রশিল্প দেখিয়া মানবকে দেব-শক্তিশালী মনে করিতেছ, ইহার কোনটিই নূতন নয়, পূর্ব্বেও এই সব শিল্প জগতে ছিল।

শিষ্য।—প্রভু! আজকালের মত জলযান, আকাশযান, বিনাতারে সংবাদ আদান প্রদান কথাও কি মহাভারতে উক্ত আছে?

গুরু:—আছে বৈ কি বাবা, সে সব উক্তিকে আমরা এতদিন অতিশয়োক্তি বা কল্পনার কথা বলিয়া মনে করিতাম। "পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিদুরপ্রেরিত মনোমারুতগামী যন্ত্রচালিত তরণীর সাহায্যে পলায়ন করিল"। এইরূপ বর্ণনা এতদিনে দ্রুতগামী ষ্টীমার দেখিয়া সম্ভব মনে হইতেছে। শৌভরাজের আকাশদুর্গে চড়িয়া শত্রুর দেশ আক্রমণের বর্ণনা, আজকালের আকাশযান জেপলিন দেখিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে। এক অস্ত্রাঘাতে আকাশযান ধ্বংশ আজ বোমা দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে হস্তিনা হইতে দ্বারকাগমন, মুহূর্ত্তমধ্যে সংবাদ লাভ, অন্তকার দ্রুতগামী যান ও তারহীনবার্ত্তা প্রেরণ দ্বারা সম্ভব হইতেছে। বৎসগণ! মহাভারতের ব্রহ্মাস্ত্র রুদ্রাস্ত্রও বুঝি আবার একদিন প্রকাশিত হইবে। এখন মহাভারত আরও কিসের ইতিহাস তাহা শ্রবণ কর। কেমন ধর্ম্ম ও কিরূপ কর্ম্মসাধন দ্বারা ভারতবাসী আর্য্যত্বের মহৎ সিংহাসনে উঠিয়া, পৃথিবীতেই দেবত্ব লাভ করিয়াছিল এবং বিষয় সংসারকে স্বর্গের নন্দনকানন করিয়া তুলিয়াছিল, এই মহাভারত তাহার ইতিহাস। আবার কালপ্রভাবে কোন্ দোষের প্রশ্রয়ে, আর্য্যজ্ঞানগৌরবের গুণমণ্ডিত উজ্জ্বলসৌধ একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল, নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত হইয়া দেবত্বের সিংহাসনে পিশাচের প্রেত নৃত্য আরম্ভ হইল, মহাভারত তাহার ইতিহাস। জীব কেমন সাধনা ও ভাব গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চজ্ঞান ও কৌশল শিক্ষা করিলে তাহা জগতের মঙ্গল বিধান করে; আবার কেমন ভাবের দ্বারা সেই জ্ঞান ও কৌশল দেশ, সমাজ ও জাতির ধ্বংশের কারণ হয়, এই মহাভারত তাহারও ইতিহাস।

শিষ্য।—গুরুদেব! কোন্ কর্ম্মের সাধনা গ্রহণ করিলে জ্ঞানসমূহ মঙ্গল প্রসব করে, আবার কিসে সেই জ্ঞানরাশি অমঙ্গলের কারণ হয়, সেই তত্ত্বটুকু আরও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

গুরু।—বৎসগণ! শাস্ত্র ও সদাচারের নিকট নিজ স্বাধীনতা বলিদান না করিতে পারিলে, কিছুতেই জ্ঞান ও বিদ্যা মঙ্গলপ্রসূ হয় না। পূর্ব্বকালে আর্য্যঋষিগণ পূর্ণমানবের ব্যবহার, শিক্ষা ও কর্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যেক মানবের পূর্ণতালাভের বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সেই বিধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য ছিল। যতদিন তাহা নির্ব্বিচারে প্রতিপালিত হইয়াছিল, কপটতা, পক্ষপাত ইত্যাদি দোষ দ্বারা তাহা দুষ্ট না হইয়াছিল, ততদিনই আর্য্যভূমি আর্য্যসন্তান-

গণদ্বারা পরিবৃত হইয়া জ্ঞান ও সভ্যতায় জগতে বরণ্য ছিল; আর্য্যস্থান ভূলোকে স্বর্গের আনন্দকানন তুল্য ছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছিলনা, অকালমৃত্যু ছিল না, অভাব অশান্তি ছিল না, জীব নির্ধন হইয়াও দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করিত না। কল্পনা নয় বৎস, এ দেশ সত্যই তেমন ছিল। বিদেশীয় পরিব্রাজকদের লিখিত বিবরণে অনেক পরবর্ত্তী কালেও এ দেশের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে এই সকল কথা লিখিত আছে; কিন্তু আজকাল আমাদের নিকটই সে সব অলীক বলিয়া মনে হয়।

শিষ্য।—প্রভু! সত্যই কি মানুষ এত উচ্চ সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারে?

গুরু।—বৎস, প্রকৃত শিক্ষা শাসন ও সঙ্গগুণে, মানব দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে এবং তার অভাবে মানব পশু ও পিশাচ অপেক্ষাও অধম হইয়া থাকে। সেকালে পুরুষদের কি কি গুণ ও নারীদেরই বা কি কি গুণ, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পূর্ণতা করিতে নর ও নারীর শিক্ষা দান হইত। শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিগুণ ও শ্রীমতীর চৌষট্টিগুণ হইতে নর ও নারীকে চৌষট্টিকলা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া পূর্ণ নরনারী করিয়া তোলা হইত। প্রত্যেক নর নারীকে রাজশাসন ও সমাজের শাসনে রাখিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহার, বিহার, ও অন্যান্য কর্ম্ম সম্পাদন করান হইত। দেহ নীরোগ ও সুস্থ করিবার জন্য কতটুক নিদ্রা যাওয়া উচিত, কোন্ সময়ে কি পরিমাণ আহার করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশ, জিহ্বায় ও দন্তে রোগ না জন্মিতে পারে, এমন করিয়া মুখ প্রক্ষালন নির্দ্দিষ্ট ছিল, কুচ্‌কী ও গুহ্যে রোগ না জন্মিতে পারে এমন ভাবে বাহ্যপ্রস্রাব শৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এমন কি জীবের জন্মের মূল স্ত্রী পুরুষ মিলনকেও, উত্তম মানব জন্মিবার জন্য বিধির ও পিতামাতার শাসনাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নীরোগ ও সুস্থ শরীরে, শুভতিথিতে, উত্তম

আর্ত্তবস্রাব হইলে স্ত্রী ও স্বামী মিলিত হইতে পারিত; সকলেই নির্ব্বিচারে বিধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য ছিল। শাস্ত্রের বচন দেখাইতে পারিলে, সম্রাটও বিনা প্রতিবাদে রাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত; অজ্ঞানতঃ বিধি লঙ্ঘন করিলেও ঋষিরা রাজসকাশে কোন শাস্তি গ্রহণ করিয়া বিধির অনুবর্ত্তিতা রক্ষা করিত; শাস্ত্রবিধিই দেশের প্রকৃত শাসক ছিল। কেহ ভ্রমে মহাপাপ করিয়া বসিলে, সে শাস্ত্রব্যবস্থামতে অকম্পিতভাবে তুষানল বা তপ্তঘৃত পান করিয়া দেহ ত্যাগ করিত; রাজাকে প্রাণদণ্ড বিধান করিতে হইত না। এইরূপে আর্য্য ঋষিগণ স্বাধীনতাকে শাস্ত্র বিধির অধীন করিয়া, পূর্ণ আর্য্যত্ব লাভ করিয়া, সকল প্রকারে সুখ, শান্তি ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিল। ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ জ্ঞানের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুবর্ত্তীতা ভিন্ন কখনো তাহা লাভ করা যায় না। অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥ আসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ দর্শনম্। এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্ত মজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

শিষ্য। প্রভু! মহাভারতের কালেত সকলেই শাস্ত্রানুবর্ত্তী শিক্ষা ও শাসনের অধীন ছিল, তথাপি এই আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্য গৌরব ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল কেন?

গুরু। বৎসগণ, শাস্ত্রানুবর্ত্তীতার লঙ্ঘন দ্বারাই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। কালধর্ম্মে মমতা, আলস্য, পক্ষপাতিতা ও চতুরতা আদি দোষ যখন শাস্ত্রবিধির কঠোরতার বেড়ায় ঘুন ধরাইয়া দিল, তখনি আর্য্য সভ্যতা ধ্বংশ হইয়া গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও পাণ্ডবগণই আর্য্যের পূর্ণশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া

ছিল। এইজন্য তাহারাই কেবল যত মহত্ত্ব, ত্যাগ, ক্ষমা, ও বীর্য্যের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণ নিজেদের মৃত্যুছিদ্রপর্য্যন্তও বলিয়া দিতে পারিয়াছিল, পাণ্ডবগণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভ্রাতাদের কত অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল; তাই তাহারা সংসারী হইয়াও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিল। আর দুর্য্যোধনের পক্ষে কেহই শাস্ত্রানুবর্ত্তী ছিল না, তাহারা স্ব স্ব সুখের অন্বেষণে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ধাবিত হইয়াছিল। সেই কালের সম্রাট, জরাসন্ধ ও তার অধীন রাজা কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র, শৌভরাজ, কালযবন ইত্যাদি সকলেই যথেচ্ছাচারী, ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘনকারী, ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ ছিল। দুর্য্যোধন কর্ণাদিও সেইপথের পথিক্ হইয়া আর্য্যভূমির ও আর্য্যজ্ঞানের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। ইহারা প্রত্যেকেই গুরুবর্গের, শাস্ত্রের ও ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিত না। শৈশবে পিতামাতার অন্যায় আদর, স্বেচ্ছামত ভোগ-বিলাস ও কুসংসর্গে থাকায় ছল কপটতা শিক্ষা করিয়া, ঈর্ষায় আর্য্যের সেই শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া নিজেরাও অকালে ধ্বংশ হইল এবং আর্য্যভূমির জ্ঞান, গরিমা, সুখ, শান্তি সমস্তই অতল জলে ডুবাইয়া দিল।

শিষ্য। গুরুদেব! কর্ণ অতি মহৎ লোক ছিল। তবু সে কেন যে দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া পাণ্ডবের হিংসা করিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারি না।

গুরু। হাঁ বৎস! কর্ণ মহান্ ও শক্তিমান্ ছিল বটে, কিন্তু তার সে শক্তি মঙ্গল-শক্তি নয়, অমঙ্গল-শক্তি। ঋষি দ্রোণাচার্য্য ইহা বুঝিয়াই তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দান করিতে স্বীকৃত হন নাই। সে ছদ্ম বেশে নাম ও জাতি লুকাইয়া, পরশুরামের নিকট হইতে মন্ত্র ও বিদ্যালাভ করিল, এবং এইরূপে শক্তিশালী হইয়াই সে দেশের, জাতির ও ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ ঘটাইল।

শিষ্য। গুরুদেব, কর্ণকে অস্ত্র শিক্ষা না দিলে, শাস্ত্র ও ঋষি একটী মহাশক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখিত না? কর্ণের বীরত্বশক্তি ত তবে জগতে প্রকাশিতই হইত না।

গুরু। এই সব যুক্তি আসিয়াইতো আসুরশক্তি শাস্ত্রানুবর্ত্তিতাকে নষ্ট করিয়া থাকে। কর্ণের এই শক্তিতে জগতের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া দেখিয়াছ কি? কর্ণ যদি যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইত, ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংশী এই ভীষণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধই সংঘটিত হইত না; দুর্য্যোধন একমাত্র কর্ণের বলের আশ্রয় লাভ করিয়াই পাণ্ডব-দিগের বিপক্ষ হইয়াছিল। কর্ণের শক্তি দেশদাহকারী দাবানলশিখা, এজন্যই ঋষি দ্রোণাচার্য্য তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দিতে চাহেন নাই। এই জন্যই অহঙ্কারী, দাম্ভিক, হিংসাপরায়ণ কুটিল লোককে ব্রহ্মাস্ত্রাদি দান করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছে। কর্ণের দানাদি সমস্ত সৎকর্ম্মই দম্ভ ও অহঙ্কার দোষে দুষ্ট ছিল, তাই তাহার কোনদিকেই সুফল লাভ হয় নাই। কর্ণ নিজের যুদ্ধের সাধ মিটাইবার নিমিত্ত জগতের সমস্ত বীরকুলই ধ্বংশ করিয়া ফেলিল। বৎস, গুরু ও শাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ স্বাধীন পথে সুখান্বেষণে স্পৃহা করে, সেই স্পৃহাই তাহার মহাশত্রু হইয়া দাঁড়ায়. ইহাই বর্ত্তমান সময়ের কাল-ধর্ম্মের মোহ। দেহের ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব সুখের অন্বেষণে ধাবিত হইলে, জীবের দেহই যেমন নাশ প্রাপ্ত হয়, দেশের প্রত্যেকেই স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব সুখের অন্বেষণে ধাবিত হইলেও তেমন দেশ, জাতি, সমাজ সবই ধ্বংশ হইয়া যায়, এবং জীবের সকল সুখ শান্তির আশাও চিরতরে নিবিয়া যায়। কলির প্রথম সম্রাট জরাসন্ধের দলের কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, রুক্মি, ভগদত্ত, শৌভরাজ, কালযবন, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সকলকেই এই উচ্ছৃঙ্খল অসুর বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রশাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন পথে সুখান্বেষণই আসুর প্রকৃতির লক্ষণ। ভগবদ্ গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব ও আসুর প্রকৃতির

যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলেই, জরাসন্ধাদিকে কেন অসুর বলা হইয়াছে বুঝিতে পারিবে। অভয়, চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, দান, সংযম, ভগবৎভজন, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্যপরতা, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তচিত্ততা, ঈর্ষাহীনতা, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা (বিনয়), লজ্জাপরতা, অচপলতা, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য্যশীলতা, শুচি, অদ্রোহ ও অমানিতা এই ষড়বিংশতিগুণ দৈব। আর দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও মোহপরতা আসুর প্রকৃতির লক্ষণ। পাণ্ডবদের মধ্যেই কেবল দৈব প্রকৃতির সকল লক্ষণ দেখিতে পাইবে, আর দুর্য্যোধনাদি সবই অসুর।

শিষ্য। প্রভু! জীবের স্বাধীনতাস্পৃহা কি এতই অনিষ্টকর? পরাধীনতার মধ্যে জীব কি করিয়া তাহার শক্তি সামর্থ্য প্রদর্শন করাইবে।

গুরু। বৎসগণ, ব্যভিচারের নাম স্বাধীনতা নয়, বিধির বিরোধী হইয়া অবিধির অধীনতাও স্বাধীনতা নয়। বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রথমতঃ বান্ধাপথে খাতায় লিখিতে হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে পরে অখাতায় ইচ্ছামত লিখিবার শক্তি জন্মে। সঙ্গীত শিখিতেও সুর সাধিতে হয়, বাদ্য শিখিতে হাত সাধিতে হয়, মন্ত্রেরও প্রথম প্রথম বান্ধানিয়মে শিক্ষালাভ করিলে, পরে স্বাধীনতার অধিকার জন্মে। তেমনি পূর্ণ-মানবের সাধনার জন্য শাস্ত্র ও সদাচার মানিয়া পূর্ণতা লাভ করিলে ত তুমিও স্বাধীনতার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিবে; তখনি যথার্থরূপে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে। বাবা, শাস্ত্র ও সদাচার মানিয়া, সংযম ও শাসনে থাকিয়া শিক্ষালাভ করাতেই, পাণ্ডবগণ অসাধারণ ত্যাগ, ক্ষমা, তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততা আদি জীবের প্রকৃত মহত্ত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, স্বেচ্ছাচারী, অশাসনে শিক্ষিত দুর্য্যোধনাদি এইরূপ শক্তি কখনও লাভ করিতে পারে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও পাণ্ডবগণের

ত্যাগ, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ধর্ম্মরক্ষণে দৃঢ়তা, শীলতা, শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা—আর ধার্ত্তরাষ্ট্রদের শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘন, মর্য্যাদা লঙ্ঘন, অশীলতা, দুর্ব্বৃত্ততা, ভ্রাতৃদ্বেষ, কপটাচার, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, এই দুইটী পাশাপাশি রাখিলে কোন্ পথকে জীবের আদর্শ ও জগতের মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয় বাবা? যথেচ্ছাচারের পথে সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া, কখনো কেহ প্রকৃত জ্ঞান ও শ্রেয়ো লাভ করিতে পারে নাই। এইরূপ ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়, তাহা স্বেচ্ছাচারীতা নামক প্রবৃত্তির অধীনতা মাত্র; এর নামই দুর্য্যোধনত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে না চাওয়া বৃত্তি। একই গুরুর নিকট একরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও সংযমীর জ্ঞান মহত্বের নিদান ও জগতের মঙ্গলের হেতু হয়—আর অসংযমী স্বেচ্ছাচারীর জ্ঞান হীনতার মূল ও জগতের অমঙ্গলের কারণ হয়। শাস্ত্র ও সদাচার লঙ্ঘনে কখনও সুফল লাভ হয় না, ইহকালেও সুখ শান্তি পায় না, পরকালেও মুক্তি পায় না। এইজন্যই ভগবদ্গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।" শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা নিজের কামের তৃপ্তিপথে ধাবিত হয়, তাহাদের কোন দিকেই সিদ্ধি অর্থাৎ কৃতকার্য্যতা লাভ হয় না, ইহকালে সুখ ও পরকালেও গতি হয় না।

শিষ্য। প্রভু, কেন তাহারা সুখী হয় না আরও একটুকু সরল করিয়া বুঝাইয়া দিন; স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পার্থক্যও দেখাইয়া দিন।

গুরু। বৎসগণ, আজকালের গৃহীগণের গৃহের দশা দেখিলেই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। একখানা নৌকার কাষ্ঠখণ্ডগুলি ও লৌহ শলাকাগুলি যদি প্রত্যেকে স্বাধীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত হয়, তবে নৌকাখানার দশা কেমন হয় বল দেখি? তখন কি নৌকা আর আরোহী-দিগের সুখের স্থল হইয়া, তাহাদিগকে জল হইতে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম

থাকে? জীবের কর্ম্মসাগরের আশ্রয়-তরণী এই সংসার বা গৃহের দশাও সেইরূপ বাবা। গৃহের উপাদান মাতা, পিতা, সন্তান, বধূ, দাস দাসী—আজ সকলেই আপন আপন সুখ অন্বেষণে ব্রতী হইয়া,কেবল নিজ তৃপ্তি সার বুঝিয়া, সেই সুখের সংসারকে অশান্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। রমণীর রমণীয়তা—মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, বধূত্ব ও কন্যাত্ব গিয়াছে; পুরুষের পুরুষত্ব—পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, প্রভুত্ব, ও দাসত্ব লোপ পাইয়াছে। রমণীর মাতৃত্ব—নিজ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তদ্‌গত ভাবে সন্তান-সেবা আর নাই, সন্তানকে হয় গর্ভেই নষ্ট করা হয়, না হয় অন্যের সাহায্যে পালন করা হয়; পত্নীত্ব—স্বামীর তৃপ্তির জন্য পত্নীর আত্মদান নাই; বধূত্ব—শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ও শাসন মানাও নাই। পুরুষের পুত্রত্ব, স্বামিত্ব, ও পিতৃত্বের গৌরবও নাই। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল আসঙ্গ অধিকারে স্বীকৃত হইতেছে; পুত্রত্ব—প্রতিদান হীন পিতা হইতে অর্থাদি গ্রহণে স্বীকৃত; দাসত্ব—ফাঁকি দিয়া কেবল মজুরী গ্রহণে স্বীকৃত হয়। কি পুরুষ কি রমণী সকলেই ভগবান, ধর্ম্ম, জাতি, দেশ ও সেবা ভালবাসা বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয় সেবা ভোগবিলাস লইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ধাবিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতাকে শাস্ত্রানুবর্ত্তিতার নিকট বলিদান না করিলে, কিছুতেই এমন হৃদয়ে জ্ঞান দান দ্বারা কোন ফল লাভ হইবে না, ইহাদের জ্ঞানে ইহাদেরতো সর্ব্বনাশ হইবেই, জাতি ও দেশের সর্ব্বদিকে সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

শিষ্য। প্রভু, মহাভারতের মধ্যে কতগুলি অমানুষী জন্ম ও কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, এই গুলিকেও কি সত্য মানিয়া লইতে হইবে? না এইগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বা রূপক কল্পনা ধরিতে হইবে।

গুরু।—বাবা, আজ যাহা আলৌকিক বা অসম্ভব ঘটনা বলিয়া বোধ করিতেছ, দুই দিন পরে হয়ত তুমিই তাহা সম্ভবপর মনে করিবে। মহাভারতের কত বর্ণনা, যাহা দশ বৎসর পূর্ব্বেও অপ্রাকৃত বা অসম্ভব কল্পনা

মনে করিয়াছি, আজ যে সে সকল সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এখন যাহা অসাধারণ বলিয়া গণ্য, তাহা যে কয় বৎসর পরে সাধারণ হইবে না তাহার প্রমাণ কি? যোগবল, ভাল আত্মা ও মন্দ আত্মার অস্তিত্ব এবং কর্ম্ম-শক্তি তো এখনি স্বীকৃত হইয়াছে। মন্দ আত্মাই বোধ হয় উপদেবতা আর ভাল আত্মাই বোধ হয় দেবতা। আর্য্যঋষিগণ এই দুইয়ের মধ্যে বহু শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কালে বোধ হয় আমাদেরও এই সব তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। আরও বাবা, ভগবৎরাজ্যই অমানুষ রাজ্য, মানুষী জ্ঞানবিশ্বাস লইয়া সে রাজ্যে যে প্রবেশ করিতেই পারিবেনা। সৃষ্টির বহির্ম্মুখী ভাবই মানুষী—প্রাকৃত জ্ঞানময়; দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সীমাবদ্ধ ভাবে কর্ম্ম করাইতেই আমাদের মানুষী জ্ঞানের জন্ম। সৃষ্টির অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ সবই অমানুষ, অপ্রাকৃত ও অসীম শক্তি-মণ্ডিত। জীবের বীর্য্য মধ্যে জীবের আত্মার বিকাশ কি প্রাকৃত ঘটনা? বীর্য্যকণিকা হইতে অস্থি, মজ্জা, মাংস ইত্যাদির উদ্ভব হইয়া আকার সহ জীবের জন্ম কি প্রাকৃত ঘটনা? স্বপ্নাবস্থার সুখ দুঃখ, সুষুপ্তাবস্থার আস্বাদন এসকলই অপ্রাকৃত, অসম্ভব ও অবোধ্য নয় কি? যাহারা প্রাকৃত রাজ্য হইতে অপ্রাকৃত রাজ্যে যাইতে চায়, তাহাদের জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থ। তাই প্রত্যেক শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, অবিশ্বাসীকে ইহা উপদেশ করিবে না। তাই বুঝি চৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন "অলৌকিক ঘটনায় যার না হয় বিশ্বাস। ইহকালে পরকালে সর্ব্বলোক নাশ" ॥ ধর্ম্মরাজ্যে যাইবারই তাহার অধিকার জন্মে নাই। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, শাস্ত্র ও ঋষি-বাক্যে শ্রদ্ধা হইলে নর সাধন স্রোতে পতিত হইল, ইহা স্রোতাপন্ন নামক জীবের প্রথম সমাধি। ভক্তিশাস্ত্রে ও বলিয়াছে আদৌ শ্রদ্ধা। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"। শ্রদ্ধা জন্মিলেই তৎপরায়ণতা আসে, সংযতেন্দ্রিয়তায় মতি হয়, তবেই জ্ঞান লাভে

সক্ষম হয়। অশ্রদ্ধার পাঠে কোনই ফল লাভ হয় না। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ॥ (গীঃ ৪—৩৯।৪০) অশ্রদ্ধ ব্যক্তিরা অজ্ঞতাজনিত সংশয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্যত্র ও বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তামস বলিয়া জানিবে। অন্যত্র "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচ তৎ প্রেত্যনো ইহ॥" (গীঃ ১৭-২৮) অশ্রদ্ধায় আহ্বান, দান, তপ যাহা কিছু কর, কিছুই ধর্ম্ম নয়, তাহা অসৎ কর্ম্ম, তাহাদ্বারা ইহকালে পরকালে কোথাও শ্রেয় লাভ হয় না। অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "অশ্রদ্দধানা পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি॥" অশ্রদ্ধাবান পুরুষের ধর্ম্ম সাধনে আমি অপ্রাপ্য, সেই সাধনে তাহারা মৃত্যু ও সংসারের পথেই ফিরিয়া যায়। তাই বলি বাবা, ঋষিদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত ও প্রত্যেক অংশ সত্য মনে করিয়া শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে, নচেৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইবে।

শিষ্য।—অমানুষ জন্মাদি, দেবতা হইতে নরের জন্ম, বস্ত্রাকর্ষণে বস্ত্র না ফুরাণ এই সবও কি বিশ্বাস করিতে বলেন?

গুরু—কেন করিবে না বাবা! প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ও তার অনুবর্ত্তী সিদ্ধ পুরুষগণ, সকলের জীবনই যে অমানুষী ঘটনায় পূর্ণ। যে সকল মানুষ, তাহাদের জীবনী লেখক তাহারা ত্রিলোকের রাজত্ব পাইলেও যে মিথ্যা বলিবার লোক ছিলেন না। আরো তাহাদের অমানুষী শক্তি দেখিয়াই ত যত মানুষের মস্তক তাহাদের পায়ের তলে লোটাইয়া পড়িয়াছিল। বৎসগণ, নিজেদের জীবনেও কত অমানুষ-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছ, মরণোন্মুখ রোগীর স্বপ্নে ঔষধ লাভ, দৈব উপায়ে বিপদ হইতে উদ্ধার ইত্যাদি ঘটনার দিকে বিশ্বাসের চক্ষে চাহিয়া দেখ, অমানুষ ভগবানের কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইবে; আর

অবিশ্বাস নিয়া থাকিলে এই ধার্ত্তরাষ্ট্রদের মত চক্ষের সম্মুখে, বস্ত্র বর্দ্ধন, দুর্ব্বাসার পারণ ও বিরাট-রূপ দেখিয়াও বিশ্বাস আসিবে না। বাবা, বিশ্বাস লইয়া মরাও ভাল, অবিশ্বাস লইয়া জীবনও চাহিও না। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশুর জন্ম দেবতা হইতে কুমারীর গর্ভে বর্ণিত হইয়াছে; অতি-মানুষ শঙ্করাচার্য্য যিনি ষোড়শবর্ষে হাটিয়া সমস্ত ভারত বর্ষের পণ্ডিত ও বৌদ্ধাচার্য্যগণকে পরাজয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নবজীবন আনয়ন করেন, তার জন্মও দেবতা হইতে বিধবার গর্ভে! তবে পাণ্ডবদের জন্মে সন্দেহ কেন বাবা? সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও সেই পথের সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই কত অমানুষী ঘটনা আজও দেখাইতেছেন, তাই বলি বাবা, ঋষি বাক্যও পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিয়া পাঠ করিয়া দেখ, তাহাতে তোমার কি অপূর্ব্ব শক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস নিয়া সহস্র বৎসর পাঠ করিয়াও তোমার কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এস, এখন মহাভারত-রহস্য শ্রবণ করাই।

আদি পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

পরিচয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বের ব্রহ্মরাজ্য সংবাদ।

(ভগবান্ ভগবতীর নিবৃত্ত, শান্ত ও প্রবৃত্ত তিনটী নিত্য স্বভাব হইতেই, সৃষ্ট জীবের আত্মা সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রত তিনটী স্বভাবের অধীনতা নিত্যই লাভ করিতেছে। পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতির সেই নিত্য তিন অবস্থার স্বরূপ প্রদর্শন এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। জীবের অগ্রে নিদ্রা না অগ্রে জাগরণ অবস্থা তাহার যেমন নির্ণয় হয় না, ব্রহ্মের তিন অবস্থারও অগ্রপশ্চাৎ নির্ণীত হয় নাই, বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ক্রমে, নিবৃত্ত, শান্ত ও প্রবৃত্ত অবস্থা বর্ণিত হইবে।)

নিবৃত্ত অবস্থা—ভগবান্ অব্যক্ত প্রকৃতি যুক্ত, অতএব গুণ ও ক্রিয়ারহিত, যেন নিদ্রাগত। এই তত্ত্বে হিন্দুর প্রকৃতির অতীত অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম। গুণ-ক্রিয়ারহিত নিরাকার, কেবল বোধময় বলিয়া এই ব্রহ্মের উপাসনা হয়।

পুরুষ—কেবল বোধযুক্ত চিন্তা ও ক্রিয়া রহিত, তাই আকার সত্বার প্রমাণ নাই, কিন্তু তিনি আছেন নিশ্চয়। মহাভারতে সমাধিস্থ **রাজা প্রতীপ**।

প্রকৃতি।—অব্যক্ত আনন্দসত্বা, কেবল বোধময়ী, আনন্দের হ্লাদিনী আস্বাদন। মহাভারতে, নামরূপহীনা, **গঙ্গানদী**।

এই তত্ত্ব হইতে জীবের সুষুপ্ত অবস্থা ও ব্রহ্ম সমাধি অবস্থার জন্ম।

শান্ত অবস্থা—ভগবান্ কতক ব্যক্ত প্রকৃতিগত, তবু ক্রিয়ারহিত যেন স্বপ্নাবস্থায়। ভোগ্যা প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ এবার ব্রহ্ম ভোগ্য সত্বাবর্গ দেহেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া উঠিলেন, প্রকৃতি ও ভোগদান জন্য তাহার দেহ ইন্দ্রিয় লইয়া সজ্জিত হইয়া দাড়াইলেন; এখনও ক্রিয়াশক্তির জন্ম হয় নাই।

এই তত্ত্ব হইতে হিন্দুর ভেদ হইয়াও অভেদ, দুই হইয়াও যেন এক সত্বা, এক প্রাণ এক দেহ, এই এক সত্বা মিলিত পুরুষ-প্রকৃতি ভাবে ব্রহ্ম উপাসনার জন্ম। এই তত্ত্বের উপাসকগণ এক দেহে স্ত্রী পুরুষ, অগ্র পশ্চাৎ স্ত্রী পুরুষ, পাশাপাশি স্ত্রী পুরুষ, পুরুষের বুকে স্ত্রী, প্রকৃতির নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী পুরুষ আদি আকারে ব্রহ্মের উপসনা করেন।

পুরুষ—প্রকৃতি দর্শন করিয়া তাহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভোগের কল্পনারত হইলেন, তাই বোধও কল্পনারত কিন্তু ক্রিয়ারহিত। মহাভারতে গঙ্গাদেবীযুক্ত **রাজা শান্তনু**।

প্রকৃতি দর্শনে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনের জাগরণই গঙ্গাগর্ভে অষ্ট সন্তান লাভ। মন ভীষ্মের জাগরণে পুরুষের নির্লিপ্ততা শান্ত অবস্থার নাশ।

প্রকৃতি—কতক ব্যক্তা আনন্দ ও চিৎসত্বা, বোধ ও চিন্তাময়ী, আনন্দের সন্ধিনী আস্বাদন। মহাভারতে, মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যময়ী **গঙ্গাদেবী**।

এই তত্ত্ব হইতে জীবের স্বপ্ন ও জল্পনারত অবস্থায় জন্ম হইয়াছে।

প্রবৃত্ত অবস্থা—ভগবান্‌ও পূর্ণব্যক্ত—সর্ব্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে আলোড়ন ও ভোগ করিবার সত্বাসম্পন্ন; প্রকৃতিও পূর্ণব্যক্তা পুরুষের সর্ব্ব প্রকার ভোগ তৃপ্তিদানে সক্ষমা। এই তত্ত্ব হইতে হিন্দুর পুরুষ ও প্রকৃতির প্রত্যেকের পৃথক ভাবে উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম উপাসনার জন্ম হইয়াছে। এই তত্ত্বের উপাসকগণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিবাদি নামে যেমন পরম পুরুষের পূজা করেন, আবার রাধা, লক্ষ্মী, গৌরী আদি করিয়া প্রকৃতি দেবীরও পৃথক পূজা করিয়া তাহাই ব্রহ্ম পূজা হয় মনে করেন।

পুরুষ—এবার বোধ, চিন্তা ও ক্রিয়াশক্তি যুক্ত। শান্ত ভগবান্ এবার বিচিত্রবীর্য্য হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মের বীর্য্য দুই প্রকার ব্রহ্মশক্তি ও মায়াশক্তি। এই দুই শক্তি জাগরণই রাজা শান্তনুর সত্যবতী গর্ভস্থ পুত্রদ্বয় লাভ করা। মহাভারতে ব্রহ্মশক্তি **চিত্রাঙ্গদ** ও মায়াশক্তি **বিচিত্রবীর্য্য**।

প্রকৃতি—পূর্ণব্যক্তা সৎ-চিৎ-আনন্দময়ী, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বোধশক্তি সমন্বিতা, আনন্দের সম্বিত আস্বাদন। ক্রিয়া করিতে হইলেই, ভোক্তা ও ভোগ্য সত্বার উপরেও ক্রিয়ার আধার, আশ্রয়, অবলম্বন জন্য তৃতীয় অপর শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই লীলার জন্য প্রকৃতি দেবী হইতে অসীম ঐশ্বর্য্যময়ী মায়াশক্তি অপরা প্রকৃতির উদ্ভব হইল; ইনিই যোগমায়া দেবী। মহাভারতে, **সত্যবতী**।

যোগমায়া সাহায্যে ভগবান্ চিত্রাঙ্গদ সত্বায় ব্রহ্মরাজ্য গোলকধাম গঠন করিয়া প্রকৃতিসহ লীলারস আস্বাদন করেন। মহাভারতে ইহাই গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদের অন্তর্দ্ধান। দ্বিতীয় বিচিত্রবীর্য্য সত্বায় মায়াময় জীবরাজ্য গঠন করিয়া লীলা দর্শন করেন, মহাভারতে ক্রমে তাহা বর্ণিত হইবে।

এই প্রবৃত্ত তত্ত্ব হইতেই জীবের ক্রিয়ারত জাগ্রত অবস্থার জন্ম হইয়াছে।

চিত্রাঙ্গদের ব্রহ্মলীলা রাজ্য।

(মহাভারতে অব্যক্ত রাখা হইয়াছে।)

সেই সৃষ্টির সমস্তই ব্রহ্ম শক্তিময়,—পূর্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা গঠিত, সর্ব্ব মায়ার অতীত—কেবল মাধুর্য্যময়,—সৎচিদানন্দ মাখা। তাই ভূমি চিন্তামণি, বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, ধেনু কামধেনু। সেই পরম পুরুষও প্রকৃতির লীলাস্বাদ স্থানই সর্ব্ব সৃষ্টি রাজ্যের গুহ্য কেন্দ্রসত্ত্বা—গোলকধাম। ব্রহ্ম ও প্রকৃতিদেবীর আনন্দ, চৎ ও সৎ এই তিন সত্ত্বা হইতে এই ধামের সর্ব্ব তত্ত্বের বিকাশ হইল।

আনন্দ তত্ত্বে—আনন্দ লাভের মূল রসতত্ত্বের জন্ম হইল। রস—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য সৈখ্য, মধুর। জীব সর্ব্বদা এই রস চক্রেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রিয়া করিতেছে। জীব রসের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, রসের প্রাপ্তিই সুখ, আর রসের অভাবেই দুঃখ বোধ করে।

চিৎ তত্ত্বে—আলোড়ন করিয়া নানাপ্রকারে রসকে আস্বাদনের জন্য উপরসবর্গের জন্ম হইল। উপরস—আদি, বীর, রৌদ্র, করুণ, বিভৎসাদি ও মিষ্ট তিক্ত কষায় কটু লবণাদি। এই সব দ্বারাই জীবের কর্ম্মে আলোড়ন উপস্থিত হয়।

সৎ তত্ত্বে—লীলার আশ্রয়, অবলম্বন উদ্দীপনা আদির জন্ম হইল। আশ্রয় জন্য স্থান, শয্যাদি; অবলম্বন জন্য দৃশ্যাদি; উদ্দীপনা জন্য হাব, ভাব, কটাক্ষ ও ভাষার জন্ম হইল।

পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতি এই ব্রহ্মশক্তি চিন্ময়ধামে নিজেরা লীলা করিয়া, সেই লীলা দেখিতেই মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃজনে ব্রতী হইলেন।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মরাজ্য।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥

গুরু—বৎস! মহাভারতের আদিপর্ব্বে বড়ই গুহ্য ও জটীল বিষয়ের সমাধান করা হইয়াছে; এই সব তত্ত্ব—গভীর চিন্তা ও মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিও! এই পর্ব্বে, সৃষ্টি রাজ্যের আদিতত্ত্ব ও জীবের আদি—প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝি এই অধ্যায়ের নাম আদিপর্ব্ব রাখা হইয়াছে। এই পর্ব্বে প্রথমে, সৃষ্টি বিকাশের পূর্ব্বে পরব্রহ্মের ও পরাপ্রকৃতির স্বরূপ কেমন ছিল, কেমন করিয়া তাহাদের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল তাহা বর্ণনা করিয়া, সেই পুরুষ প্রকৃতি হইতে ক্রমে সৃষ্টি রাজ্যের বিকাশ, ইতিহাস-লীলার মধ্যে জীবন্ত ভাবে প্রদর্শিত হইবে। ইহার পরে জীবের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচয়, কর্ম্মকারক অহঙ্কারের পরিচয়, কর্ম্মের প্রবৃত্তির পরিচয় ও কর্ম্মকারক শক্তিগণের পরিচয়, ইহাদের পূর্ণতার আশ্রয়, অবলম্বন নির্দ্দেশ ও পূর্ণ স্বভাবের পরিচয় দিয়া আদিকাণ্ডের শেষ করা হইবে।

শিষ্য—গুরুদেব! জীবন্ত ইতিহাস-লীলার মধ্যে এমন গভীর গুহ্যতত্ত্ব সমূহ প্রকাশিত হইয়া আছে। আজ যে বড়ই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম। লীলার সঙ্গে সঙ্গে সরল করিয়া এই সব আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন! মহাভারতে শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে কুরু নামে একজন মহাবীর্য্যবান ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি যেমন বাহুবীর্য্যের পৃথিবীর সমস্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া পৃথিবীর সম্রাট্

হইয়াছিলেন; ধর্ম্মবলেও তেমনি পৃথিবীর সকল নরকে পরাজয় করিয়া অতুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটস্থ একটী বিস্তীর্ণ মাঠে, তিনি এত যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, সেই ক্ষেত্র তাহার নাম যুক্ত হইয়া হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস সেই কুরুক্ষেত্রে যে কোন প্রকারে দেহত্যাগ হইলেই, মহাপাপীও সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া ভগবানের কৃপালাভের অধিকারী হয়। সেই রাজার বংশধরগণও তাঁহার নাম যুক্ত হইয়া কুরুবংশের সন্তান পরিচয়ে, সকল মানবের পূজার ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিল। সেই বংশের এক রাজার দুই পুত্রের সন্তানগণ, এই কুরুরাজ্যের অধিকার লইয়াই ভীষণ প্রতিযোগিতা করিয়া, এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ধ্বংস হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ জয়ের বিষয়ই মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব্বে ক্রমে বিবৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

শুরুদেব—হাঁ, বাবা! এই তত্ত্বটুকুই যেমন মহাভারত বর্ণনার মূল সূত্র, এই জগতে জীবের জীবন লীলার মূল সূত্রও ইহাই। অসীম বীর্য্য কুরু রাজাকে চিনিলে কি বাবা? কুরু—অর্থাৎ কর্ম্ম করিব, পরব্রহ্মের এই যে ক্রিয়াকর সত্বার বিকাশ, সেই ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মসত্বাই ত্রিজগতের আদি সম্রাট মহারাজ কুরু। তাঁহার বংশেই কর্ম্মরত জীবের জন্ম। ব্রহ্মের কর্ম্মই যজ্ঞ; সেই কর্ম্ম সম্পাদন আশ্রয়ই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র—জীবের কর্ম্মভূমি এই জগত। জীবের কর্ম্মশক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধ, একটী মুক্তি অভিমুখী অন্যটী মুক্তি বিমুখী—বন্ধাভিমুখী; এই দুই সত্বাই কুরুবংশীয় জীবের পুত্র দ্বয়। এই দুই পুত্রের সন্তানগণই দুই দল হইয়া, কর্ম্মরাজ্যে অধিকার ও প্রাধান্য লাভের জন্য, এই কুরুক্ষেত্র রূপী কর্ম্ম ভূমে ভীষণ প্রতিযোগিতার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। মুক্তি অভিমুখীরা পবিত্র দেব স্বভাব প্রদর্শন করিতে থাকে, আর বন্ধাভিমুখীরা ভীষণ আসুর স্বভাব প্রদর্শন করিতে

থাকে ; ইহাই বাবা, জীবের জীবত্ব লীলার মূল স্থত্র। পরে পরস্পর বিরোধে উভয় কূল নির্ম্মূল হইয়া গেলেই জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তির শেষ হইয়া যায়। তারপর জীব কর্ম্মভূমি হইতে মহাপ্রস্থান করিয়া স্বর্গারোহণ করে ও গুহ্যলোকে লয় প্রাপ্ত হয়। বাবা, অষ্টাদশ পর্ব্বে মহাভারতে জীবত্ব ইতিহাস লীলার মধ্যে, জীবের জীবন নাটকের এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের রহস্যই শ্রবণ করিবে। এস, এখন আদিপর্ব্বের প্রথমে রাজা প্রতীপের গঙ্গাদেবীকে প্রত্যাখ্যান করা ও শান্তনুর গঙ্গাদেবীকে বিবাহ কারণ ইত্যাদির মধ্যে স্থষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্মের সংবাদ রহস্য কিরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করি।

পরব্রহ্ম সংবাদ।

লীলা—কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপ হইতেই মহাভারতের বর্ণনার আরম্ভ। মহারাজ প্রতীপ গঙ্গানদীর তীরে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন ও তাঁহার উরুতে বসিয়া তাহার পত্নীত্ব যাচনা করিলেন। কিন্তু রাজাপ্রতীপ কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না; গঙ্গাদেবী পুনরায় গঙ্গানদীতে লীনা হইলেন। এই রাজার দেহ ত্যাগের পর, তার পুত্র শান্তনু গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন, গঙ্গাদেবী তাঁহার নিকটেও মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার পত্নীত্ব যাচনা করিলেন। রাজা শান্তনু গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া সুখী হইলেন, পত্নী হইতে চাহিলে বলিলেন, "তাহাতে আপত্য নাই।" গঙ্গাদেবী বলিলেন—"পত্নী হইব বটে, আমি আমার স্বাধীনতা কাহাকেও দান করিব না।" রাজা বলিলেন,—"তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" গঙ্গাদেবী আরও বলিলেন, "আমার স্বাধীনতায় যে দিন বাধা দিবেন সেই দিনই কিন্তু আমি চলিয়া যাইব!" রাজা বলিলেন, "বেশ,

তাতেও আমার দুঃখ নাই।” এর পর উভয়ের বিবাহ হইল; ক্রমে গঙ্গাদেবীর গর্ভে রাজার সপ্তটী পুত্র সন্তান জন্মিল। গঙ্গাদেবী সপ্তপুত্রকেই গঙ্গার সলিলে নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিলেন, রাজা দেখিয়াও কিছুই বলিলেন না। কিন্তু অষ্টম সন্তান জন্মিলে তাহাকেও দেবী গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইলে, রাজা বাধা না দিয়া পারিলেন না। অমনি গঙ্গাদেবীকে বলিয়া উঠিলেন, “একি কর? কেন পুত্রগণকে এমন করিয়া নষ্ট কর?” রাজার বাধা দানে গঙ্গাদেবী এই পুত্রকে নষ্ট না করিয়া পালন ভার গ্রহণ করিলেন. কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মত, রাজা তাহার কার্য্যে বাধা দান করায়, দেবী রাজার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পুত্রকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়া পরে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই পুত্রই অসীম জ্ঞান ও অসম্ভব বীর্য্যশালী মহারথ দেবব্রত বা ভীষ্মদেব।

ভক্ত—বাবা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই তিনটী অবস্থা যেমন প্রত্যেক জীবের নিত্য ঘটনা, ভগবানেরও তেমন তিনটী নিত্য স্বরূপ অবস্থা আছে। তবে জীব মায়া আবরিত বলিয়া তিন অবস্থার অধীন হইয়া পরে, আর মায়াতীত তূরীয় ভগবান্ তিন অবস্থায়ই পূর্ণ জ্ঞান শক্তি সমন্বিত স্বাধীন হইয়া থাকেন। তাঁহার সেই তিন অবস্থার নাম, নিবৃত্ত, শান্ত ও প্রবৃত্ত বা লীলারত অবস্থা। ভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, পুরুষ ও প্রকৃতি নির্ণয় মধ্যে পড়িয়াছ, পুরুষ কেবল সুখ দুঃখ ভোক্তা, আর কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্বের হেতু প্রকৃতিদেবী; বিকার ও গুণাদি সবই প্রকৃতি হইতে জন্মে। যথা—কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবাম্॥ গীঃ ১৩শ ২০।১৯। যতদিন পুরুষ প্রকৃতি গত না হন তত দিনই তিনি ক্রিয়া নিবৃত্ত, এর পরে প্রকৃতি সহ যুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রিয়া রত হন।

এখন পুরুষের প্রকৃতি অতীত অবস্থা ও ক্রমে প্রকৃতি গত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইবে। পুরুষ কি প্রকারে প্রকৃতি গত হইয়া লীলা করিতে বাধ্য হন তাহাও দেখিবে, আবার প্রকৃতি দেবী ও কিরূপে পুরুষকে আয়ত্ব করেন তাহাও স্পষ্টরূপে জীবন্ত দর্শন করিবে।

জীবের আত্মাসত্বাই পুরুষ আর আত্মার আশ্রয়—দ্রব্য,গুণ,ক্রিয়া অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রির স্বভাব সমুদয়ই প্রকৃতি নামে পরিচিত। সৃষ্টির অতীত ভগবানের এই দুই সত্বাকেই পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতি বলা হয়; এই দুই সত্বাকেই ভগবান্ ও ভগবতীও বলে। প্রকৃতির যুক্তাহীন নিবৃত্ত পরম পুরুষের অবস্থা ও স্বভাব রাজা প্রতীপ দ্বারা প্রদর্শন করিয়া, পুরুষত্ব যুক্তাহীন নিবৃত্ত পরাপ্রকৃতির অবস্থাকেই গঙ্গা নদী করা হইয়াছে। প্রকৃতি দেবীই সৃষ্টিরাজ্যের মূল কারণশক্তি পূর্ণ বীরজানদী বা কারণ-সমুদ্র। অসম্ভব বীর্য্যই তাঁর খড়স্রোত, অসংখ্য কর্ম্মশক্তিই তাঁর অগাধ সলিল রাশী, অনন্ত বৈচিত্রই তাঁর তরঙ্গমালা। প্রকৃতি দেবী সত্তাই গঙ্গানদীর ন্যায় ব্রহ্ম হইতে শ্রাবিত পবিত্র আনন্দধারা, তাই প্রকৃতি দেবীকে এখানে গঙ্গা নদী বলা হইয়াছে। প্রতীপ গঙ্গার পারে সমাধি মগ্ন ছিলেন, বাস্তবিকই প্রকৃতির পারে অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত থাকিলেই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন, কিছুতেই তিনি প্রকৃতি লইয়া ক্রিয়ারত হইতে স্বীকৃত হন না। প্রকৃতিদেবী বিশ্বমোহিনী রূপ ধরিয়া মধুর হাবভাব বাক্য-প্রয়োগেও তাহাকে প্রকৃতিগত করিতে পারিলেন না, তাহাই রাজা প্রতীপের গঙ্গাদেবীকে গ্রহণ না করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া। নিবৃত্ত অবস্থার পর শান্ত অবস্থা, সেই অবস্থার পরম পুরুষই প্রতীপ পুত্র রাজা শান্তনু। এবার তাঁহার নিকট প্রকৃতিদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তনু প্রথমে শান্তত্ব—ন প্রবৃত্ত না নিবৃত্ত অবস্থা রাখিয়াই প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করিলেন, তাহাই গঙ্গাদেবীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া

নিবৃত্তভাবে দেবীকে গ্রহণ। এই প্রকৃতি গঙ্গাদেবী কিন্তু পুরুষ ভগবান্‌কে প্রবৃত্ত অর্থাৎ লীলারত করিতেই মিলিত হইয়াছেন, তাই প্রকৃতি যুক্ততায় পুরুষের ক্রমে কর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি জাগরিত হইয়া উঠিতে লাগিল; ইহাই রাজা শান্তনু হইতে গঙ্গাদেবীর গর্ভে পুত্রের জন্ম। কর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল অষ্ট প্রধান প্রকৃতিই শান্তনুর এই অষ্টপুত্র। শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ জ্ঞান, অহঙ্কার বুদ্ধি ও মনই সেই অষ্ট প্রকৃতি। যথা—ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। গীঃ ৭৪। পঞ্চেন্দ্রিয়জ্ঞান, অহঙ্কার ও বুদ্ধিই গঙ্গাদেবীর প্রথম সপ্তপুত্র। এই সপ্ত প্রকৃতি জন্মিয়াও পুরুষকে শান্তত্ব চ্যুত অর্থাৎ প্রবৃত্ত করিতে সক্ষম হয় না। কি পুরুষ কি প্রকৃতি কেহই তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চান না, পালন করেন না, এই তত্ত্বই সপ্ত পুত্রের মৃত্যু। কিন্তু যেই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের জাগরণ হয়, অমনি পুরুষের শান্তত্ব নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই ভীষ্মের জন্মমাত্র রাজা শান্তনুর প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গঙ্গাদেবীর কার্য্যে বাধাদান দ্বারা দেখান হইয়াছে। শান্তত্বের আস্বাদন নাশই গঙ্গাদেবীর অন্তর্দ্ধান। গঙ্গাদেবীও এবার ভীষ্মকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া প্রবৃত্ত হইলেন। এর পর পুরুষ ও প্রকৃতি কর্ম্ম প্রবৃত্ত লীলারত হইয়া প্রবৃত্ত অবস্থার আস্বাদনে ব্রতী হইবেন; সেই তত্ত্বই এখন সত্যবতীকে বিবাহ করণ দ্বারা প্রদর্শিত হইবে।

লীলা—মহাভারতে বর্ণিত আছে, গঙ্গাদেবীর অন্তর্দ্ধানের পর রাজার পুত্র বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে গঙ্গাদেবী তাহাকে আনিয়া রাজাকে দান করিলেন। পুত্র প্রাপ্তির কতকদিন পরে রাজা একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইয়া, তথায় এক পাটনীর কন্যাকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। তাহাকে পত্নী করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলেও, লজ্জায় একথা প্রকাশ না করিয়া সেই চিন্তায় দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পুত্র গোপনে পিতার বিমর্ষতা ও

ক্ষীণতার কারণ সন্ধান করিয়া এই বিষয় জ্ঞাত হইলেন, এবং সেই পাটনীর নিকট যাইয়া পিতার জন্য কন্যাকে যাচনা করিলেন। কিন্তু পাটনী বলিল, "রাজকুমার, তুমি বিবাহ করিলে কন্যাদিতে আপত্য ছিলনা, রাজা যে বৃদ্ধ, তাতে তিনি পুত্রবান্। আমার কন্যার সন্তানেরও রাজা হইবার আশা নাই! কি দেখিয়া বৃদ্ধের হস্তে কন্যা দান করিব?" রাজপুত্র বলিলেন "আমি রাজ্যাধিকার ত্যাগ করিলাম, তোমার কন্যার পুত্রই ভবিষ্যতে এই রাজ্যের অধিকারী হইবেন, তুমি কন্যাবিবাহ দেও।" পাটনী বলিল, "তুমি ত্যাগ করিতে পার, তোমার সন্তানগণ যদি আমার দৌহিত্রকে অধিকার না দেয়! অথবা বিরোধ করে?" রাজকুমার বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিবাহই করিবনা, চির ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব, তবু আমার পিতার সহিত কন্যার বিবাহ দেও।" এবার পাটনী স্বীকৃত হইল; তাহার পালিতা কন্যা সত্যবতী দেবীর সহিত মহারাজ শান্তনুর বিবাহ হইল। পিতা বিবাহান্তে পুত্রের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং পুত্রের অপূর্ব্ব পিতৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে সকলের অজেয়ত্ব ও তাহার ইচ্ছা না হইলে কখনও তাহার মৃত্যু হইবেনা বলিয়া, ইচ্ছামৃত্যু বরদান করিলেন। এই রাজ পুত্রের প্রথমে দেবব্রত নাম রাখা হইয়াছিল, কিন্তু পিতার জন্য এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অতুল্য সম্পদ ত্যাগ ও চির ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করায়, ঐ দিন হইতে রাজপুত্র ভীষ্মনামে জগতে পরিচিত হন। হিন্দুগণ ভীষ্মদেবের এই পিতৃভক্তির স্মরণ ও সম্মান জন্য, সেই দিন হইতে প্রতিবর্ষে মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রদ্ধাসহ তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া থাকেন, সেই অষ্টমী ভীষ্মাষ্টমী নামে পরিচিত।

ভক্ত—সত্যই বাবা, জীবের মন বাল্য কৈশোর অবস্থা ছাড়াইয়া পূর্ণ বলশালী যুবক হইয়া উঠিলেই, জীব কিছুতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া আর চুপ

করিয়া থাকিতে পারেনা। মহাভারতে বর্ণিত আছে গঙ্গাদেবীই ভীষ্মকে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া আনিয়া শান্তনুকে দান করিয়া যান। জীবের মন সত্যই প্রকৃতিদেবীর সর্ব্বজ্ঞান ক্রিয়া ও শক্তিতে সত্ববান্। তাই এই মনের সঙ্গে শান্ত অবস্থার রাজা শান্তনু প্রবৃত্ত ঐশ্বর্য্য প্রকৃতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইলেন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তিনি মনের দ্বারা প্রকৃতিতে যুক্ত হন, ইহাই পুত্র ভীষ্মদ্বারা শান্তনুর বিবাহ করণ। মাধুর্য্যের শক্তির অধিকারে ঐশ্বর্য্য সত্বার বিকাশ হয়না, তাই ঐশ্বর্য্যময়ী প্রবৃত্ত প্রকৃতি ভীষ্মদ্বারা রাজ্যত্যাগ ও চির ব্রহ্মচর্য্য প্রতিজ্ঞা করাইয়া বিবাহিত হইলেন। মনের প্রকৃত জীবন্ত স্বরূপ, এই অসীম জ্ঞান ও বীর্য্যের আধার ভীষ্মদেব। মনের দুইটী স্বরূপ, একটী কুসুমাদপি কোমল, অন্যটী বজ্রাদপি কঠোর। একটী পিতার সামান্য দুঃখে গলিয়া নিজের সর্ব্ব স্বার্থ ও সুখ বলিদান করা, অন্যটী ভীষণ কঠোরতা সহ অক্ষরে অক্ষরে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করা; প্রথমের কোমল অবস্থার নামই দেবব্রত ও দ্বিতীয় কঠোর অবস্থার নামই ভীষ্মদেব। ভীষ্মদেবের পিতা হইতে বরলাভ করার ন্যায়, সত্যই মন সকলের অজেয় ও ইচ্ছামৃত্যু শক্তিধর, ইনিই জীব প্রবৃত্তির প্রধান রক্ষক ও সেনাপতি, ইহার মৃত্যুতেই—মনের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলেই প্রবৃত্তি রাজ্যের শেষ হয়। মহাভারত মধ্যে ভীষ্মদেবের জীবনে, এই মনের প্রকৃত পরিচয়, শক্তি স্বরূপ জীবন্তভাব ক্রমে দর্শন করিবে। পরের লীলা শ্রবণ কর।

লীলা—সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুইটী কুমার জন্ম গ্রহণ করিলে, রাজার মৃত্যু হইল। পুত্রদ্বয়কে ভীষ্ম ও সত্যবতী পালন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষাদান করিলেন, কিন্তু চিত্রাঙ্গদ মৃগয়ায় যাইয়া গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন। তাই দ্বিতীয় পুত্র বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন।

ভক্ত—শান্ত ভগবান্ প্রবৃত্তিরাজ্য গত হইলেই, তাহা হইতে দুইটী ক্রিয়া তত্ত্বের জন্ম হয়—একটী মাধুর্য্য ক্রিয়া, অন্যটী ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া। কেবল নিজে আস্বাদন করিব—ব্রহ্মবিনে অন্য সত্বাহীন অবস্থাই মাধুর্য্যক্রিয়া, আর অপরে কেমনে আস্বাদান করে তাহাই দেখিব, ব্রহ্ম নিজে লুকাইয়া অপরের ক্রিয়া দর্শনই ঐশ্বর্য্য সত্বা। ব্যাকরণে এই তত্ত্ব দ্বয়কেই ক্রিয়ার আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী তত্ত্ব বলা হইয়াছে; এই দুই ক্রিয়া সত্বাই সত্যবতী গর্ভস্থ পুত্রদ্বয়। চিত্রাঙ্গদই স্বআস্বাদনময়ী মাধুর্য্য সত্বা ও বিচিত্রবীর্য্যই বিতরণময়ী ঐশ্বর্য্য সত্বা। মাধুর্য্য সত্বাদ্বারা অপ্রাকৃত ব্রহ্মরাজ্য গঠন করিয়া ব্রহ্ম ও প্রকৃতদেবী ক্রিয়াশীল হইয়া লীলারস আস্বাদন করেন, আর ঐশ্বর্য্য সত্বায় মায়ারাজ্য গঠন করিয়া জীবলীলা সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। মাধুর্য্য সত্বার ব্রহ্মরাজ্য গমনই চিত্রাঙ্গদের গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে দেহত্যাগ করা; ঐশ্বর্য্য সত্বাই বিচিত্রবীর্য্য নামে কুরুরাজ্যের রাজত্বভার গ্রহণ করিলেন। এই বিচিত্রবীর্য্য হইতে ক্রমে কুরুবংশের বৰ্দ্ধন মধ্যে সৃষ্টি রাজ্যের ক্রম বিকাশ জীবন্ত ভাবে দর্শন করিবে। এখন গঙ্গানদী, গঙ্গাদেবী ও সত্যবতী দেবীর মধ্যে পরা প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন কর।

পরাপ্রকৃতি সংবাদ।

শিষ্য—গুরুদেব! প্রকৃতি দেবীকে প্রথমে নদী স্বরূপা, দ্বিতীয়ে গঙ্গাদেবী ও তৃতীয়ে সত্যবতী পাটনী কন্যারূপে দেখান হইল কেন? ইহার সার্থকতাতো কিছুই বুঝিলাম না।

গুরু—বাবা! পরমপুরুষ ভগবানের যেমন নিবৃত্ত, শান্ত ও প্রবৃত্ত তিনটী অবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে, প্রকৃতিদেবীরও সেই তিন অবস্থার তিন স্বরূপই এই সব তত্ত্ব মধ্যে জানিবে। নিবৃত্ত অবস্থায় প্রকৃতিদেবী অসম্ভব বীর্য্য ও কর্ম্মশক্তির আধার হইয়াও অব্যক্তা হইয়া

থাকেন, তখন তিনি কারণ বারী পূরিতা বীরজা নদী স্বরূপা। এর কারণ-জলেই নিবৃত্ত ভগবান্ অনন্তশয়নে নিদ্রাগত থাকেন বা সুষুপ্তির আনন্দ আস্বাদন করেন, তাই দেবীর প্রথম রূপ গঙ্গানদী। শান্ত অবস্থায় এই দেবী সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা মূর্ত্তিমতি মাধুর্য্য স্বরূপা হইয়া প্রকাশিত হন, ইনিই মহাভারতে গঙ্গাদেবী। এর পর প্রবৃত্ত অবস্থায় প্রকৃতিদেবী অঘটন পটীয়সী মহা ঐশ্বর্য্যময়ী শক্তির সাহায্য লইয়া লীলা করেন; সেই ঐশ্বর্য্য শক্তিই মহাভারতে সত্যবতী দেবী।

বাবা! প্রকৃতি দেবীকে সৎ চিদানন্দময়ী বলা হয়। ইহার সৎ+চিৎ+আনন্দ এই তিন অংশই প্রবৃত্ত, শান্ত ও নিবৃত্ত তিন অবস্থা। আনন্দ অংশ-নিবৃত্ত, চিৎ অংশ-শান্ত ও সৎ অংশ-প্রবৃত্ত অবস্থা। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাদের আরও তিনটী নাম রাখা হইয়াছে, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিত। আনন্দই হ্লাদিনী, চিৎই-সন্ধিনী আর সৎই সম্বিত। যথা—আনন্দাংশে হ্লাদিনী, চিদংশে সন্ধিনী। সৎ অংশে সম্বিত যারে জ্ঞানবলে মানি। (চৈতন্য চরিতামৃত।) এই তিন অবস্থার স্বরূপই নদীরূপা, দেবী রূপা ও সত্যবতী সৃষ্টা করিয়া, প্রত্যেক অবস্থার সকল তত্ত্ব, স্বভাব, ক্রিয়া আদি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখন প্রকৃতিদেবীর তিন অবস্থার তত্ত্বটুকু ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, তাহা হইলে নিজেই তুমি সব তত্ত্ব বুঝিয়া লইতে পারিবে।

পূর্ব্বে প্রকৃতি পুরুষ নির্ণয় তত্ত্বে শুনিয়াছ, সুখ দুঃখ ভোক্তা সত্বই পুরুষ। আনন্দ প্রাপ্তিই সুখ ও আনন্দের অভাব হওয়াই দুঃখ, তাই আনন্দকেই প্রকৃতিদেবী বলা যায়। পুরুষ আনন্দ অন্বেষণেই প্রকৃতির অধীন হইয়া কর্ম্ম চেষ্টায় ব্রতী হইয়া থাকেন। এই আনন্দ অন্বেষণের মধ্যে তিনটী স্বাদ আছে, তাহাই প্রকৃতিদেবীর তিন অবস্থা, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিত বা আনন্দ, চিৎ ও সৎ। এই তিনকেই নিবৃত্ত আনন্দ, শান্ত আনন্দ ও প্রবৃত্তি

আনন্দও বলা যায়। আমরা যেমন দুগ্ধ আস্বাদন করিতে যাইয়া, কখনও সুধু দুগ্ধ রাখিয়াই আস্বাদ করি, কখন তাহাকে ক্ষীর করিয়া, দধি করিয়া, সর, মাখন ও ছানা করিয়াও আস্বাদ করি; কখন বা ক্ষীর, ছানা, সর আদিতে অন্য দ্রব্য মিলাইয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া (মিঠাই মিষ্টান্নাদি) আস্বাদন করি। এই ত্রিবিধ আস্বাদন সত্বাই প্রকৃতির হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিত আস্বাদন। দুগ্ধ রাখিয়া সেবনই হ্লাদিনী স্বাদ; সন্ধান করিয়া সেই দুধকেই দধি, ক্ষীর, সর, ছানা করিয়া খাওয়াই সন্ধিনীর স্বাদ, আর সেই ক্ষীর, ছানা, সর আদিতে অন্য দ্রব্য মিলাইয়া বিভিন্নাকারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য গড়িয়া যে আস্বাদন তাহাই সম্বিত আস্বাদ। প্রকৃতি দুগ্ধ অবস্থায়ই গঙ্গানদী স্বরূপা; ক্ষীর, ছানা, সর ননী অবস্থায়ই সৌন্দর্য্য প্রতিমা গঙ্গাদেবী ও অন্য দ্রব্য মিশ্র অবস্থায় নানা স্বাদযুক্তা লীলাময়ী সত্যবতী যুক্ত প্রকৃতি দেবী। আরও একটু সরল করিয়া বুঝাইতেছি।

বহুদিন পর প্রিয় ও প্রিয়ার সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে উভয়কে আবেগ ভরে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পরে, আনন্দের এই ক্রিয়া ও জ্ঞানহীন অব্যক্ত আনন্দময় অবস্থাই নিবৃত্তিময় হ্লাদিনীর আস্বাদন। কতক্ষণ আলিঙ্গনে মূর্চ্ছিত থাকিবার পরই কিছু জ্ঞানের উদয় হইয়া, উভয়ে উভয়কে প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করিতে চেষ্টিত হয়—চোখ দিয়া রূপ দেখিতে চায়, মুখে প্রশ্ন করিতে চায়, কানে উত্তর শুনিতে চায়, হস্তে স্পর্শ করিতে চায়! কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ জাগিয়াও যেন ক্রিয়া রহিত, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া থাকে—দর্শন আছে রূপ নাই, শব্দ আছে ভাষা নাই, প্রতি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকের ভোগ্য একটী অব্যক্ত মধুর আস্বাদন করিতে থাকে, এই অবস্থাই শান্ত অবস্থা—সন্ধিনীর আস্বাদন। এর পর উভয়ের পূর্ণ জ্ঞান শক্তির জাগরণে, উভয়ে উভয়ের তৃপ্তি সুখ দিতে যে, সেবাকর্ম্মে নিযুক্ত হয়—বসিতে আসন দেয়, পা ধোয়ার জল দেয়, শ্রান্তি নাশ

জন্য বাতাস দেয়, পান জন্য সরবত দেয়, স্নান ভোজনের যোগারে ব্রতী হয়, গন্ধমাল্য অলঙ্কার দিয়া সাজায়, নৃত্য দেখায়, সঙ্গীত শুনায়, হাস্য পরিহাস করে, এই সবই প্রবৃত্ত লীলারস বা সম্বিতের আস্বাদন। পূর্ব্বে দুগ্ধ সেবনের কথায় বলিয়াছি, ক্ষীর ছানা আদিতে অন্য দ্রব্য মিশাইয়া আস্বাদনই সম্বিতের আস্বাদন! এখানেও সেবা তৃপ্তি জন্য, আসন, জল, গন্ধ ও দ্রব্যাদি অপর দ্রব্যের প্রয়োজন হইল। যেই সত্বা বা শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম ও প্রকৃতি ব্যতীত অপর দ্রব্য উদ্ভব করা হয়, তাহাই প্রকৃতি দেবীর অপর শক্তি। এই স্থানেই প্রকৃতি দেবী দুই অংশে বিভক্ত হইলেন, এক অংশে মাধুর্য্যময়ী পরা প্রকৃতি, অন্য অংশে ঐশ্বর্য্যময়ী অপরাপ্রকৃতি। পরাপ্রকৃতি অব্যক্তা ও ব্যক্তা দুইরূপা মহাভারতে গঙ্গানদী ও গঙ্গাদেবী। অপরাপ্রকৃতিও দুইপ্রকার, একটী সৎচিদানন্দ ময়, ব্রহ্মশক্তি ও অপরটী ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া পৃথক পৃথক দ্রব্য সৃজনকারী মায়াশক্তি। পরাপ্রকৃতিই বৈষ্ণবের রাধা-ঠাকুরাণী ও অপরাপ্রকৃতি যোগমায়া ভগবতী।

আনন্দের হ্লাদিনী আস্বাদনে পুরুষ অব্যক্ত সমাধি মগ্নের মত, প্রকৃতি দেবীও অব্যক্তা রসনদী স্বরূপা। সন্ধিনীর আস্বাদনে পুরুষ তাঁর সর্ব্বভোগ্য সত্বা লইয়া জাগ্রত, প্রকৃতিও ভোক্তার তৃপ্তিদ সর্ব্বভোগ্য শক্তি লইয়া জাগ্রত, অথচ ক্রিয়া রহিতা। এই অবস্থাই শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর সন্তান জন্মিলেও ফিরিয়া না চাওয়া, পালন না করা দ্বারা দেখান হইয়াছে। তৃতীয় সম্বিতের আস্বাদন সেবা ও তৃপ্তি জন্য ক্রিয়াময় লীলার জন্ম হইল এবং লীলা কর্ম্মের আশ্রয় জন্য উভয়ে ঐশ্বর্য্য সত্বার বিকাশ করিয়া এবার অপরাপ্রকৃতির ব্রহ্মশক্তি সহায়তায়, সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্বাময় ব্রহ্মলীলা রাজ্য গঠন করিলেন ও তথায় পুরুষ প্রকৃতি লীলা করিয়া ক্রিয়াস্বাদ ভোগ করিলেন। ক্রিয়া দ্বারা অপূর্ব্ব লীলারস আস্বাদন করিয়া, সেই লীলা অপরে কিরূপে আচরণ করে দেখিবার জন্য—আমাদের যেমন গ্রন্থ পড়িয়া ও অন্য প্রাণীর

ক্রিয়া চেষ্টাদি দেখিয়া আনন্দ লাভ হয়! তাঁহাদের ও সেই সাধ জন্মিলে, সেই সাধ মিটাইতেই ভগবান্ ও ভগবতী অপরাপ্রকৃতি—মায়াশক্তির সহায়তায় জীব-জগত সৃজন করিয়া লীলা দর্শন করেন। এখন দেবী সত্যবতীর মধ্যে অপরা প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিবে।

লীলা—মহাভারতে আছে, এক মৎস্যজীবি ও পাটনী কর্ম্মরত চণ্ডাল সত্যবতী দেবীকে গঙ্গা-জল মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করেন। এই কন্যা পুরুষের মত বলিষ্ঠা ও নানা কর্ম্মদক্ষা হইয়া, কখন জাল দ্বারা মৎস্য ধরিতেন, কখন বা নৌকা দ্বারা লোক পার করিতেন। গঙ্গাতীরে পারের ঘাটেই রাজা শান্তনু ইহাকে দেখিয়া মোহিত হন।

তত্ত্ব—সত্যই বাবা, অপরাপ্রকৃতি যোগমায়া দেবী এই সত্যবতীর মতই, ব্রহ্মবীর্য্য কারণসমুদ্র হইতে উত্থিতা, ইহার পিতামাতার সংবাদ কেহই পায় নাই। যত অবাস্তব অসত্য তত্ত্বগুলিকে সত্বাবান্ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম সত্যবতী রাখা হইয়াছে। এই বেটী সত্যই রমণী হইয়াও পুরুষের বাবা! এই মৎস্য ধরা ও নৌকা দ্বারা পার করা, এই বেটীর যেন নিত্যকর্ম্ম। এই কর্ম্ম দুইটী জানেন বলিয়াই ত পরমপুরুষ এই বেটীকে বিবাহ করিতে এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই কাজ দুইটী বুঝিলে কি বাবা? এই দেবীই বিরজানদী বা কারণসমুদ্র হইতে ভগবানের বীর্য্যাণ্ড সমূহ তুলিয়া সৃষ্টি রূপে বাজার সাজান—ব্রহ্ম শক্তিকে মায়া জালে বন্দী করিয়া জীব গড়িয়া খেলা দর্শন করেন, এই তত্ত্ব টুকুই মায়ের মৎস্য ধরা ও জালিক কর্ম্ম; আর জীবের আত্মাকে নিবৃত্তি রাজ্য হইতে প্রবৃত্তি রাজ্যে পার করিয়া দেওয়া ও আবার প্রবৃত্তি রাজ্য হইতে নিবৃত্তি রাজ্যে লইয়া যাওয়াই এই বেটীরই নিত্য কার্য্য, ইহাই দেবীর পাটনী মাঝির কর্ম্ম করা। এই বেটীই?—"ভবের ঘাটে দিচ্ছে খেয়া তরী বেয়ে বেয়ে।" তাই আজ পরমপুরুষও পারের ইচ্ছায় প্রবৃত্তি রাজ্যের ঘাটে যাইয়া এই দেবীর সাক্ষাৎ

পাইলেন। ইহার দ্বারাই তাঁহার অভিষ্ট পূর্ণ হইবে—মনের সঙ্কল্প বিকল্প মিটাইয়া প্রবৃত্তির সাধ মিটাইতে পারিবে বুঝিয়া, ইহাকে পত্নী করিতেই তিনি অতি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শিষ্য—গুরুদেব, সত্যবতী নাকি প্রথমে তত সুন্দরী ছিলেন না, শরীরে মৎস্যের মত বিকট গন্ধ ছিল, মহর্ষি পরাশরের বরে ইনি পদ্মগন্ধা ও বিশ্বমোহিনী সৌন্দর্য্যবতী হন।

গুরু—এই অপরা যোগমায়াদেবী সত্যই প্রথমে কুৎসিতার মত ভগবানের অগ্রাহ্যা থাকেন; ভগবান্ তাঁহার দিকে ফিরিয়াও তাকান না। উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্বে বর্ণিত আছে ভগবানের দৃষ্টি প্রভাবে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে, ভগবান্ তাহাতে বীর্য্য আধান করেন ও তখন প্রকৃতি সৃষ্টিকে প্রসব করেন। ভগবানের দৃষ্টি নিক্ষেপই পরাশর স্পর্শ ও বরদান এবং বীর্য্য আধানই বেদ-বিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেবের জন্ম। পূর্ব্বে দেবী শুধু মায়া ছিলেন, ব্যাসকে পুত্র লাভ করিয়াই ব্রহ্মযোগ শক্তি যুক্তা অসীম বীর্য্য, সৌন্দর্য্যবতী জগন্মাতা যোগমায়া হইলেন।

শিষ্য—এই স্থানটী আরও সরল করিয়া বুঝাইয়া দিন, প্রভু! সত্যবতী দেবীর ব্যাসকে পুত্র লাভ, আমরা যে একটা নিন্দনীয় ঘটনা বলিয়া মনে করি।

লীলা—মহর্ষি পরাশর সন্তান না হইলে পিতৃঋণ শোধ হইবে না বলিয়া, সুসন্তানের উপযুক্তা অকামা শুভলক্ষণা রমণী সন্ধান করিতে করিতে এই সত্যবতীকে প্রাপ্ত হইলেন ও উপযুক্ত আধার বোধে এই দেবীর নিকট পুত্র জন্মন জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দেবী কুমারী বলিয়া সতীত্বধর্ম্ম জন্য চিন্তিত হইয়া অস্বীকার করিলে, ঋষি বলিলেন, "আমার তপ শক্তিতে তোমার সন্তান লাভ হইবে, ইহাতে তোমার কুমারীত্ব বা সতিত্ব নাশের কোনই আশঙ্কা নাই। আর সন্তান অল্প

সময় মধ্যেই প্রসূত হইয়া চলিয়া যাইবে, তোমার লোক লজ্জাও পাইতে হইবে না। তুমি আমার সহায়তা কর, আমার বরে তুমি বিশ্বমোহনী সুন্দরী হইবে, শরীরে পদ্মগন্ধ হইবে, এবং ভবিষ্যতে তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ রাজকুলের বধূ হইয়া, রাজরাণী ও রাজমাতা হইবে। আরো তোমার এই শক্তি সম্পন্ন পুত্র দ্বারাও তুমি অশেষ কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে।” তখন দেবী স্বীকৃতা হইলেন ও ঋষির তপ শক্তিতে তাহার গর্ভ হইতে তৎক্ষণাৎ ব্যাসদেবের জন্ম হইল; ঋষিও পিতৃঋণ মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পুত্র ব্যাসদেবও জননীকে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেলেন, “যখনই মাতা স্মরণ করিবেন তখনই তিনি আসিয়া দেখা দিবেন ও মায়ের আদেশ প্রতিপালন করিবেন।

ভক্ত—বৎস, শাস্ত্রে পরাশর ও ব্যাসদেবকে ভগবানেরই অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহারা পরম ব্রহ্মেরই এক একটী শক্তি। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরাশরই ব্রহ্মের দৃষ্টি ও ব্যাসদেবই ভগবানের বীর্য্য। পরাশর যেমন সন্তান-প্রসবকারিণী শক্তির সন্ধান করিয়া সর্ব্ব জগত ঘুরিয়া এই দেবীকে উপযুক্তা বোধে ধরিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও প্রসবকারিণী শক্তির জন্যই ত, অপরা প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। পরে এই মায়াদেবীকে তিনি সৃষ্টিকারক যোগশক্তি দান করিয়া দেন, এই শক্তিই অসীম জ্ঞান ও শক্তিমান ব্যাসদেব। ব্যাসদেবের বেদ বিভাগ বুঝিলে কি? এক ব্রহ্মসত্বাই সৃষ্টি রাজ্যে অনন্ত আকারে, অনন্ত নামে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি লইয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করিবে, তাহা যিনি প্রকাশ করিবেন সেই ব্রহ্ম সত্বাই ব্যাসদেব। এই স্থানেই পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতি তত্ত্বের শেষ হইল। এখন মহাভারতে অপরাপ্রকৃতির ব্রহ্মশক্তির গড়া রাজ্যের তত্ত্ব গুপ্ত করিয়া, চিত্রাঙ্গদকে পরলোকে পাঠাইয়া দিবে, কেবল মায়াশক্তির বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্য বিশেষ রূপে প্রকাশ করিবে।

ব্রহ্মশক্তির রাজ্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রের বৃন্দাবনতত্ত্ব। সেই সৃষ্টির সমস্তই কেবল মাধুর্য্যময়, ভগবান্ ও ভগবতীর যুগলশক্তি দ্বারা গড়া। যুগলবৃন্দদ্বারা গড়া বলিয়াই সেই ধামের নাম বৃন্দাবন। সেই ধামের সমস্ত সৃষ্টিই ব্রহ্ম ও প্রকৃতির ন্যায় অসীম শক্তি মণ্ডিত। তাই ভূমি চিন্তামণি, বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, গাভী কামধেনু। ভগবানের গুপ্ত ভোক্তা-শক্তিবর্গ ও ভগবতীর গুপ্ত ভোগ্য-শক্তিবর্গই তথাকার আদি সৃষ্টি গোপ ও গোপীগণ। তাই তথায় একমাত্র ভোক্তা অধিপতি পুরুষ স্বয়ং ভগবান্—যেমন জীবের দেহ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিবর্গের একমাত্র ভোক্তা ও কর্ত্তা জীবের পরমাত্মা। এই স্থানেই মহাভারত রহস্যের আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ের শেষ করা যাউক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিচয়

মায়া রাজ্য সংবাদ

(জীব মাত্রেই হয় নিজে আস্বাদজন্য ক্রিয়ায় রত হয়, না হয় অপরের আস্বাদ দেখিতে ক্রিয়ায় রত হয়। ভগবান্ ভগবতীও ক্রিয়ার প্রথম স্বাদ নিজেরা লীলা করিয়া ভোগ করিয়া, সেই লীলা অপরে কেমনে করে তাহা দেখিতেই জগত সৃষ্টি করেন। এই সৃজন জন্য, তাঁহারা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সত্ত্বার বিকাশ করিতে যে, বৈকারীক রূপান্তর সত্ত্বার বিকাশ করিলেন তাহাই মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তির নামই অপরাপ্রকৃতি বা যোগমায়াদেবী; ইনিই সৃষ্টি রাজ্যের জননী মহামায়া দেবী। এই অধ্যায়ে এই মায়ের কর্ম্মই বর্ণনা করা হইবে।)

মায়ার তিন তত্ত্ব—এবার ভগবান্ ও ভগবতী তাঁহাদের ব্রহ্ম-সত্বার উপরেও, আরও দুইটী সত্বার বিকাশ করিতে বাধ্য হইলেন, একটী দেবত্ব ও একটী জীবত্ব। সৃষ্টি রাজ্যের সৃজন, ধারণ, পালন, পোষণ, রক্ষা করিয়া লীলা করিবার জন্য, তাঁহার ইচ্ছামত ঐ ঐ কর্ম্ম করিতে সক্ষম ঐশ্বর্য্যময়-সত্বার সৃজনই দেবত্ব সৃজন, আর সৃষ্টি রাজ্যের ধ্বংস জন্য সীমাবদ্ধ-সত্বার সৃজনই অ+সুরত্ব বা জীবত্ব-সৃজন। ভগবানের ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব ও জীবত্বই ভগবতীর পরা, অপরা ও মায়া শক্তি। এই তিন তত্ত্বে আত্মাকে বাধ্য করিবার জন্য, তিনটী পুরুষ-সত্বা ও তাহাদের আবরক ক্ষেত্র তিনটী কোষ, বা দেহের জন্ম হয়। ব্রহ্মত্বে—মুক্তাবস্থা, দেবত্বে—বিদ্যামায়া ও জীবত্বে—অবিদ্যামায়া সৃজন হইল।

বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপরা।

অবিদ্যাকর্ম্মসং জ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি বিষ্যতে ॥ বিঃ পুঃ—৬।৭।৬০

ব্রহ্মমায়াস্থ ভগবান্—তাঁহার তূরীয় শক্তি সংহরণ করতঃ নিজে যোগ নিদ্রাগত হইয়া সৃষ্টি রাজ্যের প্রাণসত্বা হন। ইনিই গীতার সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর অধিযজ্ঞপুরুষ। মহাভারতে বিচিত্র বীর্য্যের মৃত্যু।

প্রকৃতিদেবী—তাঁহার অপরা ঐশ্বর্য্যশক্তিতে ও ব্রহ্মযোগ-কারক-সত্বা দ্বারা, অগ্নি হইতে জ্যোতি ও তাপ বাহির করার মত, নিদ্রাগত ভগবান্ হইতে, ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব ও জীবত্ব এই তিন সত্বাকে বাহির করিয়া, কর্ম্ম করাইবার জন্য কারণদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ তিনটী আবরণ দ্বারা তিন সত্বাকে আবরিত করিলেন। মহাভারতে মাতা সত্যবতী ব্যাসপুত্রের সহায়তায়, বিচিত্র বীর্য্যের তিন পত্নীতে, তিন পুত্রের উদ্ভব করিয়া কুরুবংশের রক্ষা করিলেন।

সৃষ্টিরাজ্যের পুরুষ—(১) মায়াতীত যোগ নিদ্রাগত ভগবান্, গীতার অধিযজ্ঞ পুরুষ। (**মৃত বিচিত্রবীর্য্য**)

(২) **ব্রহ্মমায়ায়**—পরাপ্রকৃতিগত মুক্ত ব্রহ্মময়সত্বা, জীবের কারণদেহ-বিহারী সুষুপ্ত অবস্থা ও ব্রহ্মসমাধি অবস্থার কর্ত্তা, গীতার উত্তমপুরুষ—পরমাত্মা। (**রাজা পাণ্ডুত্ব**)

(৩) **দেবমায়ায়**—অপরাপ্রকৃতিগত দেব-ঐশ্বর্য্যময়-সত্বা জীবের সূক্ষ্মদেহ-বিহারী স্বপ্নাবস্থার কর্ত্তা মধ্যমপুরুষ, গীতার অক্ষরপুরুষ—আত্মা। (**জ্ঞানী বিদুরত্ব**)

(৪) **অবিদ্যামায়া**—মায়া প্রকৃতিগত জীবশক্তিময়-সত্বা, জীবের স্থূলদেহ-বিহারী জাগ্রত অবস্থার কর্ত্তা নামপুরুষ, গীতার ক্ষরপুরুষ—জীবাত্মা। (**অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রত্ব**)

প্রকৃতি (১) মায়াতীতা ভগবতী সত্যবতী দেবী

(২) **ব্রহ্ম মায়ায়**—আনন্দময় কোষ কারণদেহ, সমাধি ও সুষুপ্ত অবস্থার আত্মার আশ্রয়; ইহাও মায়া, তাই মায়ার দিকে ফিরিয়া আসে, তবে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ দেয়, (**পাণ্ডু জননী**)

(৩) **বিদ্যামায়ায়**—জ্ঞানময়কোষ সূক্ষ্মদেহ, স্বপ্ন ও জল্পনারত অবস্থায় আত্মার আশ্রয়, ইহাও মায়া, তবে ব্রহ্মজ্ঞান ও শক্তির আস্বাদন দেয়। (**বিদুর জননী**)

(৪) **অবিদ্যামায়ায়**—অন্নময় বা ভূতময়কোষ স্থূলদেহ, জাগ্রত অবস্থায় আত্মার আশ্রয়। জীবরাজ্য ও দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তির আস্বাদন দেয়। (**ধৃতরাষ্ট্র জননী**)

কর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্ভব—প্রকৃতিদেবীর পরাঅংশ ব্রহ্মমায়া গুণাতীত,—বিস্ময় রাজ্যের অবোধ্য ক্রিয়ারহিত তত্ত্ব, তাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যা অংশই বিষয় রাজ্যের কর্ম্মমায়া। এই মায়া বিদ্যা, অবিদ্যা ও উভয়মিশ্রা এই তিনভাবে, জীবের কর্ম্ম বন্ধের মূল, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার প্রবৃত্তি হইয়া উদ্ভব হয়। বিদ্যাঅংশে সত্বগুণ—ব্রহ্মত্ব লাভ গতি, ঋষিত্ব বা

ব্রাহ্মণত্বের জন্ম হয় ; মিশ্র অংশে রজঃগুণ—জীবের দুঃখাদি নাশ মঙ্গল চেষ্টার-ইচ্ছা, দেবত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের জন্ম হয়। আর অবিদ্যা অংশে তমঃগুণ—পশুত্ব, আত্ম ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা প্রবৃত্তি, অসুরত্ব বা শূদ্রত্বের জন্ম হয়। মহাভারতে—সত্বগুণ—**কুন্তীদেবী**, রজঃগুণ—**মাদ্রীদেবী** ও তমঃগুণ—**গান্ধারীদেবী**।

কর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্ভব বা ক্রিয়াশক্তির জন্ম—(১) সত্বগুণ হইতে বিষয় নিবৃত্তি কারক নিষ্কাম সাধক-প্রকৃতির জন্ম হয়। তাঁহারা হয় জ্ঞানযোগে না হয় রাজযোগে, না হয় ভক্তিযোগে ভগবান্ আরাধনা তৎপর হয়। (**কুন্তীপুত্র—যুধিষ্টির, ভীম ও অর্জ্জুন**।)

(২) **রজঃগুণ হইতে**—সত্বগুণের অধীন হইয়া শাস্ত্রবিধি ধরিয়া বিষয় সুখাদি কামনায়, সকাম সাধনা প্রকৃতির জন্ম হয়। তাহারা হয় ইহকালে সুখের জন্য, না হয় পরকালে সুখের জন্য যজ্ঞাদি আচরণ করেন। (**মাদ্রীপুত্র—নকুল ও সহদেব**)

(৩) **তমঃগুণ হইতে**—সত্বগুণকে একেবারে ত্যাগ করিয়া দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তিজন্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন পথে চেষ্টায় ইচ্ছা হইতে ভগবানে অবিশ্বাস, শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা জন্মিয়া, আত্মচেষ্টা ও অধর্ম্মাচরণের প্রকৃতির জন্ম হয়। (**গান্ধারীপুত্র—দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি**)

আরও মিশ্রপ্রকৃতির জন্ম—সত্বগুণ হইতে অকালে অপাত্রে জাত সন্তান **কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ** প্রভৃতি। রজের তমমিশ্র সন্তান **মদ্ররাজ শল্য**। তমের রজঃ পক্ষ সন্তান **জরাসন্ধাদি**। তমের সত্বপক্ষ সন্তান ধৃতরাষ্ট্র পুত্র **যুযুৎসু** ইত্যাদি।

জীবের বয়ো ধর্ম্ম—প্রতিদিনই যেমন কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ প্রাধান্যে, জীবের নিদ্রা, স্বপ্ন ও জাগরণ তিন অবস্থা লাভ হয়, আয়ুকাল

মধ্যেও তিন দেহের প্রাধান্য ভেদে বাল্য, কৌশোর, যৌবনাদি স্বভাব ভেদ হইয়া থাকে। বাল্যে কারণ দেহ প্রাধান্যে শিশুসকল ব্রহ্মসদৃশ স্বভাব দেখায়, কৌশোরে সূক্ষ্মদেহ প্রাধান্যে দেবস্বভাব ও লীলা প্রকাশ করে, যৌবনে স্থূল—জীবত্বের ভাবে মত্ত হইয়া জীব-স্বভাবের পূর্ণ পরিচয় দান করে।

মহাভারতে এই তত্ত্ব, প্রথমে রাজা পাণ্ডুর রাজত্ব, দ্বিতীয়ে মহাজ্ঞানী বিদুরের প্রাধান্য, তৃতীয়ে পাণ্ডুর প্রতিনিধিত্ব ও বিদুরের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইলেন দ্বারা প্রদর্শিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মায়া রাজ্য

মূকং করোতিবাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপাত্বমহং বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্॥

গুরু—বৎস! আদিপর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের লীলার মধ্যে, বিচিত্রবীর্য্য হইতে পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রের জন্ম পর্য্যন্ত, মায়াতীত ব্রহ্মসত্ত্বা কি, করিয়া প্রকৃতিদেবীর মায়াশক্তি সহ যুক্ত হইয়া, মায়াবদ্ধ সামান্য জীবত্বলাভ করেন এবং কেমন করিয়া নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা জীবক্রিয়া করিতে বাধ্য হন, জীবের মনোবিজ্ঞানের এই সমস্ত মীমাংসা জীবন্ত ভাবে দর্শন করিবে।

শিষ্য—গুরুদেব, প্রতিলীলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সরলভাবে সমস্ত বুঝাইয়া বলুন।

পুরুষ সংবাদ

লীলা—মহাভারতে আছে, বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, ভীষ্মদেব কাশীরাজার তিন কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপূর্ব্বক আনিয়া, বিবাহ জন্য ভ্রাতাকে দান করিলেন। এই তিন কন্যার জ্যেষ্ঠাভগিনী মনে মনে অন্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এই কথা প্রকাশ করায়, সেই কন্যাকে সসম্মানে রক্ষক দিয়া তাহার মনোনীত স্বামীর নিকট পাঠাইয়া, অন্য দুই কন্যাকে বিচিত্রবীর্য্য বিবাহ করিলেন। এই দুই পত্নীর উপরেও বিচিত্রবীর্য্যের একজন বৈশ্যাপত্নী ছিলেন; কেহ কেহ এই বৈশ্যাকে তাহার পত্নী না বলিয়া, পত্নীদ্বয়ের দাসী বলিয়া থাকেন। বিবাহের অল্প দিন পরই রাজা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিলেন। কুরুবংশই ধ্বংস হইয়া যায় দেখিয়া, ভীষ্মদেবের পরামর্শে মাতা সত্যবতী তাঁহার পূর্ব্বপুত্র ব্যাসদেবকে আনিয়া, বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীতে সন্তান জন্মাইয়া কুরুবংশ রক্ষা করিলেন। ঋষি ব্যাসদেবের শক্তিতে প্রথমে জ্যেষ্ঠা পত্নীতে অন্ধপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইল। পুত্র অন্ধ বলিয়া মাতা একটী উত্তম পুত্র প্রার্থনা করিলেন; এবার দ্বিতীয়া পত্নীতে অসীমশক্তি পাণ্ডুর জন্ম হইল। এই পুত্রও ব্রহ্মশাপে সংসার বিরক্ত হইবে শুনিয়া, মাতা আরো এক পুত্র প্রার্থনা করিলেন; তাহাতেই তৃতীয়া বৈশ্যার গর্ভে মহাত্মা বিদুরের জন্ম হইল।

তত্ত্ব—বাবা, ভগবানের সৃষ্টি-ইচ্ছাস্বরূপ যে ঐশ্বর্য্যসত্বা তিনিই বিচীত্রবীর্য্য। এই সত্বায় পরমপুরুষ ভগবান্ সৃষ্টিরাজ্যের প্রাণসত্বা হন ও প্রকৃতিদেবী মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্টিরাজ্যের ক্ষেত্র হন। ভগবদ্গীতায় যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, বিচিত্রবীর্য্যই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, আর সত্যবতী দেবীই ক্ষেত্র। গীতায় প্রকৃতির অতীত জীবভূত যে শক্তি

জগতকে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তিনিই এই বিচিত্র-বীর্য্য, সেই নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষসত্বা। যথা—গীতা ৭—৫। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ এই সত্বায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি কি মহাভূত, কি ভূত, সৃষ্টির অণু পরমাণু ও জীব সমস্তকে পৃথক পৃথক সত্বায় রক্ষা করিতেছেন। এই সত্বা পূর্ণ জ্ঞানময়, ব্রহ্মসহ অভেদ ও মায়াতীত। তাই সৃষ্টিকে মায়ার অধীন হইয়া কার্য্য করাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন হয়; সেই কৌশলই বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু ও তাঁর পত্নীতে ব্যাসশক্তি দ্বারা সন্তান জন্মান।

কৌশলটী এই যে যেমন একস্থানে আবদ্ধ হইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, তার জ্যোতি ও উত্তাপ বহুদূরে ক্রিয়া করিতে থাকে, তেমন ব্রহ্মও সৃষ্টি মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগ নিদ্রাগত হইয়া থাকিলে, মায়াশক্তিতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আবরিত হইয়া, অগ্নির জ্যোতি ও তাপের মত তাহা হইতে জীবত্বের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মের যোগনিদ্রাগত হওয়াই বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু দ্বারা দেখান হইয়াছে, আর জীবত্বের উদ্ভব টুকুই ব্যাসদেব দ্বারা সন্তান জন্মান। এই তত্ব সরলভাবে ব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে। যথা— "চিচ্ছক্ত্যা সজ্জমানোহথ ভগবান্ আদিপুরুষঃ। যোজয়ন্ মায়য়া দেবো যোগনিদ্রা বিকল্পয়ৎ॥ × × × গুহাং প্রবিষ্টেতস্মিংস্ত জীবাত্মা প্রতিবুধ্যতে। ৫ম—১৯।২০ শ্লোঃ। ভগবান্ আদি পুরুষ চিৎশক্তি প্রকৃতিদেবী দ্বারা সৃষ্টির উপাদান সাজাইয়া ও সবকে একত্র করিয়া মায়ায় যোগনিদ্রা কল্পনা করেন, তিনি গুহা প্রবিষ্ট হইলে জীবাত্মা জীবত্ব লইয়া প্রকাশিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে আছে—"একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিনী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥" (বিঃ পুঃ—১।১০।৫০) একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোতী যেমন বহু দূরে বিস্তৃত হয়, এক পরব্রহ্মের শক্তিও তেমন নিখিল জগৎ হইয়া বিকাশ পায়।

বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীত্রয়ই প্রকৃতিদেবীর মায়াত্রয়, সৃষ্টিরাজ্যের কর্ম্মক্ষেত্র। ঐশ্বর্য্যগত ভগবানের কর্ম্মক্ষেত্র তিনটী, সৃষ্টিক্ষেত্র, স্থিতিক্ষেত্র ও লয়ক্ষেত্র, এই তিনটী ক্ষেত্রই বিচিত্রবির্য্যের তিন পত্নী। সৃষ্টি ও ধ্বংস এই তুইটীই প্রধান কর্ম্ম, স্থিতিটী উভয়কে একটু ঠেলিয়া রাখিয়া কতকদিন লীলা করাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রকাশ করা। তাই বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নীকে রাজকন্যা ও যথার্থ পত্নী বলিয়া, অন্যকে বৈশ্যাদাসী বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের সৃষ্টিক্ষেত্র হইতেই, ব্রহ্মজ্ঞান ও শক্তি আবৃত অন্ধ জীবত্বের জন্ম হয়, এইটীই প্রথমাপত্নীর গর্ভে অন্ধপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম। ব্রহ্মের লয় বা ধ্বংসক্ষেত্রে—মুক্তকর্ম্ম নিবৃত্তির জন্ম হয়, সেই তত্ত্বই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে অভিশাপ গ্রস্থ সংসার বিরক্ত রাজা পাণ্ডুর জন্ম। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মের স্থিতিক্ষেত্রে —সংসারে স্থিতিশীল হইয়া ক্রিয়া দ্বারা জন্ম মরণের অতীত হওয়ার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির জন্ম হয়, এইটীই তৃতীয়া বৈশ্যা পত্নীতে জ্ঞানময়-পুরুষ বিদুরের জন্ম। এই তিন তত্ত্বই পরে সৃষ্টি রাজ্যে তমঃ, রজঃ ও সত্বগুণে পরিণত হয়।

ব্রহ্ম যোগনিদ্রাগত হইলে, প্রকৃতিদেবী ব্রহ্মের বিকল্পশক্তি ভীষ্মদেবের প্রেরণায় নিজ মায়াশক্তি ও ব্যাস রূপ যোগশক্তি দ্বারা, অগ্নি হইতে দীপ্তি ও তাপ বাহির করার ন্যায়, নিদ্রিত ব্রহ্ম হইতে তিনটী পুরুষ-সত্বার বিকাশ করেন; ইহারাই গীতার, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষসত্বা। মহাভারতে তাহারাই, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ও পাণ্ডু—গ্রন্থান্তরে জীবাত্মা, আত্মা, পরমাত্মাও বলা হয়। গীতায়—দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ। ক্ষরঃ সর্ব্বানিভূতানি কুটস্থোঽক্ষরউচ্যতে॥ উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ; যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫শ ১৬।১৭। এই লোকে—সৃষ্টি রাজ্যে ক্ষর ও অক্ষর দুইটী পুরুষ আছে, ভূতস্থটী ক্ষর ও কুটস্থটী অক্ষর, ইহার উপরে যে একটী উত্তম পুরুষ আছেন তিনি পরমাত্মা নামে কথিত হন, যে শক্তি তিনলোকের মধ্যেই আবিষ্ট থাকিয়া তাঁর অব্যয় সত্ব

দ্বারা সৃষ্টিকে পালন করিতেছেন। ব্যাকরণে আত্মার এই তিন সত্বাকেই, উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও নামপুরুষ বলা হইয়াছে। নামপুরুষ হইতেই ব্রহ্ম-বিস্মৃতি-অন্ধতাযুক্ত জীবত্বের জন্ম, মধ্যমপুরুষে ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত দেবত্বের জন্ম, ও উত্তমপুরুষে মুক্ত ব্রহ্মত্বের জন্ম। জীবের এই ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, ও জীবত্ব পৌরুষসত্বার বা অহঙ্কারের জন্মই, পাণ্ডু, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম। পাণ্ডু—ব্রহ্মত্ব, বিদুর—দেবত্ব ও ধৃতরাষ্ট্রই—জীবত্ব অহঙ্কার।

অগ্নির তেজ ও দীপ্তির মত, একই জীবের নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগ্রত অবস্থার মত, যদিও ব্রহ্মের একসত্বারই ত্রিবিধরূপে বিকাশে এই তিন অহঙ্কারতত্ত্ব, তবু ইহারা তিনটীই পৃথক সত্বা। প্রত্যেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, তাই তিনকে তিনক্ষেত্রে জাত তিন পৃথকসত্বা রূপে মহাভারতে বর্ণনা করা হইয়াছে। জীবের জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞানসত্বা দেহেন্দ্রিয় গত হয়—জীব দেহেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করে; স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানসত্বা দেহেন্দ্রিয় অতীত এক মনোময় রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে,তাই দেহেন্দ্রিয় অতীত মানসে দেবতার মত চিন্তা ও কর্ম্ম করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে; আবার সুষুপ্ত, গাঢ়নিদ্রাবস্থায় জ্ঞান দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত কোন এক রাজ্যে,কি জানি অব্যক্ত সুখের আস্বাদন করিতে থাকে। সুষুপ্ত অবস্থা অব্যক্ত হইলেও বোধের অতীত নয়! বোধের অতীত হইলে কল্য বড়ই ভাল নিদ্রা হইয়াছে, অদ্য ভাল হয় নাই বলিতে পারিতাম না। যাহার প্রাপ্তিতে আনন্দ, না পাইলে দুঃখ ও পাইতে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা বোধ রহিত নয়; তবে ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত বটে। এই তিন অবস্থায় জ্ঞান তিনটী পৃথক রাজ্যে না থাকিলে,—তিনটী পৃথক ভোক্তাসত্বার অধীন না হইলে, এই তিন অবস্থার জন্ম হইত না। এই তিন রাজ্যই প্রকৃতিদেবীর তিন মায়া ক্ষেত্র, ইহারাই বিচিত্রবীর্য্যের তিন পত্নী, আর এই তিন ভোক্তাপুরুষই পরমপুরুষের তিন পুরুষসত্বা—বিচিত্র-

বীর্য্যের তিনপুত্র। জীবের মধ্যে সেই তিন পুরুষের তিন পুরির নামই কারণ দেহ, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ। কারণ দেহটী প্রাণময় বা আনন্দময়, সূক্ষ্মটী মনোময় বা জ্ঞানময়, আর স্থূলটী অন্নময় বা ভূতময়। জীবের জ্ঞান বা বোধসত্বা কারণদেহগত অবস্থায় ব্রহ্ম-অহঙ্কার যোগে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিয়া ক্রিয়া করেন, সূক্ষ্মদেহগত অবস্থায় দেব-অহঙ্কার যুক্ত হইয়া জ্ঞানানন্দ আস্বাদন করিয়া ক্রিয়া করেন, আর স্থূলদেহগত অবস্থায় জীব-অহঙ্কার যুক্ত হইয়া, জীবের মত দেহেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিয়া ক্রিয়ানন্দ আস্বাদন করেন। তাই স্থূলদেহ হইতে দেহাত্মবোধের জন্ম, সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্মসন্ধান ধর্ম্মবোধের জন্ম ও কারণদেহ হইতে মায়ার অতীত ব্রহ্মযুক্ততা—সমাধির জন্ম হয়। এই তিন তত্ত্বের কর্ম্ম ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ও পাণ্ডুর, জীবন লীলার মধ্যে জীবস্তভাবে দর্শন করিবে। এখন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আদি হইতে জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম প্রকৃতি বর্গের উদ্ভব রহস্য শ্রবণ কর।

প্রবৃত্তি সংবাদ

লীলা—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল দেখিয়া, ভীষ্ম ও সত্যবতী দেবী ইহাদিগকে বিবাহ করাইয়া কুরুবংশ বর্দ্ধনের উপায় করিলেন। গান্ধার-রাজকন্যা গান্ধারীদেবীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইল, এই পত্নীর উপরে ধৃতরাষ্ট্রের একজন বৈশ্যাপত্নীও ছিল। বৃষ্ণিবংশীয় কুন্তিভোজ রাজার কন্যা কুন্তীদেবী ও মদ্ররাজকন্যা মাদ্রীদেবীর সহিত পাণ্ডুর এবং এক রাজ কন্যার সহিত বিদুরেরও বিবাহ সম্পন্ন হইল। হিন্দুশাস্ত্রে জ্যেষ্ঠপুত্র হীনাঙ্গ হইলে রাজা হইতে পারে না বলিয়া, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন না, দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুই কুরুসাম্রাজ্যের রাজা হইলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ বনমধ্যে অজ্ঞাত ভাবে এক ঋষিকে বধ করিয়া, এই ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইলেন

যে, তিনি কোন পত্নীতে আশক্ত হইলেই তাহার দেহত্যাগ ঘটিবে। এই অভিশাপ জন্য রাজার সন্তান হইবার আশা নষ্ট হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজপ্রতিনিধি করিয়া তপস্যার জন্য পত্নীদ্বয় সহ বনে গমন করিলেন। এদিকে সন্তান কামনায় ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবী ব্যাসদেবের শরণাপন্ন হইলেন। ব্যাসদেব ইহাদিগকে শত পুত্র জন্য বর দান করিয়া গেলেন। ব্যাসদেবের শক্তিতে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাপত্নীতেও যুযুৎসু নামে এক পুত্র জন্মলাভ করে। রাজা পাণ্ডুও সন্তান জন্য ব্যাসদেবের স্মরণ লইলে, ব্যাসদেব তাহাকে কুন্তীদেবীর দেব-আনয়ন শক্তির সহায়তায়, দেবতা হইতে সন্তান লাভ করিতে পরামর্শ ও মন্ত্র দান করিয়া গেলেন। সেই মন্ত্র ও কুন্তীদেবীর মন্ত্র প্রভাবে পাণ্ডু কুন্তীদেবীতে তিনটী ও মাদ্রীদেবীতে দুইটী সন্তান লাভ করেন। পাণ্ডু-পুত্রগণ পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ধার্ত্তরাষ্ট্র নামে জগতে পরিচিত হইয়াছিল; বিদুরের কোনও সন্তান হয় নাই।

তত্ত্ব—বাবা, পরমপুরুষের তিন অহঙ্কার হওয়ার বিষয় শ্রবণ করিয়াছ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ভোক্তাসত্ত্বা মাত্র; কর্ম্মের কারণ প্রকৃতিদেবী। তিন অহঙ্কারকে ক্রিয়াশক্ত করিবার জন্য, এবার প্রকৃতি দেবী হইতে জীবের কর্ম্মের মূল তিন প্রকার প্রবৃত্তির উদ্ভব বর্ণিত হইবে। এই তিন অহঙ্কারের কর্ম্মকারক তিন সত্ত্বাই কুন্তীদেবী, মাদ্রীদেবী ও গান্ধারী দেবী এই তিন সত্ত্বা; ইহাদিগকেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণ বলিয়া জানিবে। এখন প্রবৃত্তি রাজ্যের বিকাশ রহস্য শ্রবণ কর। প্রকৃতি দেবীর মাধুর্য্য আস্বাদন ও ঐশ্বর্য্য আস্বাদন হইতে, বা মনের সঙ্কল্প ও বিকল্পসত্ত্বা হইতে, কর্ম্মনিবৃত্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি এই দুইটী তত্ত্বের উদ্ভব হয়। নিবৃত্ত অবস্থায় কর্ম্মহীন একটী অবস্থা কিন্তু প্রবৃত্ত অবস্থায় তিনটী কর্ম্ম-প্রেরণার জন্ম হয়। নিবৃত্তি-অভিমুখী প্রবৃত্তি একটী, নিবৃত্তির অধীনতায়

প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর একটী, আর নিবৃত্তিহীন শুধু প্রবৃত্তির তৃপ্তি করার জন্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি একটী। নিবৃত্তির অভিমুখী প্রবৃত্তির পূর্ণ স্বরূপই কুন্তীদেবী, নিবৃত্তির অধীনা প্রবৃত্তি মাদ্রীদেবী, আর নিবৃত্তিচ্যুতা শুধু প্রবৃত্তি গান্ধারী-দেবী। গান্ধারী দেবীর চক্ষুবন্ধন তত্ত্বটাই নিবৃত্তির দিক ত্যাগকরা। কথিত আছে, গান্ধারীদেবী স্বামী অন্ধ শুনিয়া বস্ত্রদ্বারা নিজের চোখ বান্ধিয়া অন্ধ স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। এই প্রকৃতিদেবী সত্যই চোখ বান্ধিয়া, ব্রহ্মদৃষ্টি রোধ করিয়া ক্রিয়া করিবার জন্য জীবত্মাসহ যুক্ত হন; তিনিই জীবের জ্ঞান আবরক তমঃগুণ। মাদ্রীত্ব রজঃগুণ, আর কুন্তীত্বই সত্বগুণ বলিয়া জানিবে। তমঃগুণ ও অন্ধ জীবত্ব হইতে, শত শত অন্ধ জীব-অহঙ্কারের জন্ম হয়, ইহারাই গান্ধারী-গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র। আর পরমাত্মা স্ব স্বরূপ রাখিয়া প্রবৃত্তি আস্বাদন করিবার চেষ্টায়, নিবৃত্তভাবে কর্ম্মরাজ্যে বিচরণ আরম্ভ করিলেই, সত্বগুণ হইতে জ্ঞানযোগী, রাজযোগী ও ভক্তিযোগী প্রকৃতিত্রয়ের জন্ম হয়, এবং রজঃগুণ হইতে নিবৃত্তি সাধনে ইহকালে সুখ চেষ্টা ও পরকালে সুখ চেষ্টায়, ধর্ম্ম পথী কর্ম্মযোগী প্রকৃতিদ্বয়ের জন্ম হয়। এইরূপে জীবকে কর্ম্মকর করিবার জন্য পরমব্রহ্ম ও প্রকৃতিদেবী হইতে, ক্রমে ত্রিবিধ অহঙ্কার ও ত্রিবিধ কর্ম্মক্ষেত্র এবং ত্রিবিধ কর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্ভব হইল। এখন কুন্তীদেবী আদির সংক্ষেপ জীবন লীলার মধ্যে সাত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতির স্বরূপ একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। মাতা কুন্তীদেবীর জীবন নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষী মানবের অতি অপূর্ব্ব আদর্শ, এই মায়ের প্রত্যেক কর্ম্ম অতি মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখিবে।

লীলা—মাতা কুন্তী, সুপ্রসিদ্ধ বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই রাজ্যে পরম-ধার্ম্মিক, বিষ্ণুভক্ত, নিরিহ স্বভাব রাজা উগ্রসেন রাজত্ব করিতেন। তাহার পুত্র কংশ তৎকালের অসুর রাজা জরাসন্ধের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পিতাকে হীনবীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য বোধে সিংহাসন চ্যুত করিয়া

নিজে রাজা হইয়া বসিল। এবং "দৈত্য" অসুরত্বের প্রচার করিয়া, ধার্ম্মিক ও ভগবৎ ভক্তগণকে পীড়ন ও বধ করিতে ব্রতী হইল। তখন সেই বংশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই কংশাসুরকে বধ করিয়া আবার উগ্রসেনকেই সিংহাসনে বসাইলেন, এবং নিজে সশস্ত্র হইয়া এই বংশের সকলের রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন ; জগতের যত সম্পদ, বিজয়, যশ, সম্মান আদি সর্ব্ব সৌভাগ্যদ্বারা সেই বৃষ্ণিকুলকে মণ্ডিত করিয়া সেবা করিলেন।

ভক্ত—সত্যই বাবা, এই কুন্তীদেবীর প্রকৃতি বৃষ্ণিবংশরূপ, ভগবৎ ভক্তকুলেই ভগবান্ অবতার হইয়া থাকেন। এই পবিত্র বংশ সত্যই ভগবানের অতি প্রিয়! এই বংশের উপরে অত্যাচার হইলেই ভগবান্ আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না। সেই জন্মরহিত, অরূপ, নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ ভগবান্‌ও তখন "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়াচ দুষ্কৃতাম। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" হইয়া উঠেন। জীবের মত আকার ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া,—দুর্জ্জনগণকে নাশ করিয়াও ভক্তগণকে রক্ষা করেন—তাঁর ভক্তকে সর্ব্ববিধ বিজয়, সম্পদ, যশ, সৌভাগ্য দান করিয়া নিজে তাঁর সর্ব্ববিধ যোগক্ষেম বহন করেন। ভগবৎভক্ত ধার্ম্মিককে অকর্ম্মণ্য বোধে যে দিন অসুর শক্তি জগতে প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিয়া, তাঁর ভক্তকে পীড়ন ও ধ্বংসের চেষ্টায় ব্রতী হয়, তখনই ভগবান্ অবতার হইয়া জগতে আবির্ভূত হন। এই দৃষ্টান্ত জন্যই কংশাসুর পীড়িত বৃষ্ণিবংশে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া কংশকে বধ করিয়া সেই কুলের রক্ষা করেন ও বৃদ্ধ ভক্ত উগ্রসেনকেই রাজা করিয়া নিজে সেই বংশকে সুখ সম্পদ দিয়া সেবা করেন। মহাভারতে দেখিবে শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীকে পিতার ভগ্নি সম্বোধনে কত ভক্তি ও ভালবাসা দেখাইয়াছেন, ইহার সন্তানগণকে নিজের ভ্রাতৃত্ব দান করিয়া ভালবাসা ও প্রীতিদান করিয়াছিলেন। এই কুন্তী প্রকৃতি ও তাঁহার সন্তান

সদৃশ এই প্রকৃতি আশ্রয়িগণ সত্য সত্যই ভগবানের এমনি আপন জনের মত প্রিয়পাত্র। দেখিবে এই কংশাসুরের মতই যেদিন দুর্য্যোধন কুন্তীপুত্রকে অকর্ম্মণ্য বোধে পীড়ন করিয়া ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে, এই কংশের দলের মতই ধার্ত্তরাষ্ট্র দলকেও ধ্বংস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবেন, জগতের সর্ব্ব যশ সৌভাগ্য দিয়া পাণ্ডবগণকে সেবা করিবেন।

লীলা—এই মাতা, শিশুকালেই মাতাপিতা কর্ত্তৃক অন্যে দত্ত হন। রাজা কুন্তিভোজের পুত্র না হওয়ায় তিনি কন্যাকে এই সত্যে বিবাহ দান করেন যে, কন্যার প্রথম সন্তান তাহাকে দান করিতে হইবে, এই মাতা কুন্তি-ভোজের সেইরূপে প্রাপ্ত সন্তান। পূর্ব্বকালে আর্য্যদের মধ্যে পোষ্য সন্তানের ন্যায় এইরূপ সন্তান গ্রহণের প্রথা ছিল। কুন্তীদেবী শিশুকাল হইতেই অসম্ভব ত্যাগী ও পর-সেবা-পরায়ণা ছিলেন; অতি ক্রোধন স্বভাব, কেবল ছল অন্বেষণকারী, অগ্নিসম মহর্ষী দুর্ব্বাশাকেও তিনি কুমারী কালেই সেবা করিয়া তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। দুর্ব্বাশার মুখ হইতে তিনি অভিশাপের বদলে বরের বাণী লাভ করেন; মহর্ষি তাহাকে সর্ব্বদেব-আনয়ন-শক্তি সহ সিদ্ধমন্ত্র দান করিয়া যান। মা এই মন্ত্রের কথা কখনও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই, অযথা প্রয়োগও করেন নাই। ব্যাসদেব পুত্রার্থী পাণ্ডুকে কুন্তীদেবীর শক্তির কথা বলিয়া দিলে, স্বামী তাহাকে দেবতা হইতে পুত্র লইতে আদেশ করেন। তখনও এই মাতা রাজাদ্বারা শাস্ত্রমতে দেবতার আরাধনা করাইয়া, সেই সাধন তুষ্ট দেবতাকে আহ্বান করিয়া পুত্র গ্রহণ করেন, তাহাও তিনবারের উপরে আর গ্রহণে স্বীকৃতা হইলেন না। এই সবের মধ্যেও কি কোন প্রকার রহস্য আছে প্রভু?

তত্ত্ব—বাবা, এই নিবৃত্তি মায়ের মাতাপিতা কেহ নির্দ্দিষ্ট নাই, যে ই মাকে আশ্রয় দেয়, তিনি তাহারই সন্তান স্বরূপা হইয়া তাহার সর্ব্বভার

গ্রহণ করেন। এই তত্ত্ব দেখাইতেই তিনি কুন্তিভোজের পুত্রিকা-পুত্র হইয়া, রাজার দুর্ব্বাশাসেবা ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আশ্রয়ে, দুর্ব্বাশাকেও তোষণের শক্তি হয়, দুর্ব্বাশার মুখেও বরবাণী লাভ হয়। এই সত্বগুণ আশ্রয়িগণের প্রতি সর্ব্বদেবতাই তুষ্ট থাকেন, তাহাদের আহ্বান-মাত্র দেবতা আসিয়া তাহার সেবা করিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করেন, এই তত্ত্বই মায়ের দেব আনয়ন শক্তিলাভ। এই প্রবৃত্তিপথী এমন শক্তি থাকিলেও অবিধি পূর্ব্বক তাহার ব্যবহার করেন না,—দেবতাদ্বারা নিজের তৃপ্তি সেবার ইচ্ছা করেন না, এই তত্ত্বই, স্বামীদ্বারা দেব আরাধনা করাইয়া পরে দেবতা আহ্বান করা। এই প্রকৃতিপথী কখনও শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন না, সেই তত্ত্বই তিনবারের অধিক সন্তান লইতে অস্বীকার করা। এই জন্যই ভগবদ্গীতায় সত্বগুণ পরিচয়ে বলিয়াছেন। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতমনা. কেবল শাস্ত্রবিধি নির্দ্দিষ্টমতে কর্ত্তব্য বলিয়া, যজ্ঞভাবে যে কর্ম্ম সম্পাদন করে তাহাই সাত্বিক, মাতা কুন্তী ইহার জীবন্ত স্বরূপ। আর ফল অভিসন্ধি করিয়া দম্ভ অর্থাৎ বুদ্ধি চাতুর্য্য দেখাইতে যে যজ্ঞ করা তাহা রাজস, ইহার জীবন্তস্বরূপ মাদ্রীদেবী। আর বিধিহীন, অবিধিও উপাচারে হীনমন্ত্রে, হীনদক্ষিণায়, হীনশ্রদ্ধ হইয়া যে যজ্ঞ করা তাহাই তামস, ইহার জীবন্ত স্বরূপ গান্ধারীদেবী। যথা গীতা—১৭ অঃ ১১।১২।১৩ শ্লোঃ অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ॥ অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ। ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ট তৎ যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ বিধিহীনমসৃষ্টান্নংমন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

শুদ্ধা সাত্বিকি প্রকৃতির প্রধান স্বরূপ, সে ভয়ে ভয়ে প্রবৃত্তি-রাজ্যে বিচরণ করে, তাই সর্ব্বদা শাস্ত্র ও সদাচার দেখিয়া মিলাইয়া তবে কর্ম্ম আচরণ করে। কুন্তীদেবীর জীবনে এই ব্যবহার সর্ব্বদা দর্শন করিবে।

শাস্ত্র ও সদাচারের বিরুদ্ধ বলিয়াই, কুমারীকালে সূর্য্যদেব-দত্ত অক্ষয়-কবচ ও কুণ্ডল শোভিত, অপূর্ব দেবকুমারকে—পৃথিবী জয়ী বীর হইবে শুনিয়াও এই মাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণ রক্ষাকরা, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য, ব্রাহ্মণের বিনিময়ে নিজ পুত্র ভীমকে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মায়ের দেবতা হইতে যত ইচ্ছা পুত্র লাভ করিবার শক্তি ছিল, তাতে স্বামীও আদেশ করিতেছেন, তবু এই মাতা শাস্ত্রে রাজরাণীকে দেবতা হইতে তিনবার পর্য্যন্ত বর নিবার অধিকার দিয়াছেন বলিয়া, তিনি তিনবারের অধিক পুত্র গ্রহণে স্বীকৃতা হইলেন না। স্বামীর নপুংষকত্ব জানিয়া ও নিজের দেব আনয়ন শক্তিদ্বারা দেবতাকে নিজ প্রয়োজনে আহ্বান করেন নাই। স্বামীর ইচ্ছায়, তাঁহার আরাধনাতুষ্ট দেবতাকে, স্বামীরই প্রয়োজনে মাত্র আহ্বান করিয়াছেন, তাহাও তিন বারের অধিক স্বামীর প্রবৃত্তি-বাসনা পূরণে স্বীকৃতা হন নাই। এই মাতা স্বামী হারা হইয়া, স্বামীগৃহে পুত্রগণ সহ এত অত্যাচার অনাদর পাইয়াও শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করিলেন না। সন্তানগণের প্রাণনাশ সম্ভাবনা দেখিয়াও, ভোগ বিলাস স্বাধীনতায় ব্যাঘাত দেখিয়াও— পুত্রহীন পিতার একমাত্র রাজ্যাধিকারিণী মাতাকুন্তী সন্তান লইয়া পিতৃগৃহ আশ্রয় করিলেন না। মাত্র ধর্ম্ম ও ভগবানের দিকে ও কর্ম্ম ফলের উপর ভরসা করিয়া স্বামীগৃহে পড়িয়া রহিলেন। পিতা যে দেবতা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ স্বাক্ষ্য রাখিয়া কন্যাকে শ্বশুরকুলে দান করিয়া দেন— রমণী যে পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্বক শ্বশুরকুলের সেবাভার গ্রহণ করে, সে কি করিয়া সেই কুল, সেই কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবে! এই বংশের পরিচয়ে যে তাঁর সন্তানগণের পরিচয়, এই বংশীয় স্বামীর ভ্রাতার দোষ প্রকাশ করিয়া দিলে যে, পুত্রগণেরই পিতৃবংশ কলঙ্কিত হইবে! তাই মাতা অত্যাচারের সংবাদটুকুও পিত্রালয়ে প্রেরণ

করেন নাই। এমন কি জতুগৃহ দাহের পরও পিত্রালয়ে না যাইয়া, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিয়া দূরদেশে পলায়ন করিলেন—ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন তবু পিতৃবংশের বা অন্য কোনও রাজার সহায়তায় প্রতিবিধান চেষ্টা করিলেন না। ইহাতে যে তাঁহার শ্বশুরকুলের—তাঁহার সন্তানগণের পিতৃকুলের কলঙ্ক প্রকাশিত হইবে! অপরের দ্বারা পিতৃকুলের পরাজয় করা হইতে তাপস ভাবে ঈশ্বর আরাধনায় জীবন যাপনে ক্ষতি কি? পাণ্ডব যদি পারে ভগবান্ ও ধর্ম্ম সহায়ে শুধু নিজবীর্য্যে রাজ্য সম্পদ লাভ করিয়া, কীর্ত্তি ও সৎকর্ম্ম দ্বারা কুরুবংশের অধিকারিত্ব লাভ করিবে—সেই বংশের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া নিজকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবে; তবু ঘর পোড়াইয়া ভিটা অধিকার করার মত—পরের দ্বারা পিতৃবংশের অসম্মান করাইয়া বংশের অধিকারিত্ব, কুন্তীপুত্র-পাণ্ডব কখনও চাহিতে পারেনা! এই মায়ের মহৎ-শিক্ষাগুণেই পাণ্ডব এত মহৎ হইতে সক্ষম হইয়াছিল। পাণ্ডব এমন প্রাণঘাতী মহাশত্রু জেষ্ঠতাত ও তাঁর পুত্রগণকেও যথার্থ জ্যেষ্ঠতাত ও ভ্রাতার অধিকার দান করিয়া, সর্ব্বদা সম্মান ও মর্য্যাদা দান করিতে পারিয়াছিল। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ণরূপে পিতৃত্ব দান করিয়া জীবন ভরিয়া অবিচারে তাঁহার শাসন ও আদেশ পালন করিয়াছিলেন। আর 'দু' অক্ষরটীর অর্থ মন্দ বোধক বলিয়া, তিনি জীবন ভরিয়া দুর্য্যোধনকে সুযোধন বলিয়া ডাকিয়াছেন। তাঁহারা মায়ের নিকট জানিয়াছিল, 'জীবের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্তির মতই; জীবের, সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, শত্রু মিত্রলাভও নিয়তির বিধান; তাহা এড়াইবার শক্তি জীবের শক্তি চেষ্টার অতীত। তবে "তস্মিন্ তুষ্টে জগত তুষ্টং।" সেই জগতকর্ত্তা তুষ্ট হইলে, তিনি এই সকলই উলটাইয়া দিতে পারেন বটে। তাই সত্য ধর্ম্মপথে ভগবান্ তোষণ চেষ্টায় ব্রতী হও, তাঁহার ইচ্ছা হইলে শত্রুই মহামিত্র হইবে, বিপদ মহাসম্পদের কারণ

হইবে, দুঃখ ও মহৎসুখকে প্রসব করিবে। নচেৎ যে কোন শক্তির কেন সহায়তা গ্রহণ না করে—শত্রুকে বাবা ই ডাক—আর সর্ব্বধন-সম্পত্তিই দান কর,—দুর্য্যোধন না ডাকিয়া সুযোধনই ডাক, নিয়তির চক্র হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারিবেনা।" দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বিষ খাওয়াইয়া অজ্ঞান হইলে, হাত-পা বান্ধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে। ভীমকে না দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি ভিত হইয়া মায়ের নিকট উপস্থিত। ভ্রাতাগণ ভয়ে দুঃখে আকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতা স্থির হইয়া বলিলেন, "মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন তোমরা প্রত্যেকে দীর্ঘায়ু হইবে, আর তোমরাও অধর্ম্মাচারী নও, তবু তোমাদের কেন পরাজয় ও অপমৃত্যু ঘটিবে! নিশ্চয় ভীম ফিড়িয়া আসিবে। ধৈর্য্য ধারণ কর ও ভীমের অনুপস্থিত কথা ব্যক্ত করিওনা।" শাস্ত্র ও সদাচারে এমন অবিচলিত শ্রদ্ধাই পূর্ণ সাত্বিকতার লক্ষণ। এই মা এক সময় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কি চাহিয়াছিলেন জান কি? মা বলিয়াছিলেন, "আমি যেন চিরকাল দুঃখ ও বিপদের মধ্যে থাকি, তবেই তুমি সর্ব্বদা আমার স্মরণে থাকিবে।" আর এই মাতা পাণ্ডবের দুঃখ অবসান হইয়া রাজ্য ভোগ আরম্ভ মাত্রই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া চলিয়া যান, ইহাতেই কুন্তীমাতা কেমন স্বভাবের সত্বা তাহা জ্ঞাত হইতে পার। এখন মাদ্রী-প্রকৃতির সহিত এই মায়ের পার্থক্য কি তাহাই শ্রবণ কর!

রাজা পাণ্ডু ব্যাসদেবের নিকট কুন্তীদেবীর দেব আনয়ন শক্তির সংবাদ পাইয়া, মাকে দেবতা হইতে সন্তান দান করিতে বলিলে, মাতা যেন দায়ে ঠেকিয়া বলিলেন, "আপনার যখন আদেশ তখন আহ্বান করিব। যেই দেবতাকে ডাকিতে হইবে, আপনি প্রথমে সেই দেবের আরাধনা করিয়া পুত্রদান করিতে স্বীকৃত করুন, পরে আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া পুত্র গ্রহণ করিব। রাজা পাণ্ডু প্রথমে ধর্ম্মরাজ, পরে বায়ু দেবতা ও পরে

দেবরাজকে আরাধনা করিয়া, আহ্বান করিতে বলিলেন, কুন্তীদেবী তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া পুত্রগ্রহণ করিলেন; তিন পুত্রের উপরে আর দেবতা আহ্বানে স্বীকৃত হইলেন না। আর মাদ্রীদেবী নিজেই পাণ্ডুর নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন। রাজার অনুরোধে কুন্তীদেবী তাহাকে পুত্রজন্য দেবতা আনয়ন করিয়া দিতে স্বীকৃতা হইলে, মাদ্রীদেবী একবারে অধিক লাভের আশা করিয়া, এক নামীয় দুই দেবতাকে নিজে নির্ব্বাচন করিয়া আহ্বান করিলেন ও একবারে যুগল পুত্র প্রসব করিলেন। এই প্রবৃত্তির এই ফলানুসন্ধান প্রকৃতি সর্ব্বত্রই থাকিবে—রজঃগুণের এই ব্যবসায়ী বুদ্ধির প্রকাশ যে সর্ব্বদাই করিবে। সে যে দায়ে ঠেকিয়া কেবল সুখের আশায় নিবৃত্তির অধীন হইয়া চলিতে চায়—কুন্তী-শক্তি দ্বারা পুত্র লাভের ন্যায়, নিবৃত্তি-সাধনা দ্বারা প্রবৃত্তির সেবা করিতে চায়। তাই রজঃগুণ কিছুতেই সকাম সাধন-রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না; সে ইহকালে সুখ, নচেৎ উর্দ্ধভাবে পরকালে দেবত্ব, স্বর্গভোগ আদি সুখকে চায়। এই দুই ভাবই তাঁহার দুই পুত্র নকুল ও সহদেব। আর ফলানুসন্ধান হীন জ্ঞানযোগী, বায়ুযোগী ও ভক্তিযোগী নিষ্কাম ভক্ত সাধকগণই কুন্তীদেবীর তিনপুত্র, ধর্ম্মরাজ, ভীম ও অর্জ্জুন।

শিষ্য—গুরুদেব, কুন্তীমায়ের আরো একটা পুত্রের সংবাদ যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্য্যোধনের প্রধান আশ্রয় ও বল মহাবীর কর্ণও এই মায়ের সন্তান, তাঁহার জন্মরহস্যও বুঝাইয়া দিন প্রভু!

লীলা—এই মাতা দুর্ব্বাসা হইতে মন্ত্রশক্তি লাভ করিয়া, কুমারীর চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত, একদিন প্রভাতের সূর্য্যকে খুব সুন্দর দেখিয়া তাহার অধিপতী দেবতাকে আহ্বান করিয়া বসেন। অমনি সূর্য্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কুন্তীদেবীকে পুত্র গ্রহণ করিতে বলিলেন। কুন্তীদেবী কুমারীকালের ও সতীত্ব ধর্ম্মের জন্য, পুত্র গ্রহণে অস্বীকার করিলে,

দেবতা বলিলেন, "সুন্দরি! ঋষি যে, সন্তান জন্য তোমায় এই শক্তি দান করিয়াছেন, তাই আমাকে সন্তান দান করিতেই হইবে। তোমার কুমারিত্ব বা সতিত্ব জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই, দেবতা হইতে সন্তান লাভে তোমার কুমারিত্ব বা সতিত্ব নাশ হইবে না। দেবদর্শন তো বৃথা হয় না দেবি! হয় বর না হয় অভিশাপ একটী গ্রহণ করিতেই হইবে। তুমি পুত্র লও, আমার মত সুন্দর, অতি বলবান ও পরম ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিবে।" দেবী বলিলেন,—"আমি যে কিছুতেই আপনার এই পুত্রকে প্রতিপালন করিতে পারিব না, কি করিয়া আপনার পুত্র জীবিত থাকিবে।" সূর্য্যদেব বলিলেন, "আমার অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল দ্বারা এই বালক রক্ষিত হইবে; তুমি না পালিলেও এই পুত্রের মৃত্যু হইবে না। তাকে যে দেখিবে, সেই ইহাকে ভালবাসিবে ও পালন করিবে। পরে যা হইবার হইবে তুমি পুত্র গ্রহণ কর।" দেবী অভিশাপ ভয়ে স্বীকৃতা হইলেন, দেবতা পুত্র দান করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অপূর্ব্ব সুন্দর কবচ-কুণ্ডল ধারী দেবকুমারকে প্রাপ্ত হইয়াও, কুন্তীদেবী তাঁহার পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (বেশ্যানীপুত্র) নিঃসন্তান অধিরথের সম্মুখে গোপনে পুত্রকে রাখিয়া আসিলেন। অধিরথ দেবপুত্র দেখিয়া মোহিত হইলেন ও গোপনে নিজ ঘরে নিয়া, নিজ পুত্র পরিচয়ে তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। এই অধিরথের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব ছিল, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইলে, ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে রথশালার কর্ত্তা করিয়া দেন। সেই হইতে পুত্র লইয়া অধিরথ হস্তিনাবাসী হন; এই পুত্রই মহাবীর দাতাকর্ণ। এই কুন্তীপুত্রের বীর্য্যের আশ্রয়েই দুর্য্যোধন পাণ্ডব বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সাহসী হইয়াছিল।

ভক্ত—বাবা, এই শুদ্ধাপ্রকৃতি কুন্তীমায়ের সন্তান আশ্রয় বিনে, এই কর্ম্মরাজ্যে, সুফল ও বিজয় লাভের আর কোনও উপায়ই নাই। অসুর

প্রবৃত্তিগণ ও এই মায়ের কোনও সন্তানের বল আশ্রয় করিয়াই, জগতে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় নচেৎ; দেবপ্রকৃতিবর্গের নিকটে স্পর্দ্ধা করিয়া দাড়াইতেও যে তাহারা সাহসী হয় না! পুরাণে শ্রবণ কর নাই! যত যত অসুর রাজা, ঋষি শুক্রাচার্য্যের সহায়তায় দেবগণকে পরাজয় করিয়া, ত্রিলোকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মহাভারতেও দেখিবে দুর্য্যোধনের দল, কুন্তীপুত্র—কর্ণ, ঋষিপুত্র—দ্রোণ,কৃপ ও গঙ্গাপুত্র—ভীষ্মদেবের সহায়তায়ই পাণ্ডব বিজয়ের চেষ্টা করিবে। ঋষি হইয়াও কেন শুক্রাচার্য্য অসুর পক্ষ হইলেন, অন্য কোনও ঋষি হইলেন না কেন; তাহা বুঝাইতেই কুন্তীমায়ের গর্ভে কর্ণের জন্ম। বাবা, উত্তম বীজ হইলেই উত্তম ফল লাভ হয় না! যথাকালে উত্তম ভূমিতে বপন করিতে পারিলে পূর্ণ উত্তম ফল লাভ হয়। এই মায়ের সন্তানগণও তেমন কাল ও পাত্রভেদে কেহ দেবপক্ষ ও কেহ অসুর পক্ষ হইয়া পড়েন। এইজন্যই এক প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান হইয়াও কেহ দেবতা ও কেহ অসুর হইয়াছিল। তাই একই তপ-পথ আচরণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর-অতীত ঋষিত্ব লাভ করিলেন—আর হিরণ্যকশিপু আদি অসুর রাজাগণ সেই তপ আচরণ, দেবদর্শনাদি করিয়াও ভীষণ অসুরত্ব লইয়া জগতে বিচরণ করিল। মায়ের নিবৃত্তিমুখী নিষ্কাম-অবস্থায়-জাত সন্তানই দেবপক্ষ হয়, আর প্রবৃত্ত-অবস্থার পুত্রই অসুর পক্ষ হয়। তাইই কুমারীর চঞ্চলতাময়-কালে, মন্ত্র-পরীক্ষা ও সূর্য্যকে দেখিব এই প্রবৃত্তি তৃপ্তির জন্য আহ্বান করার অবস্থার-পুত্র কর্ণ—দেবতা হইতে এই মায়ের গর্ভে জন্মিয়াও, পাণ্ডবের মত নিবৃত্তিপর হইতে পারিল না। সে দর্প অহঙ্কার ঈর্ষা লইয়া, যশ ও ভোগ সুখ জন্য দুর্য্যোধনের পক্ষভুক্ত হইল। এইরূপে ঋষিপুত্র হইয়াও দ্রোণ, ও কৃপাচার্য্য, অকালে—তপস্যার সময় রমণী দর্শনে, অস্থানে—দ্রোণ মধ্যে ও শরস্তম্বে বীর্য্যপাত হইতে জন্ম বলিয়া, ব্রাহ্মণকর্ম্ম ত্যাগ

করিয়া ক্ষত্রিয়-কর্ম্মা হইলেন ও ভোগবিলাস বৃত্তি লইয়া দুর্য্যোধনের সহায়তা করিলেন। ভীষ্মদেবের দুর্য্যোধন পক্ষ গ্রহণতত্ত্ব শ্রবণ কর তবেই এই বিষয় আরও সরল হইয়া যাইবে।

মনের দুইটী অবস্থা, একটী সঙ্কল্প অন্যটী বিকল্প, সঙ্কল্পটীই নিবৃত্তি আর বিকল্পটীই প্রবৃত্তি। এই বিকল্প—প্রবৃত্ত-অবস্থায় মন মায়াময় অসুরত্ব-রাজ্যে ক্রিয়া করে, আর সঙ্কল্প—নিবৃত্ত-অবস্থায়ই দেবত্ব-রাজ্যে ক্রিয়া করে। এই বিকল্প অবস্থায়ই মন-ভীষ্ম-ধার্ত্তরাষ্ট্র অসুরত্ব রক্ষার জন্য দেবত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, পরে সেই ভীষ্মই নিবৃত্ত অবস্থায় শরশয্যা গ্রহণ করিলে, পাণ্ডব-দেবত্বের সহায়তায় বহু উপদেশ দান করিয়াছেন। মায়ের বিকল্প অবস্থার পুত্র বলিয়াই কর্ণ সর্ব্ব বিষয়ে মহৎ হইয়াও অসুরের পক্ষ হইয়া দেবত্বের প্রতিযোদ্ধা হইয়াছিল।

দেবপুত্র কর্ণকে কুন্তীদেবীর ত্যাগ করণ ও কর্ণের অসুরপক্ষ গ্রহণের মধ্যে আরও একটু রহস্য আছে। নিজে সাধনা না করিয়া, অপরের সিদ্ধমন্ত্রের প্রভাবে দেবতাগণকে আহ্বান করিলে, সেই দেবতা পূর্ণ সন্তুষ্টির সহিত আসিয়া বরদান করেন না—দায়ে ঠেকিয়া অনিচ্ছার সহিত বরদান করেন; তাতেই সেই বর সাধকের পূর্ণমঙ্গলকর হয় না। নিবৃত্তপথী শুদ্ধ সাত্ত্বিক-প্রকৃতিবান্ ব্যক্তি তাইই এইরূপ ফলকে গ্রহণ করেন না। মানব-প্রবৃত্তি অসুরত্বের অধীন না হইলে এমন ভাবে দেবগণ হইতে ফল লাভের চেষ্টা করেনা। এইরূপ ভাবে বরে বাধ্য দেবগণ হইতে প্রবৃত্তির সুখ আহরণ করাই দেবগণকে দাসত্বে নিযুক্ত করা। মহাতাপস রাক্ষসরাজ রাবণ এই পথে চলিয়াই পূর্ণরূপে অসুর-সম্রাট হইয়া পড়িয়াছিল। তাই মাতা কুন্তীদেবীকে, সূর্য্যদেব তাঁর সদৃশ রূপবান্ গুণবান্ ও অমর সদৃশ পুত্র দিলেও, মাতা লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। পরে অভিসম্পাতের ভয়ে ও দেবতা যদি পুত্র দান করিয়া তুষ্ট হন তাই করুন বলিলেও, তাঁর-দত্ত

পুত্রকে তিনি নিজের তৃপ্তি, সেবা ও সুখের জন্য গ্রহণ করেন নাই; ইহাকে পালন করিলেই মায়ের নিবৃত্তি-ধর্ম্মের নাশ হইয়া যাইত। আর কর্ণ সূর্য্যদেবের দায়েঠেকা অবস্থার-দত্ত পুত্র বলিয়াই পাণ্ডবদের মত পূর্ণ দেবত্বভাব প্রাপ্ত হইলেন না। তাই বুঝি ভীষ্মদেব শরশয্যা গ্রহণ করিলে যখন কর্ণ একা দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম অতি কষ্টের মধ্যেও কর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"কর্ণ তুমি যে পার্থ তাহা আমি সন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তুমি যে দেবপুত্র তাহাও আমি জানি! তোমার বীরত্ব, তোমার দানমহত্ব সকলি অমানুষ! কিন্তু তোমার জন্মে একটু দোষ থাকায়, নিবৃত্তিধর্ম্মে তোমার একটু দ্বেষবুদ্ধি হইয়াছে; তাই তুমি অনর্থক এমন ধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগকে ঈর্ষা ও দ্বেষ কর।" * * * এখন মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুলীলার মধ্যে, পরমাত্মার স্ব স্বরূপ হারাইয়া জীবত্ব লাভ রহস্য শ্রবণ করিবে।

লীলা—জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র চক্ষুহীন বলিয়া, কনিষ্ঠ হইয়াও পাণ্ডুই কুরুরাজ্যের অধিকার লাভ করিলেন এবং ভীষ্মাদি কাহারো সহায়তা না লইয়াই, পৃথিবীর সকল রাজাকে পরাজয় করিয়া সম্রাট পদ লাভ করিলেন। পরে কৃপাচার্য্যকে সখা ও সেনাপতি করিয়া কতক দিন রাজত্ব করিতেই, হঠাৎ অজ্ঞাতে ব্রহ্মবধ করিয়া অভিসম্পাৎ প্রাপ্ত হইলেন। এইকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য না পাওয়ায় দুঃখ বোধ করিয়া, তাহাকে নিজ প্রতিনিধিত্ব দান করিয়া, বিদুরকে মন্ত্রী ও কৃপাচার্য্যকে কর্ম্মকর্ত্তা—সেনাপতি ও ভীষ্মদেবকে রক্ষক করিয়া, নিজে তপস্যার জন্য তপভূমি হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

তত্ত্ব—এই তত্ত্বটীই জীবের প্রকৃত মুক্ত স্বরূপের তত্ত্ব বাবা! জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে, জীবত্বই তো কর্ম্মরাজ্য লাভ করিবার কথা। কিন্তু জীবত্ব যে অন্ধতাযুক্ত—আধ্যাত্ম্য চক্ষুহীন, তাই প্রথমে সে অধিকার পায় না; পরমাত্মা-পাণ্ডুই রাজা হয়। পরমাত্মা জাগরিত অবস্থায় অন্য কোন বৃত্তিরই

ক্রিয়া থাকে না, এমন কি মনভীষ্মেরও তথায় ক্রিয়াপ্রাধান্য থাকে না, তাহাই পাণ্ডুর একা সর্ব্বদেশ জয় করিয়া সম্রাট হওয়া। পরমাত্মার রাজ্যে প্রথম দয়াবৃত্তির উদ্ভব হয়, এই বৃত্তিই তাহাকে টানিয়া নিবৃত্তিরাজ্য হইতে প্রবৃত্তি কর্ম্মরাজ্যে নামাইয়া নিয়া আসে, ইহাই মাত্র কৃপাচার্য্যকে সখা ও সেনাপতী করা। এই দয়াবৃত্তির তৃপ্তি করিতে যাইয়াই পরমাত্মা জীবত্বকে ক্রমে কর্ম্মভার দান করিয়া নিজে কর্ম্মভার ছাড়িয়া দেন। সেই পরমাত্মা ভগবান্ জীবকে কেমন ভাবে, কি কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত করিয়া দেন, সেই তত্ত্বই পাণ্ডুকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যদান করার মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্ জীবকে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব লইয়া, বিবেকের মন্ত্রণাতে, দয়া বৃত্তির সহায়তায় কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করেন। এই তত্ত্বই বিদুরকে মন্ত্রী ও কৃপাচার্য্যকে কর্ম্মকর্ত্তা—সেনাপতি করিয়া যাওয়া। আর বিশেষ বিপদে ভীষ্মদেবকে রক্ষক করার তত্ত্ব, অন্য কাহারও শরণ না লইয়া নিজ মনের শরণ লইতে বলা হইয়াছে। জীব এইভাবে কর্ম্ম করিতে পারিলে, এই সংসার রাজ্যে মুক্তস্বরূপ রাখিয়া বিচরণ করিতে সক্ষম থাকে। কিন্তু জীব তাহার অন্ধস্বভাব প্রযুক্ত, প্রবৃত্তি রূপ পুত্রের অধীন হইয়া এই ভীষ্ম, বিদুর ও কৃপাচার্য্যের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া বসে, ও নিজেই কতকগুলি বিকৃত বাসনার সৃজন করিয়া, তাহাদের তৃপ্তি করিতে অসুরত্বের বা জীবত্বের পথে ঘুড়িতে থাকে; এখন এই জীবত্বের জাগরণ শ্রবণ করিবে।

লীলা—রাজা পাণ্ডু বনে যাইয়া সন্তান কামনায় ব্যাসদেবের পরামর্শে ও কুন্তীদেবীর সিদ্ধমন্ত্র সহায়তায় দেব-আরাধনা করিয়া, দেবতা হইতে কুন্তীদেবীর গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন; কুন্তীদেবী আর সন্তান গ্রহণে স্বীকৃতা হইলেন না। কিন্তু মাদ্রীদেবী সন্তানের জন্য রাজার কাছে কামনা জানাইলেন, তাই রাজা মাদ্রীদেবীকে সন্তান দান জন্য কুন্তী

দেবীকে অনুরোধ করিলেন। কুন্তীদেবীর মন্ত্র সাহায্যে মাদ্রীদেবী এক গর্ভেই দুই সন্তান লাভ করিলেন। একদিন নির্জ্জনে রাজা মাদ্রীদেবীসহ মিলিত হইলে রাজা কামপরতন্ত্র হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন, সেইকালে মাদ্রীদেবীসহ আসক্ত হওয়ায় ব্রহ্মশাপে রাজার মৃত্যু হইল। মাদ্রীদেবী রাজার সহিত সহমৃতা হইলেন, কুন্তীদেবী শিশুপুত্রগণকে লইয়া রাজধানীতে আসিলেন ও ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে পিতৃহীন সন্তানগণের রক্ষকতা গ্রহণ করিলেন।

তত্ত্ব—প্রবৃত্তি-কামনা-যুক্ত পরমাত্মার ক্রমে জীবত্বে পর্য্যবসানই এই লালাটুকু বাবা! পরমাত্মা সত্যই এই পাণ্ডুরাজার মত অভিশাপ গ্রস্ত। তাঁহার পত্নীও দুইটী, একটী নিবৃত্তি ও অন্যটী প্রবৃত্তি। ইহাদের কাহারও প্রতি আসক্ত হইলে সত্যই পরমাত্মার মৃত্যুঘটে। নিবৃত্তিগত হইলে ক্রিয়াহীন সমাধিমগ্ন হন ও প্রবৃত্তি গত হইলে ব্রহ্ম স্বরূপহীন জীব হইয়া পরেন। কেবল নিবৃত্তির অধীন প্রবৃত্তিগত হইলেই কতকদিন বিষয় রাজ্যে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন। সেই মুক্ত ক্রিয়াশক্তির জন্যই রাজা পাণ্ডুর পুত্র লাভ। পরমাত্মা জীবত্বকে পূর্ব্বে মাত্র মন, বিবেক ও দয়া এই তিনটী সত্বাই দান করিয়াছিলেন, এবার কর্ম্ম-বৃত্তিরূপ সন্তান দিতে ইচ্ছুক হইলেন, এই তত্ত্বই ব্যাসদেবের নিকট সন্তান কামনা। ব্যাসদেব এবার পরমাত্মত্ব নষ্ট না হয় এমন ব্রহ্মযুক্ত নিবৃত্তিমুখী কয়টী কর্ম্মপ্রবৃত্তির জন্মদান জন্য চেষ্টিত হইয়া, সত্বগুণ হইতে তিনটী ও সত্বঅধীন রজঃগুণ হইতে দুইটী, এই পঞ্চটী দৈব প্রকৃতির উদ্ভব করিয়া দিলেন। এই পঞ্চটী কর্ম্ম-পথেই আত্মার দীপ্তি রক্ষা করে, বা স্ব স্বরূপে, দীপ্যমান হইয়া বিচরণ শক্তি দেয়, এই বলিয়াই বুঝি ইহাদের নাম দৈব-প্রকৃতি। কিন্তু ইহাতে ও প্রবৃত্তি অভিমুখী প্রথম-পুরুষ, পরমাত্মার কর্ম্মকর স্পৃহার শেষ না হওয়ায়, তিনি নিবৃত্তি-সত্বগুণকে ত্যাগ করিয়া, এবার প্রবৃত্তি-রজঃগুণের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তখনই পরমাত্মার দীপ্তিটুকু—সেই ব্রহ্মযুক্ত অসীম জ্ঞান ও শক্তিরাশি

একেবারে নিবিয়া গেল। এই তত্ত্বই কুন্তীদেবী হীন অবস্থায় নির্জ্জনে মাদ্রীর প্রতি আসক্ত—ইহাই রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু। বাবা, এই সংসারে যদি আত্মজ্ঞান-সহিত পরমাত্মা জাগাইয়া বিচরণ করিতে চাও, কখনও নিবৃত্তি-কুন্তীদেবীকে না লইয়া প্রবৃত্তি-মাদ্রীদেবীর অধিকারে যাইও না। আর এই পঞ্চপাণ্ডব কর্ম্ম-সত্বার উপরে আর ষষ্ঠ কর্ম্ম-সত্বার দ্বারা কর্ম্মের বাসনা করিও না। নিবৃত্তি-হীনা প্রবৃত্তি বা সত্বগুণের অধীনতাহীনা রজঃগুণই মলিনা অন্ধপ্রবৃত্তি বা তমঃগুণ গান্ধারীদেবিত্ব লাভ। ইহাই পরমাত্মার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রীদেবীর ও দেহত্যাগ দ্বারা দেখান হইল। এবার কর্ম্ম-প্রবৃত্তি রাজ্যে মাদ্রীদেবীর অধিকার যাইয়া, চোখ-বান্ধা-প্রবৃত্তি গান্ধারীদেবীর অধিকার আসিল। পরমাত্মার এই অন্ধ অবস্থায় ও কতগুলি সন্তান রূপ কর্ম্ম-শক্তির উদ্ভব হইবে, ইহারাই ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ। এই সবসত্বা ব্রহ্ম-মুক্ততা ও নিবৃত্তি-হীন জীবত্ব বা অ+সুরত্বের বর্দ্ধক ও রক্ষক কর্ম্মশক্তি সমূহ। পরমাত্মা ভগবান্ এইরূপে জীবকে কর্ম্ম করিবার জন্য মন্ত্রী, সহায়, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মশক্তি দান করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিবেন ও নিজে অন্তর্হিত হইয়া জীবলীলা দর্শন করিবেন। কি কি দান করিলেন বুঝিলে তো বাবা! জীবকে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব মাত্র দিয়া, মনরূপী ভীষ্মদেবকে কর্ম্মের আশ্রয় করিয়া দিলেন। মনের সঙ্কল্প-শক্তি বা নিবৃত্তি-কর্ম্ম জন্য দ্বিতীয়-পুরুষ আত্মারূপী বিদুরত্বকে এবং মনের বিকল্পশক্তি বা প্রবৃত্তির-কর্ম্ম জন্য, তৃতীয়-পুরুষ জীবাত্মারূপী ধৃতরাষ্ট্রত্ব অহঙ্কারকে দান করিলেন। কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শুদ্ধা দৈবপ্রবৃত্তি কুন্তীদেবীর, মিশ্রা মাদ্রীদেবীর ও অশুদ্ধা আসুর-প্রবৃত্তি গান্ধারীদেবীর স্বভাব দান করিলেন। সাধারণ কথায় সত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটী কর্ম্ম প্রবৃত্তি দান করিলেন। কর্ম্মকারক-শক্তি জন্য শুদ্ধাপ্রকৃতি হইতে পঞ্চপাণ্ডবরূপী পঞ্চ প্রকারের, কর্ম্মশক্তির সৃজন করিয়া দিলেন। জীব অন্ধত্বপ্রযুক্ত পরমাত্মা হইতে চ্যুত হইয়া, তাঁহার নির্দ্দেশ লঙ্ঘন

করিয়া, অন্ধ-প্রবৃত্তির সহায়তায় কেমনে সব অসুর-প্রবৃত্তির জন্ম দান করিয়া আসুরিক পথে ধাবিত হয়, এখনে মহাভারতে ক্রমে তাহাই দর্শন করিবে।

শিষ্য—গুরুদেব, বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীগণের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করিলেন ব্যাসদেব, আবার পাণ্ডুর সন্তান জন্মের কর্ত্তাও ব্যাসদেব, গান্ধারীদেবীও তাঁহার বরেই সন্তান লাভ করেন। সর্ব্বত্র ব্যাসদেবের এই কর্তৃত্ব মধ্যেও কি কোন প্রকারের রহস্য আছে প্রভু!

গুরু—আছে বৈ কি বাবা! তাই তো এই ব্যাসকে বেদব্যাস বলা হয়; ভগবানের অংশ এই ব্যাস-শক্তিই সৃষ্টির মূল-সত্বা। প্রকৃতি-দেবী তো শুধু মায়া, এই ব্যাস-শক্তি লাভ করিয়াই তিনি সৃষ্টি প্রসবে সমর্থা হন। এই ব্যাস-শক্তিই এক ব্রহ্মকে অনন্ত-সত্বায় অনন্ত নামে বিভক্ত করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। দেবত্ব ও ইহারি সৃজন, অসুরত্ব ইহারি সৃজন। দেবতা হইতে কি প্রকারে অসুরত্বের সৃজন হয় সেই রহস্য দুর্য্যোধনাদির জন্ম মধ্যে দর্শন কর।

লীলা—ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া রাজ্য না পাওয়ায়, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পত্নী গান্ধারী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পাণ্ডুর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাই পাণ্ডু অভিশাপ গ্রস্ত হইলে, তাহাদের পুত্র রাজা হইবে আশা করিয়া ব্যাসদেবের আশ্রয়ে সন্তান চেষ্টা করেন। ব্যাসদেব শতপুত্র জন্য বরদান করিয়া চলিয়া গেলেন। রাণী গর্ভবতী হইলেন, কিন্তু প্রসবের পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলেন যে,রাজা পাণ্ডু দেবতা হইতে যুধিষ্ঠিরকে পুত্র লাভ করিয়াছেন। সেই সংবাদে নিজের পুত্রের রাজ্য-লাভের আশা নাই বলিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন ও ঈর্ষ্যায়, "তাহাদের দাস হইয়া থাকিবার জন্য আমার পুত্রের কোন প্রয়োজন ভাবিয়া," গর্ভে প্রস্তর দ্বারা ভীষণ আঘাত করিলেন; আঘাতে গর্ভস্রাব হইয়া রাণী মূর্চ্ছিত হইলেন। ব্যাসদেব তাহার বর নষ্ট হয় ভাবিয়া, রাজধানিতে আসিয়া প্রসূত মাংসাপিণ্ডে

ঘৃতের ধারা দিতে থাকিলে, সেই পিণ্ড একশাত এক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। তিনি প্রত্যেকখণ্ড এক একটী ঘৃত কুম্ভে স্থাপন করিয়া গেলেন; সেই এক এক কুম্ভ হইতে একশত পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হইল। এই গর্ভস্রাবের পর ঘট হইতে এমন অদ্ভুত জন্ম মধ্যেও রহস্য আছে বাবা ?

উত্তর—ব্যাসদেব-দত্ত-পুত্র কাল ও পাত্রের দোষেই ত দেবতা না হইয়া অসুরত্ব লাভ করিবে। এমন মহৎ বংশে জন্মিয়াও তাইই জন্মরহস্য দোষে দুর্য্যোধনাদি এমন পাষণ্ড অসুর হইয়াছিল। দেবত্বশক্তিই এমন ঈর্ষ্যাদি কারণে অকালে অপাত্রে ব্যবহার দ্বারা অসুর হইয়া উঠে; এই দোষেই পুণ্যকর্ম্মও পাপ ফল প্রসব করে। গর্ভস্রাবমধ্যে এবং মৃত মাংসপিণ্ড প্রসব মধ্যেও রহস্য আছে বাবা! অসুর ভাবগুলি সবই গর্ভস্রাব—ইহাদের আচরণে কেহই সুফল লাভ করে না,—এই প্রবৃত্তিপন্থীরা ফলের আশায় পূর্ণ সময়ের অপেক্ষায় সক্ষম হয় না। সত্যই এই ভাবগুলি গর্ভস্রাবে মৃতের মত—বাস্তব রাজ্যে এই বৃত্তিগুলির কোনও সত্বাই নাই—সবগুলিই মিথ্যা মায়াময়-সত্বা—দেবভাবগুলির বিকার মাত্র। রাজা-ধৃতরাষ্ট্র ও রাণী-গান্ধারী যেমন, এই গর্ভস্রাব-পুত্রগুলিকে চোখে না দেখিয়াও, মাত্র লোকের মুখে জীবিত হইয়াছে শুনিয়াই, তাহাদের সেবা ও তৃপ্তির জন্য নির্ম্মমতা, কপটতা ইত্যাদি আশ্রয়ে কত অধর্ম্ম আচরণ দ্বারা অসুরত্বের ক্রিয়া করিয়াছিল। জীব সত্যই এই অবাস্তব অসুর প্রবৃত্তিগুলিকে না দেখিয়াও, এইরূপে তাহাদের তৃপ্তির জন্য মোহবদ্ধ অসুর হইয়া পড়ে। মাতৃগর্ভ বিনে অস্থানে জন্মটুকুও সুন্দর। অসুর প্রকৃতিগুলির জন্ম সর্ব্বদাই এইরূপ অপাত্র ও অস্থানে—তাই অপাত্রে ও অস্থানে সর্ব্বদা কামের ও লোভের উদয় হয়—বিধি ছাড়িয়া সর্ব্বদা তাহারা অবিধিতে ধাবিত হয়। ঘৃত-কুম্ভে জন্ম রহস্যটুকুও বেশ! অগ্নি প্রজ্বলনের প্রধান অবলম্বন যেমন ঘৃত, কর্ম্মের প্রধান অবলম্বনও তেমনি লালসা, এই অসুরত্বের বীজগুলিকে লালসার কুম্ভে স্থাপন করিলেই, ইহারা ভীষণ অসুর

হইয়া জীবন লাভ করিয়া বসে। একটী খণ্ড হইতে ঘৃতের ধারার শত-খণ্ডের বিকাশও, লালসার পোষণে একটী অসুরত্বই—রক্তবীজের বহুত্ব লাভের মত বহুরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয় বলা হইয়াছে। এই বৃথা কর্ম্ম শক্তিগুলিকে চিনিলে কি বাবা! ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের নামার্থ দ্বারাই ইহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সব প্রবৃত্তির প্রধান সত্ত্বই দুর্য্যোধনত্ব—বুঝিয়াও বুঝ নামানা—ভগবানের-সত্ত্বা বোধের সম্মুখে দেখিয়াও, ধর্ম্মের ফল দেখিয়াও তাহাকে অস্বীকার করা। এর পর দুঃশাসনত্ব—শত শাসনে, বার বার ঠেকিয়াও দৈববল ও ভগবানকে অস্বীকার করা প্রকৃতি। এক কথায় বিশ্বাসই দেব-প্রকৃতি আর অবিশ্বাস সন্দেহই অসুর-প্রকৃতি। অবিশ্বাসের নানারূপই দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা ও ভগ্নী। পরমাত্মা লুকাইত হইলেই তাহা কে না দেখিতে পাইয়া, অবিশ্বাস রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, সেই অবিশ্বাসকে ঠেলিয়া বিশ্বাস স্থাপনের জন্যই ধর্ম্মজ্ঞান ও ক্রিয়ার জন্ম হয়, তাহাই দৈবপ্রকৃতির জন্ম। বিশ্বাসই মুক্তি আর অবিশ্বাস জীবত্ব। আর বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ঠেলাঠেলিটুকুই জীবের স্থিতি। এই তত্ত্বই মহাভারত মধ্যে, পাণ্ডব ও কৌরবের লীলার মূলসূত্র; মহাভারত মধ্যে অষ্টাদশ পর্ব্ব ভরিয়া এই অবিশ্বাস নাশ করিয়া বিশ্বাস স্থাপন তত্ত্বই শ্রবণ করিবে। এখন পাণ্ডবদের জন্মমধ্যে দৈবপ্রকৃতির উদ্ভব রহস্য শ্রবণ কর।

শিষ্য—রাজা পাণ্ডু প্রথম কেন ধর্ম্মরাজ হইতে পুত্র লাভ করিলেন, পরে পবন দেবতা ও তারপরে দেবরাজ ইন্দ্র হইতে পুত্র লইলেন। সত্ত্বগুণের এই তিনের অধিক সন্তান হইল না কেন? এত দেবতা থাকিতে মাত্র এই তিন দেবতা হইতে পুত্র লওয়া হইল কেন? এই সকলের রহস্যও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন প্রভু!

গুরু—বাবা! পরমাত্মা স্বরূপ রক্ষা করিয়া জগতে ক্রিয়া করিতে

চাহিয়াছিলেন, তাই স্বরূপ রক্ষাকারী ধৃ+মন=ধর্ম্মকেই প্রথমে আরাধনা করিলেন; তাঁহার পুত্রই ধর্ম্মজ্ঞানরূপ জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মরাজ—যুধিষ্ঠির। এই জ্ঞান-যোগীই সংসার-যুদ্ধে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়; তাই বুঝি তাঁহার নাম যুধিষ্ঠির। এর পর জ্ঞানপথে জীব কর্ম্মশক্তির মূল সন্ধান করিয়া বায়ুতত্ত্বের সংবাদ লাভ করে। বায়ুযোগেই জীবের অভ্যন্তরস্থ ছন্দবৃক্ষ হইতে ভাব আসিয়া, সেইরূপ ভাবে কর্ম্ম সম্পাদন হয়। এই ছন্দ-বৃক্ষতত্ত্ব—গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, এই তত্ত্ব জানিয়া, জীবের বায়ুকে আয়ত্ত করিতে বাসনা হয়; এই বায়ুযোগ জ্ঞানই পবন দেবতার পুত্র মহাবল ভীমসেনকে পুত্র লাভ করা। * এই যোগ বল বিষয়রাজ্যে অতীব অদ্ভুত

* বায়ুযোগ জীবের কর্ম্ম-রাজ্যের অতি অদ্ভুত-রহস্যের আবিষ্কার! ঋষিগণ অতি গবেষণা ও সাধনা দ্বারা লাভকরিয়া এই তত্ত্ব-রত্ন মানব জাতির মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সৃষ্ট-পদার্থ মাত্রই সীমাবদ্ধ হয়! আর যাহা সীমাবদ্ধ সেইতত্ত্ব চেষ্টা করিলেই আয়ত্ত করা যায়, তবে জীবতত্ত্ব জানা যাইবেনা কেন? প্রতি সৃষ্ট যন্ত্রের মধ্যেই সেই যন্ত্রের ক্রিয়াকৌশল প্রকাশ-জন্য কৌশল করিয়া রাখিতে হয়, তবে মানবের দেহ যন্ত্রের মধ্যেও নিশ্চয় ক্রিয়া-প্রকাশক কৌশল আছে? এই কৌশল-সংবাদই বায়ুযোগরহস্য। প্রতি জীবেরই হৃদপিণ্ড প্রথমে জন্মে, পরে তাহা হইতে অতীসূক্ষ্ম কেশেরমত একটা স্নায়ু ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া মস্তিষ্ক-মণ্ডল জন্মে। এরপরে তাহা হইতে সেইরূপ সূক্ষ্ম একটী স্নায়ু বাহির হইয়া, মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া তাহার নিম্ন-মূল পর্য্যন্ত গমন করে, এই স্নায়ু দুইটীই জীবের জীবত্ব-রাজ্য। এই স্নায়ুর উপরের বেষ্টনের তারতম্যে পৃথক পৃথক জীব হয় বটে, কিন্তু এই স্নায়ুই প্রতি জীবের জীবত্ব প্রকাশক যন্ত্র। হৃদয়ে জীবের ভাবশক্তি, মস্তিষ্কে জ্ঞানশক্তি আর মেরুদণ্ডমধ্যে জীবের কর্ম্মশক্তির কৌশলযন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধ ও তারপরে ক্রমে ভ্রূমূল-সূত্রে, কণ্ঠমূল-সূত্রে, হৃদয়সূত্রে, নাভীসূত্রেও লিঙ্গসূত্রে এই ছয়টী গ্রন্থিতে,ছয় প্রকার কর্ম্মশক্তির কৌশলযন্ত্র আছে। মেরুর ঊর্দ্ধগ্রন্থিকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে, তথা হইতে ব্রহ্মশক্তির কর্ম্মের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়ে গুণাতীত কর্ম্মশক্তি—শুক, সনন্দাদির অহেতুকি ভক্তিক্রিয়া, তৃতীয়ে গুণসাম্য প্রজাপতীগণের কর্ম্ম, জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তির ক্রিয়া; চতুর্থে সত্বগুণিয় ঋষিগণের-ব্রাহ্মণ ভাবের

ও অসাধারণ শক্তি, তাই বিষয়ীরা তাহাকে ভয়ানক মনে করে, এই জন্যই বুঝি ইহার নাম ভীমসেন। জ্ঞান ও যোগ আচরণ-দ্বারা জীবের ভগবানে আত্মসমর্পণ-করা ভক্তির উদ্ভব হয়। এই ভক্ত-প্রকৃতিই সৃষ্টি-রাজ্যের দীপ্তিশীল কর্ম্মকর-সত্তাবর্গের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান-সত্তা। তাই এই তত্ত্বের আরাধনাই দেবরাজের আরাধনা, তাঁর পুত্রই ভক্তিরূপ অর্জ্জুন। পূর্ণভক্ত জীব হইয়া ও ব্রহ্ম-সদৃশ্য তাই বুঝি অর্জ্জুনকে নরনারায়ণ বলা হইত। সাত্বিকপ্রকৃতি এই জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত বই আর কোন প্রকারের হইতেই পারে না, তাই কুন্তীমায়ের আর সন্তান নাই। মাদ্রীদেবীর একগর্ভে দুই-পুত্র লাভ রহস্য শ্রবণ কর! নিবৃত্তির অধীন হইয়া প্রবৃত্তি-রাজ্যে বিচরণ করিতে হইলেই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধিধর্ম্ম, কর্ম্মযোগের প্রয়োজন হয়। এই কর্ম্মযোগ দুই প্রকার, একটী এইজগতে স্বাস্থ্য-সুখ ও প্রীতি-সুখ, সম্মানাদি লাভের জন্য চেষ্টা, অন্যটী পরকালে, স্বর্গাদিলোক, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব লাভের চেষ্টা। এই সকাম ভোগ সুখ প্রার্থনায় নীতিধর্ম্ম ও বিধিধর্ম্মের জ্ঞানতত্ত্ব দ্বয়ই মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব। নকুলের নীতিকুশলতা ও বিশ্ব-দর্শিতাগুণই ইহকালের সুখতত্ত্ব, আর সহদেবের ভবিষ্যৎ-দর্শিতাই পরকালের

কর্ম্ম; পঞ্চমে রজগুণিয় ক্ষত্রিয়-কর্ম্মও ষষ্ঠে তমগুণিয় অসুরকর্ম্ম, শূদ্রক্রিয়া। এই ছয়প্রকার ভাব মেরু-মূলের গুহ্য-সমষ্টের গ্রন্থিতে, প্রাণ বায়ুয়োগে সংক্রামিত হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। মেরুমূলে মন বেষ্টিত জীবাত্মা-শক্তি অবস্থান করে। মন প্রাণবায়ুসহ যেই গ্রন্থিতে আবিষ্ট হইবে, উপস্থিত কর্ম্মকে জীব সেইভাবেই দেহন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লীলা করে। যেই গ্রন্থির যেইরূপ সত্তা, গুণ ও ক্রিয়াশক্তি আছে, মন সেইচক্রে যুক্ত-হইয়া সেইরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করে। এইজন্যই আলোচনা, ও সঙ্গগুণে ঐভাবের চক্রের উদ্দীপনায়, জীব সৎ ও অসৎ কর্ম্মা হইয়া যায়। এই যোগ সাধনায় জীব প্রাণ-বায়ুকে আয়ত্ত করিয়া, বলপূর্ব্বক ও হীনত্ব নাশে সক্ষম হয়। প্রতি চক্রের-সিদ্ধতা দ্বারা জীব অমানুষ বীর্য্য ও শক্তির অধিকারী হয়—জীব দেবত্ব, ঋষিত্ব, ব্রহ্মত্ব-পর্য্যন্ত লাভকরিয়া বসে, এর নামই বায়ুযোগ সিদ্ধি।

সৌভাগ্য লাভ তত্ত্ব। নিবৃত্তির অধীনা-প্রবৃত্তিরও এই দুইয়ের অধিক আর কোনও কর্ম্মসত্তা হইতে পারেনা, তাই-ই মাদ্রীদেবীর মাত্র দুই পুত্র। ভগবানের নিজের দিকে আকর্ষণকারী ও নিজ হইতে বিকর্ষণকারী দুই ইচ্ছা হইতে, তাঁহার অভিমুখী ও তাঁহার বিমুখী দুই প্রকার কর্ম্মসত্তা দৈব ও আসুর নামে উদ্ভব হইল। মহাভারতে অভিমুখী দৈব-প্রকৃতি-বর্গের স্বরূপ পাণ্ডবগণ দ্বারা ও বিমুখী আসুর-প্রকৃতিবর্গের স্বভাব ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণ দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ভগবানের আকর্ষণকারী সত্তাকেই শুধু মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ বলেন ও তাঁহার বিকর্ষনকারী সত্তাই জগতস্রষ্টা ঐশ্বর্য্যময় বিষ্ণু। বিষ্ণুকেই তাঁহারা সঙ্কর্ষণ বা বলদেবও বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যসত্তায় ভগবান্ হইতে আব্রহ্ম-স্তম্ভ-পর্য্যন্ত সৃষ্টি বিকর্ষিত হইয়া বাহির হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সত্তায় ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব সৃষ্টি তাঁহার মধ্যে লয় হইয়া যায়। এইজন্যই মহাভারতে দেখিতে পাইবে দুর্য্যোধনাদি বহু অত্যাচার অবিচার করিয়া, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মের কণ্টক স্বরূপ হইলেও, বলরাম ক্ষমা করিয়া সর্ব্বদা তাহাদের মঙ্গল ও উন্নতিই কামনা করিয়াছেন ;— কেননা মুক্তিধর্ম্মের বিরুদ্ধাচার না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হয় কৈ? আর শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল তার নিবৃত্তিধর্ম্মা পাণ্ডবগণের সহায়তাই করিয়াছেন, পরে নিজেই যেন ক্রোধ করিয়া ধর্ম্ম নির্য্যাতক অসুর প্রকৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন ও পাণ্ডবদিগকে লইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

শিষ্য—প্রভো! পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান জন্মিল, বিদুরের সন্তান না হওয়ার মধ্যেও কি কোন প্রকার রহস্য আছে? আবার রাজা-পাণ্ডু সন্তান-গণকে কেন শিশু রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন, বিদুর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলেন! তাহারও কি কোন রহস্য আছে?

গুরু—কারণ-দেহ-বিহারী পরমাত্মা জীবের দেহেন্দ্রিয়ের ও মনের অতীত সুষুপ্ত অবস্থার কর্ত্তা, তাঁহার সন্তানরূপ কোন প্রকার ক্রিয়া-শক্তিই

নাই; সেই অবস্থা ব্রহ্মযুক্ত সমাধি-রাজ্য। পরমাত্মা কর্ম্মেচ্ছায় নিজের কর্ম্মশক্তির বিকাশ করিলেই, তিনি সূক্ষ্ম-দেহ-বিহারী হইয়া উঠেন। ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সম্বলিত দেহ না হইলেত কর্ম্মসম্পাদন শক্তি হয়না, তাই অব্যক্ত কারণ-দেহ এবার ব্রহ্মসত্তাযুক্ত চিন্ময় সূক্ষ্ম দেহ হইয়া উঠে, তখন সূক্ষ্ম দেহ-বিহারী-অহঙ্কার মধ্যমপুরুষ সেই ব্রহ্মশক্তি-গুলিকে চালনা করিতে থাকেন। এই শক্তিগুলি ব্রহ্ম হইতে জাত হইয়াও দ্বিতীয়-পুরুষের ক্রিয়া-সম্পাদন-শক্তি পুত্র স্থানীয় হয়। এই তত্ত্বই বাবা, পাণ্ডুপুত্রগণ বিদুরের আশ্রয় লাভ করিয়া পুত্রসম পালিত হওয়া। এই দ্বিতীয়পুরুষ মনোময় দেহধারী ক্রিয়া-রহিত শুধু জ্ঞানময় নির্লিপ্তসত্তা, জীবের স্বপ্নাবস্থার বা জল্পনারত অবস্থার কর্ত্তা বলিয়াই বিদুরকে নিঃসন্তান সন্ন্যাসী বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই বিদুর-সত্তাই জীবের মধ্যে অন্তর্য্যামী গুরুশক্তি, প্রত্যেক জীবকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেন, ইহাকে বিবেকও বলা হয়। এইসত্তা প্রতি জীবের মধ্যেই, ঠিক এই বিদুরের মত নির্লিপ্ত থাকিয়া, জীবকে সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে মতি জন্য অন্তঃকরণ হইতে পরামর্শ দান করিয়া থাকেন। দেব-প্রকৃতিবানগণ পাণ্ডবদের মত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া থাকেন, আর অসুর প্রকৃতিগণ এই ধার্ত্তরাষ্ট্রদের মত তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করেন না। এর পর পরমাত্মা সূক্ষ্মদেহ হইতে স্থূলদেহগত হইলে ব্রহ্মযুক্ততা হীন হইয়া জড়ভূতময় সীমাবদ্ধ-দেহের অধীন হইয়া, নিজের সঙ্কীর্ণজ্ঞানের প্রভাবে দেব-প্রকৃতি-বর্গকে বিকৃতি করিয়া, নূতন আসুর বা জীবপ্রকৃতির সৃজন করিয়া লয়। সেই প্রকৃতি রূপ সন্তানগুলি জীবত্বেরই ঈর্ষ্যাপ্রসূত, গর্ভস্রাবিত বা অকাল-প্রসূত কতকগুলি মিথ্যা সন্তান মাত্র; ইহারা পরমাত্মা ভগবৎ-সত্তার কোন প্রকৃতিই নয়। ইহারাই ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ।

শিষ্য—প্রভো! জীবের যে তিনটী দেহের কথা বলিয়াছেন, সেই

কারণদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের বিষয় আরও একটু সরল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শুরুদেব—বাবা! আমরা কর্ম্মচেষ্টান্বিত হইলেই প্রথমে একটি কর্ম্ম করিব নির্ণয় করি, দ্বিতীয়ে সেই কর্ম্মের দ্রব্যটীর আকার প্রকারাদি কেমন হইবে সর্ব্ব বিষয় নির্ণয় করিয়া মানসে একটী প্রতিরূপ বা নক্সা কল্পনা করি, তৃতীয়ে জড় উপাদান দ্বারা সেই প্রতিরূপের মত করিয়া তাহাকে গঠন করি। সৃষ্টিকর্ম্ম জন্য ব্রহ্মও এই তিন প্রকারেই সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। পর-ব্রহ্মের চিন্তা, কল্পনা ও কর্ম্ম সবই যে নিত্য, তাই সৃষ্টি রাজের প্রত্যেকেই এই তিন তত্ত্বে তিনটী দেহ-আবরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমের মানব সৃষ্টি করিব মাত্র এই অব্যক্ত ইচ্ছা হইতে, অব্যক্ত পরমাত্মার বিহার-স্থান কারণ-দেহের জন্ম। তারপরে দ্বিতীয়ে, মানবের আকার ও কর্ম্মশক্তি আদি কিরূপ হইবে চিন্তা করিয়া জ্ঞানের দ্বারা প্রতিরূপ কল্পনা হইতে জ্ঞানময় সূক্ষ্ম দেহের জন্ম। এরপরে তৃতীয়ে, ভুতাদি দ্বারা সেই কল্পিত মানবকে মানবাকারে গঠন করাই ভূতময় স্থূলদেহের জন্ম। এই কর্ম্মের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল তত্ত্বকেই, গীতায় অধিদৈব, আধ্যাত্ম্য ও অধিভূততত্ত্ব বলিয়া ব্যখ্যা করিয়াছেন। জীবদেহের অধিদৈব-পুরুষ, পরামাত্মা,—রাজা-পাণ্ডু, আধ্যাত্ম্য-পুরুষ আত্মা—বিদুর ও অধিভূত-পুরুষ জীবাত্মা—ধৃতরাষ্ট্র। জীবের অধিদৈবপুরুষ পরমাত্মা যোগনিদ্রা গত হইয়া, জীবাত্মাকে প্রতিনিধি ও আত্মাকে গুরু বা মন্ত্রী নিয়োগ করেন, ইহাই জগতে জীবত্বের প্রকাশ। জীব গুরু ও আত্মাকে মানিয়া চলিলে জ্ঞানময় বিদ্যারাজ্যে ক্রিয়া করেন, আর তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে অজ্ঞান অবিদ্যারাজ্যে ডুবিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। এইস্থানে আদিপর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করা যাউক। এর পর তৃতায় অধ্যায়ে জীবাত্মার স্বাভাবিক গতি, কোন প্রকৃতি তাহাকে কোন দিকে কেমনে টানিয়া নেয় তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

আদি পর্ব্ব।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিচয়।

কর্ম্ম মায়া সংবাদ।

এই অধ্যায় দৈব ও অসুর উভয় পক্ষের কর্ম্ম-আকর্ষক-সত্তাগুলিকে পৃথক পৃথক মূর্ত্তিমান করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীব—ধৃতরাষ্ট্র

বিদ্যামায়া।

দেবত্বপথ—আর্য্যত্ব।

(সত্ত্বগুণ)

১। **রক্ষক**—ব্রহ্মের সঙ্কল্প-তৃপ্তি। (পাণ্ডব যুক্ত ভীষ্ম)

২। **কর্ত্তা**—ব্রহ্মযুক্ত-পুরুষ আত্মজ্ঞান। (বিদুর)

অবিদ্যা মায়া।

অ + সুরত্ব বা জীবত্বপথ—অনার্য্যত্ব।

(তমঃগুণ)

১। **অবিদ্যার রক্ষক**—ব্রহ্মের বিকল্পতৃপ্তি। (পাণ্ডবহীন শুধু ধার্ত্তরাষ্ট্রযুক্ত ভীষ্ম।)

২। **অবিদ্যার কর্ত্তা**—ব্রহ্ম-যুক্ততাহীন পুরুষ, জীবত্ব-জ্ঞান। (দুর্য্যোধন)

৩। **আশ্রয়**—নিবৃত্তিপরা-প্রবৃত্তি, সত্বগুণ। (মাতা কুন্তীদেবী)

৪। **কর্ম্ম প্রেরণার গুরু**—নিষ্কাম দয়াবৃত্তি। (শুধু কৃপাচার্য্য ও দ্রোণকে লইয়া কৃপাচার্য্য)

দ্রোণহীন কৃপ হইতে—ত্রিতাপনাশ মুক্তি-চেষ্টায় ঋষিত্বের জন্ম।

দ্রোণযুক্ত কৃপহইতে—দেশ, জাতি, জীবের দুঃখনাশ-চেষ্টা ও অধর্ম্মনাশ, ধর্ম্মস্থাপন চেষ্টায় ক্ষত্রিয়ত্বের জন্ম।

৫। **অধিকার**—আধ্যাত্ম-রাজ্য। (দ্রুপদ রাজার অধিকার।)

৬। **অবলম্বন**—গীতায়-উক্ত দৈবসম্পদ—বৈরাগ্য, বিনয়, ধৈর্য্য, ভোগ-ত্যাগ, গুরু ও ভগবানে বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সদাচারে শ্রদ্ধা গ্রহণ।

৩। **অবিদ্যার আশ্রয়**—নিবৃত্তি-হীনা শুধু-প্রবৃত্তি, তমঃগুণ। (চোখবান্ধা মাতা গান্ধারী)

৪। **অবিদ্যার প্রেরণা**—সকাম-দয়া-বৃত্তি বা লোভ। (শুধু দ্রোণ ও দ্রোণ অধীন কৃপাচার্য্য।) এবার দয়া কাম-আবরিত হইয়া, স্বদেহ, স্বইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি ও আত্মীয়ে অধিক কৃপাযোগে মমত্বযুক্ত হইল। ইহাই আপন ও পর জ্ঞান লইয় সঙ্কীর্ণতা জীবত্বের উদ্ভব।

শুধু দ্রোণ হইতে—নিজ-তৃপ্তি।

দ্রোণ অধীন কৃপ হইতে—পরিবারের তৃপ্তি।

৫। **অবিদ্যার অধিকার**—অধিভূত বিষয় রাজ্য। (দ্রোণাচার্য্যের অধিকার।)

৬। **অবিদ্যার অবলম্বন**—গীতায়-উক্ত অসুর-সম্পদ-বিষয়-বাসনা, অনমনিয়তা, অধৈর্য্য, ভোগ-বিলাস, গুরু ও ভগবানে অবিশ্বাস, শাস্ত্র ও সদাচারে সন্দেহ গ্রহণ।

৭। **উদ্দীপনা**—সৎ সঙ্গ, নিজের অজ্ঞাতা-বোধ, অনলস-শাস্ত্রালোচনা (পাণ্ডবের, জ্ঞানবৃদ্ধদের সঙ্গ গ্রহণ ইত্যাদি।)

৭। **অবিদ্যার উদ্দীপনা**—অসৎসঙ্গ, নিজকে জ্ঞানী-বোধ, আলস্য, আলোচনা বিমুখতা। (ধার্ত্তরাষ্ট্রদের, শকুনী, কর্ণ আদির সহিত মিশিয়া আলস্য ও খেলায় দিন কাটান)।

৮। **লাভ বা পুরস্কার**—আত্মজ্ঞান, ভগবৎভক্তি, নির্ভর ও চির সন্তোষ। (কেবল আনন্দময় ব্রহ্মত্ব লইয়া ঘুড়ে, ব্রহ্মই আত্মা এই বোধ জন্মে।)

৮। **অবিদ্যার লাভ**—বিষয়জ্ঞান, ভগবানে সন্দেহ, আত্ম-চেষ্টা, চির অসন্তোষ। (ত্রিতাপে জ্বলিয়া, দুঃখময় জীবত্ব লইয়া সুখের সন্ধানে ঘুড়ে। দেহই আত্মা এই বুদ্ধি জন্মে।)

৯। **আশা**—স্ব স্বরূপ রক্ষা করিয়া বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিয়া অন্তে মুক্তি লাভ হউক। (পাণ্ডবের আশা।)

৯। **অবিদ্যার আশা**—জীবত্বের পোষণে দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি লইয়া বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিবার শক্তি হউক। (**দুর্য্যোধনের আশা**।)

১০। **শক্তি**—ধৈর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্মরক্ষণে দৃঢ়তা প্রকাশ করা।

১০। **অবিদ্যার শক্তি**—অধৈর্য্য, অক্ষমা, আত্মতৃপ্তি জন্য দৃঢ়তা গ্রহণে আত্মচেষ্টা।

১১। **বীর্য্য**—অসম্ভব প্রলোভন, বিপদ নির্য্যাতন, ভয়, কিছুতেই শাস্ত্র সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্ম, শীলতা, লজ্জা ও দয়াকে অতিক্রম করিবেনা।

১১। **অবিদ্যার বীর্য্য**—সামান্য ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তির তৃপ্তি জন্য ধর্ম্ম-বিধি, সদাচার, শীলতা, লজ্জা, গুরু-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ও নিষ্ঠুরত

(পাণ্ডবের জীবন ব্যাপী কর্ম্ম-বীর্য্য)

১২। কর্ম্ম—জ্ঞান-যোগ, রাজ-যোগ ও ভক্তি-যোগ গ্রহণে শাস্ত্র-সম্মত তাপস হওয়া বা কর্ম্ম যোগ গ্রহণে, দেশ ও জাতীর সেবা গ্রহণ বা স্বর্গাদি কামনায় শাস্ত্রমতে যজ্ঞাদি আচরণ।

অবলম্বন করা। (দুর্য্যোধনের জীবন ব্যাপী কর্ম্মবীর্য্য)

১২। অবিদ্যার কর্ম্ম—ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, কুটীলতা, আশ্রয় করিয়া লোভের-রাজ্যে কর্ম্মাভিমান ও অবাধ্যতা লইয়া, ভগবানে ধর্ম্মে অবিশ্বাস আনয়ন ও শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার গ্রহণ।

এই তৃতীয় অধ্যায়ে বীর্য্য পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষার পরীক্ষা দানে, উভয় পক্ষের কর্ম্ম শক্তি প্রদর্শন করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জীব-প্রকৃতির জ্ঞান ও শক্তির সংবাদ।

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে যৎপদাশ্রয় বীর্যতঃ।
সংগৃহ্নাত্যাকর ব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত সন্মণীম॥

গুরু—বৎস! এই অধ্যায়ে লীলার মধ্যে অন্ধ-জীবাত্মা ও মলিনা-প্রবৃত্তির হস্তে পড়িয়া, দৈব ও আসুর প্রকৃতিগুলি কেমন আশ্রয়, শিক্ষা ও

উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয় তাহাই বর্ণিত হইবে। প্রকৃতি-দেবীর বিদ্যা-মায়ার উদ্দীপনার আশ্রয় ও শিক্ষাদি কিরূপ, এবং অবিদ্যা-মায়ার উদ্দীপনার আশ্রয় ও শিক্ষাদিই বা কিরূপ তাহাও প্রদর্শিত হইবে। জীব অন্ধত্ব-প্রযুক্ত কি প্রকারে বিদ্যার দিক হইতে সরিয়া অবিদ্যার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে, তাহাও প্রদর্শিত হইবে; এবং দৈব ও আসুর-প্রকৃতি-বর্গের পূর্ণ-স্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের শক্তি, আশা, জ্ঞান ও কৌশল আদি কিরূপে সংগৃহিত হয় ও জীব কোন প্রকৃতির আশ্রয়ে প্রকৃত-জ্ঞান বীর্য্য লাভ করিয়া জগতের ও নিজের মঙ্গল করিতে সক্ষম হয়, তাহা পরিদর্শন করিয়া এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইবে।

লীলা—মহাভারতে বর্ণিত আছে পিতৃহীন পাণ্ডবগণ পিতৃসখা কৃপাচার্য্য ও পিতৃব্য বিদুরের পিতার মত স্নেহ পাইয়া পিতার অভাব ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র স্বপুত্রস্নেহে অন্ধঃ হইয়া অনেক সময় নিজ পুত্রগণের যত্ন পরিচর্য্যায়ই তৎপর থাকিতেন, পাণ্ডবদিগকে যত্নাদি করিতে যেন অবসরই পাইতেন না। কখনও মনে হইলে বা অপর কেহ স্মরণ করাইয়া দিলেই তাহাদের প্রতি যত্ন নিতেন ও নিজের ত্রুটী স্বীকার করিতেন। এইরূপে ক্রমে কৌরব অন্তঃপুরে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষে দুইটী দল গঠিত হইয়াছিল। এক পক্ষে পাণ্ডবদের আশ্রয় ও অবলম্বন মাতা-কুন্তীদেবী, বিদুর ও কৃপাচার্য্য, অন্য পক্ষে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের আশ্রয় ও অবলম্বন মাতা-গান্ধারী-দেবী, মাতুল-শকুনী ও পিতা ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের অমনোযোগিতার জন্য যদু রাজ্য হইতে উদ্ধব আসিয়া সতর্ক করিয়া যান, তখন ধৃতরাষ্ট্র অকপটে দোষ স্বীকার করিয়া সাবধান হন। আর কৃপাচার্য্যের পিতৃবৎ বাৎসল্যের কথা, জয়দ্রথ বধের পর কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের শরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, অর্জ্জুন অতি দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তত্ত্ব—এই দুই দল দ্বারা বিষয়-রাজ্যের দেবত্ব ও জীবত্ব দুই অংশ

পৃথক করিয়া দেখান হইতেছে। সৃষ্টিরাজ্যে কৃপাচার্য্যরূপ দয়া-বৃত্তিই দৈব ভাবের রক্ষক সদৃশ। তাই বুঝি তুলসীদাস বলিয়াছেন "দয়া ধরম কি মূল হায়, নরক মূল অভিমান।" পালক মুক্তি-আকাঙ্ক্ষী সত্বগুণ-কুন্তীদেবী, আর বুদ্ধিদাতা আশ্রয় বিদুররূপী বিবেক। সেই দয়া মমত্ব-যুক্ত হইয়া সীমাবদ্ধ হইলেই, অর্থাৎ আত্ম ও পর এই জ্ঞানের জন্ম হইলেই জীব দেবত্ব ভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করিবে। তখন অন্ধ-জীব তমঃগুণ-গান্ধারী-প্রকৃতির প্রতিপাল্য হইয়া,গান্ধারী-ভ্রাতা শকুনিত্ব কুটজ্ঞানের আশ্রয় লইবে ও অসুরত্ব, দেহেন্দ্রিয়-তৃপ্তি ইচ্ছারূপ সন্তানবর্গ পালনে ধাবিত হইবে। তাই পাণ্ডবগণ, কুন্তী, কৃপ ও বিদুরকে লইয়া একদল ও গান্ধারী শকুনী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে লইয়া আর একদল করিয়া দেখান হইয়াছে।

লীলা—বালকগণ শৈশব ছাড়াইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলেই কৃপাচার্য্য সকলের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধাদি শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। একদিন বালকদের একটী খেলিবার কুন্দুক অর্থাৎ বল, কূপে পতিত হওয়ায়, বালকগণ কূপ নিকটে গোল করিতেছিল। সেই সময়ে একজন ধনুকধারী, তেজস্বী তাপস-ব্রাহ্মণ আসিয়া হাসিতে হাসিতে কৌশলে, কুশ-মাত্রের সহায়তায় বল তুলিয়া দিলেন; কেবল বল নয়, হস্ত হইতে ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়ক কূপে ফেলিয়া তাহাও তুলিয়া আনিলেন। পরে বালকগনকে বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! কৃপাচার্য্য তোমাদিগকে এই কৌশলটুকুও শিক্ষাদান করেন নাই? বালকগণ, ব্রাহ্মণের অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং দৌড়িয়া যাইয়া ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যের নিকট ব্রাহ্মণের বিষয় জ্ঞাপন করিল। ব্রাহ্মণের আকারের বিষয় ও তাঁহার ক্রিয়ার কথা শুনিয়াই, তাঁহারা তাঁহাকে দ্রোণাচার্য্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন ও নিজেরা যাইয়া আদর ও সম্মান করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্যের ভগ্নীপতি হইতেন, ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যের অনুরোধে

তিনি কৌরব বালকগণের শিক্ষা ভার গ্রহণ করিলেন। কৃপাচার্য্য তাঁহার শিক্ষাগারের ভার দ্রোণাচার্য্যকে দান করিয়া, নিজেও তাঁহার সাহায্যে ব্রতী হইলেন। এই গুরু পরিবর্ত্তন লীলা ও বল আদি উত্তোলন মধ্যে ও রহস্য আছে বৎস!

তত্ত্ব—এই লীলাটী প্রকৃতি-দেবীর বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামার পরিচয় তত্ত্ব। বিষয় আসক্তি-শূন্য নিষ্কাম দয়াবৃত্তির অধিকারই বিদ্যামায়ার রাজ্য, আর বিষয়-আসক্ত ও বিষয়জন্য চেষ্টা কৌশল অবলম্বি সকাম-দয়া-বৃত্তিই অবিদ্যামায়া। পাণ্ডুসাম্রাজ্যের দ্রোণাচার্য্যের যোগহীন কৃপাচার্য্যই বিদ্যা-রাজ্যের দয়া, আর ধৃতরাষ্ট্র-রাজ্যের দ্রোণযুক্ত কৃপাচার্য্যই অবিদ্যা-রাজ্যের সকামদয়া। নিষ্কামদয়া সামান্য একটী খেলিবার বল বা অঙ্গুরীয় লাভ জন্য আসক্ত হইয়া, প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা কৌশল শিক্ষাদান করেনা। এইরূপ বৃথা জিনিষে আসক্তি ও লাভজন্য দৃঢ়তা ও চেষ্টা-কৌশল শিক্ষাদান, কামযুক্ত দয়ার কার্য্য। এই সকামদয়া হইতেই সৃষ্ট-রাজ্যের খেলবার বল ও দেহ শোভার অঙ্গুরীয়ের মত বিষয়-লোভ ও বিষয়-প্রাপ্তি চেষ্টার জন্ম হয়, ইহাই বাবা, অবিদ্যা-মায়া। দেবপ্রকৃতি মুক্ত-রাজ্যের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য-যুক্ততা-হীন কৃপাচার্য্য, আর আসুর অবিদ্যারাজ্যের শিক্ষাগুরু দ্রোণযুক্ত কৃপাচার্য্য। পূর্ব্বে পাণ্ডব-পক্ষ ও ধার্ত্তরাষ্ট্র-পক্ষ যে দুইটী পক্ষ দেখিয়াছ, সেই দলকে কর্ম্ম চেষ্টা সম্পন্ন করিবার জন্য উদ্দীপনা দিতে কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যকে গুরু পদে নিয়োগ করা। ব্রহ্মের মনরূপ ভীষ্মদেবের সঙ্কল্প-রাজ্যের উদ্দীপক প্রেরণা দাতা গুরু কৃপাচার্য্য-কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম—পরের মঙ্গল জন্য দয়া-যুক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রবৃত্তি দেয়। আর তাঁহার বিকল্প রাজ্যের কর্ম্ম উদ্দীপক গুরু দ্রোণাচার্য্য—সকামভাব—কেবল নিজের তৃপ্তি-সুখ জন্য কর্ম্মেব্রতী হওয়া। এই দুইটী দলকে খুব ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে হইবে! দৈব প্রকৃতি-বর্গের অধিপতি-পুরুষ বিদুর বিষয় অলিপ্ত বিবেক-সত্ত্বা;

আশ্রয় কুন্তীদেবী—নিবৃত্তির অভিমুখী সত্বগুণ; কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা স্বভাব, পঞ্চ-পাণ্ডব—জ্ঞানযোগী, রাজযোগী ভক্তিযোগী ও কর্ম্মযোগিগণ, উদ্দীপনা বা কর্ম্মাশক্ত করিবার গুরু কৃপাচার্য্য—নিষ্কাম দয়া। আর অসুর প্রকৃতির বর্গের অধিপতি-পুরুষ বিদুর-যুক্ততাহীন ধৃতরাষ্ট্র—আধ্যাত্মজ্ঞানহীন জীবাত্মা, আশ্রয় গন্ধারীদেবী—নিবৃত্তি-বিমুখী তমঃগুণ; কর্ম্মের উদ্দীপনার গুরু দ্রোণাচার্য্য—মূর্ত্তীমান বিষয়-কামনা। জীব এই দুই দলের কাহার আশ্রয়ে কিরূপ স্বভার গুণ ও ক্রিয়া শক্তি লাভ করে, সেই তত্বই পাণ্ডব ও ধূর্ত্তরাষ্ট্র-গণের জীবনে জীবন্তরূপে দর্শন করিবে। দেখিবে চীর-জীবন ভরিয়া পাণ্ডব বিষয় নির্লিপ্ত অহঙ্কার যুক্ত হইয়া কেবল দেশ, জাতি, ও আত্মার মঙ্গল জন্য—কি করিয়া দেশ ধনে ধান্যে পূর্ণ হয়, রোগতাপ শূন্য হয়, মানবগণ পাপ অসুর-মোহ ত্যাগ করিয়া ভগবানের ভক্ত হয়, শাস্ত্রে ও সদাচার ধরিয়া জগতে দেবসুখের অধিকারী হইতে পারে, সেই জন্যই কর্ম্ম ও যুদ্ধাদি করিয়াছে। আর ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষ, দেশ জাতি বিস্মৃত হইয়া, কেবল নিজেদের দেহেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, দর্প, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যাদির তৃপ্তি-জন্য—দেশধ্বংস, মানবের উপর অত্যাচার, শাস্ত্র-সদাচার লঙ্ঘন করিয়া, যত অধর্ম্ম অবিচার ক্রিয়াই প্রদর্শন করিয়াছে। এখন গুরু-দ্রোণাচার্য্যের জীবন মধ্যে আবত্থামায়ার-আচার্য্য গুরু-শক্তির স্বরূপ শ্রবণ কর।

লীলা—ভরদ্বাজ-মুনীর অযূনীসম্ভব-পুত্র দ্রোণাচার্য্য, তিনি কৃপাচার্য্যের ভগ্নী বিবাহ করিয়া, তপোবনে তাপস জীবন গ্রহণ করিয়াই প্রথম জীবন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু তাহার পুত্র অশ্বথামার জন্ম হইলে, পুত্র বাৎসল্যে-পুত্রের সুখ ও সেবার জন্য বাসনাও যুক্ত হইয়া উঠিলেন। তাই পুত্রের সুখ জন্য ধন ও গাভী প্রার্থণার জন্য পাঠ্যাবস্থার বন্ধু, বর্ত্তমানে পাঞ্চাল-দেশের রাজা মহারাজ দ্রুপদের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রুপদ যখন রাজ সভায় সিংহাসনে বসিয়া রাজ-কার্য্য

করিতেছেন, এমন সময় ঋষিকুমার যাইয়া তাহাকে সখা বলিয়া আহ্বান করিলে, দ্রুপদ-রাজা অহঙ্কার প্রযুক্ত, ভিখারী ব্রাহ্মণকে বন্ধু পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিলেন, ও দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—"কাহাকে কি বলিতেছ ব্রাহ্মণ! যাচনা থাকে কিছু প্রার্থনা কর, এই সম্বোধন কেন? রাজার বন্ধু কি কখনো ভিখারী হয়! ভিক্ষা আর রাজলক্ষ্মী কখনও একস্থানে থাকে না।" রাজার এই গর্ব্বিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের আত্ম-সম্মানে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি ক্রোধ-যুক্ত হইয়া তখনই রাজ সভা ত্যাগ করিলেন ও ঋষি-শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রগুরু জমদগ্নির নিকট যাইয়া কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ়তাসহ চতুর্ব্বেদ সহিত ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিলেন এবং সেই দ্রুপদকে পরাজয় ও রাজ্যধন লাভ কামনায়ই, কৌরব বালকগণের শিক্ষাভার লইতে কুরু-রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্য তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ করেন। তিনি কুরুবংশের পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র সকলকে অস্ত্র-শিক্ষায় পূর্ণ করিয়া, গুরু দক্ষিণা প্রার্থনা কালে, রাজা দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া আনিয়া দিতে বলেন। রাজা দ্রুপদ কৌরবগণ সহ যুদ্ধে পরাস্থ হইয়া, বন্দী হন, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য বন্ধুর প্রতি ক্রোধ যুক্ত হইলেও—তাঁহার দর্প ভঙ্গ করিয়া, বন্ধুর প্রতি যথা কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য, রাজ্য দুই অর্দ্ধ করিয়া, দ্রুপদকে অর্দ্ধরাজ্য দিলেন ও নিজে অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিলেন।

তত্ত্ব—এই ইতিহাস লীলার মধ্যে কাম বা লোভের মুর্ত্তিমান স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। কামের জন্ম, পরিণতি, স্বভাব ও ক্রিয়া এই লীলার দ্বারা জীবন্ত দেখান হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্য অযুনী-জাত কৃপাচার্য্যও তাহাই! কাম ও দয়াবৃত্তি জীবকে কর্ম্মরত করিবার জন্য ব্রহ্ম হইতে জাত-শক্তি, তাই ইহাদের মানবের মত জন্ম হয় নাই। কাম ও দয়া উভয়ই অপাত্রে জন্মে, আর জন্মের সময়েরও ঠিক নাই, তাই বুঝি

উভয়েরই তপস্যা-কালে হঠাৎ অস্থানে বীর্য্যপাত হইয়া জন্ম দেখান হইয়াছে। তাই কাম বা লোভের কাল পাত্র বিচার থাকেনা, দয়ারও সেই-রূপ কাল পাত্র বিচার নাই। লোভের তিনটী অবস্থা, প্রথমে পিতামাতার আদর ও দয়ার-দান পাইতে পাইতে জীবের লোভ বা বিষয়-বাসনার জন্ম হয়—শিশু পিতা মাতার দয়া দত্ত ভোগ-বিলাস ক্রিয়া-দ্রব্য লাভ করিয়াই, নিষ্কাম নিস্পৃহ-রাজ্য হইতে সকাম স্পৃহাশীল লোভপর হইয়া উঠে। এই দয়ার দানই কৃপাচার্য্যের-ভগ্নী বিবাহ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রথম জীবন যাপন দ্বারা দেখান হইয়াছে। এর পর জীবের বিষয়-স্পৃহা কামনার জন্মই, দ্রোণাচার্য্যের পুত্রের সুখের চেষ্টায় রাজ-দ্বারে ভিক্ষার্থী হওয়া! এই অবস্থায়ই বালক পিতার নিকট নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য যাচনা করিয়া গ্রহণ করে। এই প্রার্থনায় যদি দ্রব্য না মিলে, কেহ যদি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তখন জীব ক্রোধ যুক্ত হইয়া প্রার্থীত লাভের জন্য দৃঢ়তাসহ নানা চেষ্টায় ব্রতী হয়। এই তৃতীয় অবস্থাই দ্রুপদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়া দ্রোণাচার্য্য বিদ্যা ও অস্ত্রচালনা শিখিলেন এবং পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র গণকে যুদ্ধকৌশল শিখাইয়া, দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন লীলা-দ্বারা দেখান হইয়াছে। দ্রব্য-জন্য আকাঙ্ক্ষা টুকুই লোভ বা কামের সত্তা, আর দৃঢ়তা সহ যে প্রাপ্তি চেষ্টায় ব্রতী হওয়া এই সত্তাটুকুই ক্রোধ-সত্তার ক্রিয়া, ক্রোধই দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা। এই কাম ও ক্রোধ একত্র হইলেই বিদ্যা-গুরু কৃপাচার্য্যের নিষ্কাম অধিকার নাশ করিয়া, মায়ার খেলা আরম্ভ করিতে সক্ষম হয়। তাই দ্রোণাচার্য্যরূপী লোভের তৃতীয় অবস্থায় অশ্বত্থামাকে লইয়া কৌরব রাজ্যে আসিয়া গুরুপদ গ্রহণ করিলেন। এই পাণ্ডব ও ধৃর্ত্তরাষ্ট্রদের মধ্যে যাহার এই পিতা পুত্রকে অশেষ ভোগ আদি দিয়া সেবা করিল, তাহারই অধিক অবিদ্যা মায়াগ্রস্ত হইয়া উঠিল, আর

যাঁহারা ইহাদিগকে ভোগ বিলাস না দিয়া, কৃপাচার্য্যের অধীন থাকিয়া সাত্বিক ভাবে, ভক্তি-সহ ইহাদের সেবা করিল, তাহারা বিষয় বিরক্ত হইয়া বিদ্যারাজ্যের অসীম জ্ঞান-শক্তির অধিকারী হইল।

শিষ্য—প্রভো! দ্রুপদ রাজার সহিত দ্রোণাচার্য্যের বন্ধুত্ব ও দ্রুপদ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান মধ্যেও কি কোন প্রকার তত্ত্ব আছে?

গুরু—আছে বৈকি বাবা! কর্ম্ম জগতের অতীগুহ্য-তত্ত্ব এই দ্রুপদ রাজার রাজ্য। তাই তো মহাভারতের প্রথমেই দ্রোণ ও দ্রুপদ বিরোধ হইতে কৌরব গুরুর উদ্ভব। তার পরে এই দ্রুপদের কন্যা লাভ জন্য সর্ব্ব পৃথিবীর মানবের চেষ্টা দর্শন করিবে। এর পর পাণ্ডব ধার্ত্তরাষ্ট্র লীলার মূলেই দেখিবে এই দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদী দেবী। পাণ্ডবগণের সুখ সৌভাগ্য কি দুঃখ দৌর্ভাগ্য সর্বত্রই এই দ্রুপদ্র কন্যাকে সেবা ও রক্ষা করিতে দেখিবে. আর ধার্ত্তরাষ্ট্রদের যত আক্রোষ অত্যাচার এই দ্রৌপদীর উপর হইবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দেখিবে এই দ্রুপদরাজা ও তাঁর পুত্রগণই যুদ্ধ জয়ের প্রধান ভার গ্রহণ করিবেন—এই দ্রুপদ রাজার পুত্র বিনে ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষের প্রধান সেনাপতী ভীষ্ম ও দ্রোণ বধই সম্পন্ন হইত না। তাই বলি বাবা! এই দ্রুপদ রাজার-তত্ত্ব ও দ্রোণসহ তাহার বিরোধ-তত্ত্ব কর্ম্ম জগতের অতি অদ্ভুৎ একটী রহস্যের কথা।

তত্ত্ব—দ্রুপদ-রাজা ভাগ্য-দেবতা, ইনিই জীবকে সুখ সম্পদ দান করিয়া থাকেন। লোভ অর্থাৎ উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সহিতই ইহার নিত্য বন্ধুত্ব; আকাঙ্ক্ষা-হীন কখনও ভাগ্যলাভ করিতে পারে না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা-শালীও যদি দৃঢ়তাসহ বিদ্যা ও কৌশল অর্জ্জন না করিয়া, এই দ্রোণাচার্য্য যেমন ভিক্ষা চাহিতে দ্রুপদের দ্বারস্থ হইয়াছিল তেমনি ভাবে চেষ্টান্বিত হয়, সে কখনও সৌভাগ্য দেবের কৃপা লাভ করিতে পারে না। "ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।" ভিক্ষাদ্বারা কখনও লক্ষ্মী লাভ হয় না। এই তত্ত্বটুকুই

বাবা! রাজা দ্রুপদ কর্ত্তৃক ভিক্ষার্থী দ্রোণাচার্য্যকে বন্ধু বলিয়া অস্বীকার করা। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষা আর রাজলক্ষ্মী কখনও এক স্থানে থাকে না, রাজায় আর ভিখারীতে বন্ধুত্ব হয় না।" এই আঘাতে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধ যুক্ত হইয়া অতি-দৃঢ়তা ও যত্ন অবলম্বনে বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করিলেন ও কুরুবংশ রূপ কর্ম্মকর-সত্ত্বাবর্গকে জ্ঞান-কৌশল শিক্ষা দিয়া তুলিয়া, এবার সৌভাগ্য-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভাগ্য-দেবতা পরাজিত হইয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনামত রাজ্য তাহাকে দান করিয়া দিলেন। এইরূপই বাবা! সত্যই যদি বিষয় জগতে সৌভাগ্য-দেবের কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, ভিক্ষার্থী না হইয়া প্রকৃত বীরের মত আক্রমণ করিয়া ভাগ্যকে কাড়িয়া লইতে হইবে, নচেৎ কিছুতেই তুমি ভাগ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে না। আক্রমণ ও যুদ্ধজয় করার মধ্যেও ভাগ্য-লাভের পন্থা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে ধার্ত্তরাষ্ট্রের দল চারিদিক হইতে, প্রত্যেকে স্পর্দ্ধা করিয়া দ্রৌপদ-বল আক্রমণ করিয়াছিল, সকলেই পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ পদ হইতে বাধ্য হইল। যখন পাণ্ডব-পক্ষ অগ্রে ভীমকে, মধ্যে অর্জ্জুনকে, পৃষ্ঠে ধর্ম্মরাজকে, দক্ষিণে নকুল ও বামে সহদেবকে লইয়া ব্যূহিত হইয়া, এক সত্তায় আক্রমণ করিল, তখন দ্রুপদ রাজা পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। এই সৌভাগ্য-ধরা ব্যূহ ও যুদ্ধ টুকু বুঝিলে কি? যখন জীব ভক্তিকে মূল রথী করিয়া, যোগ বলকে অগ্রবল, ধর্ম্ম-জ্ঞানকে পৃষ্ঠ বল, বিশ্বদর্শিতা নীতিকে দক্ষিণের ও ভবিষ্যদর্শিতাকে বামের বল করিবে, তখন সর্ব্ব দুর্ভাগ্য নাশ করিয়া সৌভাগ্য-দেবকে ধরিতে সক্ষম হইবে; ইহাদের সহায়তা বিনে ধার্ত্তরাষ্ট্র অসুর-বলের শত চেষ্টায়ও জগতে সৌভাগ্য লাভ হইবে না।

শিষ্য—দ্রুপদ রাজ্যের অর্দ্ধ-রাজ্য গ্রহণ মধ্যেও কি কোনও রহস্য আছে প্রভো?

গুরু—বাবা! কামের বা লোভের অধিকার নির্ণয়ই এই রাজ্য বিভাগ রহস্য। জীব-জগতে সৌভাগ্য বা সম্পদ-রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, আধ্যাত্ম্য রাজ্য ও অধিভূত বা বিষয় রাজ্য। জীব-চেষ্টার অধিকার অধিভূত-রাজ্য আর দৈব চেষ্টার অধিকার আধ্যাত্ম্য-রাজ্য, তাই জীবত্বের শিক্ষা গুরু লোভ দেবতা কেবল সৌভাগ্যের পূর্ব্ব অর্দ্ধ অধিভূত অংশ গ্রহণ করিয়া অপর অর্দ্ধ ত্যাগ করিলেন। কামের অধিকার বিষয়-রাজ্য আর প্রেমের অধিকার আধ্যাত্ম্য রাজ্য। সৌভাগ্য-দেবতার আধ্যাত্ম্য রাজ্যার্দ্ধের সম্পদ্ শক্তি লাভ, অবিদ্যা-মায়া-রাজ্যের কাহারই অধিকার নাই। সেই রাজ্যের সম্পদের সংবাদ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে বর্ণিত হইবে। তখন দেখিবে, সেই রাজ্যের শক্তি সহায়তা ও সুখ লাভের জন্য জগতের সকলেই বিশেষ লালায়িত হইলেও কাহারা কেমনে তাহা লাভ করে। তখন দেখিবে, অস্ত দৈব-স্বভাব পাণ্ডবগণের সহায়তায় যাহারা অনায়াসে দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছে, সেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বথামা পাণ্ডব হীন হইয়া জগতের সমস্ত রাজার সহায়তায়ও সেই রাজ্য হইতে পরাজিত ও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যাইবে। ভাগ্য-দেবতা দ্রুপদের-রাজ্যের দুইঅর্দ্ধের একভাগ দৈব-প্রবৃত্তির অধিকার, অন্যভাগ জীব বা আসুর প্রবৃত্তির অধিকার। একভাগ প্রবৃত্তি অভিমুখীর বিহার স্থান—তাহারা লোভের অধীনতায় ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি লইয়া ক্রিয়া করিবে, অপরভাগ নিবৃত্তির অভিমুখী বিষয়-নিবৃত্ত ও ভগবান্ অভিমুখী হইয়া ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি দ্বারা ক্রিয়া করিবে। এখন শিক্ষা-রহস্য আলোচনা কর।

শিষ্য—প্রভো! শিক্ষা-অধ্যায়ের রহস্য সরল করিয়া বুঝাইয়া দিন। দ্রোণাচার্য্য একজন ঋষি ছিলেন, তিনি কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিয়া অল্প ও অধিক উপদেশ দান করিবার পাত্র নন! তবু তাহার শিষ্যগণ সকলে সমান শিক্ষা না পাইয়া, ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া পড়িল কেন প্রভো?

গুরুদেব—এই তত্ত্বটীইত শিক্ষা অধ্যায়ের রহস্য বাবা! পূর্ব্বে যে দৈব ও অসুর বা পাণ্ডবপক্ষ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষ দুইটী দল দেখান হইয়াছে, সেই দুই দলের আশ্রয়, অবলম্বন, সঙ্গ ও উদ্দীপনার বিভিন্নতা হইতে একই শিক্ষা বিভিন্ন আকার রূপ ধারণ করিয়া বসিল। সাক্ষাৎ ত্যাগের-মূর্ত্তি ব্রহ্মচারিণী মাতা-কুন্তীদেবীর আশ্রয়ে, বিষয়-নিবৃত্ত বিদুরের অধীনতায় ও কৃপাচার্য্যের স্নেহশিক্ষায়, সদয় হৃদয়ের উপরে লোভ-দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষা কৌশল যেইরূপ ক্রিয়া করিল; স্বাক্ষাৎ ভোগের-মূর্ত্তি রাণী গান্ধারী-মায়ের অন্ধ-ভালবাসার আশ্রয়ে, বিষয়মত্ত অন্ধ-ধৃতরাষ্ট্রের অধীনতায়, কৃপাচার্য্য-চ্যুত—তাহাকে অগ্রাহ্যকারী, নির্দ্দয় হৃদয়ে শুধু লোভ-দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষা কৌশল সেইরূপ ক্রিয়া করিবে কেন? এর উপরে জীবত্বকে মুগ্ধ করিয়া দৈবপ্রকৃতিবর্গের বিপক্ষে বৈরতাযুক্ত করিবার জন্য, আরও কয়টী ভগবৎ মায়াশক্তি আসিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষে যোগদান করিলেন। বাবা, জীবকে দৈবপ্রকৃতি-চ্যুত করিবার প্রধানমায়া এই সত্তাগুলিকে বিশেষরূপে চিনিয়া রাখিবার প্রয়োজন। ইহাদের একজন শকুনি-মামা, একজন সখা-কর্ণ, একজন গুরুপুত্র অশ্বথামা। মাতুলমহাশয়ই তমোগুণ অন্ধ-জ্ঞানের আনয়ন-কারী প্রধান-সত্তা সন্দেহ ও কুটিলতা, ইনি ভগবানে ও ধর্ম্মে সন্দেহ তুলিয়া আত্ম-চেষ্টায় সুখগ্রহণে মন্ত্রণা দেয়। সখা-কর্ণ হিংসার জীবন্ত-স্বরূপ, জগতে জ্ঞানে গৌরবে নিজে শ্রেষ্ঠ হইবার মতিকে, ইনি আবরণ করিয়া মহত্তের প্রতি শুধুশুধী দ্বেষ ও ঈর্ষ্যার জন্ম দেয়—মহৎকে পরাজয় ও ধ্বংস করিয়া কেবল নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মতি হয়। আর গুরুপুত্র অশ্বাথামা, লোভের পুত্র ক্রোধমহাশয়, ইহার অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে জীব কোপন-স্বভাব হইয়া শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না—নিজের তৃপ্তির ব্যাঘাত হইলেই গুরুবর্গের মর্য্যাদা লঙ্ঘন, পরপীড়ন, অধর্ম্ম, অবিচার দ্বারা ও স্বতৃপ্তি লাভে মতি হয়। দুর্য্যোধনের দল এই কয় জনের সঙ্গ প্রভাবেই সহজমিত্র

ভ্রাতা-পাণ্ডবদিগের যশ প্রতিষ্ঠায় হিংসান্বিত হইয়া, কুটীল পথে তাহাদের ধ্বংস চেষ্টায় ব্রতী হয়; তাহাতে বাধা পাইয়া পরে ক্রোধযোগে নির্লজ্জ হইয়া, গুরুবর্গকে অগ্রাহ্য করিয়া, ভীষণ অধর্ম্ম অবিচার দ্বারাও পাণ্ডব ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিল। এই সব সঙ্গ ইত্যাদি দোষেই ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষ পাণ্ডবদের মত বিদ্যালাভে সক্ষম হয় নাই।

বাবা, পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনাদির জন্ম মধ্যে শুনিয়াছ অসুর ভাবগুলি সবই গান্ধারী দেবীর ঈর্ষ্যা হইতে, বৈকারিক গর্ভস্রাবে জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপ দৈবপ্রকৃতির তৎপরতা, দৃঢ়তা ও উত্তমরূপে কর্ম্মসম্পাদন প্রবৃত্তিই বৈকারীক-সত্বায়, সকাম-লোভের শিক্ষায় বিকার পাইয়া শকুনিত্ব, অশ্বাথামাত্ব ও কর্ণত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মতৎপরতা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় দ্বারা সহজে কর্ম্মসম্পাদন চেষ্টাই, দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইত্যাদি ভাব যোগে কপট ছলতাময় সার্থসাধনার বুদ্ধিতে পরিণত হয়, অসুর দলের ইনিই প্রধান মন্ত্রী মাতুল মহাশয়। এরপর কর্ম্মদৃঢ়তা, কর্ম্মটী শাস্ত্র বিধান মতে সম্পন্ন করিবই-সত্তা, স্বকাম দেহেন্দ্রিয়-তৃপ্তি যুক্ততায় অবাধ্যতাপূর্ণ ক্রোধ হইয়া ~~যায়~~; অসুরের দলের ইনি একজন বড় আদরের সম্মানের গুরুপুত্র। এর পর উত্তমরূপে বা দেবতার মত করিয়া কর্ম্মটী সম্পাদন করিব এই ভাবটাই স্বকাম দেহেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, ক্রোধ ও কুটীলতা যোগে, মহতের দ্বেষ ও তাহাকে নাশ করিবার মতি হিংসায় পরিণত হয়; ইনি অসুরের দলের কর্ম্মরাজ্যের প্রধান সেনাপতী! মহাভারতে দেখিতে পাইবে—যতদিন ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও কৃপাচার্য্যের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, পরামর্শ শুনিয়া চলিয়াছে, ততদিন শকুনি, অশ্বথামা ও কর্ণ কুটীলতা, মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ও হিংসা প্রকাশ করে নাই। কর্ণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ভীষণ দৃঢ়তা ও চেষ্টায় পাণ্ডবদের মত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল, অশ্বথামা ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই, শকুনিও দুর্মন্ত্রণা দান করে নাই। যেই ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবপক্ষকে পর বোধ করিয়া,

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আপন সংজ্ঞা করিল, তাহাদের তৃপ্তিসুখ জন্য ক্রমে আসক্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের তৃপ্তি জন্য বিদুর ও কৃপাচার্য্যের প্রাধান্য লঙ্ঘন আরম্ভ করিল, তখনই দুর্য্যোধন, শকুনি কর্ণাদি মিলিয়া পাণ্ডব বধের চেষ্টায় কুটীলতা ও হিংসা আশ্রয় করিল। চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া পরে অশ্বথামাকে সেবা করিয়া দলভুক্ত করিল, এবং কাম ও ক্রোধরূপী দুর্জ্জয় পিতাপুত্রের সহায়ে তাহারা পাণ্ডব-দেবত্বের অধিকার ও প্রাধান্য নাশের চেষ্টায়, দৃঢ়তাসহ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল।

বাবা, শিক্ষা অধ্যায় মধ্যে কোন-বৃত্তি প্রধান মানুষ কেমনে কিরূপ শিক্ষা লাভ করে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন বৃত্তিশালীব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গুরু সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কাহাদের শিক্ষা জগতের মঙ্গলকর হইয়া গুরুর গৌরব বর্দ্ধন করে, আর কাহাদের শিক্ষাদানে জগতের অমঙ্গল হয়, গুরুরও অশেষ নিন্দাভাগী হইতে হয় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক কথায়, পাণ্ডবদের মত এমন বিষয়-নিবৃত্ত দেবপ্রকৃতিবর্গের শিক্ষায়ই জগতের মঙ্গল ও গুরুর গৌরব বর্দ্ধিত হয়। আর ধার্ত্তরাষ্ট্রদের মত অসুরের-দল শিক্ষা পাইলে জগতের উৎপাত সদৃশ হইয়া জীবের শান্তিসুখ নষ্ট করে, গুরুকেও অযশ কলঙ্কে ডুবাইয়া অধর্ম্মপথে লইয়া যায় ও অকালে বধ করিয়া ফেলে। মহাভারত মধ্যে এইতত্ত্ব জীবন্ত দর্শন করিবে।

শিষ্য—গুরুদেব! দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যের মধ্যে অর্জ্জুনের মত এমন সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত আর কেহই হয় নাই কেন? ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষ কিন্তু বলিত গুরু পাণ্ডবদিগের প্রতি, বিশেষ অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাত করিতেন; গোপনে অধিক শিক্ষা দিতেন বলিয়া সে এত অধিক শিখিয়াছিল:

গুরু—দ্রোণাচার্য্য যে ঋষি ছিলেন বাবা, ঋষির ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ইত্যাদি কোনও দোষ থাকে না, তিনি পক্ষপাত করেন নাই! সাগর

যেমন অনন্ত বারীরাশি লইয়া পড়িয়া আছে, যে কোন প্রাণী তাহা হইতে যাহার যত শক্তি সেইরূপ সলিল আহরণ করিতেছে, দ্রোণাচার্য্যও সেইরূপ সকলকে সমান ভাবে উপদেশ দিলেও, শিষ্যগণ যার যার সত্তানুরূপ উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার মৃত্যুর জন্য যজ্ঞ হইতে জাত হইয়াছে শুনিয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সখাপুত্র বলিয়া সর্ব্বব্রহ্মাস্ত্রসহ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দান করেন, নিজ পুত্রের মত যত্ন ও সেবা করেন, সে কি পক্ষপাত করার ব্যক্তি বাবা? গুরু অর্জ্জুনের ব্যবহারে বুঝিয়াছিলেন, প্রাণ গেলেও সে গুরু-দ্রোণাচার্য্যের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবে না, সেই জন্য তিনি এমন পুত্র হইতেও প্রিয় শিষ্যকে গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা ছলে, 'প্রয়োজন হইলে তুমি আমার সঙ্গেও যুদ্ধ করিবে," এই বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি কি সাধারণ গুরু বাবা? তিনি পক্ষপাতের অতীত ঋষি ছিলেন। অর্জ্জুন তার নিজের গুণের অধিকারেই, দ্রোণাচার্য্য হইতে অধিক জ্ঞান ও শিক্ষা-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল। অর্জ্জুন কেমনভাবে চলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিয়াছিল, প্রত্যেক বিদ্যার্থীই তাহা জানিয়া রাখার প্রয়োজন।

বাবা, বিদ্যালাভ জন্য শিষ্য গুরুতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া, দীনভাবে তাঁর অনুশাসন মানিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়, তবে শিষ্যের প্রতি গুরুর কৃপা হয়। বাবা, যে এইরূপ গুরুতে ভক্তিযুক্ত না হয়, নিজের বিদ্যার অভাবের বোধযুক্ত না হয় এবং গুরু হইতে বিদ্যালাভ না করিলে তাহার বিশেষ ক্ষতী হইবে এই বোধই না থাকে, সে বিদ্যালাভ করিতে সক্ষম হয় না, গুরুর কৃপাও পায় না। আবার বিদ্যালাভ কালেও যাহারা, ব্রহ্মচর্য্যশীল, জীতেন্দ্রিয়, সৎসঙ্গী ও সৎচিন্তাপর না হয়, স্ব স্বাধীনতা ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি লইয়া গুরুর উপদেশ শ্রবণ করে, গুরুর উপদেশে তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষই হয় না। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিদ্যালাভে আকাঙ্ক্ষ থাকিলেই বিদ্যার্থীর জীতেন্দ্রিয়তা, দীনতা, স্বাধীনতা-হীনতা ইত্যাদি গুণ

আপনি আসিয়া উদয় হয়; বিদ্যালাভের মূলই, গুরু ও বিদ্যায়-শ্রদ্ধা। এই জন্যই ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়।" শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া জ্ঞান লাভ করে। এই শ্রদ্ধা ও তৎপরতা এবং জীতেন্দ্রিয়তা-গুণেই পাণ্ডব-পক্ষ প্রকৃত জ্ঞান লাভে সক্ষম হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ মধ্যে অর্জ্জুন শ্রদ্ধার মূর্তিমানস্বরূপ, তাই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুকৃপা ও বিদ্যালাভ করিয়াছিল। বাবা; এই বিশ্বজগতে দেবরাজ-পুত্র অর্জ্জুন-সত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসত্তা আর জগতে নাই। দীপ্যমান-সত্তাবর্গের শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাকে দেবরাজ শক্তি বলা হইয়াছে। মহাভারতে দেখিতে পাইবে এমন-পাষণ্ড দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনকে ভাল বাসিত, দ্রৌপদীদেবী সর্ব্বাপেক্ষা ইহাকেই অধিক ভালবাসিতেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরত অর্জ্জুন প্রাণেরমত প্রিয় ছিল! শ্রীবলদেবের প্রিয়া-ভগ্নী সুভদ্রাদেবী দাদার অমতেও রাজা-দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজেই অর্জ্জুনকে পতিত্বে বরণ করেন। অগ্নিদেব যাচিয়া গাণ্ডীবধনু, অক্ষয়তুল্য, মায়ারথ অর্জ্জুনকেই দান করেন। সর্ব্ব দেবগণ তুষ্ট হইয়া প্রত্যেকের অস্ত্র ও শক্তি অর্জ্জুনকে দান করিয়া দিলেন। এহেন অর্জ্জুনকে দ্রোণাচার্য্য অধিক ভাল বাসিবেন, তাহা কি দ্রোণাচার্য্যের দোষ বাবা? অর্জ্জুন-সত্তাতেই এইরূপ ভালবাসা ও জ্ঞান লাভের অসাধারণ শক্তি থাকে; অর্জ্জুন-সত্তার অভাবেই জীব গুরু-কৃপা ও জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়না। অর্জ্জুন কি কি গুণে সর্ব্বাধিক গুরু-কৃপা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এখন ক্রমে তাহা শ্রবণ কর। মহাভারতে শিক্ষা অধ্যায়ে এই বিষয়ের চারটী লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

লীলা। (১) দ্রোণাচার্য্য প্রতিদিন স্নান করিয়া আসিলেই, বিদ্যাদান আরম্ভ করিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন; সকল বালককেই স্নান সন্ধ্যা করিয়া জল লইয়া আসিতে হইত! সেই জল আনয়নজন্য সকলকে একরূপ

পাত্রই দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই পাত্রে এমন একটু কৌশল ছিল, সেই কৌশল অবলম্বন করিলে অতি শীঘ্র জল ভরা যাইত। অশ্বত্থামা পূর্ব্বেই সেই পাত্রের কৌশলটুকু জানিতেন, তাই তিনি শীঘ্র জল ভরিয়া সকলের পূর্ব্বেই আসিয়া অস্ত্রশিক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। সকলেই এই অশ্বত্থামার গমন দেখিল, কাহারও মনেই কিছু ভাব হইল না, কিন্তু অর্জ্জুন বুঝিল নিশ্চয় কোন' কৌশলে অশ্বত্থামা শীঘ্র জল ভরিয়াছে। তাই সে চেষ্টা করিয়া কৌশল বাহির করিয়া অশ্বত্থামার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিল। অন্য পাণ্ডবগণ জল ভরা হইলেই চলিয়া আসিত, কিন্তু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, জটলা করিয়া গল্প-করিয়া বিলম্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যোগদান করিত, এই জন্যই বালকদের বিদ্যা শিক্ষার তারতম্য হইয়াছিল। একমাত্র অর্জ্জুনই বুঝিয়াছিল, পিতার পুত্র হইতে প্রিয় অন্য কেহ হইতে পারেনা, পুত্রকে অধিক শিক্ষা দান করাই পিতার স্বভাব ও ধর্ম্ম। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য যখন ঋষি, তিনি সেইরূপ করিবেন না। তবে তাহারা সেই সুযোগ করিয়া দিলে—পুত্রকে একা পিতার নিকট বিদ্যা শিখিবার সময় দানকরিলে, তিনি নিশ্চয় পুত্রকে অধিক শিক্ষা দান করিবেন ; তাই গুরুপুত্রকে সে একা শিক্ষা করিতে সময় দেয় নাই।

তত্ত্ব—এইরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব শিক্ষার্থী গুরুভ্রাতাদের প্রতি যাহারা দৃষ্টি রাখে, শীঘ্র জলভরার-ন্যায় কেহ নূতন কিছু করিলেই অমনি তাহা শিক্ষা করে, আলস্য ইত্যাদি কোন কারণেই শিক্ষার সময়ে ক্ষণকালও অনুপস্থিত না থাকে, সে ই পূর্ণ বিদ্যা-লাভ করিতে পারে।

লীলা—(২) পূর্ব্বে গুরু-গৃহে শিক্ষা করিতে, রাজপুত্রের ও গুরুর আশ্রমে সামান্য দুঃখী দরিদ্রের মত ভোগ বিলাস হীন হইয়া, গুরুর অনুশাসন মানিয়া, তাঁহার পরিবারের দাসত্ব করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবার নিয়মছিল। কেননা জীবের দেহকে দুঃখ-কষ্টভোগের শিক্ষাই যে দিতে হইবে ও স্ব চেষ্টায়

সামান্য অবস্থা হইতে দুঃখ-দারিদ্রতা নাশ করিয়া, পুনঃ সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিতেইত শিক্ষা করিতে হইবে। মানবের দুঃখ-দারিদ্রতা ভোগই শিখিতে হয়, সুখ ভোগ না শিখিলেও চলে। তাই কৌরব কুমারগণ কৃপাচার্য্যের আশ্রমে আসিয়া, কৃপ ও দ্রোণাচার্য্য দ্বারা, জীবন কাটাইবার প্রতিদিনের কর্ত্তব্য, আহার, বিহার, বিশ্রাম, ঈশ্বর-সাধনার জ্ঞান কৌশল শিক্ষা করিতেছিল। একদিন দ্রোণাচার্য্য অন্ন-পরিবেশককে বলিয়া দিলেন, "পরিবেশন কালে হঠাৎ দীপ নিভাইয়া দিও!' রাত্রি ভোজন কালে ঐ দিন হঠাৎ দীপ নিভিয়া গেল, ও ক্ষণ পরেই গুরুর আদেশে আবার দীপ জ্বালিয়া ভোজন সমাপ্ত করিয়া কুমারগণ ও গুরু শয়ন করিলেন। কিন্তু কতক্ষণ পরেই বাহিরে অস্ত্র চালনার শব্দ শুনিয়া গুরু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অর্জ্জুন নিদ্রা না যাইয়া অন্ধকারেই বাণত্যাগ শিক্ষা করিতেছে। গুরু হাসিয়া বলিলেন, 'একি করিতেছ! অন্ধকারে বাণ ত্যাগে কি ফল?' অর্জ্জুন বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "গুরুদেব! অদ্য ভোজন কালে দীপ নিভিয়া গেলে দেখিলাম, অভ্যাসবশে হস্ত ঠিক মুখ গহ্বরেই অন্নগ্রাস পৌঁছাইয়া দিল, তাহাতে একটুকুও ভুল বা বিলম্ব হইল না! তাহাতে বুঝিলাম অভ্যাস করিতে পারিলে, অন্ধকারেও লক্ষ্য-ভেদ অভ্যাস হইতে পারে! তাই আমি অন্ধকারের মধ্যেই, উভয় হস্তে লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেছি।' গুরুদেব আনন্দে শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্ব শিষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে।'

তত্ত্ব—এইরূপ শিক্ষাকালে যাহারা গুরুর প্রত্যেক-ক্রিয়া অর্থ যুক্ত ভাবে দর্শন করে, শিক্ষা লাভ জন্য অতি আগ্রহান্বিত হইয়া, নানা স্থান হইতে নানা জ্ঞান আহরণ করে ও অনলস হইয়া, নিদ্রাদি সুখ ত্যাগ করিয়া—রাত্রি জাগিয়াও শিক্ষার জন্য অভ্যাসাদি চেষ্টা করে, তাহারাই অধিক বিদ্যালাভ ও গুরুর ভালবাসা লাভ করিতে সক্ষম হয়।

লীলা—(৩) একদিন গুরু শিষ্যগণের পরীক্ষার জন্য, বৃক্ষের উপরে একটী কৃত্রিম পাখী বসাইলেন ও সমস্তকে আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, এই পাখীর চক্ষুতে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে! সকলে লক্ষ্য স্থির কর! আমার আদেশ মাত্র ভেদ করা চাই।" প্রত্যেকেই লক্ষ্য স্থির করিয়া বাণ্ যোজনা করিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে দেখিয়া, গুরু একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "লক্ষ্য স্থির হইয়াছে কি?" প্রত্যেকেই উত্তর করিল—'হইয়াছে?' তিনি আবার ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি এখন তুমি কি কি দেখিতেছ?" অর্জ্জুন বিনে ক্রমে সকলেই বলিল, "কেন, আমি সবইত দেখিতেছি! আপনাকে দেখিতেছি, গাছ দেখিতেছি, পাখী দেখিতেছি।" গুরু অমনি লক্ষ ভেদের আদেশ দিলেন, কেহই লক্ষ ভেদে সক্ষম হইল না। কিন্তু অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল "পাখীর চক্ষুটুকুবিনে আর কিছুই দেখিতেছি না।" অমনি গুরুর আদেশের সঙ্গেই পাখীর চক্ষু ভেদ হইয়া গেল।

তত্ত্ব-এই পরীক্ষাটী বুঝিলে কি বাবা, লক্ষ্য-সাধন করিতে হইলে গুরুর অভিপ্রায়টী ভাল করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে! স্থান ও সময় অনুযায়ী গুরুর ব্যাক্যের অভিপ্রায় বোধ যার অধিক, সেই গুরুকে তত তুষ্ট করিতে পারে ও নিজে যথেষ্ট জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। লক্ষ্যভেদ উদ্দেশ্যে অর্জ্জুনের মত একাগ্র বুদ্ধি, অন্য ভাব চঞ্চলতা রহিত না হইলে, কেহই লক্ষ্যভেদ অর্থাৎ ইষ্টলাভ করিতে সক্ষম হয়না।

লীলা—(৪) একদিন স্নান করিতে গেলে গুরুকে হঠাৎ কুম্ভীরে কামড়াইয়া ধরিল ও গভীর জলে লইয়া চলিল। গুরু ব্যগ্র হইয়া চিৎকার করিয়া তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন ও সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ সকলে গুরুর এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল—কেন না জলের ভিতরে কুম্ভীরসহ যুদ্ধরত গুরু,

এঅবস্থায় অস্ত্রাঘাত করিলে গুরুর গায়ে লাগিতে পারে। কিন্তু সকলে বিমূঢ় হইলেও অর্জ্জুন বিমূঢ় হয় নাই, তাহার অন্ধকারে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস থাকায় সে অতি দ্রুত কুম্ভীরকে বাণাঘাতে ছেদন করিয়া ফেলিল। গুরুদেব কুম্ভীর-মুক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন ও অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তখনই ব্রহ্মশির নামক একটী অমোঘশক্তি ব্রহ্মাস্ত্র, প্রয়োগ মন্ত্রাদি সহিত তাহাকে দান করিলেন।

ভক্ত—বাবা, এইজগতে যাহারা সম্পদে বিপদে কোন অবস্থায় বিমুঢ় না হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত থাকে। তাহারা প্রকৃত উত্তম ফল লাভ করিয়া সর্ব্বদিকে সাফল্য লাভ ও গুরুর তোষণে সক্ষম হয়। ভালবাসায় প্রিয় বস্তুর প্রতি অতি লক্ষ্য হয় ও তাহার বিপদে প্রাণ দিয়াও রক্ষায় মতি হয়। অর্জ্জুন গুরুকে অতিভালবাসিত বলিয়া, তাঁহার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিত, এইজন্যই আর সকলের প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইলেও তাহার বিলম্ব হয় নাই ও সে অন্যের মত বিমূঢ়ও হয় নাই। এই ভালবাসা জনিত অতিলক্ষ ও তৎপরতা জন্যই অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যায় শ্রেষ্ট ও গুরুর প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিল। তাই বলিয়াছি বাবা, অর্জ্জুনশক্তি নিজের গুণ ও শক্তিতেই অধিক বিদ্যা ও গুরুকৃপা লাভ করিতে পারে।

শিষ্য—অর্জ্জুন বিনে অন্য পাণ্ডবগণ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও কর্ণাদি গুরুকে কি ভাল বাসিত না প্রভো? গুরুর প্রতিতো সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল।

গুরু—শ্রদ্ধা সকলেরই ছিল বটে, কিন্তু এক এক জনের শ্রদ্ধা এক এক রূপ। মানবের সত্তানুযায়ী এক এক রূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির জ্ঞানপ্রধান তাই কর্ত্তব্যবোধে শ্রদ্ধা, ভীমের যোগপ্রধান, অর্জ্জুনের ভক্তি ভালবাসা-প্রধান, নকুল নীতি-প্রধান, সহদেব ভবিষ্যৎদর্শিতা-প্রধান, কর্ণ ঈর্ষ্যা-প্রধান, অশ্বত্থামা ক্রোধ-প্রধান, শকুনি কুটীলতা-প্রধান, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি-সুখ প্রধান শ্রদ্ধা করিত। ধার্ত্তরাষ্ট্র দল অব্রহ্মচারী হইয়া—

গোপনে দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি রাখিয়া বিদ্যালাভ জন্য অল্পচেষ্টা করিত, অথচ অন্যে অধিক শিখিল বলিয়া ঈর্ষ্যা করিত। বিনাশ্রমে লাভ জন্য কুটীলতার সহায়তায় কৌশল অবলম্বন করিত, গুরুর প্রতি ক্রোধযুক্ত হইয়া "পাণ্ডবের মত আমাদিগকে শিক্ষা দেন না কেন?" বলিয়া অনুযোগ করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, তাহারা রাজপুত্র, পিতা যখন বিদ্যাদান জন্য গুরু নিয়োগ করিয়াছেন, গুরুই শিক্ষাদান করিবেন, আমরা আবার অধিক চেষ্টা করিব কি? আরও যার যার সত্তামত সেবা দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করিতে চেষ্টার দোষেও বিদ্যার তারতম্য হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ দেব সত্তাবান্ এইজন্য গুরুকে সাত্বিক সেবা—দীনতা, ব্রহ্মচর্য্য, শৌচাদি রক্ষা করিয়া বাক্য পালন দ্বারা তুষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। দুর্য্যোধন পক্ষ আসুর স্বভাবে গুরুর দেহেন্দ্রিয়তৃপ্তি ভোগবিলাস-দ্রব্য যোগাইয়া, অঙ্গ সেবাদি করিয়া তুষ্টির চেষ্টা করিত। এখন ইহাদের লাভালাভ শ্রবণ কর।

লীলা—অর্জ্জুনকে দুর্লভ ব্রহ্মশির-অস্ত্র দান করায়, পুত্র অশ্বত্থামাই ঈর্ষ্যান্বিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার নিকট ব্রহ্মশির প্রার্থনা করিল। ঋষি-পিতা হাসিয়া বলিলেন, "একি পুত্র, পিতার নিকট প্রার্থনা করিলে যে? পিতার কি পুত্র হইতে প্রিয় আর কেহ হয়! পিতার শ্রেষ্ঠ ধন নিশ্চয় পুত্রের জন্যই ধরিয়া রাখে, সময় হইলে পিতাই ডাকিয়া পুত্রকে তাহা দান করেন। তোমার সে বিলম্ব সহিতেছে না কেন? অর্জ্জুনকে দান করায় তোমার ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ হইয়াছে! তাহার গুণ দেখিয়া লজ্জা আসিল না, প্রাপ্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ হইতেছে, এমন লোক কখনও বীর ও মহৎ হইতে পারে না।" কর্ণ ও একলব্য, দুর্য্যোধনের দলে থাকিয়া আলস্য করিয়াও পাণ্ডবের মত লাভের আকাঙ্ক্ষাটী করিত, এবং গুরু পাণ্ডবদের-মত অস্ত্রাদি তাহাদিগকে দেন না বলিয়া, গুরুকে পাণ্ডবের প্রতি পক্ষপাতী বলিয়া সন্দেহ করিত। তাহারা নির্জ্জনে গুরুকে অনুযোগ দিয়া পাণ্ডবদের

মত ব্রহ্মাস্ত্র সকল যাচনা করিল। গুরু হাসিয়া বলিলেন,—"শিষ্যের কি চাহিতে হয় বাবা! শিষ্য যে যেমন উপযুক্ত হয় গুরু তাহাকে তেমনি শিক্ষাদান করেন। তোমরা শুধুশুধি পাণ্ডবগণকে দ্বেষ কর কেন? তাহাদের মত গুণবান, ধার্ম্মিক ও ত্যাগীরাই ব্রহ্মাস্ত্র পাইবার অধিকারী! তোমরা ধর্ম্মে দ্বেষকারী, অহঙ্কারী ও মহতের হিংসাকারী, আমি তোমাদিগকে মন্ত্র সহিত ব্রহ্মাস্ত্র দান করিতে পারি না! শাস্ত্রে তোমাদের মত ব্যক্তিকে ব্রহ্মাস্ত্র দান করিতে নিষেধ করিয়াছে।" একলব্য ও কর্ণ উভয়েই আশাভঙ্গ জন্য দারুণ ক্রোধ ও ঈর্ষ্যায়, যে প্রকারে হউক ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিবই নিশ্চয় করিয়া গুরুর আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেল।

শিষ্য—গুরুদেব, একলব্য ও কর্ণ দুইজনই পরে মহাবীর ও পাণ্ডবের সমকক্ষ যোদ্ধা হইয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন দুইটী শক্তিকে শিক্ষাদান না করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া কি, ঋষি-গুরুর উপযুক্ত হইয়াছিল?

গুরু—ঋষি বলিয়াইতো এই দুইয়ের ভবিষ্যৎ জানিয়া, জগতের মঙ্গলজন্য, তিনি এই দুইজনকে শক্তিহীন করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন, কর্ণের লুকাইত-বীর্য্য জ্বলিয়া উঠিলে—সে কৃতাস্ত্র হইলে, দুর্য্যোধন তাহার আশ্রয়ে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক ধ্বংসের চেষ্টায় ব্রতী হইবে; আর একলব্যও অসুর হইয়া জগতে বিচরণ করিবে! এই শিক্ষা জগতের একটী উৎপাত স্বরূপ হইবে, বলিয়াই ব্রহ্মাস্ত্র দান করিতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু একলব্য ও কর্ণ-শক্তি স্ববলেই গুরু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র আদায় করিয়া লইতে পারে। ঋষি-গুরু ইহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শত্রুর কাজ করেন নাই বাবা! প্রত্যাখানের দ্বারাও তিনি ঋষি-গুরুর মতই কার্য্য করিয়াছেন। ঈর্ষ্যাবান্‌গণকে এমন প্রত্যাখ্যান করিয়া আঘাত না দিলে, তাহাদের জড়তার নাশ হয় না, বিদ্যালাভ জন্য দৃঢ়তা ও চেষ্টাই জন্মে না; দ্রোণাচার্য্য এই জন্যই তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। জগতে দেব-প্রকৃতিবানরাই

গুরু কৃপায় পূর্ণরূপে বিদ্যালাভে সক্ষম হয়; আসুর প্রকৃতির মধ্যে একলব্য ও কর্ণ প্রকৃতিও, আসুর চেষ্টা দ্বারা বিদ্যালাভ করিতে পারে। তাহারা কেমনে কি লাভ করে এই দুই-জীবন মধ্যে দর্শন করিবে। তাহারা স্বার্থজন্য গুরুকে কপট শ্রদ্ধা ও সেবাদিতে অভিভূত করিয়া বিদ্যালাভ করিবে।

লীলা—একলব্য যদুবংশেরই চেদিশাখার একজন রাজকুমার ছিল। গুরু দ্রোণাচার্য্য তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দান করিবে না বলায়, সে নির্জ্জন বনে যাইয়া, এই দ্রোণাচার্য্যের একটী মৃন্ময়মূর্ত্তি গঠন করিল ও অতি কঠোর ব্রতধারী হইয়া, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ গুরুর মত সেবা ও পূজা আরম্ভ করিল এবং দিনরাত্র অনলস হইয়া অস্ত্র-চালনা অভ্যাস করিতে লাগিল। সেই চেষ্টায় একলব্য অপূর্ব্ব অস্ত্র চালনা ও হস্ত লাঘবতা আয়ত্ত করিল। একদিন দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণকে মৃগয়া করাইতে বনে যাইলে, তাহাদের শিকারী কুকুর এই একলব্যের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া ভীষণ রবে ডাকিতে লাগিল; একলব্য একবারে অষ্টটী বান্ তাহার মুখে পুড়িয়া দিয়া, কুকুরের শব্দ করার শক্তি নষ্ট করিয়া দিল; অথচ তাহাতে কুকুরের মুখে একটুকু আঘাতও লাগিল না। এই অবস্থায় কুকুর কৌরবদের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে, তাহারা কুকুরের এই দশা দেখিয়া বিস্মিত হইল। কুকুর একবার হাঁ করার মধ্যে অষ্টটী বান্ তাহার মুখে কে পুড়িয়া দিতে পারিল, তাহাকে দর্শন জন্য সকলেই গুরুসহ একলব্যের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। গুরুকে দেখিয়া একলব্য তাহাকে আসিয়া প্রণাম করিলে, গুরু তাহার নাম ও অস্ত্র-গুরুর পরিচয় জানিতে চাহিলেন। একলব্য নিজকে তাহারই শিষ্য বলিয়া পরিচয় দান করিল। কিরূপে সে তাহার শিষ্য গুরু জানিতে চাহিলে, সে তাঁহাকে মৃন্ময়মূর্ত্তি দেখাইয়া, তাহার ব্রতের বিষয় জ্ঞাপন করিল ও বলিল, "সে এই ব্রত দ্বারা হয় ব্রহ্মাস্ত্রাদি লাভ করিবে, নচেৎ

দেহ ত্যাগ করিবে!" গুরু তাহার একনিষ্ঠতা, বিদ্যাজন্য আগ্রহ ও দৃঢ়তাসহিত চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত ও সন্তুষ্ট না হইয়া পারিলেন না! তবু একলব্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "সত্যই কি আমি তোমার গুরু ও তুমি আমার শিষ্য? তবে আমি তোমার নিকট যাহা চাহিব, তাহাই কি তুমি আমায় দান করিতে পারিবে?" একলব্য অবিচলিত ভাবে বলিল, "আপনার এই কৃপার্থী শিষ্য, আপনি যাহা চহিবেন, আপনার আশীর্ব্বাদে তাহাই আপনাকে দান করিবে।" গুরু বলিলেন, "তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীটী কর্ত্তন করিয়া আমায় গুরু দক্ষিণা দান কর!" একলব্য অম্লানবদনে অবিলম্বে বৃদ্ধাঙ্গুলী ছেদন করিয়া ফেলিল, যুদ্ধশক্তির প্রধান অবলম্বন বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া দিতেও সে বিচলিত হইল না। এবার গুরুর আসন টলিল—'তোমায় ব্রহ্মাস্ত্র দিব না' গুরুর এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল! দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও মন্ত্র কৌশল সহিত ব্রহ্মাস্ত্রাদি দান করিলেন। পরে বর দান করিয়া তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলীর অভাবও ঘুচাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "মন্ত্র আদি চালনায় তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলীর অভাবে কোনই কষ্ট হইবে না, আরো আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জগতে অতি দুর্জ্জয়, সকলের অজেয় বীর হইবে।" বাস্তবিকই একলব্য অতিদুর্জ্জয় মহাবীর হইয়া, জগতের উৎপাত স্বরূপ অসুর হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। দ্রোণপর্ব্বে ঘটোৎকচের মৃত্যুর পর অর্জ্জুন ম্রিয়মান হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে একলব্যের বিষয়ে এই সব কথা বলিয়াছেন। এইরূপ অমানুষী গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া একলব্য গুরু কৃপা ও ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিল।

ভক্ত—বৎস! এই একলব্যের মত কেহ কেহ একটী গুণ দ্বারা গুরুকে তোষণ করিলে গুরু কৃপায় মহৎ শক্তি ও বিদ্যালাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের এই বৃদ্ধাঙ্গুলী দানের মত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। আর উপদেশ, সেবা-শিক্ষা ও অনুশাসন ইত্যাদি না পাওয়াতে,

তাহাদের দেহ ও মন অবিদ্যার-মোহ জয় করিতে সক্ষম হয় না। তাই বিদ্যা ও শক্তির অপব্যবহার করিয়া, সকলের দুর্জ্জয় মহা-অসুর হইয়া জগতের উৎপাত স্বরূপ হয়; একলব্যও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। কর্ণ নিজের ঈর্ষ্যাবৃত্তির তৃপ্তির জন্য, গুরুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কুটীলতা আশ্রয়ে অন্য গুরুকে প্রাণপণে সেবা করিয়া বিদ্যা ও শক্তি লাভ করিবে। আর ভালবাসার পাত্র, আশ্রয়দাতা ও অন্নদাতা, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের-পুত্র অনুপযুক্ত হইলেও, দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে গুরু গুহ বিদ্যা ও ব্রহ্মাস্ত্র আদির উপদেশ দান করিবেন, এইরূপ বিদ্যায় কি ফল প্রসব করে, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের জীবন মধ্যে দেখিতে পাইবে।

লীলা---কর্ণ গুরুর প্রত্যাখ্যানে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুকেও পরাজয় করিতে পারে, এমন শিক্ষালাভ করিতে দৃঢ়চিত্ত হইল। পরে সেইকালের অস্ত্রধারী-শ্রেষ্ঠ পরশুরামকে গুরু করিতে মনস্থ করিল। ভগবান্ পরশুরাম তখন নির্জ্জনে সাধন ভজনে রত ছিলেন, তিনি শিক্ষাদান করিতেন না। কর্ণ কুটীলতা আশ্রয় করিয়া, তাহার নিকট হইতেই শিক্ষা কৌশল ও ব্রহ্মাস্ত্র-বাহির করিয়া লইতে কৌশল অবলম্বন করিল। ভৃগু-বংশীয় ব্রাহ্মণ কুমার পরিচয় দিয়া, অতিযত্নে, অনলসতাসহ সর্ব্বপ্রকারে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরশুরামের সেবা আরম্ভ করিল। কর্ণ একেত অতি সুশ্রী দেবকুমার, তাতে অতি যত্নে, নিতান্ত বাধ্য হইয়া দিনরাত্রি সেবা করায়, পরশুরাম তুষ্ট হইয়া সে কি চায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কর্ণ সময় বুঝিয়া অতি দীন ভাবে, মধুর বাক্যে গুরুকে আরও তুষ্ট করিয়া অস্ত্রশিক্ষা প্রার্থনা করিল। গুরু একেত সেবায় তুষ্ট, তাতে তার বীরত্ব ব্যঞ্জক দেবসদৃশ আকার, তাই বীরত্বের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া আরও সন্তুষ্ট হইলেন। এমন একটী ব্রাহ্মণ শিশুকে পাইলে তিনি তার যুদ্ধ-শক্তি দান করিয়া যাইবেন ইচ্ছাও ছিল; তাই আগ্রহে কর্ণকে অস্ত্রবিদ্যা দান করিতে লাগিলেন;

প্রয়োগ-মন্ত্র সহিত ব্রহ্মাস্ত্রও দান করিলেন। এই অস্ত্র শিক্ষাকালে কর্ণ অসাবধানে বাণ মারিয়া এক ঋষির হোমধেনু বধ করিয়া ফেলিল। সেই তাপস হোমগাভীর মৃত্যুতে অতি দুঃখিত হইয়া, কর্ণকে এই অভিসম্পাত দান করিলেন। "যে আমার এমন মাতৃতুল্যা গাভীকে অনবধানে বধ করিল, সে যার সঙ্গে স্পর্দ্ধাকরে তাহার হস্তেই এমন অনবধানে মৃত্যুলাভ করিবে। সেই আপদ কালে গোরূপা পৃথিবী তাহার রথচক্র গ্রহণ করিবেন।" কর্ণ ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিতে বহু মিনতি করিলেও ব্রাহ্মণের ক্রোধ শান্তি হইল না, অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। এর পর একদিন, গুরু-পরশুরাম কর্ণের উরুতে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলে, একটী রক্তভোজী বজ্রনামক কীট মৃত্তিকা হইতে কর্ণের সেই উরু আক্রমণ করিয়া ক্ষত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ণ ইহার দারুণ দংশনকেও, গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে ধীরভাবে সহ্য করিতে লাগিল। এদিকে কীটের দংশনে রক্তপাত হইয়া গুরুর পৃষ্ঠস্পর্শ করিতেই গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দেখিলেন দারুণ বজ্রকীটের দংশনে শিষ্যের উরু হইতে রক্তধারা বাহির হইতেছে, শিষ্য অবিচলিত ভাবে দংশন সহ্য করিতেছে। তিনি বিস্মিত হইয়া কর্ণকে বলিলেন "এমন ধৈর্য্যতো ব্রাহ্মণের নয়! তুমি নিশ্চয় ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়! প্রবঞ্চণাদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিয়াছ। শীঘ্র বল তুমি কে?" কর্ণ অভিশাপ-ভয়ে কাতর হইয়া গুরুর পদতলে পড়িল ও সে যে সুত-অধিরথের পুত্র, দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্ম মন্ত্র দিতে অস্বীকার করিলে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়াছে তাহা নিবেদন করিল। পরশুরাম বলিলেন, "তুমি ক্ষত্রিয় নও ও তোমার সেবায় যথার্থই তুষ্ট হইয়াছি বলিয়াই তোমায় ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু গুরুকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিদ্যালাভ চেষ্টাকারীর কামনা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। আর যাহা শিক্ষা করে তাহাতেও তাহার কখনও মঙ্গল প্রসব করে না; আপদ কালে এইসব বিদ্যা তাহার মনেই আসেনা। আরও 'ব্রহ্মদৈবত'

বলিয়া—নামগোত্র নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলাম বলিয়া যে সব মন্ত্রময় মহাস্ত্র দান করিয়াছি, তোমার সেই নাম গোত্র নয় বলিয়া তাহাতে কোন কার্য্যই হইবে না। আরও প্রবঞ্চনা করিয়া গুরর মনে যে আঘাত করিয়াছ, তাহার ফলে তুমি যাহার সঙ্গে সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা কর, তাহার নিকটই তোমার পরাজিত হইতে হইবে।" দুষ্টমতি কর্ণ, আবার চাটুবাক্যে গুরুকে তুষ্ট করিতে নানা বিনয় বাক্য বলিতে লাগিল! কিন্তু পরশুরাম দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "প্রবঞ্চকের স্থান তপোবন নয়, তুমি এই ক্ষণই এই বন হইতে চলিয়া যাও! তোমার মুখ আর দেখিতে চাই না।" কর্ণ দারুণ আশাভঙ্গে এবার কান্দিয়া গুরুর চরণে লোটাইয়া পড়িল। অক্লান্ত ভাবে মনোরঞ্জন করিয়া সেবা করিতে পারিলে কে তুষ্ট না হইয়া পারে! সেবায় হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক ও যে হিংসা ভুলিয়া মানবের ভৃত্য স্বরূপ হইয়া পড়ে। তাই সেবাতুষ্ট পরশুরাম কর্ণকে সান্ত্বনা করিয়া তুলিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমার সেবায় যথার্থই তুষ্ট হইয়াছিলাম, তাই বলিয়া দিতেছি, তুমি যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই তোমার যথেষ্ট হইবে, কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না, জগতে একজন শ্রেষ্ঠ মহারথ বলিয়া গণ্য হইবে। আপদ কাল বিনে ব্রহ্মাস্ত্র সমূহ কার্য্যকারী থাকিবে, এখন চলিয়া যাও।" কর্ণ এই আশীর্ব্বাদেই নিজকে কৃতার্থ ও একজন শ্রেষ্ঠ মহারথ মনে করিয়া, গর্ব্বে অভিমানে স্ফিত হইয়া, পূর্ব্বগুরু দ্রোণাচার্য্যের দর্প খর্ব্ব করিতে নিজ বাটীতে চলিয়া আসিল। কর্ণ দেবপুত্র বলিয়া যেরূপ তেজস্বী ও শক্তিধর ছিল, তাতে আবার সূর্য্যদেবের অক্ষয় কবচ কুণ্ডলের গুণে স্বভাবতই মানবের অজেয় হইয়াছিল, ইহার উপরও যদি পরশুরাম হইতে ভীষ্ম, দ্রোণের মত পূর্ণশিক্ষা প্রাপ্ত হইত ও অভিশাপ গ্রস্ত না হইত, তবে সে নিশ্চয় দ্বিতীয় অর্জ্জুন হইতে পারিত।

ভক্ত—ঈর্ষ্যাপরায়ণ কখনও পূর্ণশিক্ষা লাভ করিতে পারে না;

স্বার্থপর কি বহুদিন নিজের ভাব লুকাইয়া রাখিতে সক্ষম হয়! সকাম ঈর্ষ্যুক স্বার্থ সাধন জন্য কপটতা অবলম্বনে, অসাধারণ অক্লান্ত চেষ্টায় ঋষিরও মন তোষণ করিয়া ফেলিতে পারে! তাহারাই দৃষ্টান্ত একলব্য ও কর্ণ। কিন্তু কপটতায় পূর্ণলাভ অসম্ভব! তাহার দৃষ্টান্ত জন্য উভয়ের লাভালাভ প্রদর্শন করা হইয়াছে। পুণ্যস্থান তপোবনে, ঋষি গুরুর নিকট কে আর কতদিন অধর্ম্ম কপটতা লুকাইয়া রাখিতে পারে! কোন প্রকারে তাহা প্রকাশ হইয়া যাইবেই। তাহাই কর্ণের পূর্ণ লাভের পূর্ব্বেই তাড়িত হইতে হইল; অর্জ্জুনের মত দেব-গন্ধর্ব্ব জয় শক্তি-লাভ তাহার হইল না; আরও অভিসম্পাতের ভাগী হইল। এই অসুর প্রকৃতি ঈর্ষ্যান্বিতগণ অল্পশক্তি লাভ করিলেও গর্ব্বে, দর্পে সর্ব্বদা নিজকে সকলের নিকট শ্রেষ্ঠ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। কর্ণের জীবনেও সর্ব্বদা দেখিবে সে নিজকে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ বলী বলিয়া দর্প করিয়াছে। কর্ণের দান, আতিথেয়তা, ব্রত সমস্তই কেবল এই দর্পের দোষেই সুফল দান না করিয়া কুফল প্রসব করিয়াছে। আর অর্জ্জুন, চতুর্ব্বেদজ্ঞান, যোগ শক্তিসহ ধনুর্ব্বেদ শিখিয়া, গন্ধর্ব্ব, দৈব, ব্রহ্ম, রুদ্র, পাশুপাত পর্য্যন্ত মহাস্ত্র সকল জানিয়াও একটু গর্ব্ব করে নাই—মানবের সহিত মানব-অস্ত্রে, দেবতার সহিত দৈব-অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়াছে, ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিরোধ বিনে জীবনেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে নাই। ভীষ্ম, দ্রোণও অযোগ্যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায়, অর্জ্জুনের জীবনেই তাহা হয় নাই; তাই বলিয়াছি বাবা, অর্জ্জুন শক্তি বিনে কেহই পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া, পূর্ণ মানব হইতে পারে না। অসুর প্রকৃতিগণ জ্ঞানকাণ্ড বেদকে ত্যাগ করিয়া, কেবল কর্ম্মকাণ্ড ধনুর্ব্বেদ আদিই মনোযোগ করিয়া শুনে ও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে, তাই তাহারা নীতি-আদি জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া পরে, কিছুতেই দেবতাদের মত পূর্ণ জ্ঞান ও বীর্য্যশালী হয় না। এই স্থানেই শিক্ষা অধ্যায় শেষ করা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিচয়।

জীবলীলা সংবাদ।

এইবার বিদ্যা ও অবিদ্যা আশ্রয়ী জীবের দুই অবস্থারই জ্ঞান ও শক্তির ব্যবহার, কর্ম্মলীলা এবং লাভালাভ সংক্ষেপতঃ প্রদর্শন করা হইবে। জীবরূপ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে উভয় প্রকৃতি যেন, অস্ত মূর্ত্তি ধরিয়া রঙ্গভূমিতে যার যার লীলা কৌশল দেখাইয়া, তাহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। এই তত্ত্বই কুরুবংশীয় কুমারগণের শিক্ষা কৌশল প্রদর্শন। **অবিদ্যার স্বভাব**—ধার্ত্তরাষ্ট্রদের মধ্যে ও **বিদ্যাময় স্বভাব**—পাণ্ডবদের মধ্যে দেখান হইবে।

জীবস্বভাব—জীব প্রথমে লজ্জা, শীলতা, বিনয়াদি সদাচার পরায়ণ হইয়া, নিরহঙ্কার ভাবে, প্রয়োজনমত সামান্য সামান্য জ্ঞান ও শক্তি প্রদর্শন করে। (ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবের শিক্ষা কৌশল প্রদর্শন।)

১। **অবিদ্যার আক্রমণ**—অসুরত্বের মূলই ঈর্ষ্যা ও ধৈর্য্য-হীনতা। কর্ম্মক্ষেত্রে অপরকে কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসা ইত্যাদি লাভ করিতে দেখিলেই, নিজে পারে নাই বলিয়া জীবের মনে লজ্জার সঞ্চার হয়! অসুরত্ব সেই লজ্জাকে ঈর্ষ্যা করিয়া গঠন করে, তখন সেই গুণবানকে তাহার যশ ও কৃতিত্ব নাশকারী শত্রুবলিয়া মনে হয়। নিজেও সেইরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে, তাহাকে কৃতিত্ব দ্বারা ঢাকিয়া দিতে, অথবা তাহাকে পরাজয় করিয়াই কৃতত্ব

দেখাইতে তখন মতি হয়। এই সব আমিও জানি, ইহার অধিকও বহু জানি! নিজ মুখেই এই দর্প প্রকাশে মতি জন্মে। (এই তত্ত্বই অর্জ্জুনের কৃতিত্ব প্রশংসা লাভ দেখিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ক্লেশ হওয়া ও কর্ণ ঈর্ষ্যায় আত্মহারা হইয়া, দর্প প্রকাশ করিতে করিতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করা।)

অসুর।

অবিদ্যাগ্রস্তজীব এই ঈর্ষ্যাকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া, বুকে করিয়া গ্রহণ করে ও তাহাকে নিজের সর্ব্বপ্রকার অধিকার ও শক্তিদান করিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হয়; কর্ম্মরাজ্যে তাহাকেই প্রধান কর্ম্ম সেনাপতি করে। তখন দারুণ ঈর্ষ্যার আগুণে জীবের নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান সহিত স্নেহ, ভালবাসা ও ধৈর্য্য ভস্ম হইয়া যায়।

(দুর্য্যোধন তাহার ভ্রাতাকে আক্রমণকারী কর্ণকেও সখা বলিয়া আলিঙ্গন করিল, নিজের রাজ্য ও রাজমুকুট পর্য্যন্ত দিয়া ভ্রাতাগণ সহিত তাহার সেবায় ব্রতী হইল এবং গুরু মার্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্যে পাণ্ডব দিগকে কটু কাটব্যও বলিল।)

দেবতা।

ঈর্ষ্যার আলোড়ণে আলোড়িত হইয়াও শাস্ত্র ও সদাচারের দিকে চাহিয়া, আত্মজ্ঞানের উপদেশে ও দয়ার সাহচর্য্যে উপেক্ষা করিয়া ধৈর্য ধারণ করে। এই ধৈর্য্য ও ক্ষমাই বিদ্যারাজ্যের মূলসত্তা, অসুরত্বের বাধক শক্তি। দেবপ্রকৃতি এই দুর্জ্জয় ঈর্ষ্যাকে মহাশত্রু বলিয়া চিনিয়া রাখে ও পরাজয়ের বলসংগ্রহ করে।

(অর্জ্জুন কর্ণের, অশিষ্টতা, রাজদ্রোহিতা, বৃথাদ্বেষ ও যুদ্ধ আহ্বানকে, সদাচার ও গুরুবর্গের দিকে চাহিয়া উপেক্ষা করিল ও কর্ণকে মহাশত্রু নির্ব্বাচন করিয়া চিনিয়া রাখিল।)

২। অবিদ্যার মোহমায়া প্রকাশ—এবার জীবের স্বাভাবিক বিদ্যাপ্রীতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ও দয়ার অধীনতা এবং সত্বগুণ ও তাহার জ্ঞান, যোগ, ভক্তি আদি পঞ্চ প্রকার ধর্ম্মসাধন যুক্ততাকে, নষ্ট করিয়া ফেলিতে কৌশল অবলম্বন করে। সেই কৌশলই বিষদান ও জতুগৃহ দাহ।

বিষদান—মনরাজ্যে বিপ্লব জন্য কুযুক্তি ইত্যাদি দ্বারা **ভাবে বিষ** দান করে, আর বহিঃরাজ্যে বিপ্লবজন্য অবৈধ ভোজন দ্বারা **খাদ্যেবিষ** দান করে।

জতুগৃহ দাহ—অজ্ঞানাগ্নি জ্বলিবার দরুণ দাহ্যপদার্থ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির তৃপ্তিদ ভোগ, বিলাস, প্রভুত্ব ময় ভোগগৃহে জীবকে স্বাধীনতা লইয়া, কুসঙ্গ ও কুভৃত্য যোগে বাস করিতে দেওয়াই জতুগৃহে বাস। তাহাতে জীবের সত্বগুণ সহ ধর্ম্মসাধন যুক্ততা দগ্ধ হইয়া যায়; জীব তখন অজ্ঞানাবরিত হইয়া, শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করে।

অসুর।	দেবতা।
১। কুযুক্তি ও কুভোজনে বিষাক্ত হইয়া, জীব আত্মজ্ঞান, দয়া, শাস্ত্র ও সদাচারের মঙ্গল দান শক্তিতে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। ধর্ম্মসাধন যুক্ততা ত্যাগ করিতে চায়।	১। এই সবে বিষাক্ত হইয়া জ্ঞান হারাইয়াও সে আবার বিদ্যা-রাজ্যে ফিরিয়া আসে, বিষের অতীত হইবার শক্তি সঞ্চয় করে।
(দুর্য্যোধন, শকুনি আদির দুর্ম্মন্ত্রণা ও কুযুক্তিতে, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও কৃপের প্রতি সন্দিগ্ধ হইল এবং ভীমকে বিষ খাওয়াইয়া অজ্ঞান হইলে জলে ডুবাইয়া দিল।)	(ভীম বিষে অজ্ঞান হইয়া, শ্রোতে বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াও আবার ফিরিয়া আসিল ও অমৃত ভোজন করিয়া বিষের অতীত হইয়া বহু বিষ হজম করিয়া ফেলিল।)

২। জতুগৃহরূপ দারুণ ভোগ-গৃহের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, ভোগ-সুখকে কুসঙ্গ ও কু ভৃত্য সহিত স্বাধীনভাবে ভোগ করিয়া, জীব দেহাত্ম বুদ্ধিকে লাভ করে। তখন বিস্থারাজ্যের কেবল মনোময়, নিরাকার-আনন্দ —দয়া ও উপকার করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা হইতেও দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি, সাকার-সুখকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। সে এই সবকে লাভ করাই জীবনের সার্থকতা মনে করে।

(ধৃতরাষ্ট্র পাপমতি সন্তানদের সঙ্গে রাজ্যভোগ করিতে করিতে, ত্যাগধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া, বিষয় ভোগাসক্ত হইয়া উঠিল। রাজত্ব লাভকেই জীবনের মোক্ষ কর্ম্ম নির্ণয় করিল)

২। এই ভোগগৃহে বাস করিয়াও দেব-প্রকৃতিবান্, আত্মজ্ঞানের উপদেশে, দয়ার নির্দ্দেশে চলিয়া ও সত্বগুণ আশ্রয়ে পঞ্চপ্রকার ধর্ম্ম সাধন করিয়া, কিছুতেই ভোগাসক্ত হয় না, তাই দেহাত্মবুদ্ধিও জন্মেনা। ভোগ গৃহকে অজ্ঞানের দাহনযন্ত্র ও ভোগ প্রভুত্বকে মৃত্যুর মারণ-মায়া মনে রাখিয়া, সাকার দ্রব্যময়-সুখ হইতেও নিরাকার, জ্ঞানময় আনন্দকেই শ্রেষ্ঠ মনেই করে ও এইসব লাভেই জীবনের সার্থকতা ধরিয়া লয়।

(পাণ্ডব রাজপুরে রাজভোগ ভোগ পাইয়াও বিদুর, কৃপাচার্য্যের উপদেশে, কুন্তীদেবীর আশ্রয়ে ধর্ম্মসাধনা করায়, নিবৃত্তি ধর্ম্ম তাপস ব্রতধারী হইয়া গেল।)

৩। **অসুরত্বের স্বভাব বিকাশ**—অবিদ্যায় আবরিত-জ্ঞান জীব এইবার সামান্য বিষয় প্রভুত্ব লাভের জন্য ধর্ম্ম, দয়া, ভালবাসা সব বর্জ্জন করিয়া মহাপাপ পথেও ধাবিত হইবে। (সম্রাট পদ লাভের জন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রদল ভ্রাতা পাণ্ডবগণকে বধ করিতেই কৃতনিশ্চয় হইল।)

অসুর।	দেবতা।
১। দেহাত্ম বুদ্ধিগ্রস্ত,* ধর্ম্ম ও ভগবানে সন্দিগ্ধ-বুদ্ধি জীব, আত্মজ্ঞান ও দয়াকে দূরে রাখিয়া, স্বাধীনভাবে, প্রভুত্ব লইয়া ভোগ গৃহে বাস করিতে গেলেই, কুসঙ্গ ও কুভৃত্য প্রদত্ত অজ্ঞান অগ্নিতে, তাহার সত্বগুণ সহিত জ্ঞান যোগাদি পঞ্চ ধর্ম্ম-সাধনকে একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। তাহার আত্মজ্ঞান ও দয়ার যুক্ততাও নষ্ট হইয়া যাইবে।	১। দয়া ও আত্মজ্ঞানকে ত্যাগ না করায়, নিবৃত্তি মাতার সঙ্গে, সৎসঙ্গ ও ধর্ম্ম সাধনায়, দেবপ্রকৃতি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভোগ গৃহকেই, তাহার সকল অবিদ্যা উপাদান সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলে; তখন তাহারা জগৎকেই গৃহ প্রাপ্ত হয়।
(ধার্ত্তরাষ্ট্র দলের সত্বগুণ সহিত ধর্ম্ম সাধন যুক্ততা নষ্ট হইয়া যাওয়াই, কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া, স্বাধীন রাজা হইতে মতি হইল।)	(পাণ্ডব জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল, ও তাপসব্রত লইয়া বনে ও পরগৃহেই সুখে বাস করিতে লাগিল।)
২। অসুর অজ্ঞান অগ্নির জ্বালা ভোগস্পৃহায় অস্থির হইয়া, ধর্ম্মাধীনতা পরিত্যাগ করিল ও জ্বালার শান্তি জন্য স্বাধীনতা লইয়া, অন্ধের মত দিগভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বার বার আঘাত পাইতে লাগিল।	২। দেব-প্রকৃতি ধর্ম্ম-সাধনা যোগে, ভোগ-রাক্ষসের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, তাহাকে বধ করিয়া ফেলায়, ভোগ সুন্দরী তাহাদের দাসী হইয়া সেবাভার গ্রহণ করিল।
(ধৃতরাষ্ট্র নিজে সুখ তৃপ্তির আশায় বিদুর, কৃপাচার্য্যাদির অধীনতা ত্যাগ করিয়া নিজেই স্বাধীন চেষ্টায় ব্রতী হইল। এবং বহু দুঃখ ও অকৃত কার্য্যতার ভাগী হইল।)	(পাণ্ডব ভীষণ হিরম্ব রাক্ষসকে বধ করায় অসীম মায়াশক্তিধারিণী হিরিম্বা রাক্ষসী তাহাদের দাসী হইয়া সেবাভার গ্রহণ করিল।)

৩। অজ্ঞানাবৃত জীব স্ব স্বরূপ অসীম ব্রহ্মশক্তি—দেহী হইয়াও দেহাতীত, আমিত্বরূপ জীবত্বের গণ্ডি শূন্য, আনন্দময় অবস্থা হারাইয়া পশু আদির মত, সীমাবদ্ধ-জ্ঞান ও শক্তিশালী জীব হইয়া পরে অপ্রাকৃত জ্ঞান ও শক্তি হারা হয়।

(তাই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ স্বদেহেন্দ্রিয় চেষ্টান্বিত এবং দেবতা ও গন্ধর্ব্বাদি সহ যুদ্ধে অশক্ত ছিল।)

৩। দেবপ্রকৃতি নিবৃত্তি-ধর্ম্ম সাধনায় দেহধর্ম্ম—দেহ শ্রান্ত হইয়া পরা আদি এবং কালধর্ম্ম শীত গ্রীষ্মাদি ও রাত্রিতে নিদ্রা, দিবায় ক্ষুধাদির, আক্রমণের অতীত হইয়া যায়। তাহাদের আমি আমার সংজ্ঞা থাকেনা! তাহারা অপ্রাতহত গতিত্ব ও দেব গন্ধর্ব্ব বিজয়ী শক্তি লাভ হয়।

(অর্জ্জুন রাক্ষসী বেলায়ও গন্ধর্ব্ব জয় করিল ও মায়া-অশ্ব লাভ করিল; বিদেশে, বনেও আনন্দে বাস করিতে লাগিল।)

জীবলীলা প্রদর্শন—এবার বিদ্যা ও অবিদ্যাগ্রস্ত উভয় প্রকার মানুষের পৃথক পৃথক লীলাকর্ম্ম সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইবে।

অসুর।

অসুর আবন্ধাগ্রস্ত হইয়া, জড় বিষয় লাভকেই পরমার্থ লাভ মনে করে, শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘনই স্বাধীনতা প্রকাশ, পরপীড়নেই বীর্য্য প্রকাশ, জীব নির্য্যাতন ও বিনাশের কৌশল উদ্ভাবনই বুদ্ধির প্রকাশ, ইন্দ্রিয় দ্বারা নানা প্রকারে বিষয় ভোগ কৌশলকেই জ্ঞান প্রকাশ, অত্যাচারেই প্রভুত্বের প্রকাশ নিশ্চয় করিয়া, কায়মন বাক্যে এইসব গ্রহণেই নিযুক্ত হয়।

দেবতা।

বিদ্যা আশ্রয়ী বিষয়কেই মহা অনর্থ লাভ, সদাচার লঙ্ঘনই প্রবৃত্তির অধীনতা, পরপীড়নই দুর্ব্বলতা প্রকাশ, পরনির্য্যাতনের কৌশল উদ্ভবনাই বুদ্ধিহীনতা, ইন্দ্রিয় ভোগ কৌশল শিক্ষাই হীনবুদ্ধির বিকাশ, অত্যাচার করাই প্রকৃত দাসত্ব প্রকাশ নির্ণয় করিয়া, রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়াও ধর্ম্মসাধনে ভগবান্ কৃপালাভকে শ্রেষ্ট কর্ম্ম নির্ণয় করে এবং কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত হয়।

১। সামান্য প্রভুত্ব পদ লাভের জন্য অসুর ধর্ম্ম, দয়া ও ভালবাসা বিসর্জ্জন দিয়া, পুত্রসম আশ্রিত বালক, নির্দ্দোষ বিধবাকেও নির্দ্দয় ভাবে বধ করিতে প্রস্তুত হয়।

(রাজা পাণ্ডুর পুত্র জিবিত থাকিতে প্রজাগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে রাজা স্বীকার করিবেনা বলিয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডুপুত্রগণকে মাতার সহিত বধ করিতে মনস্থ করিল।

২। অসুর অভাবনীয় কপটতার আবরণে স্নেহ বাক্যে ভুলাইয়া নিশ্চিন্তে তাহার আশ্রয়ে নিদ্রিত আত্মীয়কেও, স্বার্থজন্য অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে।

(ধৃতরাষ্ট্র নানা স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে পাঠাইয়া, রাত্রিতে অগ্নিদান করিতে লোক নিযুক্ত করিল।)

১। দেবপ্রকৃতি প্রাণঘাতী শত্রুর প্রতিও স্ব কর্ত্তব্য সদাচার ভ্রষ্ট হয় না, দ্বেষ বা শত্রুতাও করেনা। ইহাও ভগবানেরই খেলা মনে করিয়া, ভগবান্ তোষণে ধর্ম্মসাধনায় রত হয়।

(পাণ্ডব জতুগৃহ হইতে পলাইয়া তপস্যা গ্রহণ করিল, তবু প্রতিশোধ দানের চেষ্টা করিলনা।)

২। দেবপ্রকৃতি সামান্য কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য বিপন্নকে রক্ষা করিতে, নিজেই বিপন্নের প্রতিনিধি হইয়া প্রাণ দিতে বিপদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

(ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য ভীমসেন তাহার প্রতিনিধি হইয়া রাক্ষসের নিকট গমন করিল।)

জীব জীবনের সার্থকতা প্রকাশ-এইবার উভয় প্রকৃতির কর্ম্মফলের লাভালাভ প্রদর্শিত হইবে।

অসুর।

১। অসুর ছলেবলে অধর্ম্মদ্বারা বিষয় রাজ্যের ধন, সম্পদ, বিজয়কে লাভ করিয়াই, তাহার জীবনের লক্ষ-ভেদ হইয়াছে মনে করে। তাহারা ভাবে এখন নিশ্চয় ভাগ্যলক্ষ্মী— সন্তোষদেবী তাহাকেই বরমাল্য দান করিয়া, জগতের সকল প্রকার কল্যাণ ও সুখ শান্তি দিয়া তাহার সেবা করিবে।

তখন সে বিষয়রাজ্যের মহামূল্য রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, দুর্জ্জয় অসুর বলে পরিবৃত থাকিয়া, অভি-মানের উচ্চ রাজসিংহাসনে, রাজমুকুট পরিয়া ভাগ্যদেবীর বরণের স্বপন দেখিতে থাকে।

(ধার্ত্তরাষ্ট্রদল দ্রৌপদীলাভের আশা করিয়া, মহামূল্য বেশভুষায় সাজিয়া, বহু আড়ম্বরে সৈন্যাদি লইয়া উচ্চ সিংহাসনে যাইয়া বসিযাছিল।"

দেবতা।

দেবপ্রকৃতি ধর্ম্মসাধনে আধ্যাত্মিক ধন সম্পদ, জ্ঞান বৈরাগ্যাদি লাভ করিয়া ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহেই পরম বিজয় বোধ করিয়া, জীবনের লক্ষভেদ হইয়াছে মনে করে। তাঁহারা মনেকরে নিশ্চয় ভগবানই কৃপা-করিয়া একদিন আমাদিগকে ভাগ্যলক্ষ্মী ও সুখ শান্তি দান করিবেন।

তখন তাহার বিষয় নিবৃত্ত ভগবানের দাসদের বেশে সজ্জিত হইয়া, তাহাদের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিষ্কাম ভাবে তাহাদের দলে বসিয়া থাকেন।

(পাণ্ডব দ্রৌপদীলাভের আশাও না করিয়া পবিত্র তাপস বেশে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসিয়া স্বয়ম্বর শোভা দেখিতেছিল।

২। অবিদ্যাগ্রস্ত অগ্য জীবনের শেষ সাফল্য লাভের পরীক্ষাদিনে দেখিতে পায়, ভাগ্যলক্ষ্মী লাভের লক্ষ ভেদত দূরের কথা, সেই লক্ষের সংবাদও তাহারা পায় নাই। লক্ষভেদের কি ধনু, কি ধনুর ছিলা, কি তাহার বাণ ইহার একটীও তাহারা সারাজীবনে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সেই ধনু, ছিলা ও বাণ আনিয়া তাহাদিগকে দেওয়া হইলেও, তাহারা সেই ধনু ব্যবহার করিতেই পারিলনা। কেহ ধনু তুলিতে পারিল না, কেহ ধনু তুলিয়াও ছিলা দিতে পারিল না, কেহবা ছিলা দিয়াও বাণ জোজনা করিতে পারিল না।

(দুর্য্যোধনাদি অসুর রাজাগণ প্রথমে দ্রৌপদী লাভের লক্ষই দেখিল না। পরে লক্ষভেদের চেষ্টায় যাইয়া ধনু আদি ব্যবহার করিতে পারিল না।)

২। কেহই লক্ষভেদ করিতে পারে না দেখিয়া, দেবপ্রকৃতি খেলিবার ভাবে সেই দুর্জ্জয় ধনু দেখিতে যাইয়া, অনায়াসে তাহাতে গুণাদি জোজনা করে ও মুহূর্ত্ত মধ্যে লক্ষভেদ করিয়া ফেলে।

(অর্জ্জুন দ্রৌপদী লাভজন্য নয়, কেবল কেহ পারিল না কেন দেখিতেই লক্ষভেদ করিয়া ফেলিল।)

লক্ষভেদ করিলেই ভাগ্যদেবী সেই দেবপ্রকৃতিকে বরণ করিতে অগ্রসর হয়। সে দেবীকে গ্রহণ করিতে না চাহিলেও দেবী আপনিই তাহার অজিন ও আসন গ্রহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া ভিক্ষা কুটীরেও তাহাদের সেবাভার গ্রহণ করেন।

(অর্জ্জুন লক্ষভেদ করায়, দেবী দ্রৌপদী তাহাকে বরণ করিতে গেলে, সে বরণে নিষেধ করিল! তবু দেবী তাহার পিছে পিছে যাইয়া তাহাদের সেবাভার গ্রহণ করিল।)

৩। অসুর লক্ষভেদে অসক্ত হইয়া. সন্তোষ-দেবীকে বিষয় ধন সম্পদের বিনিময়ে ক্রয়ের চেষ্টা করিল। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, এবার স্বীয় দুর্জ্জয় অসুর বলদ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে লুটীয়া লইতে উদ্যত হইল। "হয় আমাদের কাউকে বরণ কর, নচেৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিব, তবু ভিক্ষুক ব্রতী ব্রাহ্মণকে তোমায় নিতে দিব না।"

লক্ষ্মীর অবমাননায়, ভগবানের ক্রোধে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের দুর্জ্জয় বল প্রতিহত হইল। তাহারা অপ্রত্যাশিত পরাজয়, লাঞ্ছনা পাইয়া হতবল, হতশ্রী হইয়া জন্ম মৃত্যুর আলয় সংসারে ফিরিয়া আসিল।

(ধার্ত্তরাষ্ট্র লক্ষভেদে অসক্ত হইয়া, ধন রাজ্য বিনিময়ে দ্রৌপদী লাভের চেষ্টা করিল। তাতে অসক্ত হইয়া বলপূর্ব্বক লইতে যাইয়া পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেল।)

৩। অসুরের অসম্মাননা হইতে লক্ষ্মীকে রক্ষা করিতে, সামান্য অ[illegible] লইয়া অসংখ্য দুর্জ্জয় অসুরের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ায়, লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে ও ভগবানের সন্তোষে দেব প্রকৃতি সর্ব্বদিকে মঙ্গলের অধিকারী হইল; সকল দিকেই পাণ্ডবের দুর্ভাগ্য নাশ হইয়া গেল। অসুরগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, ভাগ্যলক্ষ্মী অচঞ্চল হইয়া তাহাদের গৃহবাসিনী হইলেন। ভগবান্ ও আপনি তাহাদের কুটীরে যাইয়া অভয় দিয়া সর্ব্বভার গ্রহণ করিলেন। পরে বিষয় রাজ্যে সম্রাটপদ ও আধ্যাত্মরাজ্যের রাজর্ষীপদ দিয়া তাহাদিগকে সেবা করিলেন। পরে মহাপ্রস্থানে নিজলোকে লইয়া গেলেন।

(পাণ্ডব দ্রৌপদী রক্ষায় সকল রাজাগণের বিপক্ষেও যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হইলে, ভগবৎ কৃপায়ই যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল; শ্রীকৃষ্ণ ভয় দেখাইয়া রাজাগণকে নিরস্ত করিলেন, পরে কুটীরে যাইয়া পাণ্ডবগণকে দর্শন দান করিলেন ও অভয় দান করিয়া তাহাদের সর্ব্বভার গ্রহণ করিলেন।)

জীব কর্ত্তব্য—ধৃতরাষ্ট্র উভয় প্রকৃতির লীলা কৌশল লাভালাভ দেখিয়া, দৈব ও অসুর প্রকৃতিকে যথাযোগ্য কর্ম্মক্ষেত্র বণ্টন করিয়া দিলেন। দৈবপ্রকৃতিকেই কুরুরাজ্যে কর্ম্ম স্বাধীনতা দিলেন আর অসুর প্রকৃতিকে আত্মজ্ঞান, দয়া ইত্যাদি মন্ত্রীর অধীন করিয়া দৈবপ্রকৃতিকে ও সাহায্যকারী ও রক্ষক করিয়া চলিতে নির্দ্দেশ করিলেন। (এই তত্ত্বে পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে রাজ্যবিভাগ করিয়া দেওয়া।)

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রকৃতিবর্গের কর্ম্ম-স্বরূপ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতা ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু॥

গুরু—বৎস্য! এই অধ্যায়ে, দৈব ও আসুর প্রকৃতি দ্বয়ের স্ব স্বরূপ স্বভাব ও লাভালাভের বিষয় সংক্ষেপত বর্ণনা করা হইবে। এই অধ্যায়ের কর্ম্মলীলাটুকই বিস্তৃত ভাবে পরের সপ্তদশ পর্ব্ব-অধ্যায়ে দর্শন করিবে। এই জন্যই বুঝি প্রকৃতি দ্বয়ের এই লীলাটুকুকে ঋষি আদিপর্ব্ব মধ্যেই রক্ষা করিয়াছেন। বাবা, জগতে অন্ধকার না থাকিলে, আলোককে কে চিনিত! তাই মন্দের অস্তিত্ব বই ভালর অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। এইরূপ জগতে দেবত্বের সৌন্দর্য্য ও মহত্বের বিকাশের জন্যই পাষণ্ডতাময় অসুরত্বের প্রয়োজন। হীনত্ব না হইলে মহত্বকে কে বুঝিত, দীন না থাকিলে দয়া কি করিয়া প্রকাশিত হইত, অধর্ম্ম অত্যাচার না থাকিলে,

ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, ত্যাগ, ঈশ্বর মহিমা জগতে কি করিয়া প্রকাশিত হইত। অসুর-রাজা হিরণ্যকশিপুর অমানুষ অত্যাচারেইত প্রহ্লাদের অমানুষ, ভগবৎ-ভক্তির বল ও সৃষ্টি রাজ্যে অমানুষ ভগবৎ-সত্তার বিকাশ জগতবাসী দেখিতে পারিয়াছিল। আজ মহাভারতেও দেখিতে পাইবে প্রথমে দুর্য্যোধনের দলে অসুরত্ব বিকাশ আরম্ভ করিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের মধ্যে দেবশক্তি বীর্য্যের ক্রিয়া প্রদর্শন আরম্ভ হইবে। অসুর প্রকৃতিগুলি, কেমনে কি জন্য দেবপ্রকৃতিগুলির বিপক্ষ হইয়া, তাহাদিগকে শুধুশুধি পীড়ন আরম্ভ করে, এবং সেই পীড়ন দ্বারা—প্রস্থর মিশ্রিত স্বর্ণকে খনি হইতে তুলিয়া, পোড়াইয়া পিটাইয়া শুদ্ধ স্বর্ণ করিয়া জগতে পরিচিত করার মত, কেমন দেবপ্রকৃতির পূর্ণত্ব লাভের সহায়তা করে তাহাই প্রদর্শিত হইবে। শিক্ষা অধ্যায়ের পরে লীলার মধ্যে এখন ক্রমে এই সবই প্রদর্শিত হইবে।

লীলা। মহাভারতে বর্ণিত আছে কর্ণ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিতে পাইল, কৌরবদের বিদ্যা শিক্ষারও শেষ হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সেই শিক্ষা কৌশল প্রদর্শনের জন্য, সুন্দর রঙ্গস্থল নির্ম্মিত হইয়া, রাজ্যবাসী প্রধানগণকে আহ্বান করিয়া, রাজকুমারগণের যুদ্ধ শক্তি ও কৌশল প্রদর্শন হইতেছে। রঙ্গস্থলে, বিদ্যা ও কৌশল প্রদর্শনে পাণ্ডবগণই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ হইতে অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। বিশেষ অর্জ্জুন শিক্ষা কৌশলে, চাতুর্য্যে, হস্ত লাঘবতায় সকলকে অতিক্রম করিয়া, অমানুষী শিক্ষা প্রদর্শন করিল। সভাস্থ সকলে অর্জ্জুনের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল, তাহার কৃতিত্বে গুরু দ্রোণও নিজকে কৃতার্থ বোধ করিয়া অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু কর্ণ অর্জ্জুনের যশ ও কৃতিত্বকে আর সহ্য করিতে পারিল না। গুরুর উপরে ক্রোধ ছিল, তাই অদ্য গুরু দ্রোণকে সাধারণের নিকট অপদস্ত করিবার জন্য, তাহার প্রধান শিষ্য হইতেও

সে অধিক শিক্ষা কৌশল শিখিয়াছে, তাহা দেখাইতে মনস্থ করিল। সে ঈর্ষ্যায় আত্মহারা হইয়া স্থান, কাল, পাত্র জ্ঞান ভুলিয়া গেল। কেহ না ডাকিতেই ভীষণ দর্পভরে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞা দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "অর্জ্জুন আর কি কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে! সে কিই বা অস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছে! এই গুলিত আমি খেলিতে খেলিতে দেখাইতে পারি! এর উপরেও আমি কত জানি।" এই বলিয়া অর্জ্জুন যা যা লক্ষ ভেদাদি করিয়াছিল, সে দর্পভরে সবগুলি ভেদ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুনের সলজ্জ, নিরভিমান অস্ত্র কৌশল প্রদর্শন, আর কর্ণের সদর্প সাহঙ্কার কৌশল প্রদর্শন, তাই সকলে কর্ণকেই অর্জ্জুন হইতে অনেক বড় মহাবীর বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। দর্পান্ধ কর্ণ কেবল এই ধৃষ্টতা দেখাইয়াই নিরস্ত হইল না, অর্জ্জুনকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বসিল। বলিল "অর্জ্জুন আর কি শিখিয়াছে! তাহাকে আমি আমার শত অংশের এক অংশও মনে করি না। আমি তাহাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।" দ্রোণাচার্য্য যে কর্ণকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিল, অদ্য তাঁহার অতিপ্রিয় প্রধান শিষ্যকে তাঁহার সম্মুখে বধ করিয়া, সে সেই প্রত্যাখ্যাণের প্রতিশোধ লইবে। কর্ম্মচারীর পুত্র হইয়া প্রভু পুত্রকে, দেশের রাজার পুত্রকে যুদ্ধ আহ্বান যে রাজদ্রোহ পাপ হয় তাহাও সে বিস্মৃত হইয়া গেল! কর্ণের অনধিকারচর্চ্চা, দম্ভ, অহঙ্কার ও ধৃষ্টতা দেখিয়া ভীষ্মাদি সকলেই নিতান্ত ত্যক্ত হইয়াছিলেন, এখন যুদ্ধে আহ্বানে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অর্জ্জুন ও অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিল। চারি পাণ্ডব, কৃপ, দ্রোণ, ভীষ্ম অর্জ্জুনকে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন ভ্রাতাগণ সহিত তাহাতে যোগদান করিল না! দুর্য্যোধন অদ্য রঙ্গস্থলে পাণ্ডবের বীর্য্য কৌশল যশ ও লোকপ্রীতি দেখিয়া, মনে আঘাত পাইয়াছে, সেও অদ্য

পাণ্ডব বিপক্ষতার শক্তিই সন্ধান করিতেছিল! হঠাৎ কর্ণের আবির্ভাব ও শক্তি-কৌশল প্রদর্শন করিয়া সে পাণ্ডব ধ্বংসে চেষ্টিত হওয়ায়, তাহারও এই দলে যোগ দিতেই ইচ্ছা হইতেছিল! তাই সে পাণ্ডব পক্ষে যোগ না দিয়া, দূরে দাড়াইয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে লাগিল। নীতিবিদ্ ভীষ্মদেব কর্ণকে বলিলেন, "হে বীর! তুমি কৌরব কুমারকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছ, কৌরব কুমারও নিশ্চয় তোমার সে বাসনা পূর্ণ করিবে। কিন্তু রাজকুমারত যার তার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করে না, তুমি কোন্ দেশের রাজকুমার সেই বিষয়ের পরিচয় দেও! পরে আমরা দ্বৈরথ যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দেই।" এতক্ষণে কর্ণের দেশ, কাল, পাত্র ও অধিকারের কথা মনে পড়িল, এবং যুদ্ধ আহ্বানটী যে ভাল হয় নাই তাহাও বুঝিয়া লজ্জায় মাথা নীচ হইয়া আসিল। পরিচয় দিতে লজ্জিত ও মুখ মলিন দেখিয়া, এই কালে ইহার কোনও উপকার করিলে নিশ্চয় সে তাহার অনুগত হইয়া থাকিবে বুঝিয়া, যাহাতে তাহার লজ্জার কারণ পরিচয় বৃত্তান্ত না বলিয়াও সে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, দুর্য্যোধন তাহাই করিতে ধাবিত হইল। দুর্য্যোধনও ঈর্ষ্যায় দেশ, কাল, পাত্র বিচার ভুলিয়া গেল! তাহার পিতা তাহাকে অঙ্গ নামক রাজ্যের কর্তৃত্বভার দান করিয়াছিল, সেই রাজ্য তাহার দানের কোনও অধিকারই ছিলনা, তবু সে অগ্রসর হইয়া কর্ণকে সখা বলিয়া আলিঙ্গন করিল ও সর্ব্ব সমক্ষে নিজের মুকুট তাহার মস্তকে পরাইয়া দিয়া বলিল, "অদ্য হইতে তুমি আমার অঙ্গদেশের রাজা হইলে সখা! তুমি অঙ্গদেশের রাজা পরিচয়ে নিজ পরিচয় দান করিয়া, অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ কর।" এইকালে অযাচিত ভাবে দুর্যোধনের এইরূপ সহায়তা পাইয়া,কর্ণও আনন্দে তাহাকে অভিনন্দন করিল। সেই সময় কর্ণের পিতা বৃদ্ধ-অধিরথ পুত্রকে রাজা হইতে দেখিয়া, আনন্দে দিশাহারা হইল ও সে লোক ঠেলিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

পিতাকে দেখিয়া কর্ণও তাহাকে প্রণাম করিল, তখন ভীষ্মাদি তাহাকে কর্ণ বলিয়া চিনিতে পারিল। ভীমও চিনিয়া হাসিয়া বলিল, "কর্ণ আমাদের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করতে আসিয়াছিল! যা রথশালায় যাইয়া রথের সজ্জা কর।" দুর্য্যোধন এই বাক্য শুনিয়া সেই গুরুবর্গের মধ্যেই চোখ রাঙ্গাইয়া বলিয়া উঠিল, "কর্ণ আমার সখা, আর অঙ্গদেশের রাজা! এখন আর তোমাদের রথশালার কর্ম্মচারীর পুত্র নয়; ইহাকে সম্মান করিয়া কথা না বলিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে না!" অদ্য দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া, প্রকাশ্যে পাণ্ডব বিপক্ষতায় ব্রতী হইল। তাহার আশা হইল, পাণ্ডব যে তাহাকে শক্তি, বীর্য্যে, অধিকারে সর্ব্বদিকে পরাজিত করিয়া নগণ্য করিয়া ফেলিতেছে! এই মহাবীর কর্ণের বীর্য্য শক্তির আশ্রয়ে, সে আবার জগতে সেই সব অধিকার লাভ করিয়া যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হইবে।

ভক্ত—ঈর্ষ্যার পূর্ণ স্বরূপ এই কর্ণের মধ্যে দেখান হইল বাবা! ঈর্ষ্যা-পরায়ণ দয়ার দানে তুষ্ট থাকে না, তাই কৃপাচার্য্যের প্রতি কর্ণ তুষ্ট ছিলেন না; তাই তাঁহার নীতি আদিও তিনি শিক্ষা করে নাই। কর্ণ লোভ-দ্রোণাচার্য্যের শক্তির আশ্রয়ে, লাভের আশায়, নাম জাতি লুকাইয়া, অসাধারণ চেষ্টা ও পর সেবা করিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিল। এর পরে ক্রোধের আশ্রয়ে এই ঈর্ষ্যা, দর্প, অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া, নিজের মুখেই নিজের গুণ বলিতে লাগিল! সদাচার শীলতা লঙ্ঘন করিয়া, অনধিকারে প্রবেশ করিয়া গুরুবর্গের অমর্য্যাদা করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল! এর পর ঈর্ষ্যা হননইচ্ছা—হিংসায় পরিণত হইয়া মহৎকে নষ্ট করিয়াই নিজে বড় হইতে প্রবৃত্তি দিল। ঈর্ষ্যার এই স্বরূপই অস্ত্র রঙ্গস্থলে কর্ণের প্রবেশ, দর্প প্রকাশ ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধ আহ্বান দ্বারা দেখান হইল। ক্রোধ যুক্ত ঈর্ষ্যার এই পর্য্যন্তই অধিকার, এর পর হিংসা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শকুনিমামা যুক্ততায় কুটপথে হিংসা তৃপ্তির

জন্য কি কর্ম্ম গ্রহণ করে, পর লীলায় দর্শন করিবে। এই দারুণ ঈর্ষ্যাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, নিজের অধিকার তাহাকে দান করিলে জীবের কি অবস্থা হয়, দুর্য্যোধনের জীবন দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইল। কর্ণকে আশ্রয় দিয়া তাই আজ দুর্য্যোধন সদাচার ভ্রষ্ট হইল। দেশ, কাল, পাত্র বিচার রহিত হইয়া গুরুমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিল! অনধিকার চর্চ্চা ধৃষ্টতা দেখাইয়া, ভ্রাতৃ-দ্রোহী হইয়া দর্প ও অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া বসিল! কেবল তাহা নয়, ঈর্ষ্যার শেষ দোষ পাণ্ডব হিংসা—তাহাদের নাশ চেষ্টায়ও ব্রতী হইল; এখন সেই লীলাই শ্রবণ করিবে।

লীলা—দুর্য্যোধনের এই ধৃষ্টতা, পাণ্ডব দ্বেষ ও গুরু মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কর্ণকে হঠাৎ রাজ্য দান দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রও সুখী হন নাই, আর ভীষ্ম, বিদুর, কৃপাদিত বিরক্ত ও দুঃখিতই হইলেন। রাজবংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দুর্য্যোধনের অনধিকারের দানকেও তাহারা স্বীকার করিয়া লইলেন; কর্ণ অঙ্গরাজ্যের যথার্থই রাজা হইল। এইবার দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে তাহার অধীন করিয়া রাখিতে মনস্থ করিল। তাহার পিতাই বর্ত্তমানে রাজা, সেই এই রাজ্যের অধিকারী হইবে নিশ্চয় করিয়া, পাণ্ডবদের উপর প্রভুত্ব ও তুচ্ছতাচ্ছল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মরাজ জ্ঞান-প্রযুক্ত সবই সহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ছোট ভাই বলিয়া দুর্য্যোধনকে সর্ব্বদাই মান্য করিত, কিন্তু প্রায় সমবয়স্ক ভীষণ বলশালী ভীম উগ্রযোগীস্বভাব প্রযুক্ত, দুর্য্যোধনের অন্যায় সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; তিনি একা শত ভাইকে নিগ্রহ করিয়াও নিজের প্রভুত্ব ও সম্মান গ্রহণ করিতেন। এইজন্য দুর্য্যোধন এই ভীমকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। বন বিহারের নাম করিয়া পিতাদ্বারা গঙ্গাতীরে জল স্থল ব্যাপিয়া সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া, ভ্রাতাগণও পাণ্ডবগণ সহিত তথায় বিহার করিতে গেল। তথায় যাইয়া কতদিন বহু বিহার ও ভোজন সুখে

কাটাইয়া, একদিন একা ভীমকে ভুলাইয়া জলগৃহে লইয়া গেল ও নানাপ্রকার দ্রব্য খাওয়াইয়া দিতে দিতে, তীব্র বিষযুক্ত মোদক নিজহস্তে তাহাকে ভোজন করাইয়া দিল। বিষের ক্রিয়ায় ভীম জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলে, হস্তপদ রজ্জুদ্বারা বান্ধিয়া তাহাকে গঙ্গাস্রোতে ঠেলিয়া দিল ও নিজে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইল। যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা ভাইদিগকে চোখে চোখে রাখিতেন, কেবল বলশালী ও দুর্জ্জয় বলিয়া ভীমের দিকে তত চাহিতেন না। তিনি যে দুর্য্যোধনকে সন্দেহ করেন এই কথা সরল ভীমকে বলিলে, সে বা কিছু অনর্থ করিয়া বসে, তাই তাহাও বলেন নাই। আজ অনেক্ষণ ভীমকে না দেখিয়া তিনি তাহার সন্ধানে ব্রতী হইলেন ও সেস্থানে কোথাও তাহাকে না পাইয়া বিশেষ চিন্তিতও হইলেন। পরে ভাবিলেন হয়ত কোন কারণে বিরক্ত হইয়া সে মায়ের কাছে চলিয়া গিয়াছে! তাই অর্জ্জুনাদিকে লইয়া দ্রুত মায়ের নিকট আসিয়া ভীমের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা সমস্ত শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেও গোল করিতে নিষেধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বিদুরকে আনয়ন করিলেন ও ভীমের বিষয় জানাইলেন। বিদুর বলিলেন, "ব্যাসদেব বলিয়াছেন পাণ্ডবেরা প্রত্যেকে দীর্ঘায়ু হইবে, আর তাহারা প্রত্যেকে ধর্ম্মাচারী, তাহাদের অকাল মৃত্যু কিছুতেই সম্ভবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তার সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিতেছি। আপনারা ভীমের অভাব কাহাকেও জানিতে দিবেন না।" এদিকে বিদুরের কথাই সত্য হইল, চারিদিন পর ভীমসেন সুস্থ শরীরে আরও তেজস্বী ও বলবান হইয়া ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দুর্য্যোধনের কুকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতেই উদ্যত হইল। কিন্তু বিদুর, মাতা ও যুধিষ্ঠির তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল। আরও একবার ভোজন-দ্রব্যে তীব্র বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল, দুর্য্যোধনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুযুৎসু তাহা প্রকাশ করিয়া

দেয়; ভীম হাসিতে হাসিতে তাহা খাইয়া, যোগবলে বিষ হজম করিয়া ফেলিল। পাণ্ডব বিপক্ষে এই সব গুপ্তআক্রমণ নাশ করিবার জন্য বিদুর, ভীষ্ম ও কৃপ গোপনে পরামর্শ করিয়া উপায় নির্ণয় করিলেন। একদিন রাজ সভায় সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,"পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র এখন উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা উচিত! সে বৰ্ত্তমানে কুরুবংশের সকলের জ্যেষ্ঠ ও গুণেও সকলের শ্রেষ্ঠ! সকলেই যাতে তাহার অধীন হইয়া থাকিতে শিক্ষা করে, এখন হইতেই সেই শিক্ষাদানের প্রয়োজন।" ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন; মহাসমারোহে ধর্ম্মরাজের অভিষেক হইয়া গেল। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের রাজকার্য্যের সাহায্যকারী হইলেন। ভীম, ভ্রাতাদ্বয় ও অর্জ্জুনের সহিত রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলায় ব্রতী হইল—বহুদেশ জয় করিয়া রাজ্য বৰ্দ্ধন করিল, অবাধ্য রাজগণকেও পরাজয় করিয়া বাধ্য করিয়া দিল। বিদুর ভাবিয়াছিল, দুর্য্যোধন নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিলে—পাণ্ডবেরাই যে রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী তাহা বোধ করিতে পারিলে,তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ ও নির্য্যাতন চেষ্টা ছাড়িয়া মিশিয়া থাকিবে। কিন্তু অবিদ্যা মায়াগ্রস্ত, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ও কুটীলতা আশ্রয়ীর তাহা হইবে কেন? সে অন্তঃপুরে মাতা পিতার মনে ভীষণ অনর্থ জাগাইয়া তুলিল। ভোগ, বিলাস, আহার পরিত্যাগ করিয়া, কেন দাসত্ব করিবার জন্য তাহাদিগকে এত ভোগ সুখ দিয়া প্রতিপালন করা হইয়াছিল, বলিয়া পিতামাতাকে অনুযোগ দিতে লাগিল। পাণ্ডব কি করিয়া এ রাজ্যের অধিকারী! পাণ্ডু জ্যেষ্ঠের অধিকার হরণ করিয়াছিল। তাহারাই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী, ইত্যাদি নানা কুট তর্ক দ্বারা পুত্র বৎসল মাতা-পিতার মন বিচলিত করিয়া তুলিল। ধৃতরাষ্ট্রের মন বিদুর ভীষ্ম, কৃপআদির সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি অবিশ্বাসী ও সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল! তবু ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম বিদুরাদিকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইল না, গোপনে শালক শকুনির দল আহ্বান করিয়া, সকলের অজানত ভাবে পাণ্ডবকুলকেই

সমূলে ধ্বংস করিতে পরামর্শ করিল। কৌশলে কোন্ দূরদেশে পাঠাইয়া, তথায় ঘুমের মধ্যে অগ্নি দ্বারা মাতার সহিত পঞ্চপাণ্ডবকেই ভস্মীভূত করিতে বুদ্ধি করিল। বারণাবত নগরে, গোপনে ভিতরে দারুণ দাহ্যপদার্থ রাখিয়া, উপরে সুন্দর সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করাইল ও কুকার্য্যে দক্ষ বিশ্বাসী অনুচর ও সৈন্য নিযুক্ত করিল। পরে রাজ সভাতে ক্রমান্বয়ে রাত দিন ধরিয়া বারণাবতের সৌন্দর্য্য সুখ, তথাকার তীর্থ ও বৃহৎ শিব-মেলার প্রশংসা চলিতে লাগিল। তার পরে একদিন যুধিষ্ঠিরকে মাতা ও ভ্রাতাগণ সহিত বারণাবতের তীর্থ ও মেলা দেখিয়া আসিতে বলা হইল। কেবল বলা নয়, যুধিষ্ঠির তীর্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, যাত্রার আয়োজন করিয়া একরূপ বলপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ভীষ্ম, কৃপ এই কুটীলতা ভেদ করিতে না পারিলেও মহাজ্ঞানী বিদুর সন্দেহ না করিয়া পারিলেন না। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে না যাইয়া উপায় না দেখিয়া, ম্লেচ্ছ ভাষায় (ইংরাজী ভাষায়) বিদেশে শত্রু গৃহে বাসকালের কতিপয় নীতির কথা বলিয়া দিলেন। ১। যাহারা গর্ত্তে বাস করে, তাহাদের অগ্নিভয় থাকে না। ২। যাহারা শত্রুদত্ত ভোগ বিলাস ভোগ না করে, তাহাদের বিষের ভয় থাকে না। ৩। যাহারা কোন স্থানে যাইয়া অনলস হইয়া ভ্রমণাদি করে, তাহারা আপদ কালেও পথ নির্ণয় করিতে পারে। ৪। যাহারা আকাশের তারকা দেখিয়া দিক নির্ণয় ঠিক করিয়া রাখে, তাহারা বনেও দিক-ভ্রান্ত হয় না। ৫। যাহারা রাত্রিতে সাবধানে নিদ্রা যায়, তাহারা নিদ্রা মধ্যে হঠাৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না। পাণ্ডবগণ বিদুরের এই উপদেশ রক্ষা করায় ও বিদুরের গুপ্তচরগণের সহায়তায়, জতুগৃহ দাহ হইতে রক্ষা পাইয়া, মৃত্তিকা নিম্নস্থ পথের সহায়তায় বনে পলায়ন করেন ও তথা হইতে বিদুর প্রেরিত যন্ত্র-চালিত মন-মারুতগামী জলজানের সহায়তায় দূরদেশে পলাইয়া, ভিখারী

ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জীবন কাটাইতে থাকেন। এদিকে রাজপুরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলেই তাহার গন্ধে বারণাবতবাসিগণ তাহা জতুগৃহ বলিয়া বুঝিতে পারিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই অধিবাসিগণ সহিত পুরী একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল; কেহ তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেও সক্ষম হইল না। তখন তাহারা বুঝিল, রাজ্যলাভ জন্যই এই জতুগৃহ দ্বারা কৌশলে মাতা সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করিতে ধৃতরাষ্ট্র এস্থানে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল; তাহাদের পাপ অভীষ্ট সুন্দররূপেই পূর্ণ হইয়াছে! দেশবাসী সকলের প্রিয় রাজপুত্র-গণকে হত্যা করিয়া, পাষণ্ডগণ সেই হত্যার ভার বারণাবতবাসী প্রজাগণের স্কন্ধেই তুলিয়া দিয়াছে। বারণাবতবাসী ক্রোধে দুঃখে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় যাইয়া জতুগৃহে পাণ্ডব নিধন সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং এই হত্যা যে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছায়ই সম্পন্ন হইয়াছে, দাহ্য পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত গৃহ দ্বারাই তাহা বুঝা যায় ইত্যাদি বলিয়া, তাঁহাকে সভা মধ্যে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পাণ্ডবদের মৃত্যু সংবাদে কপট শোক প্রকাশ ও মূর্চ্ছাদির ভান করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন আদি হত্যা অপরাধ বারণাবতবাসীর ও রাজকর্ম্মচারীদের উপর ফেলিল ও তাহাদিগকে নিশ্চয় এইজন্য আদর্শ শাস্তি দান করিবে ইত্যাদি বলিয়া, আড়ম্বর সহিত শোক প্রকাশ ও বিরাট ভাবে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। নানা যুক্তি দিয়া হত্যাপরাধ অপনোদনের চেষ্টা করিল ও পাণ্ডব মরিয়াছে ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া, রাজ্যোধিকারের দর্প ও প্রভুত্ব ব্যবহারে ভোগবিলাসে মন সংযোগ করিল।

ভক্ত—বাবা! এই লীলাটুক জীবের মনোরাজ্যের একটী সুন্দর জীবন্ত স্বরূপ। আজ জীবকে কর্ম্মশীল করিবার জন্য, একদিকে বিদ্যা—তাঁর আত্মজ্ঞান, দয়া, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি আদি সহিত ব্রহ্মের সঙ্কল্পতৃপ্তি পথে লইতে চেষ্টা করিতেছে। অন্যদিকে অবিদ্যা—তার জীবত্বজ্ঞান বিষয়লোভ, দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি লইয়া, ভগবানে অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, কুটীলতা সহিত ব্রহ্মের বিকল্প তৃপ্তিপথে

লইতে চেষ্টা করিতেছে। দৈবপক্ষ দেহেন্দ্রিয়ের ক্লেশকর অবোধ্য, কেবল আত্মানন্দ, বোধময় নিরাকার তৃপ্তি লইয়া শান্ত ভাবে দাড়াইয়া আছে! আর অসুর পক্ষ দেহ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর, তাহাদের আস্বাদের আনন্দ, সাকার দ্রব্যাদি লইয়া, নানা মোহকর ভাষা প্রয়োগে, হাবভাবময় চেষ্টা দ্বারা তাহার দিকে লইতে চেষ্টা করিতেছে। বাবা, এই দুই পক্ষকেই সুমতি ও কুমতি বলিয়া থাকে। সু=সৎ, আত্মার সুখ লাভেচ্ছায় মতি, তাহাই সুমতি। কু=পৃথিবী, পার্থিব সুখ লাভেচ্ছার যে মতি, এই বিষয় সুখ ইচ্ছাই কুমতি। এই সুমতিই ভ্রাতা বিদুর, আর কুমতি পুত্র দুর্য্যোধন। কুমতি ঠিক এই দুর্য্যোধনের মতই কান্দিয়া কাটিয়া, আখট করিয়া, পাষণ্ড যুক্তিআদি দ্বারা জীবকে ভগবানে, ধর্ম্মে, শাস্ত্র সদাচারে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসী করিয়া বিষয় সুখে লুব্ধ করিবে এবং ঈর্ষ্যা, হিংসা, ক্রোধ, কুটীলতা আশ্রয়ে শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করাইয়া, দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিপথে টানিয়া লইবে। জীবকে কুমতিতে অধিকার করিবার কৌশলটী এই লীলার মধ্যে জীবন্ত ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। বাবা! এই দুর্য্যোধনটীই বিষয় রাজ্যের মূল প্রধানসত্ত্বা, জীবোহহং—আমি জীব এই অহঙ্কারসত্ত্বা। তাই ইহার জন্মমাত্রই বিদুর ও ঋষিগণ ইহাকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন; নচেৎ এই পুত্র হইতে সর্ব্বকুল ধ্বংস হইবে এই ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। সত্যই বাবা এই দুর্য্যোধন বৃত্তিকে নষ্ট করিতে বা ত্যাগ করিতে পারিলেই, জীবের অসুর হইবার ভয় আর থাকে না। দুর্য্যোধন জন্মিয়াই অমানুষ গর্দ্দভের মত চীৎকার করিয়াছিল— সত্যই এই শক্তি পশুত্বের দিকেই জীবকে চালিত করে, তার বাক্যযুক্তি সমস্তই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্থাৎ দেবত্বের বিপরীত। এই সত্বার মূলই ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানে অবিশ্বাস করিয়া, তাহাতে নির্ভর ছাড়িয়া আত্মচেষ্টায় সুখ অন্বেষণে ব্রতী হওয়া। লোভ, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ ও কুটীলতা এই সত্তার অস্থি মজ্জা! তাই এই চারি সত্ত্বায়ই ইহার জন্ম, পালন, শিক্ষা, কর্ম্ম ও মৃত্যু পর্য্যন্ত

দেখিতে পাইবে। গান্ধারীদেবী রাজ্য লোভে, পাণ্ডুর রাজ্য প্রাপ্তিতে ঈর্ষ্যা করিয়া সন্তান চেষ্টায়, ব্যাসদেবের বরে ইহাকে গর্ভে ধারণ করেন! যুধিষ্ঠিরের জন্ম শুনিয়া, হিংসা, ক্রোধে গর্ভে আঘাত করিয়া ইহাকে পাতিত করেন! আবার লোভ, ঈর্ষ্যা, কুটীলতা লইয়া ইহাদিগকে শৈশবে পালন করেন! শিক্ষাকালেও সে রাজ্য-লোভী গুরু-দ্রোণ, ঈর্ষ্যুক কর্ণ, ক্রোধী অশ্বত্থামা, কপটী শকুনির সঙ্গই গ্রহণ করে! এখন কর্ম্মকালেও তাই সে জীবের সম্মুখে রাজ্যলোভকে ধরিয়া, আত্মচেষ্টায় লাভ করিবার জন্য ঈর্ষ্যা, ক্রোধ ও কপটতার সাহায্য লইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভগবানে নির্ভরতার বিপক্ষে, শাস্ত্র ও সদাচারের বিপক্ষে নানা দোষ, পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া, তাহাতে হীনতা প্রতিপাদন করিতে লাগিল। বিষ দান ও দারুণ জতুগৃহ রচনা করিয়া, দৈব কর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া, বিবেক, দয়া আদিকে নিজের অধীন করিয়া রাখিতে মতি দিতে লাগিল। যোগজ্ঞান—অমানুষ জ্ঞান ও শক্তিরূপ ভীমসেনকে বিকৃত বা নষ্ট করিবার জন্য বার বার বিষ ভক্ষণ করাইতে লাগিল। জীব ইহার কথা না শুনিলে, দৈবশক্তি প্রভাবে বিষ হজম করিয়া ও জতুগৃহকে দগ্ধ করিয়া, জগতে অতুলকীর্ত্তি ও সুখ সম্পদের অধিকারী হয়। আর ইহার যুক্তি পরামর্শ শুনিলে, পাণ্ডব প্রদত্ত অগ্নিতে পুরোচনের মৃত্যুর মত, জীব চিরজীবন ধরিয়া জ্বলিয়া মরিবে, বিষ ভক্ষণের জ্বালা চিরজীবন ভোগ করিবে। এই অধ্যায়ে এই দুই বিষয়ই পাশাপাশী করিয়া দেখান হইতেছে। জীব অন্ধত্ব প্রযুক্ত স্বভাবতঃই দুর্য্যোধনের পক্ষপাতী হইয়া উঠে, বিষ খাওয়ান ও জতুগৃহ রচনার সহায়তা করিতে থাকে; এই বিষয় এই প্রথম লীলা দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইল। জীব কেমনে অবিদ্যা মায়ার অধীন হইয়া নিজে যে আত্মার প্রতিনিধি মাত্র, তাহা বিস্মৃত হয়। আত্মার দেওয়া স্বভাবমন্ত্রী গুরুশক্তি—বিবেককে ও কর্ম্ম-সেনাপতি—দয়াকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবত্ব গ্রহণ

করিয়া বসে! তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন-অধীন হইয়া পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করা ও পাণ্ডবহীন নূতন রাজত্ব স্থাপন করা। ধার্ত্তরাষ্ট্র ক্রিয়া দ্বারা জীবের বন্ধন-রহস্য দেখাইয়া, পাণ্ডবের ক্রিয়া দ্বারা দৈব-প্রকৃতিবর্গ কেমনে দুর্য্যোধন দেওয়া বিষ ও জতুগৃহ হইতে রক্ষা পায় এবং দেবত্ব আশ্রয়ে তাহারা কি লাভ করে তাহাই প্রদর্শন করা হইবে। এখন বিষদান ও জতুগৃহ রহস্য শ্রবণ কর।

বিষ দান তত্ত্ব—দুর্য্যোধন কেবল ভীমসেনকেই বিষ ভোজন করাইয়াছিল! তাহাকে বিষ ভোজন করাইতেও মাতা কুন্তী, দাদা ধর্ম্মরাজ ও ভ্রাতা অর্জ্জুনাদি হইতে দূরে নিয়া ভোজন করাইয়াছিল। বাবা, যোগ শক্তিকে অসুরত্বে লইবার চেষ্টাই এই বিষদান! যোগীর অমানুষ সিদ্ধাই শক্তিকে সত্বগুণ মাতা, জ্ঞান দাদা, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ ভ্রাতা হইতে বিচ্যুত করিয়া দিতে পারিলেই যোগী মরিয়া, দেবত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মযোগ ভ্রষ্ট হইয়া যায়; তখন সে ভীষণ অসুর হইয়া সে জগতে বিচরণ করিতে থাকে। হিরণ্যকশিপু, রাবণাদি অসুরগণ যোগাদি সাধনে সিদ্ধ হইয়া, এই সত্বগুণ, জ্ঞান,ভক্তিআদি হারাইয়াই ভীষণ অসুর হইয়া ত্রিজগতের উৎপাত হইয়াছিল! অসুরত্ব আত্মজ্ঞানীদিগকে উন্মাদপ্রলাপী ও ভক্তকে হীনবীর্য্য মনে করে, তাই দুর্য্যেধন ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনকে উপেক্ষা করিয়াছে। সে যে শুধু যোগীর অসীম শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, তাহা দ্বারা জীবত্বের ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া লইতে চায়, তাই ভীমকেই সে বার বার আক্রমণ করিয়াছে। ভীমের বিষে অজ্ঞান হইয়া, তাহা হজম করিয়া আরও বলশালী হইয়া ফিরিবার রহস্যটুকু এখন শ্রবণ কর।

লীলা—ভীম, দুর্য্যোধনের চক্রান্তে তাহার সঙ্গে নির্জ্জনে যাইলে, নানা খাদ্যের সঙ্গে তাহাকে বিষ ভোজন করাইল ও অজ্ঞান হইলে তাহাকে বান্ধিয়া জলে ফেলিয়া দিল। ভীম গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া নাগলোকে যাইয়া

পড়িল ও তথায় নাগ দংশনে তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইল; জঙ্গম বিষ ক্রিয়ায় স্থাবর বিষ নষ্ট হইয়া গেল। তখন সে নিজের হস্তপদ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, নাগেরাই বুঝি তাহাকে বান্ধিয়া আনিয়াছে মনে করিল ও নাগকুল সংহারে প্রবৃত্ত হইল। নাগকুল যুদ্ধে পরাস্ত হইলে নাগরাজ তাহার পরিচয় পাইয়া আদর করিয়া নিজ পুরে লইয়া গেলেন ও তাহাকে অমৃত ভোজন করাইয়া বিষের অমর করিয়া দিলেন। অমৃত ভোজন করিয়া এক নিদ্রায়ই তাহার তিন রাত্রি কাটিয়া গেল, তাই ভীমসেন চতুর্থ দিনে রাজধানীতে ফিরিয়া মাতা ও ভ্রাতা সহ মিলিত হইল।

তত্ত্ব—যোগী যদি সর্ব্বপ্রকারে গুণ ক্রিয়ার অতীত সমাধি অবস্থা লাভ না করে, তবে তাহার যোগ সিদ্ধিই হয় না। সত্বগুণ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মযোগ যুক্ত হইয়া চলিলে, যোগীর সমাধি সিদ্ধি জনিত অমৃত ভোজন করিয়া বিষয়-বিষের অতীত অবস্থা লাভ হয় না। সমাধি অবস্থা দ্বিবিধ, ব্রহ্ম-সমাধি—ব্রহ্মেরসত্ত্বা রূপ গুণাদি ধ্যানে সমাধি; আর নাড়ী-চক্রভেদ সমাধি—ষট-চক্রাদি ধারণায় সমাধি। এই নাড়ী-চক্রভেদ-সমাধি যোগে জীব সহস্রার মস্তিষ্কে যাইয়া অমৃত ভোজন করিতে পারিলে,সর্ব্বপ্রকারে জড়-জগতের অতীত হইয়া যায়! অনিমা, লঘিমাআদি অষ্ট সিদ্ধির অধিকারী হইয়া, বিষ, অগ্নি আদির অতীত অসীম শক্তি বীর্য্য লাভ করে। ভীমসেন অন্ধ অজ্ঞান অবস্থায় নাড়ী-চক্রভেদ রূপ নাগলোক জয় করিয়াই অমৃত ভোজনে, দুর্য্যোধন-দত্ত বিষ হজম করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। যোগী এই দুর্য্যোধনের বিষে মোহিত হইয়াও, যদি রাবণাদির মত ধর্ম্ম সাধন ছাড়িয়া না দেয়—হঠাৎ ছাড়িলে ও পুনরায় সত্বগুণ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের সহিত মিলিত হয়, তবেই সে অবিদ্যা মোহ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। ভীমসেন সমাধিতে যোগসিদ্ধ হইয়াও পুনরায় আসিয়া সত্বগুণ মাতা ও ধর্ম্মজ্ঞান দাদার অধীন হইয়া ভক্তি ও কর্ম্মযোগ ভাইকে অনুবল করিয়াছিল।

তাই অসুরত্ব লাভ করিল না; দুর্য্যোধন দেওয়া তীব্র বিষ হজম করিয়া ফেলিল। বাবা, মাতা কুন্তীর প্রতিপালিত এই পঞ্চ পাণ্ডবের একটীর হ্রাস হইলেই পূর্ণ দেবত্বের হানি হইবে। ছোট ভ্রাতাদ্বয় মাদ্রী-পুত্র অভাবেই প্রথম তিনটী ঋষি-ধর্ম্মা হইয়া কেবল মুক্তি-চেষ্টান্বিত হইয়া পড়িবে! এই দুই এর যোগেই তাহারা আসক্তিহীন হইয়া জগতের মঙ্গল জন্য কর্ম্মাদি করিয়া—চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু আদির মত, দেবত্ব শক্তির লীলা করেন। আবার জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলে, পূর্ণতার হানী হইয়া মুক্তি লাভে অক্ষম হয়। এই পঞ্চপাণ্ডব প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত মিলিত থাকিলেই দেবত্ব স্বভাবের পূর্ণতা। বাবা, এই বিষদান ও জতুগৃহ দাহ প্রত্যেকটীই দুই পক্ষে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। একটী ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ অন্যটী ধর্ম্মরাজ পক্ষ। বিষদান ধর্ম্মরাজ পক্ষে—তাহাদের যোগ শক্তি ভীমকে, সত্বগুণ ধর্ম্মজ্ঞানাদি যোগচ্যুত করিয়া নিতে চেষ্টা; আবার ধৃতরাষ্ট্র পক্ষে—তাঁহার ধর্ম্ম সাধন বিশ্বাসকে নষ্ট করিবার চেষ্টা জানিবে। ভীমকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া মিষ্টখাদ্যে বিষ মিশাইয়া সেবন করান টুকু ধৃতরাষ্ট্র পক্ষে—শ্রবণ মধুর কুযুক্তি শ্রবণ করান ও সুস্বাদ তামসখাদ্য ভোজন করান বুঝিবে। এইরূপে জতুগৃহেও পাণ্ডব পক্ষে—পাণ্ডবরা গৃহ দগ্ধ করিয়া যাইবে, আর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব হীন হইয়া তাহাদের দেওয়া আগুণে জ্বলিয়া মরিবে। এখন জতুগৃহ রহস্য শ্রবণ কর।

জতুগৃহ দাহ তত্ত্ব—দুর্য্যোধনের গড়া জতুগৃহটীকে যেমন, কৌরবের সভাসদ মহাজ্ঞান ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপআদি পর্য্যন্তও চিনিতে পারেন নাই! সত্যই বাবা, এই দেবত্ব সংহারক দারুণ জতুগৃহের সংবাদ এমনই অসুরের গুপ্ত আক্রমণ; এই ভীষ্ম, দ্রোণের ন্যায় ঋষিরাও ইহাকে চিনিয়া উঠিতে সক্ষম হন না। অনেক মানব এই জতুগৃহকে না চিনিয়া, সুন্দর সুখের বাসস্থান ভাবিয়া, নিশ্চিন্তমনে ইহাতে বাস করিতে যাইয়া অজানতঃ ভাবে—

যেন ঘুমের মধ্যে, সর্ব্ব দৈবপ্রকৃতিবর্গকে মাতা সত্বগুণ সহিত ভস্ম করিয়া ফেলে। ভিতরে ভীষণ ভীষণ দাহ্য-পদার্থ উপরে অতি শোভন চিত্রাবলী অঙ্কিত, সুগন্ধ, প্রতি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির সুখকর, এই দারুণ জতুগৃহটীকে চিনিলে কি বাবা ? এই গৃহটী জীবের ভোগ বিলাস প্রভুত্বময় বিষয়-সংসার। পাণ্ডবদিগকে যেমন ভীষ্ম, বিদুর, কৃপ ইত্যাদির সংযোগহীন করিয়া, স্বাধীনতা দান করতঃ, দূরে রাজপ্রাসাদে, ভোগ বিলাস,প্রভুত্ব সহিত, কুভাব প্রেরণাকারী কু-আদেশ পালনকারী দাস ও সৈন্যবল দিয়া বাস করিতে পাঠাইয়াছিল। জীবকেও সত্যই, আত্মজ্ঞান, দয়া ও নিবৃত্তি-সত্বগুণ হীন করিয়া, স্বাধীন ভাবে কুসঙ্গ সহ সৌন্দর্য্য, প্রভুত্ব, ভোগ বিলাসকে সম্ভোগ করিতে দিলে, নিশ্চয় সে অজানত ভাবে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি আদিকে চিরতরে হারাইয়া বসিবে। সেই ভোগ বিলাস, প্রভুত্ব আদিরূপ ভীষণ দাহ্য-পদার্থগুলি, সত্যই হঠাৎ পুরোচন রূপী কুসঙ্গ ও অনুচরের দেওয়া অজ্ঞান-অগ্নিতে দারুণ ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া,দেব-প্রকৃতিগুলিকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে ; জীবকেও সারাজীবন ভরিয়া অবিদ্যাতাপে দগ্ধ করিতে থাকিবে। তখন সেই দহনের জ্বালা নিবাইতে জীব পথ ভুলিয়া, মুগ্ধের মত অসুরত্বের পথে সুখের সন্ধানে ঘুরিবে—সারাজীবন ভরিয়া বিষয়-রাজ্যে আধ্যাত্মরাজ্যের শান্তির চেষ্টা করিবে, এই টুকুই বাবা, দুর্য্যোধনত্বের জতুগৃহ গড়ার রহস্য।

দেব-প্রকৃতি পাণ্ডব জতুগৃহে যাইতেই ভয়ে অস্থির হইয়াছিল, তাই সেই গৃহকে তাঁহারা সর্ব্বদা ভয় করিয়া,সন্দেহ করিয়া চলিয়াছে ! আরও বিদুর দত্ত সে গৃহ বাসের সাবধানতা ও উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিয়া পালন করিয়াছিল ; মাতা কুন্তীকে সঙ্গে করিয়া নিয়াছিল, তাই ভোগবিলাস, প্রভুত্ব, স্বাধীনতা কিছুই ভোগ করে নাই ; কুসঙ্গ ও কুভৃত্য পুরুচনকেও প্রশ্রয় দেয় নাই, তাহাতেই তাহারা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা এই ভোগময় জতুগৃহকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহাদের নিকটই গৃহ দগ্ধ হইল, আর অসুরদের নিকট দৈবপ্রকৃতি

পাণ্ডবগণ সত্বগুণ সহিত দগ্ধ হইয়া গেল। অসুররা কি হারাইল বুঝেও না, তখন তাহারা সুখ বলিয়া দারুণ দুঃখকেই বরণ করিয়া লয়,—আত্মচেষ্টায় বহু ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তি খুঁজিতে যাইয়া, কেবল অতৃপ্তি অশান্তি জন্য ঈর্ষ্যা, ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে; তবু বৃথা-দর্প অহঙ্কার ও আত্মচেষ্টাকে ত্যাগ করিতে পারে না। ভীষণ অসুর-চক্রে মুগ্ধ হইয়া ধৃতরাষ্ট্র কেমন করিয়া, ধর্ম্মে ভগবানে অবিশ্বাসী হইল, বিদুরের উপদেশ মন্ত্রণা ও ভীষ্ম কৃপে অনুশাসনকে লঙ্ঘন করিল এবং দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হইয়া, দৈব প্রকৃতিবর্গকে দূর করিয়া জীবত্ব লাভ করিল তাহাত শ্রবণ করিলে! এখন যাহারা কিছুতেই অসুর মোহে, আত্মজ্ঞান, দয়া ও সত্বগুণ হইতে বিচলিত না হয়, তাহাদের অবস্থা, লাভালাভ পাণ্ডব জীবন দ্বারা দর্শন কর।

লীলা—পাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বাধ্য হইয়া মাতাসহ বারণাবতে যাইলে, তথাকার সকলেই গুণবান্ ধার্ম্মিক রাজপুত্রগণকে অতি আদরে গ্রহণ করিল; নব নির্ম্মিত অতি শোভন রাজপুরীতে তাহাদের বাসস্থান হইল। সেই পুরে অসম্ভব রাজ ভোগ্য দ্রব্য সম্ভার, দাস, দাসী, যান, বাহন সহিত সুচতুর ভৃত্য পুরোচন আসিয়া, পাণ্ডবগণকে বিশেষ ভাবে সেবা করিতে লাগিলে, এই সকল দেখিয়া সকলে ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবস্নেহ ভাবিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ কিন্তু বিদুরের কথা মনে রাখিয়া ও মায়ের অনুশাসনে বাহিরে বিশ্বাস ও স্নেহ প্রীতি দেখাইলেও, ভিতরে এই পুরীর সকলকেই মহাশত্রু নির্ণয় করিয়া চলিতে লাগিল। মৃগয়াদি করিয়া বা বাধ্য প্রজাদের দান দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভোজন করিত, তবু ভৃত্যদের দত্ত ভোগ বিলাস গ্রহণ করিত না। তাহাদিগকে যে সন্দেহ করেন তাহাও তাহাদিগকে বুঝিতে দিতেন না! প্রকাশ্যে সব গ্রহণ করিয়াও গোপনে ত্যাগ করিয়া চলিতেন। আবার বিদুর প্রেরিত ছদ্মবেশী লোকগণ আসিয়া তাহাদের সহায়তায় ব্রতী হইল, তাহাদের দত্ত আহারাদিই গোপনে ভোজন করিতেন।

ভৃত্যবর্গকে দেখাইয়া রাজশয্যায় শয়ন করিয়া তাহারা চলিয়া গেলেই. গর্ত্তের ভিতরে শয়ন করিতেন,—বিদুরের চরেরা কৌশলময় গুপ্ত গর্ত্ত ও ঘর হইতে পলাইবার সুরঙ্গ পথ করিয়া দিয়াছিল। এর পর যখন গুপ্তচর মুখে শ্রবণ করিল, পুরোচন শীঘ্রই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিবে! তাহার অগ্নি দানের পূর্ব্বেই, সেই রাত্রিতে নিজেরা গৃহে অগ্নি দান করিয়া, সেই গুপ্ত সুরঙ্গ-পথে পলায়ন করিলেন বিদুরের চরগণ অগ্নি নিবাইতে পাণ্ডব অন্বেষনের ছলে, ছাই দ্বারা সুরঙ্গের মুখ ভরিয়া দিল। দৈবে সেদিন এক মাতাসহিত পঞ্চভ্রাতা ব্যাধ, রাত্রিতে পাণ্ডব পুরে ভোজন করিয়া, বিদায় হইয়াও নিকটেই শুইয়াছিল, তাহারা ও দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বাহিরের দিকে থাকায় তাহারা পূর্ণ ভস্ম হয় নাই! এই ছয়কেই প্রজাগণ মাতাসহিত পঞ্চপাণ্ডব মনে করিয়া, পাণ্ডবের মৃত্যু নিশ্চয় করিল ও ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দান করিল।

এদিকে পাণ্ডবগণ রাত্রিকালে সুরঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অস্থির হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন একা, মাতাকে স্কন্ধে, নকুল সহদেবকে কোলে ও ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া সকলকে রক্ষা করেন। কতদূরে নদী তীরেই বিদুরের চর দ্রুতগামী যন্ত্র-চালিত জলযান লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার সাহায্যে অতি শীঘ্রই বহু দূরে এক বনময় প্রদেশে নামিয়া তাহারা দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিল। জলযান মধ্যেই তাহারা ব্রাহ্মণ কুমারের বেশ ধারণ করিয়া ছদ্ম নামও গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা ভীষণ বনপথে রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে চলিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই, শ্রান্ত ও পিপাসাতুর হইয়া পড়িল। এই আজানত স্থানে কোথায় জল তাহাও কেহ জানেনা, তাতে ভীষণ নিবির বন, হিংস্র জন্তু আদির ভয়, কি করিয়া জল আহরণ হইবে সকলেই ভাবিয়া অস্থির, অথচ জল না হইলেও প্রাণ বাঁচা দায়। তখন অসীম শক্তি ভীমসেনই একা জল আনিতে চলিলেন, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ মাতা ও কনিষ্ঠ দ্বয়ের প্রহরী রহিলেন। ভীমসেন অনেক কষ্টে

জল পাইলেন বটে কিন্তু জল আনয়নের ভাণ্ড যে নাই! পরে মাথার পাগরী ভিজাইয়া জল লইয়া আসিলেন, কিন্তু আসিয়া দেখিলেন শ্রান্ত তৃষ্ণাতুর মাতা ও ভ্রাতাগণ সকলেই, এমন দারুণ বনেও অবসন্ন হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। অগু রাজপত্নী মাতা ও রাজপুত্র ভ্রাতাদের এমন দুর্দ্দশা দেখিয়া, পাপ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদির প্রতি তাঁর দারুণ ক্রোধ হইতে লাগিল! পরে মাতা ও ভ্রাতাদের জন্য আক্ষেপ করিতে করিতে, নিজেই জাগিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই বনে হিড়িম্বা নামে এক ভীষণ রাক্ষস বাস করিত। সেই রাক্ষস অগু ছয়টী মানুষকে নিজের অধিকারে দেখিয়া,বড়ই আনন্দে নিজ ভগ্নী রাক্ষসীকে ইহাদিগকে ধরিয়া আনিতে প্রেরণ করিল। রাক্ষসী কিন্তু ভীমের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাকে স্বামী করিতে বাসনাবতী হইয়া উঠিল। রাক্ষসী সুন্দরী মানবীর রূপ ধরিয়া আসিয়া ভীমকে রাক্ষসের কথা বলিল ও তাহাকে শীঘ্র পলায়ন করিতে উপদেশ দিল। রাক্ষস মহাবলশালী, কত মানুষকে সে খাইতে দেখিয়াছে তাহাও বলিয়া দিল। ভীম কিন্তু একটু ভীত বা চঞ্চলও হইল না। তখন রাক্ষসী বলিল, "ওগো, তাকে তুমি জাননা, সে বড়ই বলবান! আমি তাকে খুব জানি। আমি তারই ভগ্নী, তোমাদিগকে নিতেই আমায় পাঠাইয়াছিল, কিন্তু তোমায় দেখিয়া আমার বড়ই মায়া হইতেছে, তাই তোমায় পালাইতে বলিতেছি। এখনি হয়ত সে আসিয়া পড়িবে, তুমি সবকে জাগাও, আমি তোমাদের সবকে পিঠে করিয়া বহু দূরে লইয়া যাইব।" ভীম বলিল, "সুন্দরি, তুমি নিশ্চিন্ত হও! সে আসিলে আমিই তাহাকে শিক্ষা দিতে পারিব। ইহাদিগের ঘুমের ব্যাঘাত করিবার কোনই প্রয়োজনই নাই।" এমন সময় সত্যই সেই রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল, ও ভগ্নীকে মানবীরূপে ভীমের নিকট অবস্থিত দেখিয়া সে সবই বুঝিতে পারিল। সে ভগ্নীকে তর্জ্জন করিয়া শাসন করিতে ধাবিত হইলে, ভীমসেন দ্রুত

বেগে উঠিয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া, ঐ স্থান হইতে দূরে লইয়া গেল। তখন রাক্ষস ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ভীমকেই আক্রমণ করিল। ভীমও দুর্য্যোধনের প্রতি যত ক্রোধ হইয়াছিল তাহা ঢালিবার সুযোগ পাইয়া, রাক্ষসকে দারুণ বিক্রমে আক্রমণ করিল। রাক্ষসের গর্জ্জনে পাণ্ডবদের নিদ্রাভঙ্গ হইল ও সকলে অস্ত্র লইয়া ভীমের সাহায্যে ধাবিত হইয়া, তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল! কিন্তু ভীম একাই শুধু বাহুবলের সহায়তায়, রাক্ষসকে মধ্যস্থলে ভগ্ন করিয়া বধ করিয়া ফেলিল। ভীম আসিয়া মাতা ও দাদাকে প্রণাম করিল! মাতা আশীর্ব্বাদ করিলেন, ধর্ম্মরাজ আলিঙ্গন করিলেন, ভ্রাতাগণ প্রণাম করিল! পরে সকলে ভীম আনিত জল সেবন করিয়া আবার গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসীও কিন্তু তাহাদের সঙ্গেই চলিতে লাগিল। মাতাকুন্তী তাহার পরিচয় চাহিলে, রাক্ষসী অকপটে সমস্ত পরিচয় ও নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া ভীমের পত্নীত্ব কামনা করিল। ভীম কিন্তু রাক্ষসী বলিয়া ইহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন! কিন্তু ধর্ম্মরাজ ও কুন্তী-দেবী ইহাকে গ্রহণ করাই স্থির করিলেন, তাই বলিলেন, "ভীম! তুমি ইহাকে গ্রহণ কর! এ তোমাকে সত্যই ভালবাসিয়াছে, নচেৎ তোমার হস্তে ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়াও তোমায় যাচনা করিত না। আর সে ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়া ত আমাদের বীর্য্য বল বুঝিয়াছে, সে বিপক্ষ হইয়া আমাদের কি আর করিবে? আমাদের এখন এমন একটী রাক্ষসী শক্তির প্রয়োজন আছে, তাই তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।" তখন ভীম বলিল "পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিব বটে, কিন্তু একটী সন্তান হইলেই তার সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ থাকিবেনা! এই সর্ত্তে গ্রহণ করিতে পারি।" রাক্ষসী তাহাতেই স্বীকৃতা হইলে, মায়ের ও দাদার আদেশে ভীম রাক্ষসীকে গ্রহণ করিল। এই রাক্ষসীকে সঙ্গে লইয়া পরিব্রাজক ব্রাহ্মণদের মত ভীক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে করিতে, দূরদেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে থাকিলে, রাক্ষসীর একটী পুত্র জন্মিল, সেই

পুত্রই মহাবীর ঘটোৎকচ। পাণ্ডব এই ভীম-পত্নী ও ভীম-পুত্রের দ্বারা, বনপর্ব্বে ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল; এই পুত্র না হইলে কর্ণকে বধ করাই অসম্ভব হইত। সন্তান জন্মিলেই প্রতিজ্ঞা মতে রাক্ষসী পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বলিয়া গেল, তাহারা যেন বিপদে আপদে তাহাদিগকে স্মরণ করেন, স্মরণ করিলেই তাহারা আসিয়া পাণ্ডবগণের যথাসাধ্য সেবা করিবে।

ভক্ত—বাবা, জগতের ভোগগৃহই জীবের দেবত্ব ধ্বংসকারী দারুণ জতুগৃহ। বিবেকের উপদেশে সত্বগুণ আশ্রয়ে, অলিপ্তভাবে ভয়ে ভয়ে সেই রাজ্যে থাকিয়া, বিদুরের চররূপ সাধুদের সঙ্গ ও সহায়তা গ্রহণ করায়, পাণ্ডব জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সেই গৃহ ভস্ম করিলেও ঋষিদিগের পন্থা গ্রহণ করিয়া তাপসব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। বিষয় রাজ্যে থাকিয়াও ত্রিতাপে অদগ্ধ থাকিবার উপায় কেবল এই বিদুরের চররূপী সাধুগণই বলিয়া দিতে পারেন, পালাইবার গুপ্ত পথও ইহারাই দেখাইয়া দেন। গৃহ হইতে পলায়ন কালে ভীম বিনে সকলেই অভিভূত হইবার জয়গাটুক বুঝিলে কি? যোগী বিনে ভোগ গৃহের মোহ অগ্নিতে স্থির থাকা জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মযোগী সকলের পক্ষেই কঠিন হইয়া পড়ে; তাহারা যেন পথ খুজিয়াই পায় না। তখন মাত্র যোগ সাহায্যেই জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী, মাতা সত্বগুণকে ভোগগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এই ভোগগৃহ হইতে পালাইয়া যোগিগণ কেবল বিদুরের চর—সাধুগণের সহায়তা লইলেই, দুর্য্যোধনত্বের অবিদ্যার আক্রমণ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে সক্ষম হয়; ইহাই বিদুরের চরের সহায়তায় দূরে পলায়ন। এর পর ভীম বিনে সকলের শ্রান্তি ও তৃষ্ণাতুর হইয়া নিদ্রিত হইয়া পরাটুকুও বড়ই সুন্দর তত্ত্ব বাবা! ভোগ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিতে কতদূর যাইয়াই প্রথমে বিশ্বদর্শীতা ও ভবিষ্যৎ দর্শীতা কর্ম্মযোগ দ্বয় শ্রান্ত ও ভোগ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া

উঠে, তাহাই প্রথমে কনিষ্ঠ দ্বয়ের কাতর হওয়া। ভীম তাহাদের রক্ষাভার ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনের হাতে দিয়া জল আনিতে গেলেই, তাহারা দুইজনও নিদ্রিত হইয়া পরা দ্বারা, জ্ঞানী ও ভক্তও যে যোগ হীন হইলে সেইকালে মোহিত হইয়া পড়ে,—মাতা সত্বগুণের রক্ষা ও কর্ম্ম যোগকে রক্ষা করার কথা ভুলিয়া যায়, তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেবল যোগীই সেই দুর্দ্দিনে জাগিয়া থাকিয়া সত্বগুণ মাতা ও জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মযোগ ভ্রাতাগণকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়; ইহাই ভীমের জাগিয়া প্রহরা দেওয়া। এর পর রাক্ষসীর পত্নীত্ব প্রার্থনা ও ভীষণ রাক্ষসের আক্রমণ তত্বও আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিত্য তত্ব বাবা।

হিরম্বা বধ-হিরিম্বা লাভ—এই রাক্ষসই ভোগ প্রবৃত্তিরূপ কামনা অসুর। এই রাক্ষসই, মায়াশক্তি দ্বারা ধর্ম্মরাজ আদিকে নিদ্রিত করিয়া মায়ের সহিত ভোজনের চেষ্টা করিয়াছিল। যাহারা এই ভোগাসুরকে ব্রহ্মযোগ দ্বারা জয় করিতে সক্ষম হয়, ভোগশক্তি আপনিই তাহার অধীন হইয়া, তাহার ইচ্ছামত সেবার দাসী হইয়া থাকিতে চায়। এই তত্বই ভীম কর্ত্তৃক হিরম্বা বধ ও হিরিম্বাকে পত্নী লাভ করা। বাবা, এসংসারে যদি ভোগ সেবা পাইয়া প্রকৃত সুখী হইবার বাসনা থাকে, তবে কখনও ভোগের অধীন হইও না, ভোগকে তোমার অধীন করিয়া রাখিও! তবেই সে তোমার ভোগ্যাপত্নী ও দাসী হইয়া সেবা করিবে। আর যদি তাহার অধীন হও, তবে এই হিরম্বা রাক্ষসের মত তোমাকে বধ করিয়া সে ভোজন করিবে অর্থাৎ তোমার সত্বগুণ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ আদিকে নষ্ট করিয়া, তোমায় কামাধীন রাক্ষস করিয়া ফেলিবে। ভীম ব্রহ্মযোগী বলিয়াই ভোগ সিদ্ধি হিরম্বারাক্ষসী, জগতের যত ঐশ্বর্য্য ভোগ, সুখ, বিজয় লইয়া তাহার পত্নী হইতে চাহিলেও, এই সিদ্ধই শক্তি মাত্রই আসুর—দেবত্বের বাধক বলিয়া, গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। জ্ঞানী

দেখিল, শক্তি ব্যবহার না করিয়া হাতে রাখিলে দোষ কি! দরকার হয় আপদকালে ব্যবহার করিব, নচেৎ ব্যবহার না করিলাম! দারুণ অসুর বিপক্ষেই যদি ইহার প্রয়োজন হয়; তাই ধর্ম্মরাজ বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন। ভীম কিন্তু এক পুত্র পণে তাহাকে বিবাহ করিলেন, অর্থাৎ একটি সিদ্ধাই শক্তি মাত্র গ্রহণে স্বীকার করিলেন; এই টুকুই অনাশক্ত ভাবে গ্রহণ। ভোগের অধীন না হওয়ায়, পাণ্ডব ভোগাসুরকে জয় করিয়া ফেলিল। আর তার শক্তি আপনি আসিয়া, জগতের যত ভোগ ঐশ্বর্য্য সম্পদ লইয়া তাহাদের পদে লোটাইয়া পড়িল। এখন দেখিলে বাবা, দুর্য্যোধন অন্য পাণ্ডবগণকে ত্যাগ করিয়া, কেবল ভীমকে বধের চেষ্টা করিয়াছিল কেন? দেব-প্রকৃতির মূল ভিত্তিই যোগশক্তি! এই যোগশক্তির সহায়তা বিনে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না, এই জন্যই দুর্য্যোধন ভীমকেই বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বিরাট পর্ব্বে এই বিষয় আরও স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

বাবা, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যেমন শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া শিক্ষার পরীক্ষা ও কর্ম্মকৌশল-অবাধ্যতা, কুমন্ত্রণা, বিষদান ও জতুগৃহ দ্বারা দেখাইয়াছে। আজ পাণ্ডব পক্ষ ও তাহাদের শিক্ষার পরীক্ষা, কর্ম্মকৌশল—ধৈর্য্য সহিত অত্যাচার সহন, বিষ হজম ও জতুগৃহ দাহন আদি দ্বারা প্রদর্শন করিতে লাগিল! জতুগৃহে অনাশক্ত ভাবে বাস ও অগ্নিদান পর্য্যন্ত জ্ঞানের কৃতিত্ব প্রদর্শন হইল। পলায়নকালে, রাক্ষস বধে ও হিড়িম্বা গ্রহণে যোগের কৃতিত্ব ও প্রকাশ হইল, এরপর ভক্তির কৃতিত্ব শ্রবণ করিবে। তার পর মাতা কুন্তীদেবী সর্ব্ব পাণ্ডবের কর্ম্ম পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কৃতিত্বে তুষ্ট হইয়া দেবত্বকে বধ করিয়া, পুত্রগণকে রাজ্য, সম্পদ, ভোগ সুখ দান করিলেন, আর মাতাকুন্তী তার পুত্র পাণ্ডবগণকে কি অপূর্ব্ব পুরস্কার দান করিবেন তাহা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে দেখিতে পাইবে।

লীলা—একদিন যাইতে যাইতে রাত্রিকালে মাতা অত্যন্ত পিপাসা কাতর হইলে, অর্জ্জুন মায়ের জন্য জল আনিতে যাইয়া, অঙ্গারপর্ণ নামে এক ভীষণ গন্ধর্ব্বের হস্তে পড়িয়াছিল। গভীর রাত্রিতে রাক্ষস গন্ধর্ব্বাদির পূর্ণ পরাক্রমের কাল, তাতে সেই গন্ধর্ব্বও বলশালী এবং ভীষণ যোদ্ধা ছিল বলিয়া অর্জ্জুনের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল বটে, কিন্তু অর্জ্জুন মহাবীর ও মাতৃভক্ত বলিয়া, দৈব অস্ত্রে গন্ধর্ব্বকে পরাজিত করিল। গন্ধর্ব্ব নরের হস্তে পরাজিত হইয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "তুমিত সামান্য মানব নও! মানবের মধ্যে যাহারা মন্ত্রবিদ্ ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিতের আশ্রয় থাকে, তারাই আমাদিগকে পরাজয় করিতে পারে! আর যাহারা খুব মাতৃভক্ত রোজ মাতাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্মে বাহির হয়, মাতার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করে, তারাই আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে। বল বীর! তুমি কি বলে আমাকে প্রতিহত করিলে? ভগবানের নির্দ্দেশ মতেই এই গভীর নিশায়, যে কেহ আমাদের নিকটে আসিলে আমরা তাহাদিগকেই পরাজয় করিতে পারি! তোমাকে কেন পারিতে-ছিনা?" অর্জ্জুন বলিল,"আমাদের পুরোহিত আশ্রয় নাই বটে, কিন্তু মায়ের আশীর্ব্বাদই আমাদের প্রধান বল ও আশ্রয়। মা বিনে আমাদের আর কেহই নাই। কেবল মায়ের জন্য জলের প্রয়োজনেই, এই কাল মানবের ভ্রমণের নয় জানিয়াও, জল লইতে আসিয়াছি। প্রাণপাত করিয়াও মাতাকে জল খাওয়াইতে চেষ্টা করিব।" গন্ধর্ব্ব বলিল, "তুমি মাতৃ ভক্তিতেই আমায় জয় করিয়াছ! তোমার সঙ্গে আর আমার বিরোধ নাই; আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি! আজ হইতে আমি তোমার সখা হইলাম। আমি তোমাকে কতটী গান্ধর্ব্ব-অশ্ব দান করিতেছি, তোমার স্মরণ মাত্রই তাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে। তাহারা যুদ্ধে কখনও শ্রান্ত হয় না ও সাধারণ অস্ত্রাঘাতেও বিদ্ধ হয় না।" অর্জ্জুন বলিল, "আমরা ক্ষত্রিয় আমাদের ত

পরের দান গ্রহণের অধিকার নাই! যদি আমার নিকট হইতেও কিছু গ্রহণ করেন তবে আমি অশ্ব লইতে পারি। আমরাত ব্রাহ্মণ নই, কি করিয়া দান গ্রহণ করিব।" গন্ধর্ব্ব আরও সন্তুষ্ট হইয়া একটী ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়া অশ্ব দান করিল। তখন অর্জ্জুন মন্ত্রবিদ ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, গন্ধর্ব্ব তাহাকে মহর্ষি ধৌম্যকে পুরোহিত গ্রহণ করিতে পরামর্শ দান করিল ও তাহার অবস্থান স্থানও বলিয়া গেল। অর্জ্জুন আসিয়া সমস্ত সংবাদ বলিলে, ধর্ম্মরাজ সকলকে লইয়া মহর্ষি ধৌম্যের নিকটে যাইয়া, নিজেদের পরিচয় ও সর্ব্বাবস্থা বলিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিও এমন ধার্ম্মিকগণের পৌরহিত্য সানন্দে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের অভ্যুদয় জন্য যজ্ঞে ব্রতী হইলেন।

তত্ত্ব—এই স্থানে অর্জ্জুনের ভক্তিবলের ক্রিয়াকৌশল দেখিলে ত বাবা! এই ভক্তিধর্ম্ম জ্ঞান বিচার হীন হইলেও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। ভগবদগীতায় তাহাই জোর করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন, "কৌন্তেয় প্রীতি যানিয়ো নমেভক্ত প্রণশ্যতি।" হে কৌন্তেয়, তোমায় বিশেষ প্রীতি করিয়া বলিতেছি, আমার ভক্ত কখনও নাশ পায় না। ভগবানে যাহাদের প্রীতিভক্তি নাই তাঁহারা কখনও সত্ত্বগুণকে এমন আদর করেন না; সত্ত্বগুণ আশ্রয়ীই তাঁর প্রকৃত ভক্ত। ইহাকে যদি সত্ত্বগুণ না ধরিয়া মাতৃভক্তি বল! এমন মাতৃভক্তি—মায়ের জন্য গভীর রাত্রিতে, একা দূরে নদীতীরে জল আনিতে গমন, অসুর প্রকৃতি দ্বারা কখনও হইবে না; সত্ত্বগুণীরই এমন মাতৃভক্তি হয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, সবই দৈবপ্রকৃতির সম্পদ, ভগবৎ ভক্তির অন্তর্গত। এই জন্যই বুঝি গীতায় বলিয়াছেন। "যে হপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যযন্ত্য হবিধি পূর্ব্বকম্॥" শ্রদ্ধাসহ অন্য দেবতার ভজনও অবিধি পূর্ব্বক আমারই ভজন হয়। আবার বলিয়াছেন, "যো যো যাং যাং তুনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিত মিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলং শ্রদ্ধা তামেব বিদধাম্যহম॥” যে, যে কোন তনুকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি, তাহাতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা হইবার সুযোগ করিয়া দেই। শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃত্তিটীই ব্রহ্মের নিজস্ব সম্পদ, তাহাতে আর কাহারই অধিকার নাই। তাই শ্রদ্ধা তাঁহার অতীব প্রিয়, শ্রদ্ধাকারীও ভগবানের প্রাণস্বরূপ, তাদের ক্রটী, অপরাধ স্বয়ং ভগবান্ শোধন করিয়া লন। এই জন্যই অর্জ্জুন অনায়াসে গন্ধর্ব্ব হস্তে রক্ষা পাইল, ভবিষ্যতে আরও কত বার পাইবে। এই ভক্তি বলেই গন্ধর্ব্ব হইতে অশ্ব ও ধৌম্যকে পুরোহিত পাইয়া, পাণ্ডব দুর্ভাগ্যসাগরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। এই সকল মাতা কুন্তীদেবীর পাণ্ডব-পরীক্ষা চলিতেছে, আর এক পরীক্ষা শ্রবণ কর।

লীলা—ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণ একচক্রানগরে, এক ব্রাহ্মণ গৃহে অতিথি হইলেন। ভীমের প্রকাণ্ড শরীর ও বীরাকৃতি বলিয়া, পাণ্ডবেরা তাহাকে দিবসে প্রায় লুকাইয়াই রাখিতেন, অন্য চারি ভাই ভিক্ষা করিতে গমন করিতেন। সেদিন চারি পাণ্ডব ভিক্ষার বাহির হইলে, ব্রাহ্মণ বাটীর অন্তপুরে একটু দুঃখপূর্ণ বাদানুবাদ শুনিয়া, কুন্তী দেবী কৌতূহল বশে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন, সেই দেশে এক রাক্ষসের উপদ্রব আছে। রাজা সেই রাক্ষসসহ যুদ্ধে না পারিয়া নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, প্রতিদিন একজন করিয়া মানুষ ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অন্ন ব্যঞ্জনাদি উপহার, তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিবে, সে যেন দেশ ধ্বংস না করে। সেই নর গ্রহণ জন্য রাজা প্রতি প্রজার ঘর হইতে এক এক দিন এক এক জনকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অদ্য এই ব্রাহ্মণের বাটীর একজন রাক্ষসের ভোজন জন্য যাইতে হইবে! ব্রাহ্মণের বাটীতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, তাহাদের বিবাহযোগ্যা এক কন্যা ও শিশুপুত্র মাত্র এই চারিটী প্রাণী। ইহার মধ্যে কে যাইবে তাহা লইয়াই এই বাদানুবাদ চলিতেছে। কন্যা বলিতেছে, “আমিই যাই আমার ত, দুইদিন পরে এই বাটী হইতে

যাইতেই হইবে, না হয় কিছু আগেই গেলাম। তোমরা থাকিলে আবার আমার মত কন্যা হইবে, তোমাদের কাজে লাগিয়া আমার জীবন সফল হউক।" পত্নী বলিতেছে, "আমি যাই, তুমি আবার বিবাহ কর, তবেই আমার অভাব সংসারে থাকিবে না। কিন্তু তুমি গেলে, আমিত সংসার রক্ষা করিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "আমি যে তোমাদের এই বাটীর কর্ত্তা, তোমাদের ভর্ত্তা ও আশ্রয়! আমি থাকিতে তোমাদিগকে রাক্ষস হস্তে দিতে পারিব না। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আমার কর্ত্তব্য করিয়া যাই, পরের কথা ধর্ম্ম জানেন, ভগবান জানেন! তোমাদের দ্বারা অন্ত জীবন রক্ষা করিব, কল্য যে আয়ুঃশেষ হইবে না তার স্থিরতা কি? আমিই যাইব।" মাতা কুন্তী সমস্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ব্রাহ্মণ-রক্ষা দেশ রক্ষা যে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম! বিশেষ কুরুবংশের ইহা যে কুলধর্ম্ম। কুরু বংশীয় বীর উপস্থিত থাকিতে কি করিয়া ব্রাহ্মণ রক্ষা না করিয়া পারে। ভীমের নিকট যাইয়া তিনি সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "ভীম! তুমি কি ব্রাহ্মণ রক্ষায় রাক্ষসের নিকটে যাইতে পার না? আমার আশীর্ব্বাদে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে ও সত্য ধর্ম্মের বলে নিশ্চয় তুমি রাক্ষসকে বধ করিতে সক্ষম হইবে।" ভীম আনন্দে মায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণ রক্ষায়, দেশের আপদ রাক্ষস বধে, আমি নিশ্চয় যাইব, মা! তোমার আশীর্ব্বাদ ও চরণধূলির প্রসাদে ভীম একাই ত্রিজগতের সকল রাক্ষসকে মুহূর্ত্ত মধ্যে জয় করিতে পারে।" মাতা আনন্দে ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ আপনাদের আপদের কথা আমি আড়াল হইতে সবই শ্রবণ করিয়াছি। আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, আপনাদের কাহারই যাইতে হইবে না।" ব্রাহ্মণ বলিল, "মাগো, আমরা একজন না গেলে যে, রাক্ষস কল্য এই দেশের সকলকেই বধ করিতে-আরম্ভ করিবে।" মাতা বলিলেন, "আপনাদের সেই ভয়ও নাই, আমার পঞ্চটী পুত্র আছে, তাহারই একজন

রাক্ষসের অন্নাদি লইয়া যাইবে, তাই আপনাদের যাইতে হইবে না।” ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল “কি বলিতেছ মা! অতিথীর জীবন দিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতে বল কি? তাঁহার জীবন হইতে আমার জীবন এমন কি মূল্যবান! আমার রক্ষার জন্য তোমার পুত্রের প্রাণ দিতে চাও মা! আমি তাহা কিছুতেই হইতে দিব না।” “নিশ্চয় তোমায় আশীর্ব্বাদে আমার পুত্রের প্রাণনাশ হইবে না!” ইহা বলিয়া মাতা কুন্তী আরও বলিলেন,“ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদে নিশ্চয় আমার পুত্র রাক্ষসকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। বাবা, মাতার পুত্র অনেক হইলেও কি, মাতা কোন পুত্রের মৃত্যু কামনা করিতে পারে! তবে কি করিয়া আমি আমার পুত্রকে মৃত্যুর মুখে যাইতে দিব? আমার পুত্র রাক্ষস নাশক বিদ্যা জানে। সে মহা বলবান, অনেক রাক্ষস সে বধ করিয়াছে, তাই তাহাকে ব্রাহ্মণ শত্রু, দেশের শত্রু রাক্ষসকে বধ করিতে পাঠাইব। তোমরা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রশান্তমনে বিদায় দেও, সে রাক্ষস বধ করিয়া ফিরিয়া আসুক।” ব্রাহ্মণ ভীমের বীরত্ব প্রকাশক আকার ও মায়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল ও রাজকর্ম্মচারিগণ সঙ্গে ভীমকে পাঠাইয়া দিল। মাতা ভীমকে বিদায় দিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল ও ভীমকে না দেখিয়া, সে কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। মাতা তখন তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। যুধিষ্ঠির মায়ের মহত্বে বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “কি করিয়াছ মা? ভীমকে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিয়াছ? যে ভীম বই আমরা অগ্নিগৃহ হইতে উদ্ধার হইতে পারিতাম না, বনেও হয়ত রাক্ষসের হস্তে নিহত হইতাম! যার ভয়ে দুর্য্যোধনের সুনিদ্রা হয় না, আমাদের সুখ-সৌভাগ্যের আশা ভীমকে, পরের প্রাণ রক্ষার জন্য রাক্ষসের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছ?” মাতা বলিলেন, “কি করিব বাবা, পাঠান বিনে যে, তোমাদের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম,

কুরুবংশের কুলধর্ম্ম রক্ষার আর উপায় দেখিলাম না। তোমাদের বর্ত্তমানে রাক্ষসের হস্তে ব্রাহ্মণের জীবন যাইবে? ভীমের জন্য আশঙ্কা করিও না; আমি ভীমের বিক্রম জানি। ব্যাসদেব তাঁর কথা আমায় বলিয়াছেন, সে দীর্ঘায়ু হইবে, বহু রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবে। আর মানব ধর্ম্মপথ ত্যাগ না করিলে, কখনও তার পরাজয় ও অকাল মৃত্যু হইতে পারে না।" যুধিষ্ঠির মাতাকে আনন্দে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা এই কাজ তোমার মত মায়ের উপযুক্ত কর্ম্মই হইয়াছে! আমরা ধন্য যে তোমার মত মা পাইয়াছিলাম। ভীমের নিজ বলে না হউক মা, তোমার পুণ্য ও আশীর্ব্বাদ বলেই সে রাক্ষস বধ করিতে পারিবে; নিশ্চয় সে ফিরিয়া আসিবে। আমি অর্জ্জুনকে লইয়া ভীমের সাহায্য জন্য চলিলাম, শীঘ্রই তাহাকে লইয়া আসিয়া তোমায় প্রণাম করিব।" ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির বিশ্রাম মাত্র না করিয়া, অস্ত্র লইয়া দ্রুত রাক্ষসের বনের দিকে চলিয়া গেল! তাহারা না যাইতেই ভীমসেন শুধু বাহু বলের সহায়তায় রাক্ষসকে বধ করিয়া ফেলিয়াছিল। যুধিষ্ঠির বিজয়ী ভীমকে আদরে অভিনন্দন করিয়া আলিঙ্গন করিল, অর্জ্জুন প্রণাম করিল। এক ভীমেই রক্ষা নাই, তাতে আবার আরও দুইজন আসিয়া মিলিল দেখিয়া, রাক্ষসের অনুচরগণ সেই রাজ্য হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন ভীমকে লইয়া আসিয়া মাতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। তাহারা প্রকাশিত হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণকে তাহাদের বিষয় বলিতে নিষেধ করিয়া, রাত্রি থাকিতেই সেই দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কতদূর যাইতেই ব্যাসদেব আসিয়া পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তোমাদের মত সত্ত্বগুণাশ্রয়ীই এই বিশ্বজগতে সুখ ও সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হয়। এমন দুরবস্থায় পড়িয়াও যখন তোমরা সত্যধর্ম্ম, সত্ত্বগুণ ও সদাচারকে লঙ্ঘন কর নাই, ভগবান্ ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধারক্ষা করিতে পারিয়াছ, তোমাদের

দুর্ভাগ্য আর থাকিতেই পারে না। সৌভাগ্য আগত প্রায়, তোমরা দ্রুপদ রাজ্যেগমন কর!" ব্যাসদেবের আদেশে তাহারা দ্রুপদ রাজ্যেরদিগে চলিয়া গেল।

তত্ত্ব—এই লীলা দ্বারা পাণ্ডবগণ সত্যই সত্ত্বগুণ পথে চলিতে চায় কি না, তাহারই পরীক্ষা হইল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডব রাজা হইবে ভাবিয়াই ঈর্ষ্যায় খুল্লমাতা সহিত পঞ্চজন ভ্রাতাকে বধ করিয়া, দয়া, ধর্ম্ম, কুলগৌরবে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। আর এই লীলায় দেখিলেত? পাণ্ডব একজন অজানত ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার জন্য, দয়া, ধর্ম্ম, কুলাচার রক্ষার্থে নিজেরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে কুণ্ঠিত হইল না! শাস্ত্র, সদাচার ও মুনি বাক্যে কি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস! ধর্ম্মপথে চলিলে আমরা নিশ্চয় বিজয়ী হইব। চক্ষের সম্মুখে অধর্ম্মের দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্র রাজ্য লাভ করিয়াছে দেখিয়াও, পাণ্ডবের ধর্ম্ম বিশ্বাস টলিল না, ইহারই নাম সত্ত্বগুণ আশ্রয়। এমন ধার্ম্মিক কি আর দুঃখ ভোগীতে পারে বাবা! তাই ব্যাসদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহাকে ভাগ্যদেবতার রাজ্যে ভাগ্যলাভের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের পুরস্কারত লোভ-দ্রোণাচার্য্যের অধিকার বিষয়রাজ্যে নাই! তাই পুরস্কার লাভ জন্য আধ্যাত্মিকরাজ্য দ্রুপদ অধিকারে যাইতে বলিলেন। তথায় যাইয়া তাহারা কি লাভ করিল, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মধ্যে তাহা শ্রবণ করিবে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

গুরু—বাবা! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও লক্ষভেদ সৃষ্টি-জগতের একটী গুহ্য-রহস্য প্রকাশ; এই তত্ত্বটীই জীবের কর্ম্ম আলোড়ণের মূলসত্ত্বা। সর্ব্ব-প্রকৃতির শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য এই দ্রুপদরাজ্যের অধিকার লাভ জন্যই, বিদ্যা শক্তি সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্ব প্রবৃত্তিগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান

করেন ও তাহাদের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া সেই অধিকার গ্রহণ করেন। জীব-মাত্রেই এই দ্রুপদরূপী ভাগ্যদেবতার রাজ্যের কোন প্রকার অধিকার লাভ জন্য, বিদ্যা শক্তি সংগ্রহ করিয়া, সেই জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতা দ্বারা ক্রিয়া করিয়া কর্ম্মরূপ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। জীব কি চায় জান বাবা? সকলেরই প্রধান প্রাপ্তির লক্ষ এই দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীদেবী! সৃষ্টি-জগতের প্রত্যেক প্রাণীই, তার জ্ঞান শক্তি লইয়া এই দেবীকে লাভ করিতেই, কর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। কেহ অসুর প্রবৃত্তির সহায়তা লইয়া, বিষয় রাজত্বের সর্ব্ব সম্পদ, ধনরত্ন, বিজয়, প্রভুত্ব লইয়া সম্রাট সাজিয়া, তাহাকে লাভ করিবে ভাবিতেছে! কেহ ভীষণ যোদ্ধা হইয়া তাহাকে পাইবে ভাবিতেছে! কেহ দৈব সম্পদ ব্রাহ্মণত্ব লইয়া তপঃপথে দেবী লাভের চেষ্টা করিতেছে। কেহ ত্যাগে, কেহ ক্ষমায়, কেহ প্রতিজ্ঞা রক্ষায়, কেহ বীরত্বে, কেহ সতীত্বে, কেহ দানে, সকলেই বাবা, এই কন্যাকেই লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই দ্রৌপদী দেবীকে চিনিলে কি বাবা? ইনি সন্তোষ বা আনন্দ বা শান্তি সুখ। সৃষ্টি-রাজ্যের ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্ম দ্বারা, এই সন্তোষ সুন্দরীরই সন্ধান করিতেছে না বাবা? এই ভাগ্য-রাজকন্যা প্রকৃত সন্তোষদেবীকে লাভ করা, ঠিক এই দ্রৌপদী দেবী লাভের মতই কঠিন ব্যাপার। এই দেবীকে মূল্য দিয়া বা বলপূর্ব্বক বা ছল পূর্ব্বক কিছুতে লাভ করা যায় না। ইনি স্বয়ং স্বয়ম্বরা হন,—যেখানে যাইবার, যাহাকে বরণ করিবার ইনি নিজেই করেন, তাহাতে অপরের হাত নাই। তবে ভাগ্য-দেবতা একটী দারুণ লক্ষভেদ পণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই লক্ষটী কেহ ভেদ করিতে পারিলে, সে যে জাতিই কেন না হউক, এই কন্যা সত্যই তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, সে না চাহিলেও তাহার সেবিকা হইয়া সেবা করেন। এই লক্ষ ভেদ করিতে না পারিলে, তুমি যতই কেন কর্ম্মকুশল না হও—ত্রিজগতই জয় কর, আর অষ্টসিদ্ধিই লাভ কর, সন্তোষদেবীর ছায়াও

স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। তাই ঋষি স্বয়ম্বর-সভায় জগতের সমস্ত বীর ও সাধকগণকে একত্র করিয়া আনিয়া দেখাইলেন, দ্রৌপদী দেবী কাহার ভোগ্যা, তাঁহাকে লাভ করিবার অধিকার কি, কে তাহাকে লাভ করিতে পারে। পিতৃসর্ত্তে চিরব্রহ্মচারী ভীষ্মদেব পারিলেন না, গুরু দ্রোণ কৃপও পারিলেন না। সম্রাট জরাসন্ধ, মহাবীর অশ্বত্থামা, শিশুপাল আদি ও মহাবীর দাতাকর্ণও পারিল না। আর স্থান ভ্রষ্ট, বিতাড়িত, হীন ব্রাহ্মণবেশী, ভীক্ষাজীবী পাণ্ডব, লক্ষভেদ করিয়া দ্রৌপদী দেবীকে লাভ করিল। অন্যে পারিবে কেন বাবা? তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৌভাগ্যরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ অধিভূত বিষয় রাজ্য, অন্য ভাগ আধ্যাত্ম্য রাজ্য। অসুর সম্পদের অধিকার বিষয়রাজ্য পর্য্যন্ত, তাহাতে ধন সম্পদ প্রভুত্ব সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে; এই দ্রোণাচার্য্য অধিকার বিষয়-রাজ্যের বাসীরা, সেই আধ্যাত্ম্য রাজ্যের সম্পদ কি করিয়া লাভ করিবে! ভাগ্য-রাজ্যের দ্রুপদের অধিকার আধ্যাত্ম্য-রাজ্যে এই কন্যা ও তাঁহার মহাবল পুত্রগণ বাস করেন, ইহারাই আধ্যাত্ম্য রাজ্যের সম্পদ বাবা। যেই কন্যার জন্য জগতের সকলেই লালাইত তাহার পরিচয় পাইয়াছ, পুত্রগণের পরিচয়ও একটু শুনিয়া রাখ! জ্যেষ্ঠ পুত্রটী ভীষ্মদেবের বধের জন্য জাত; এই মন পরাজয় শক্তিটীকে চিনিলেত? ভীষ্মপর্ব্বে বিশেষ পরিচয় পাইবে। এখন একটু শুনিয়া রাখ, ইনি সমাধিযোগ। আর একটী পুত্র দ্রোণ বধের জন্য জাত, ইনি লোভ বিজয়ী বৈরাগ্য-ঠাকুর। এই সন্তোষ, সমাধি, বৈরাগ্যাদি লাভ করা কি একটুকু অসুরত্ব থাকিতেও হয় বাবা! তাই দেখিতে পাইবে, পাণ্ডব হারা শুধু ধার্ত্তরাষ্ট্র যুক্ত ভীষ্ম দ্রোণাদিও অন্য দ্রৌপদী লাভের যোগ্য হইলেন না। রাজা দ্রুপদ কৃত এই দুর্জ্জয় দুর্লক্ষ্য লক্ষ ভেদের মত, সত্যই সন্তোষ জন্য দারুণ লক্ষবেধ পরীক্ষা দিতে হয়। এখন এই লক্ষের পরিচয় শ্রবণ কর!

লীলা—দ্রোণাচার্য্য বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া রাজ্যার্দ্ধ বাহির করিয়া লইলে, রাজা দ্রুপদ, দ্রোণাচার্য্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার নাশক-শক্তির জন্য যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞাগ্নি হইতে, এক কন্যা ও এক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। কন্যাটী এই দ্রৌপদী দেবী, আর পুত্রটী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন; কন্যাটীকে তিনি দেব স্বভাব পাণ্ডব বধূ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু জতুগৃহে পাণ্ডব নিধন সংবাদ পাইয়া, বীর জামতা লাভ জন্য একটী দুর্জ্জয় লক্ষ রচনা করিলেন ও জগতের সকলকে কন্যার স্বয়ম্বরে আহ্বান করিলেন। লক্ষটী একটী মৎস্য চক্র ভেদ করিতে হইবে। অতি ঊর্দ্ধে একটী মৎস্য রাখিয়া মধ্যপথে কয়টী চক্র ঘূর্ণায়মান ভাবে রাখা হইয়াছিল। ঊর্দ্ধদিকে চাহিলে মৎস্য দেখাই যায় না, লক্ষের নিম্নে একটী জলপাত্রে চাহিলে ঘূর্ণায়মান চক্রগণের ছিদ্রপথে, মাঝে মাঝে সেই মৎস্যের চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র; সেই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া লক্ষ পাতিত করিতে হইবে। চক্র ভেদের জন্য একটী নূতন ধনু ও নূতন বাণ সেই স্থানেই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই ধনু বাণ দ্বারা এই লক্ষ ভেদ করিতে পারিলে, দ্রৌপদী দেবীকে লাভ করিতে পারিবে।

ভত্ত্ব—এই দ্রৌপদী লাভের মৎস্য চক্রই মীনকেতনের মীনচক্র বাবা! কামদেবের এই কামচক্র ভেদ না করিতে পারিলে, কেহই সন্তোষ লাভে সক্ষম হয় না। আরো এই কামকে চক্ষু বিধিয়াই ভেদ করিতে হয়। চোখটী নাশ করিতে পারিলে,—দেখিবার ভাবটী বদলাইয়া, অন্যভাব মাতৃত্ব কন্যাত্ব ভাব আনিতে পারিলেই কাম জয় হইয়া যায়। ঊর্দ্ধ দিকে চাহিলে কামকে খুজিয়াও পাইবে না, নিম্নদিকে তাহার বিহার স্থানে ভাল করিয়া দৃষ্টি করিলে দেখিবে—অসংখ্য কামনাচক্র ঘূর্ণায়মান হইয়া মানবকে সর্ব্বদা লক্ষভ্রষ্ট করিয়া ঘুরাইতেছে বটে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া লক্ষ করিলে মাঝে মাঝে চক্রের মধ্য দিয়া সেই মৎস্যের চক্ষুও দেখা যায়। জগতে সকলেই এই লক্ষ

ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া বাণ ত্যাগ করিতেছে বটে, ধনুর দোষে বাণ অত দূরে যায়ই না, কতক বা অন্য চক্রে লাগিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সত্যই বাবা, এই চক্র ভেদের ধনু, গুণ, বাণ, দ্রুপদ রাজার দেওয়া হওয়া চাই। এই ধনু আদি রাজা দ্রুপদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্ত্বা না হইয়া, অধিভূত রাজ্যের জিনিষ হইলে এই কন্যা লাভের লক্ষ ভেদ হইবে কেন? তাই দ্রুপদ রাজাই লক্ষভেদের ধনু, ছিলা ও বাণ রাখিয়া দিলেন। দ্রৌপদী দেবীর জন্মই যে দ্রোণ শক্তির নাশ চেষ্টা যজ্ঞ হইতে, তাইই বাবা, দ্রোণ অধিকারের কোন সত্বাই ইহাকে লাভ করিতে পারে না; তাহাই সন্তোষ সাধনাতে লোভের নাশ হয়। সেই লক্ষভেদের ধনু বাণ আদির পরিচয় শ্রবণ কর! ধনুটী ধৈর্য্য, ছিলাটী দৃঢ়তা ও বাণটী সত্যসঙ্কল্প। অনেক অসুর প্রকৃতির বড়ই অধৈর্য্য, তাহারা ধনুই তুলিতে পারিবে না। আবার কারো বেশ ধৈর্য্য আছে, কিন্তু নাই দৃঢ়তা, তাহারা ধনু তুলিয়াও ছিলা দিতে পারিল না। কারো কারো ধৈর্য্যও দৃঢ়তা আছে, নাই সত্য সঙ্কল্প,—যেই টুকুর অভাবে রাবণাদি অসুররাজারা ধৈর্য্য ও দৃঢ়তাসহিত সাধনে সিদ্ধ হইয়াও, বর লাভের বেলা রাক্ষসত্ব, অসুরত্ব বর চাহিয়া বসিল, এই সত্যসঙ্কল্পের অভাবে কেহবা ছিলা দিয়াও বাণ ত্যাগ করিতে সক্ষম হইল না; কেহ বা বাণ ছাড়িলেও তাহা লক্ষ ভ্রষ্ট হইল। এখন লক্ষভেদ রহস্য শ্রবণ কর।

লীলা—রাজা দ্রুপদ সকলকে লক্ষভেদ করিতে বলামাত্র, বলদর্পী নৃপতিগণ স্পর্দ্ধা করিয়া লক্ষভেদে ধাবিত হইলেন, কিন্তু অনেকে ধনুই তুলিতে অক্ষম হইল, কেহ বা কষ্টে তুলিয়াও ছিলা দিতে পারিলনা, সামান্য কয়জন মাত্র ছিলা দিতে পারিলেন, কিন্তু বাণ যোজনা আর হইলনা; এর পরেত লক্ষ দর্শন। ভীষ্ম ও দ্রোণ মাত্র বাণ যোজনান্তে লক্ষ দর্শন করিয়া বাণ ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষভেদ হইল না। কর্ণ গুণ দান করিতেই,

দ্রৌপদী দেবী, 'সুত পুত্রকে বরণ করিবনা' বলায়, তিনি ধনু ত্যাগ করেন। কেহই লক্ষভেদ করিতে পারিল না দেখিয়া, দ্রুপদ পুত্র যে কেহকে লক্ষভেদ করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই আর সাহস করিয়া উঠিল না। কেহই পারিলনা দেখিয়া অর্জ্জুনের এই লক্ষভেদ করিতে ঔৎসুক্য হইল। তাহারা ব্যাসদেবের আদেশে দ্রুপদরাজ্যে আসিয়া অন্ত স্বয়ম্বর দেখিবার জন্য, ব্রাহ্মণদের দলে মিশিয়া বসিয়াছিল। অর্জ্জুনকে লক্ষভেদে উৎসুক দেখিয়া, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ইঙ্গিতে আদেশ দান করিলেন। অর্জ্জুন অনায়াসে ধনু তুলিয়া, কর্ণ দেওয়া ছিলা খুলিয়া আবার ছিলা পরাইল ও বাণ যোজনা করিয়া লক্ষভেদ করিয়া ফেলিল! সমস্ত রাজা ও বীরগণ বিস্মিত হইয়া গেল, ব্রাহ্মণগণ আনন্দে জয়ধ্বনী করিতে লাগিল। দ্রুপদপুরেও মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল, দ্রোপদী দেবী বরণমালা লইয়া লক্ষ বেদ্ধাকে বরণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন তাহাকে বরণ করিতে বারণ করিয়া বলিল, "আমাকে নয়, অন্যকে বরণ করিতে হইবে।" দাম্ভিক অসুর রাজগণ, দ্রৌপদী দেবীকে ভিখারী বরণ করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। এমন রাজকন্যা ভিখারীর অঙ্কশায়িনী হইবে? তাহাদের ধন সম্পদের সাজসজ্জা, প্রভুত্বের সেবক ও সৈন্য বল, তবে সবই কি অসার! দ্রৌপদী ইহার কোন দিকেই ফিরিয়া চাহিবে না। ব্রাহ্মণ, বরণ করিতে নিষেধ করায় তাহারা একটু আশা পাইল। ভিখারী-ব্রাহ্মণ রাজকন্যা লইয়া কি করিবে! পালন করিবার সামর্থই বা তার কোথায়? তাই বুঝি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়া ভুলাইয়া দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিনা কেন! অমনি প্রত্যেক রাজা, প্রচুর ধন, সম্পদ, রাজ্য ও শত শত সুন্দরী কন্যা পর্য্যন্ত বিনিময়ে, দ্রৌপদীকে প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণেরই নিকট দূত পাঠাইল। রাজাদিগের এই জঘন্য প্রার্থনায় অর্জ্জুনের কুরুবংশের ক্ষত্রিয়তেজ এবার জ্বলিয়া উঠিল।

সে দূতগণকে বলিয়া দিল, "হে দূত! তুমি যাইয়া বল, এই ব্রাহ্মণ যদি বলে, তোমাদের পত্নী আমায় আনিয়া দেও! আমি তোমাদিগকে অতুল রাজ্য দান করিব! তখন তাহা শুনিতে কেমন লাগিবে? রাজাদের এমন প্রস্তাব করা বড়ই অন্যায়!" তাহারা পারে নাই সেই কার্য্য এই ব্রাহ্মণ করায়, এমনই ত সকলে নিজকে অপমানিত মনে করিতেছিল! তাতে দ্রৌপদীকে লইয়া যায় দেখিয়া তাহাদের আরও ভীষণ গাত্রদাহ, ইহার উপর আবার এমন সমান উত্তর পাইয়া, রাজগণের ক্রোধ অসুর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "সামান্য ভিক্ষাবৃত্তি ব্রাহ্মণের এতদূর ধৃষ্টতা! আমরা দেশের রাজা, আমাদিগকে সমানে উত্তর দেয়! লক্ষ্যভেদ করিয়া ধরাকে কি সরা দেখিতেছেন? ইহাকে শিক্ষা দিতেই হইবে! এইটী ক্ষত্রিয়ের বিবাহ সভা, ব্রাহ্মণ হইয়া এই লক্ষ্যভেদে তার কিসের অধিকার? রাজা দ্রুপদ আমাদিগকে অসম্মান করার জন্যই বুঝি এই লক্ষ্যভেদ কৌশল করিয়াছে। রাজাকে সহিত ব্রাহ্মণকে বধ কর! দ্রৌপদী হয় কোন রাজাকে বরণ করুক, নচেৎ তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব! তবু আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া ভিখারী ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে দিব না।" এই বলিয়া রাজগণ বেগে উত্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। যুধিষ্ঠির অবস্থা বুঝিয়া সাহায্য জন্য ভীমকে দ্রুত আদেশ করিয়া, মাতার জন্য চিন্তিত হইয়া কনিষ্ঠদ্বয়কে লইয়া তাঁর নিকটে চলিয়া গেলেন। ভীমসেন অস্ত্রের অভাব দেখিয়া, শীঘ্র একটী বৃহৎ বৃক্ষকে বলে উৎপাটন করিয়া, তার কাণ্ডটীকে গদা করিয়া লইলেন ও অর্জ্জুনের অগ্রে যাইয়া, রাজগণের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা জড়াসন্ধ, শল্য ও দুর্য্যোধন ভীমকে ক্রমে আক্রমণ করিয়া পরাস্থ হইয়া বিস্মিত হইল, কর্ণ, শিশুপাল আদিও অর্জ্জুনের নিকট প্রতিহত ও পরাজিত হইয়া স্তম্ভিত হইল, আর রাজগণ ভয়েও ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও যদুবংশীয়গণ যুদ্ধে যোগ দেন নাই,

যদুবংশ লক্ষ্য বেধের চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু এই কালে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণাদি সহিত মধ্যে আসিয়া দাড়াইয়া যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। বলিলেন "ব্রাহ্মণ ন্যায়পথে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, ন্যায়-দণ্ডধারী রাজগণের তাহাতে বাধা দেওয়া কি উচিৎ? আর যুদ্ধ করিয়া ত দেখিলে, ছেলের হাতের নাড়ু নয় কাড়িয়া খাইবে! আর কেন লোক হাসান. যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়া চলিয়া যাও।" রাজগণের ক্রোধ না যাইলেও, একেত ব্রাহ্মণদ্বয়ই দুর্জ্জয়, তাতে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম বাধা দিতেছে, আবার দুর্জ্জয় দুই ব্রাহ্মণ দ্রোণ ও কৃপকেও সঙ্গে দেখা যাইতেছে বলিয়া, বুদ্ধিমানের মত গোলযোগ না করিয়া, অপ্রতিবাদে রাজ্যের দিকে চলিয়া গেল। যুদ্ধ থামিলে অর্জ্জুন ও ভীম ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিশিয়া আত্মগোপন করিয়া মায়ের নিকট চলিয়া গেল, দ্রৌপদী দেবীও ভীমার্জ্জুনের মৃগচর্ম্ম বহন করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন।

ভক্ত—অসুর শক্তির সন্তোষ লাভ চেষ্টার সত্যই এইরূপ ফল হয় বাবা! তাহাদের আড়ম্বর দম্ভ ও সাজ সজ্জাই সার। বাবা, এই বিষয় রাজ্যের সমস্ত সম্মান,প্রভুত্ব,চেষ্টা কৌশল দিয়াও সন্তোষ—আনন্দ বা শান্তিকে কখনও লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। এই দেবী অসুরের রাজ্য, সম্পদ, প্রভুত্বের আড়ম্বর যুক্ত রাজপ্রাসাদকে পরিত্যাগ করিয়াও, ভিখারী ব্রাহ্মণ মূর্ত্তির ভিক্ষান্ন ও মলিন ছিন্ন বস্ত্রকে বরণ করিতেই সর্ব্বদা লালায়িত। জগতে দেহেন্দ্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, যাহারা দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিবর্গের সজীবতা প্রদর্শনের—আত্মচেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া, ঈশ্বর-নির্ভর ত্যাগে শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করিয়াও বিষয় রাজ্যে প্রাধান্য, বিজয়, রাজ্যলাভ করাকেই জীবনের কৃতার্থতা বোধ করে, তাহারা কখনও এই দেবীর কৃপালাভে সক্ষম হইবে না। যাহারা দেহধারণ করিয়াও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি,তৃপ্তিরূপ জীবত্বের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না—আত্মচেষ্টাকে শাস্ত্র সদাচারের নিকট বলিদান করিয়া, নিরভিমানে ভোগসুখ ত্যাগে, বিষয় রাজ্যের সুখ দুঃখ উভয়কেই

ভগবানেরই দয়ার দান বলিয়া আনন্দে বহন করিতে শিখিবে, অর্থাৎ কামনা বাসনার অতীত হইতে পারিবে! সে এই দেবীকে না চাহিলেও দেবী আপনি যাইয়া তাঁহার সেবাভার-গ্রহণ করিবেন। অগ্র সেই জন্যই দ্রৌপদী দেবী অর্জ্জুনের মৃগচর্ম্ম বহন করিয়া তাহার পিছে পিছে যাইয়া তাহাদের অতিথির আশ্রয় পরগৃহেই উপস্থিত হইলেন। তবু অসুর রাজাদিগকে বরণ করিলেন না।

এই দেবী, এই পঞ্চপাণ্ডবের মাতা সত্ত্বগুণ কুন্তী দেবী বিনা আর কাহার নিকটই প্রণত হন না, আর কাহারও চরণ সেবাও করেন না। আর এই মায়ের অতিবাধ্য সন্তান বিনেও, কেহই এই দেবীকে লাভ করিতেও সক্ষম হন না। লক্ষ্যভেদ কে করিতে পারে দেখিলে ত! এই দারুণ লক্ষ্যভেদ, এই মায়ের পুত্র জ্ঞানী ও যোগীর ভ্রাতা, দ্বিবিধ কর্ম্ম যোগীর দাদা ভক্তিযোগীই মাত্র ভেদ করিতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের দ্বারাও কামের চক্ষু ভেদ করা যায় না, যোগেও হয় না, কর্ম্মযোগীরাও তাহাতে সক্ষম হয় না, মাত্র ভক্তি—ভালবাসা দ্বারাই কামের চক্ষু মুহূর্ত্ত মধ্যে বদলাইয়া যায়। ভক্তি সহিত মাতৃ সম্বোধনে রমণীর হৃদয়ে পুত্র স্নেহ সঞ্চারে কামভাব অতল স্নেহে ডুবিয়া যায়, স্তনে ক্ষীরের সঞ্চার হয়। এইজন্যই অর্জ্জুন বিনে আর কোন পাণ্ডব লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয় নাই। জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মপথীরাও এই মায়ের আশ্রয়ে ভক্তি লাভ করিয়া সন্তোষ লাভে সক্ষম হয়। তাহাই দ্রৌপদী দেবীকে পঞ্চপাণ্ডবে বিবাহ করার মধ্যে দর্শন করিবে। লক্ষ্যভেদ রহস্য শ্রবণ করিয়াছ, এখন দ্রৌপদী লাভ তত্ত্ব শ্রবণ কর! লক্ষ্যভেদ করিলেই দ্রৌপদী লাভ হয় না। বাবা! দ্রৌপদী দেবীকে পত্নীলাভ করা লক্ষ্যভেদ হইতেও কঠিন ব্যাপার, দ্রৌপদী বিবাহ অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব-রহস্য শ্রবণ কর।

শিষ্য—প্রভু! পঞ্চজনে এক রমণীকে বিবাহ করণ, এ বিষয়টী কিন্তু বড়ই কুৎসিত হইয়াছে, একেবারে অনার্য্যের কর্ম্ম। পাণ্ডবের মত মহৎ জ্ঞানবানেরা কি করিয়া ইহা করিয়াছিলেন?

গুরু—বৎস, মহৎ জ্ঞানবান্ যাহা করেন, তাহা তোমার চক্ষে অন্যায় বোধ হইলেও অন্যায় বলিয়া নিশ্চয় করিতে নাই! করিবার কারণ ছিল বলিয়াই করিয়াছেন ধরিতে হয়। ধর্ম্মসঙ্কট কালে, যেই সময় পরস্পর বিরোধী দুই তিনটী কর্ত্তব্য একত্র আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই কালে কর্ত্তব্য নির্ণয় বড়ই কঠিন হইয়া পরে। তখন কেবল মহাজ্ঞানী, ঋষিতুল্য ব্যক্তিরাই স্থির থাকিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হন। আজকাল যেমন কোন জটিল আইনের বিচার মীমাংসা, উচ্চ-আদালত স্থির করিয়া দিলে, তাহা দেখিয়াই অন্য সকলে বিচার মীমাংসা করে। শাস্ত্রোক্ত লীলা সমূহও সেই কালের উচ্চ-জ্ঞানীকৃত মীমাংসিত, ঋষি-স্বীকৃত আপদ-ধর্ম্মে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ। (হাইকোর্টের নজির) তাই পুরানাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন সব অশ্লীল, আমাদের চক্ষে জঘন্য ঘটনার সমাবেশও দেখিতে পাই। সীতা, সাবিত্রী আদিকে যে সতীর আসন দেওয়া হইয়াছে, দেখি সেই সতীর আসনে, তাহারা আবার অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরীকেও বসাইয়া দিয়াছেন। সীতা সাবিত্রী সরল ধর্ম্মপথে সতী, আর অহল্যা দ্রৌপদী আদি আপদধর্ম্ম, জটিল পথে পড়িয়া, দৃশ্যতঃ অসতীর মত হইয়াও সতীই ছিলেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন জানিবে।

ভগবদ্গীতায় পড় নাই, কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কর্ম্ম তিনই আছে, তাই কর্ম্মের গতি নির্ণয় বড়ই কঠিন। যে অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম, কর্ম্মের মধ্যেও অকর্ম্ম দেখিতে পায়, সে ই মনুষ্য মধ্যে যথার্থ বুদ্ধিমান, সে ই প্রকৃত মুক্তপুরুষ, সে ই প্রকৃত কর্ম্মকারী অর্থাৎ ঋষি। গীঃ ৪ ১৭।১৮ শ্লোঃ কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ পাণ্ডবেরাও সেই মানুষ ছিলেন যে, তাই তাহারা এমন ভাবে দ্রৌপদীর বিবাহ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এমন

কর্ম্ম করিবার লোক বুঝি তখন ভারতে আর কেউ ছিল না। এখন বিবাহ রহস্য শ্রবণ কর।

লীলা—দ্রুপদ রাজ্যে এক কুমারের কারখানাঘরে মায়ের কাছে যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব লইয়া বসিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা স্ববীর্য্যে কত আস্থাবান, সব রাজাকে জয় করিতে ভীমার্জ্জুনই যেন যথেষ্ট! যুধিষ্ঠির যুদ্ধ জয়ে নিশ্চয় করিয়া, মা বা যুদ্ধ কোলাহলে ব্যাকুলা হন, তাঁর বা কোন বিপদ ঘটে, সুকুমার কনিষ্ঠদ্বয় যুদ্ধে লাগিয়া বা আহত আদি হয়, ভাবিয়া ভ্রাতাদ্বয় লইয়া মায়ের নিকট আসিয়া নানা কথা বলিতেছিলেন, তবু যুদ্ধের কথা কিছুই বলেন নাই। মাতাও আজ বিমনা, তাঁর পুত্রগণ আজ রাজ পরিচয়ে থাকিলে, তারাওত এই স্বয়ম্বরে আসিত, হয়ত তাঁর পুত্রগণই লক্ষ্যভেদ করিত। আজ ব্রাহ্মণের বেশে পলাইত পুত্রগণ, লক্ষ্যের নিকটও যে যাইতে পারিবে না। এমন সময় যুদ্ধ বিজয়ী পুত্রদ্বয়, আজ জগতের সর্ব্ব রাজার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহাদের মস্তকমণি লুটিয়া লইয়া দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি আনন্দে ভীম মাকে ডাকিয়া বলিল, "এসে দেখ মা, আজ কি মহাভিক্ষা আনিয়াছি।" ভীমের যে আজ আনন্দের সীমা নাই, আজ মহা-শত্রু দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনিকে রিক্তহস্তের কিছু বল দেখাইয়া আসিয়াছে। কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম মধ্যে পড়িয়া গেল, নচেৎ অদ্যই সব কামনা পূর্ণ করা হইত। পুত্রের আহ্বানে মাতা আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "যা আনিয়াছ বাবা, পঞ্চজনে ভোগ কর, আমি দেখিয়া চোখ জুড়াই।" কিন্তু দ্বার খুলিয়াই সম্মুখে দেখিলেন অপূর্ব্ব এক সুন্দরী কন্যা লইয়া পুত্রদ্বয় দণ্ডায়মান। মাতাকে বিস্মিতা দেখিয়া ভীম একে একে সব কথা বলিয়া দ্রৌপদীর পরিচয় দান করিল, বলিল, "রাজারা লক্ষ্যভেদ করিতে কেউ পারিল না মা, অর্জ্জুন সে লক্ষ্যভেদ করিয়াছে। ব্রাহ্মণে লক্ষ্যভেদ করিয়া, রাজাদের অসম্মান করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যাইবে বলিয়া, সব রাজা যুদ্ধ করিয়া

দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল। আমি ও অর্জ্জুন সব বেটাকে আচ্ছা করিয়া শিক্ষা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। আমি দুর্য্যোধনকে কিছু শিক্ষা দান করিয়াছি, অর্জ্জুনও কর্ণকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম দ্রোণ মধ্যে না পড়িলে, আরও কিছু শিক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল।" দ্রৌপদী কুন্তী দেবীর মহিমা মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া ও ভীমার্জ্জুনের মাতা জানিয়া, ভক্তিভরে মায়ের পদতলে প্রণাম করিল। আর কুন্তী দেবীও প্রার্থনার বস্তুকে সত্যই হস্তগত দেখিয়া, আদরে বুকে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন, মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে হাতে ধরিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট লইয়া বলিলেন, "পুত্র, এ কেমন হইল? ভীম ভিক্ষা দ্রব্য আনিয়াছে বলায়, আমি তাহা পঞ্চজনে সমানে ভোগ কর বলিয়া ফেলিয়াছি। এযে দ্রব্য নয়। এই দ্রৌপদীকে কি করিয়া তোমরা পঞ্চজনে সমানে ভোগ করিবে? অথচ তোমরা যে মাতৃবাক্য কখনও লঙ্ঘন কর না। অবিচারে মাতৃপিতৃবাক্য প্রতিপালন করাই যে তোমাদের কুলধর্ম্ম! সেই কুলধর্ম্মকে এখন কি করিয়া রক্ষা করিবে? আবার দ্রৌপদীরও সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া চাই! তুমি ইহার ব্যবস্থা কর!" যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজার পণ ছিল, যে লক্ষ্য ভেদ করিবে এই কন্যা তাহার হইবে। তুমি লক্ষ্যভেদ করিয়াছ তুমি ইহাকে বিবাহ কর!" অর্জ্জুন বলিল, "আমি আমার জন্য লক্ষ্য ভেদ করি নাই, এই দ্রৌপদী আপনার, আপনি ইহাকে বিবাহ করুন। আপনার বিবাহ না হইলেত আমাদের বিবাহ হইতে পারে না!" তখন ধর্ম্মরাজ কতক্ষণ চিন্তা করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সর্ব্ব ভ্রাতাই অপূর্ব্ব সুন্দরী দ্রৌপদীকে, অতি আনন্দে দর্শন করিতেছে। তখন তিনি মাতাকে বলিলেন, "মা তোমার বাক্যই রক্ষা করিব, দ্রৌপদীকে আমরা পঞ্চজনেই বিবাহ করিব। সে আমাদের পঞ্চজনেরই সম ভোগ্যা হইয়াও ব্রহ্মচারিণী সতী থাকিবে।" এরপর তাহারা ভোজনাদি করিতে ব্যস্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ কালেই ভীমার্জ্জুনকে দেখিয়া চিনিয়াছিলেন, তাই পিছে লোক লাগাইয়া, অবস্থান জানিয়া রাত্রিতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। হারান ধনের পুনঃ প্রাপ্তির ন্যায়, অতি ভালবাসার পিসীমাতা ও তার পুত্রগণকে ফিরিয়া পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না। পাণ্ডব যে শ্রেষ্ঠ মানবের মত, অপরের সাহায্য না লইয়া নিজবলে ভাগ্য লাভে চেষ্টিত হইয়াছে ও তাহাতে সক্ষমও হইয়াছে, সেই জন্যও তিনি আনন্দে তাহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া গেলেন। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নও লুকাইয়া ভগ্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সব দেখিয়া, ইহাদিগকে পাণ্ডব বলিয়া নিশ্চয় করিলেন ও পিতাকে ইহাদের সংবাদ দান করিলেন। পরদিন রাজা রথ পাঠাইয়া মিনতি জানাইয়া মাতাসহ পাণ্ডবগণকে ঘরে তুলিয়া লইলেন ও পরিচয় জানিয়া মহানন্দে মহা মহোৎসব করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠবীর, পরমধার্ম্মিক পাণ্ডব আজ তার জামাতা হইয়াছে। এরপর পঞ্চপাণ্ডবের সহিত পৃথক পৃথক দিনে দ্রৌপদীর পঞ্চবার বিবাহ সম্পন্ন হইল।

শুরু—বৎস, পাণ্ডবগণ এই বিবাহ ভোগের বিবাহ করেন নাই, ত্যাগের বিবাহ করিয়াছিলেন। তাই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিল, "তোমার কথাই থাকিবে মা! পঞ্চজনেই সমান ভাবে এই দেবীকে ভোগ করিব, অথচ দ্রৌপদীর সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা পাইবে।" বাবা, উদ্যোগপর্ব্বে পাণ্ডবের মহাশত্রু ধৃতরাষ্ট্রও রাজসভা মধ্যে, যে দ্রৌপদীকে মহাব্রহ্মচারিণী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, তাহাকে কি তুমি অব্রহ্মচারিণী বলিতে চাও! ধৃতরাষ্ট্র মহাদুঃখে বিলাপ করিয়া বলিয়াছেন—"আমি যুধিষ্ঠিরের তপ, অর্জ্জুনের অস্ত্র ও ভীমের বাহুবলকেও ভয় করি না, এই চিরব্রহ্মচারিণী দ্রৌপদীর ক্রোধকে যত ভয় করি। এই দ্রৌপদীদেবী যার উপর ক্রুদ্ধা হইয়াছে, সেত নষ্ট হইয়া রহিয়াছে।" এমন দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ মধ্যে কি

ভোগ ছিল মনে কর বাবা? এই বিবাহ মহাত্যাগের বিবাহ; হিন্দুর আর্য্যত্বের এক চরম নিদর্শন। এক পাণ্ডবগণ বিনে এই ধর্ম্ম আচরণের দ্বিতীয় পাত্র সেইকালেও বুঝি আর কেউ ছিল না। বাবা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি টুকু ছাড়িয়া দিলে, দশজনেও এক রমণীকে বিবাহ করিলে রমণীর সতীত্ব ও ব্রহ্মচারীত্ব নাশ হয় কি?

শিষ্য—প্রভু, পঞ্চজন হইতে পঞ্চটী সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াও দ্রৌপদীদেবী ব্রহ্মচারিণী সতী রহিলেন, ইহা যে বুঝিয়া উঠিতেই পারিতেছি না। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না থাকিলে সন্তান জন্মিল কি করিয়া প্রভু?

গুরুদেব—বাবা, ধর্ম্মরাজের ইচ্ছা ছিল, ইন্দ্রিয় ভোগ ছাড়িয়া, পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর সেবা ও ভালবাসাই সমভাবে ভোগ করিবেন—তবেই সমান ভোগও হইবে, দ্রৌপদীর সতীত্বও রক্ষা পাইবে। কিন্তু পরে ঋষিগণ সহ বিচারে দেখিলেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" সন্তান না জন্মিলে বিবাহের সার্থকতাই বাকী থাকে। তাই নারদ ঋষির পরামর্শে একটী করিয়া সন্তান পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ রাখা হইল। সন্তান ইচ্ছা বিনে ও গর্ভধারণক্ষম সময়—ঋতু কালের দশম রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি মধ্যে, এই সময় বিনে, তাতেও শুভ তিথি যোগ না হইলে যে ইন্দ্রিয় তর্পণ, ঋষিদের মতে তাহা অব্রহ্মচর্য্য ও বেশ্যা গমন তুল্য তুষ্য। পাণ্ডবগণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দ্রৌপদীতে পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই পঞ্চ পাণ্ডবই আবার বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাহাতে আরও সন্তানও হইয়াছিল। দ্রৌপদীদেবী পঞ্চস্বামী পাইয়াও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়াই, তাহার ব্রহ্মচর্য্যের এত গৌরব ছিল। তাইই বনগমন কালে,কুন্তী দেবী নকুল ও সহদেবকে দ্রৌপদীর হাতে সপিয়া দিয়া, পুত্রের মত দেখিতে ও যত্ন করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। দ্রৌপদী সত্যই ব্রহ্মচারিণী ও সতী ছিলেন, ঋষিদের মতে মাত্র পুত্রার্থে ইন্দ্রিয় বিহারে

ব্রহ্মচর্য্য নাশ হয় না, তাই এক স্ত্রী ব্রহ্মচারী বলা হয়। এইজন্যই সেই কালে নিঃসন্তান বিধবাও এই নিয়মে ভ্রাতা, দেবর বা ব্রাহ্মণ হইতে একটী সন্তান গ্রহণ করিয়া বিবাহ পূর্ণ করিতেন, ইহাতে তাঁহারা পতিতা হইতেন না।

বাবা, এই বিবাহ কি সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল? আজ কালের মত যথেচ্ছাচার করিবার যুগ সেকালে ছিল না, আর পাণ্ডবগণও যথেচ্ছাচার করিবার লোক নন। নারদ, ব্যাস আদি ঋষিগণ, পুরোহিত, রাজা-দ্রুপদ ও তার সভাসদ পণ্ডিতগণ, কুন্তী দেবী, পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী দেবীকে লইয়া, পুরাণাদি শাস্ত্র বিচার করিয়া সকলের মত হইলে এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল। দ্রুপদ কি সহজে স্বীকার করিয়াছিলেন! যখন পুরাণ হইতে এইরূপ বিবাহ আরও হইয়াছে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিল, তাহারা এইরূপ আচরণ করিয়াও মহত্তের মত সাধন শক্তি দেখাইয়াছে প্রমাণ দিল, তখন তাঁহার সম্মতি হইল। এই বিষয়ে যযাতি রাজার কন্যা মাধবী দেবীর দৃষ্টান্তই অধিক জীবন্ত। এই উপাখ্যান কোনও মহাভারতে এইস্থানে ও কোনও মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে অতি আগ্রহের ফল জন্য নারদ ঋষি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানেরই অধিক উপযোগী।

শিষ্য—প্রভু, আমাদিগকে সেই মাধবীদেবীর কথাটুকু বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

লীলা—বিশ্বামিত্রশিষ্য গালব শতবর্ষ গুরুর সেবা করিলে, গুরু তুষ্ট হইয়া বর দ্বারা তাহাকে সর্ব্ববেদ দান করিলেন। গালব গুরুকে দক্ষিণা গ্রহণ করিতে বলিলে, তিনি বলিলেন "তোমার সেবাই যে যথেষ্ট দক্ষিণা পাইয়াছি, আর দক্ষিণার কি প্রয়োজন!" দক্ষিণা গ্রহণের জন্য গালব অতি আগ্রহ করিতে থাকিলে, বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অষ্টশত অশ্বমেধের অশ্বতুল্য শুভ লক্ষণ অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। গালব এই অশ্ব দান অসম্ভব বলিয়া মৃত্যু সঙ্কল্প করিলে, তার বন্ধু গরুড় তাহাকে লইয়া সম্রাট যযাতির নিকট উপস্থিত

হইলেন। সেইকালে সম্রাট যযাতি যজ্ঞেব্রতী ছিলেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রার্থীর সর্ব্বপ্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিবেন। কিন্তু যেই কালে গালব উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা তাঁর সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা গালবের প্রার্থিত পূরণে অশক্ত হইয়া, ব্রতভঙ্গ ভয়ে ভীত ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। পরে বিচার করিয়া নিজের অতি সুলক্ষণা, ঋষিগণ কর্ত্তৃক চারিটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র লাভের বর প্রাপ্তা কন্যা, মাধবী দেবীকে গালব করে দান করিয়া বলিলেন, "আমার এই কন্যাকে আপনি আপনার প্রার্থনার মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করুন! এই কন্যা অতি সুলক্ষণা ও গুণবতী, তাতে ঋষিগণ ইহার চারিটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে বলিয়া বরদান করিয়াছেন। কোনও রাজার নিকট অশ্ব থাকিয়া থাকিলে, সেই রাজা চক্রবর্ত্তী-পুত্রের বিনিময়ে, নিশ্চয় আপনাকে অশ্ব দান করিবেন! পরে কন্যা আমায় ফিরাইয়া দিবেন।" গালব এক রাজার নিকট দুইশত অশ্বের সংবাদ পাইলেন। সেই রাজা বলিল, "আমার মাত্র দুইশত অশ্ব আছে, আমায় যদি বিনিময়ে একটী পুত্র দেন, আমি এই অশ্ব দিতে প্রস্তুত আছি।" গালব তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন ও পুত্র হইলেই, আবার কন্যাকে লইয়া অশ্ব-জন্য অন্য রাজার নিকট গমন করিলেন। সেই স্থানেও দুইশত অশ্ব পাইয়া তাহাকে এক পুত্র দান করিলেন। এইরূপে তিন স্থানে বিবাহ দিয়া ছয়শত অশ্ব লইয়া গুরুকে এই অশ্ব ও কন্যাদান করিলেন। বিশ্বামিত্রও একপুত্র লাভ করিয়া আর দুইশত অশ্ব হইতে তাহাকে মুক্তিদান করিলেন, গালবের দক্ষিণা দান পূর্ণ হইল। গালব মাধবীদেবীকে তাঁহার পিতার নিকট দিয়া আসিলে, কন্যার বিবাহ জন্য রাজা স্বয়ম্বর আয়োজন করিয়া রাজগণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। কিন্তু কন্যা সভায় দাড়াইয়া বলিলেন, "সন্তান জন্য বিবাহের প্রয়োজন, আমার যখন তাহা লাভ হইয়াছে, আর বিবাহে প্রয়োজন কি? আমি ব্রহ্মচর্য্যকেই বরণ করিলাম।" সেই হইতে কন্যা

তাপসী হইয়া বনে চলিয়া গেলেন। মাধবীদেবীকে চারিবার বিবাহ-কর্ত্তা চারিজন রাজাই, ভারতের প্রসিদ্ধ চারিজন ধার্ম্মিক মহারাজা ও পুত্র চতুষ্টয়ও স্বনাম ধন্য চক্রবর্ত্তী-রাজা। প্রথম স্বামী অযোধ্যারাজ হর্য্যশ্ব পুত্র বসুমান, দ্বিতীয় কাশীপতি দিবোদাস পুত্র প্রতর্দ্দণ, তৃতীয় রাজা উশীনর পুত্র কপোত জন্য মাংসদাতা রাজা শিবি, চতুর্থ বিশ্বামিত্র পুত্র রাজা অষ্টক।

এই চারি ভ্রাতার পরস্পর বড়ই সৌহৃদ্য ছিল, এক সময় এই চারিভ্রাতা একত্র হইয়া একস্থানে যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিল, সেইকালে পরলোক গত যযাতি ক্ষীণপুণ্য জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছিলেন। পুত্রগণ একজনকে পতিত হইতে দেখিয়া, দয়াযুক্ত হইয়া পতন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যযাতি পুণ্যক্ষয়ে পতন বর্ণনা করিলেন। তখন সেই পুত্রগণ বলিল, "আপনি আমাদের পুণ্য গ্রহণ করিয়া পুনঃ স্বর্গে গমন করুন।" রাজা বলিলেন "আমি ক্ষত্রিয় রাজা, আমি ত পরের দান গ্রহণ করিতে পারি না। দান গ্রহণে ব্রাহ্মণের অধিকার।" এই পুত্রদের মাতাও সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি ইহাদের দান গ্রহণ করিতে পারেন, ইহারা আপনার দৌহিত্র, আমার সন্তান"। তখন যযাতি তাহাদের পুণ্য গ্রহণ করিলেন। ক্রমে চারি পুত্র পুণ্যদান করিতে থাকিলে রাজা ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বর্গ পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না। তখন কন্যা উঠিয়া বলিলেন, "পিতঃ আমি চিরকাল ব্রহ্মচয্য পালন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনাকে দান করিলাম, আপনি স্বর্গে গমন করুন।" সেই ফলে যযাতির স্বর্গলাভ হইল। দ্রৌপদী দেবীও এই মাধবী দেবীর মত চিরব্রহ্মচারিণী সতী ছিলেন; তাই ঋষিগণ দ্রৌপদী দেবীকে সীতা, সাবিত্রির মত সতী সংজ্ঞায় তুলিয়া লইয়াছেন! এই বিবাহ করিয়াই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন,

সেইদিন হইতে তাঁহাকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঋষিগণও স্বীকার করিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচারিণী ছিলেন বলিয়াই দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবেরই প্রাণসমাপ্রিয়া ছিলেন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াসখী হইতে পারিয়াছিলেন। মহাভারতে কুন্তী দেবীর দ্বিতীয় মূর্ত্তিই এই দ্রৌপদী দেবী। বনপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া সত্যভামাদেবী দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবেরই অতিপ্রিয়া দেখিয়া, তাহার নিকট স্বামী বশ করিবার ঔষধ খুঁজিতে গিয়াছিলেন। সত্যভামা বলেন, "আমরা এতজনেও এক স্বামীকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছি না, তুমি কি করিয়া এই পঞ্চজনকে এমন করিয়া বশীভূত করিয়াছ। এই স্বামী বশের ঔষধ আমাকে শিখাইয়া দাও।" সেই কালে দ্রৌপদী দেবী তাহার সংসারী-লীলার কর্ম্ম সমূহ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব রমণীর এক আদর্শ চিত্র। তেমন রমণী সত্যই সকলের প্রাণ সমা হইয়া থাকেন। তেমন রমণীই এই কর্ম্মক্ষেত্র রূপ সংসারে কর্ম্মবীর পুরুষগণের শান্তির আশ্রয়, জীবগণের সুখ শান্তির পাদপ, পুরুষের আয়ু-বীর্য্য-বর্দ্ধক গৃহলক্ষ্মী; ইহারাই শক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রী। তাই বলিয়াছিলাম দ্রৌপদীর বিবাহ ভোগের বিবাহ নয়, মহা ত্যাগের বিবাহ।

শিষ্য—প্রভু, ত্যাগের দিগ আমাদিগকে আরও সরল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

গুরু—প্রথমে দেখ, এ জগতে পশুও যেই পত্নীর ভোগভাগ অপরকে দান করিতে প্রস্তুত নয়, পাণ্ডব শুধু মায়ের বাক্য রক্ষার জন্য সেই পত্নীভোগ ভাগ করিয়া দিল। জগতে আর সব দ্রব্যই অপরকে ভোগ করিতে দান করা যায়, পত্নীদান কখনও শুনিয়াছ কি? দ্বিতীয়—যেমন তেমন পত্নী নয়, যেই রমণী লাভজন্য সহস্ররাজা উন্মাদবৎ হইয়া, রাজ্যধন বিনিময়ে বা অধর্ম্ম পথে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল! এমন রমণীকে হাতে পাইয়াও ধর্ম্মরাজ এবং অর্জ্জুন অপরকে

ভোগ অধিকার দান করিল, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিল। তৃতীয়তঃ আরও ভাবিয়া দেখ, নিজ পত্নীর নিন্দা, নিজেদের নিন্দা শ্রবণ করা কত কষ্টকর! মায়ের বাক্য রক্ষারই জন্য পাণ্ডবগণ আজ একটী মহানিন্দা মস্তকে তুলিয়া লইল। পঞ্চজনের পত্নী বলিয়া, তাহাদের প্রাণসমা পত্নী দ্রৌপদীদেবীকে সাধারণে অসতী বলিয়া কটাক্ষ করিবে, তাঁহাদিগকেও নিন্দা করিবে, এই বিষয় কি আর পাণ্ডবগণ জানিত না? তাই বলিয়াছি বাবা, পাণ্ডবের এই বিবাহ ভোগের বিবাহ নয়, মহাত্যাগের বিবাহ। তত্ত্ব রাজ্যেও এই বিবাহ সন্তোষলাভের এক অদ্ভুত রহস্য। "তোমরা পঞ্চজনে সমানে ভোগকর।" কুন্তীদেবীর এই বাক্য, নিবৃত্তি মায়ের সন্তানগণ পূর্ণজ্ঞানী হইয়া সন্তোষ লাভের অধিকারী হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ। আজ নিবৃত্তিমাতা ইচ্ছা করিয়াই পাণ্ডবের ভীষণ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, হঠাৎ অনিচ্ছায় বলিয়া ফেলেন নাই।

শিষ্য—সে আবার কি কথা প্রভু! সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বরাজ্যের কথাও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন।

ভক্ত—বাবা, 'তত্ত্বানুসারিণী লীলা।' আধ্যাত্মিক তত্ত্বটীই জড়দেহে বাহির্ম্মুখী হইয়া লীলারূপে জগতে প্রকাশিত হইতেছে। আধ্যাত্মরাজ্যে কামচক্র ভেদ করিলেই সন্তোষ ভোগের অধিকার হয় না বাবা! সন্তোষ তাঁর হস্তগত হয় মাত্র, ভোগের অধিকার আরও উপরে। যেমন বৃক্ষ হইতে ফল পারিয়া আনা এক কথা ও তাহাকে আহার করা আর এক কথা, এও সেইরূপ। হস্তগত সন্তোষকে, যাহারা নিবৃত্তি মায়ের আদেশে অর্থাৎ নিবৃত্তি ধর্ম্মের অধীন হইয়া, পাঁচজনকে লইয়া সমানে ভোগ করিতে চেষ্টা করে, তারাই মাত্র সন্তোষ ভোগের অধিকারী। অপরের তৃপ্তি সন্তোষের দিকে যাহার দৃষ্টি নাই, কেবল নিজেই সন্তোষ পাইতে চেষ্টান্বিত, এমন লোকেরা লক্ষ্যভেদ করিয়া সন্তোষ হাতে পাইলেও তাহার ভোগের অধিকার পায় না।

চুন শাস্ত্র অনুবর্ত্তী হইয়াই জ্যেষ্ঠকে সর্ব্ববিষয়ে অধিকারী করিয়াছিল, ও জ্যেষ্ঠের বিবাহ অগ্রে করাইতে প্রস্তুত হইয়া, দ্রৌপদীকে জ্যেষ্ঠের করে সমর্পণ করিয়া দিল। আবার ধর্ম্মরাজও যখন দেখিলেন, সব ভ্রাতাই তদ্গত হইয়া দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া আছে—সকলেই যেন দ্রৌপদী পাইলে সুখী, তখনই তিনি সকলকে সমভাবে দ্রৌপদী ভোগ করাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাদিগকে অসন্তোষ করিয়া একা সন্তোষ ভোগে তাঁহার ইচ্ছা আর হইল না। বাবা, এইরূপ অর্জ্জুনের মত যাহারা শুধু নিজের তৃপ্তির ও সন্তোষ জন্য, কিছুতেই শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নয়, তারাই প্রকৃত সন্তোষকে ভোগ করিবার অধিকার লাভ করে। আর যারা এই ধর্ম্ম রাজের মত পাঁচজনকে সন্তোষ দিয়া নিজে সন্তোষ পাইতে চেষ্টা করে, তারাই প্রকৃত সন্তোষ লাভ করিয়া ধন্য হয়। সত্যই এই দ্রৌপদী দেবী যেমন একাধারে মাতা, পত্নী, সখী, দাসী ও শিষ্যা হইয়া, সম্পদে, বিপদে, দুঃখে ও দরিদ্রতায় সর্ব্বাবস্থায় পাণ্ডবের সহায়তা ও সেবা করিয়াছিল তখন সন্তোষ দেবী সেই সন্তোষ সাধককে এইরূপই সর্ব্বাবস্থার সন্তোষ পাইবার অধিকারী করেন; ইহাই প্রকৃত সন্তোষ দেবীকে লাভ করা। আর যাঁরা স্বয়ম্বর সভার রাজগণের মত, শুধু স্বতৃপ্তির জন্য অশাস্ত্রমতে এই দেবীকে গ্রহণ করিতে ধাবিত হয়, তাহারা এই দেবীর ছায়াও প্রাপ্ত হয় না! তাহারা জরাসন্ধ, দুর্যোধন, কর্ণাদির মত প্রচুর রাজসম্পদ, শিক্ষা শক্তি পাইয়াও, সর্ব্বদা অতৃপ্তি অসন্তোষ ভোগ করিতে থাকে। এখন হইতে মহাভারতের শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পাণ্ডবের সন্তোষ ভোগ ও অসুরদের যে কোথায় কোন অবস্থায়ই সন্তোষ নাই তাহাই প্রদর্শিত হইবে। এই দ্রৌপদী লাভই জীবলীলার মূল সূত্র জানিবে বাবা।

শিষ্য—প্রভু! অপরকে অসন্তোষ না দিয়া সমভাগে সন্তোষ ভোগই যদি সন্তোষ লাভের যোগ্যতা, তবে পাণ্ডবগণ অন্য রাজাদিগকে

অসন্তোষ দিয়া সন্তোষভোগ করিল কেন? মাত্র পঞ্চপাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী হইল, অন্য কেউ হইল না কেন?

গুরু—ইহাতেও রহস্য আছে বাবা। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীই নিত্য, ইহার আর ষষ্ঠস্বামী নাই! এই পঞ্চস্বামীতেও তত্ত্ব আছে। মাত্র, জ্ঞানযোগী, রাজযোগী, ভক্তিযোগী এবং সকাম ও মোক্ষকামী দ্বিবিধ কর্ম্মযোগী, এই পঞ্চ যোগপথী বই সন্তোষের আর ভোক্তাস্বামী নাই, ইহারাই দ্রৌপদী দেবীর নিত্য পঞ্চস্বামী। অন্য রাজগণ কেন সন্তোষ পাইবার অধিকার পাইল না, তাহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাবা, শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘনকারী, স্বসুখ মাত্র অন্বেষণা এই দেবীর ছায়া প্রাপ্তিরও অধিকারী নয়, তারা কি করিয়া দ্রৌপদী দেবীকে লাভ করিবে। আর পাণ্ডবগণ যে সর্ব্বদাই অশাস্ত্রপথে সন্তোষ আক্রমণকারীর বিপক্ষ হইয়া অস্ত্র লইয়া দাড়াইয়া আছে। তাই তাহারা স্বয়ম্বর কালে অন্যায় আক্রমণকারী রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাড়াইয়া দিল। তারা যে নিজেদের তৃপ্তিসুখ বা মরণের ভয়েও শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘনে প্রস্তুত নয়, শাস্ত্র সদাচার রক্ষায় সর্ব্ব জগতের সঙ্গেও যুদ্ধ ঘোষণায় প্রস্তুত! দেখিবে এই জন্য একদিন আর্ত্ত ও অত্যাচারিতের পক্ষ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও ইহারা যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। তাই বলিলাম বাবা, মাত্র পঞ্চপাণ্ডব বিনে দ্রৌপদীলাভের আর ষষ্ঠপাত্র নাই। বাবা, এই পঞ্চযোগপথে গমনে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া যারা এই সব যোগ আচরণ বিনে, নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মাচরণে ব্রতী হয়, তাহারাই শুধু দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা অসুরত্বের হাত এড়াইয়া, পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিয়া সন্তোষ লাভের অধিকারী হয়।

বৎসগণ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দ্বারা, অসুর ও দেবত্বের স্বরূপ দর্শন করিলেত। অন্ধপ্রবৃত্তির সন্তানগণ কত আড়ম্বর বলাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া, নিজেই যেন জগতের শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রকাশ জন্য বহু রত্নখচিত সজ্জা, যান বাহন

দেখাইয়া দর্পে অহঙ্কারে উচ্চ রত্নসিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়াছিল। দ্রৌপদী-লাভের কত সুখ স্বপ্নই না দেখিতেছিল, লক্ষ্যভেদ জন্য কত ব্যস্ত হইয়া ধাবিত হইয়াছিল। আবার ধর্ম্মপথে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভে অক্ষম হইয়া, কত দর্পে ক্রয় করিতে ও অধর্ম্ম পথে বল করিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিতে ধাবিত হইয়াছিল। তাহাদের আশা ভগ্ন হইল, দর্প চূর্ণ হইল, অহঙ্কার খর্ব্ব হইল, অস্ত্র প্রহারে সুবেশ স্খলিত, দেহ ছিন্ন হইল, বল নিহত হইল, তাড়িত পলাইত হইয়া তাহাদের স্বদেশে ফিরিতে হইল। ইহাই অসুর প্রকৃতির প্রকৃত শোভা তাহাদের পূর্ণত্বের স্বরূপ। সত্যের রাজ্যে, মিথ্যা অসুরত্বের ইহাই যথার্থ প্রাপ্য ফল; অসুরেরা সর্ব্বদিকে এইরূপ লাভ লইয়াই অনিত্যরাজ্যে ঘুরিতে থাকিবে। আর শুদ্ধাপ্রবৃত্তি নিবৃত্তির সন্তানগণের স্বরূপ দেখিলেত? তাহারা স্বভাবতঃ যেন নিস্তেজ বীর্য্যহীনের মত, ভোগ স্বাধীনতায় নিবৃত্ত, শত্রুবর্গ হইতে পলাইত, ছদ্মবেশে যেন হীন, দীন ভিখারীবৃত্তিপর ব্রাহ্মণের মত। স্বয়ম্বর সভায় হীনবেশে হীন আসনে থাকিয়াও তাহারাই সকলের দুর্ভেদ্য দুর্জ্জয় লক্ষ্য ভেদ করিয়া ফেলিল সমবেত রাজাগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে পরাজয় করিয়া দিল, সর্ব্বরাজার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহাদের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষার দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইয়া আসিল। ইহাই দৈব প্রকৃতির শোভা ও তাহাদের সত্য স্বরূপ। মুখে দর্প নাই, বাহিরে আড়ম্বর নাই, গ্রহণে ব্যস্ততা নাই, বিবাদে অগ্রবর্ত্তীতা নাই, অথচ বিশ্বের সর্ব্বপ্রলোভন বা ভয়েও ইহারা স্বকর্ত্তব্য—শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। ধর্ম্ম পথে বিপক্ষ হইয়া দাড়াইলে অসীম বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রসম শত্রুকেও পরাজয় করিয়া দিব, ইহাই দৈব প্রকৃতির স্বভাবের পূর্ণস্বরূপ ও শোভা। অন্ধপ্রবৃত্তি তার পুত্রগণকে শিশুকাল হইতে সুখভোগ, অহঙ্কার ও স্বাধীনতা দান করিয়া সন্তানকে অতিজীবন দান করিতে যাইয়া, কেবল হীনত্ব, পরাজয় ও ধ্বংসের পথে লইয়া গেল। আর নিবৃত্তিমাতা তাঁর সন্তানগণকে শিশুকালে,

ভোগহীনতা, পরাধীনতা, দুঃখদরিদ্রতা দান করিয়া, সর্ব্বদা শাস্ত্র অধীনতায় মৃতের মত নগণ্য করিয়া রাখিয়া, কেমন মহত্ব, বিজয় ও অমৃতের পথে লইয়া গেল। পাণ্ডব নিবৃত্ত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া অন্ত সন্তোষ-দ্রৌপদী দেবীকে লাভ করিতে পারায়, পাণ্ডবের সর্ব্বদিকের অসন্তোষ ও অশান্তি দুঃখই চুলিয়া গেল। "তস্মিনতুষ্টে জগৎতুষ্ট" ভগবানের তুষ্টিতে আর কে তাহাদের প্রতি অতুষ্ট থাকিতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবের দ্রুপদ আশ্রয়, দ্রৌপদী লাভে লক্ষ্যভেদ ও সর্ব্বরাজগণকে পরাজয় করণ বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাহাদের বীর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। নিজের দুর্ম্মতি পুত্রদের বীর্য্যে ও বাক্যে অনাস্থা আসিল ও আবার বিদুর, ভীষ্মাদির প্রতিও শ্রদ্ধা হইল! তাহাদের পরামর্শ অধীন হইয়া, বহু উপচার সহিত বৃদ্ধ আত্মীয়গণকে পাঠাইয়া, বহু আদর সম্মান দেখাইয়া, দ্রৌপদী সহিত সমাতা পাণ্ডবগণকে ঘরে তুলিয়া লইলেন। এইস্থানেই আদিপর্ব্বের শেষ হইল।

এর পরে জীব উভয়ের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নিজের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিল। অসুরপ্রকৃতিগণকে নিজের শাসনে সংযত করিয়া ও দৈবপ্রকৃতিগণকে স্বাধীনভাবে কর্ম্মাধিকার দান করিয়া, এবার দৈব ও আসুর উভয়মিশ্রিত রজোগুণীয় কর্ম্ম দর্শনের ইচ্ছা করিল। এই তত্ত্বই পাণ্ডবদিগকে সাদরে আনিয়া রাজ্য দান করা। সর্ব্বাধিকার দান করিলেন না! অসুরপুত্র-স্নেহে তাহাদের স্বার্থ সুখ ছাড়িতে মতি হয় নাই, তাই পাণ্ডবগণ দ্বারা পুত্রদের ভয়নাশ ও সুখবর্দ্ধনের উপায় করিয়া দিলেন মাত্র। পাণ্ডবের বিজয় গৌরবাদিতে অন্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা ও বিজয় গৌরব লাভ করিবে ও ধার্ত্তরাষ্ট্রের বিপদে পাণ্ডব সাহায্য করিবে। এই জন্যই সন্ন্যাসী-পাণ্ডবকে রাজ্য সম্পদ দিয়া, সত্ত্বগুণকে একটু নামাইতে চেষ্টা করিলেন, আবার পাণ্ডবের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, নিজে কর্ত্তা হইয়া, বিদুর, ভীষ্মাদির শাসন পরামর্শ আদি দ্বারা, নিজ পুত্রগণকেও একটু তুলিয়া দিতে—তমঃ হইতে

রজোগুণীয় করিতে চেষ্টা করিলেন। জীব এই অধ্যায়ে পূর্ণরূপে দুর্য্যোধনের অধীন হইয়া বদ্ধতমোগুণের রাজত্ব করিয়াছিল। সেই অধিকারে দৈব ও অসুরের কর্ম্ম ও লাভালাভ দর্শন করিয়াছ, এখন হইতে জীবের রজোগুণীয়-রাজ্যে উভয় প্রকৃতির অবস্থা ক্রিয়াশক্তি আদি দর্শন করিবে। রজোগুণীয়-রাজ্য সৌপ্তিকপর্ব্বে শেষ হইয়া, অশ্বমেধপর্ব্বে সত্বগুণীয়-রাজ্য প্রদর্শিত হইবে। তারপরে গুণসাম্যে মহাপ্রস্থান করাইয়া, গুণাতীতে স্বর্গারোহণ বর্ণিত হইবে। এখন সত্বগুণের অধীন রজগুণীয়-রাজ্যের দৈবপ্রকৃতির কর্ম্মপরিচয়, সভাপর্ব্বের পাণ্ডব লীলায় দর্শন কর।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

সভা-পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

পরিচয়।

দৈবপ্রকৃতির বিষয়-বিহার সংবাদ;

(আদিপর্ব্বে দৈবপ্রকৃতি কেমনে তামস আসুরমায়া অবিদ্যাকে জয় করিয়া শুদ্ধ সত্বগুণ আশ্রয়ে লীলা করে, তাহাই পাণ্ডবগণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইবার সেই পূর্ণজ্ঞান-শক্তি সমন্বিত দেবপ্রকৃতিকে বিষয়-রাজ্যের কর্ম্মভার অর্পণ করিলে, তাহারা কেমনে এই দুঃখ অশান্তিময়, অপবিত্র বিষয় সংসারকেই সুখ শান্তিময় করিয়া, পবিত্র মধুর লীলা করে তাহাই প্রদর্শিত হইবে। সত্বগুণ আশ্রয়ে রজোগুণের সৌন্দর্য্য প্রদর্শনই এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়।)

১। **অবিদ্যা মায়ার আশ্রয় নাশ**—অসুরেরা অপ্রয়োজন বোধে যে রাজ্যের দিকে ফিরিয়াও চায় না, যাহার মার্জ্জনা বিনে কিছুতেই বিদ্যা পরিস্ফুট হয় না—জ্ঞানদেবের মন্দাগ্নির নাশ হয় না, দেবপ্রকৃতি প্রথমেই তাহা মার্জ্জনা করেন। (খাণ্ডব বন দাহন করিয়া অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি নাশ করা।)

২। **পূর্ণজ্ঞানের ফল পরিচয়**—জ্ঞানাগ্নির মন্দাগ্নি নাশ করিয়া তুষ্ট করিতে পারিলেই, জীব পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্ববিজয় শক্তি, অভ্রান্ত জ্ঞান, অপ্রতিহত গতি লাভ করে এবং ভগবান্‌কে বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারেন। (অগ্নিদেব হইতে পাণ্ডব গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূন, মায়ারথ লাভ করিল ও শ্রীকৃষ্ণকে সখা ও সারথী করিয়া গ্রহণ করিল।)

৩। **অবিদ্যার মূল উচ্ছেদ**—দেহাত্ম অহঙ্কারকে যোগবলে নষ্ট করিয়া, সৎপ্রকৃতি ও ভগবৎভক্তি আদি প্রকৃতিবর্গের উদ্ধার করেন। (জরাসন্ধ বধ করিয়া রাজগণের ও রাজকন্যাগণের উদ্ধার।)

৪। **ধর্ম্মরাজ্য গঠন**—সর্ব্ব প্রকৃতিকে রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও দ্বিবিধ কর্ম্মযোগ দ্বারা আয়ত্ত করিয়া, ধর্ম্মবিধি ও জ্ঞানের অধীন করেন এবং সকলের উপর ভগবানের অবতার-লীলার আদর্শকে স্থাপন করেন। (ভীম অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব দ্বারা চারিদিক বিজয় করিয়া, ধর্ম্মরাজকে সম্রাট করন ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা আদর্শকে জগতে স্থাপন দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞ করেন।)

৫। **দৈবলীলা**—দেহ, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিবর্গের ক্লেশকর ভোগাশক্তির নাশ, এমনকি প্রাণের ভয়েও ভীত না হইয়া শাস্ত্র সদাচার রক্ষার চেষ্টা করা। (পাণ্ডবের জীবনব্যাপী এইরূপ কর্ম্ম হইলেও এই কর্ম্মের দুইটী দৃষ্টান্ত এইখানে বলা হইল।)

(ক) দস্যুর শাসন ও ব্রাহ্মণ রক্ষায়, নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে জানিয়াও, নির্জ্জনে উপবিষ্ট দ্রৌপদী ও ধর্ম্মরাজের নিকটে যাইয়া অর্জ্জুন অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং দস্যু শাসনাদি করিয়া পরে দ্বাদশবর্ষ নির্ব্বাসনে গমন করিলেন।

(খ) আশ্রিত রক্ষা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, দণ্ডীরাজাকে আশ্রয়

দিয়া পাণ্ডব, তাহাদের আদর্শ-পুরুষ, প্রাণেরপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষেও যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে উদ্যত হইলেন।

৬। **দৈবপ্রকৃতির লাভ**—শাস্ত্র, সদাচার ও ধর্ম্ম-সাধনের যেই ফল—পাণ্ডব যশ, কীর্ত্তি, সুখ, সম্মান সমস্তই লাভ করিল।

(ক) প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে নির্ব্বাসনে যাইয়া, অর্জ্জুন কল্যাণময়ী, শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রা দেবীকে পত্নী লাভ করিলেন।

(খ) আশ্রিত রক্ষার্থে প্রাণ দিতে দাঁড়াইয়া, পাণ্ডব সর্ব্ব-দেব বিজয়ী-শক্তি যশ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন।

দৈবপ্রকৃতি পাণ্ডবগণকে কর্ম্মরাজ্যে অধিপতি করিয়া, কুরুসাম্রাজ্য অন্ত সৌন্দর্য্যে, সুখ-শান্তিতে, ভোগ-বিলাসে, বিজয়-সম্মানে, ধন-সম্পদে সর্ব্বদিকে দেবলোককে পর্য্যন্ত পরাজয় করিল। বিষয়রাজ্য শোভায় নন্দনকানন হইল, জীব দেবতা হইল। অবিদ্যার অশান্তি, অতৃপ্তি, বিদ্যার জ্যোতিতে নাশ হইয়া গেল। জ্ঞানের তৃপ্তি ও শান্তিতে জীব সত্য, দয়া ও ভগবানের আরাধনা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

প্রথম অধ্যায়।

দৈবপ্রকৃতির বিষয়-বিহার সংবাদ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপাত্বমহং বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

গুরু—বাবা, এই সভাপর্ব্বের প্রথম অংশ দৈবপ্রকৃতির রজোগুণ আশ্রয়ের ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, দ্বিতীয় অংশে অসুর-প্রকৃতির রজোগুণ আশ্রয়ের ক্রিয়া প্রদর্শিত হইবে—এক কথায় জীবের সত্বমিশ্র রজঃ ও তমঃমিশ্র রজোগুণের স্বরূপ ও ক্রিয়া প্রদর্শন করা হইবে। আদিপর্ব্বে জতুগৃহ-দাহ, লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদি বিবাহাদি লীলার মধ্যে, পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্য হীন শুধু কৃপাচার্য্যের শিক্ষার বা জীবের শুধু সত্ত্বগুণীয় ক্রিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশের পাণ্ডবলীলা দ্বারা দ্রোণযুক্ত কৃপাচার্য্যের শিক্ষার ক্রিয়া বা সত্ব ও রজোগুণ মিশ্র জীবক্রিয়া প্রকাশ করা হইবে। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আদিপর্ব্বে বিষদান, জতুগৃহ দাহ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর আদিতে কৃপাচার্য্য হীন শুধু দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষা বা শুধু তমোগুণাশ্রয়ী জীবের লীলা প্রকাশ করিয়া, এইবার সভাপর্ব্বের প্রথম অংশে তাহাদের কৃপাচার্য্যযুক্ত দ্রোণাচার্য্য শিক্ষা বা রজঃমিশ্র তমোগুণের ক্রিয়া প্রদর্শিত

হইবে। ইহার পর সভাপর্ব্ব দ্বিতীয় অংশে আবার অসুর তমোগুণ আশ্রয় করিয়া দৈবপ্রকৃতিবর্গকে পীড়ন করিবে। দেবপ্রকৃতি শুধু সত্ত্বগুণ আশ্রয়ে সেই অমানুষ অত্যাচারকেও সহ্য করিবে।

সভাপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ের পাণ্ডবলীলার মধ্যে বিদ্যাপ্রকৃতির জীব-মার্জ্জনা অর্থাৎ তমঃগুণ অধিকারের নাশ করিয়া সত্ত্বগুণময় রাজ্য স্থাপন করিতে, কি কি করিতে হয় তাহাই প্রদর্শিত হইবে। দৈব প্রকৃতিবর্গকে কর্ম্ম স্বাধীনতা দিয়া, অসুর প্রকৃতিবর্গকে অধীন করিয়া রাখিতে পারিলে, জীবের বিষয়রাজ্য কিরূপ রূপ ধারণ করিয়া উঠে—তখন তাহাদের লীলা-কর্ম্ম কেমন হয়—আশা ও লাভালাভ ই বা কেমন হয়, একে একে প্রদর্শিত হইবে। ইহাদের প্রথম লীলাই 'খাণ্ডববন দাহন।' এই লীলাই ধর্ম্মরাজ্যের মূলভিত্তি শোধন। দ্বিতীয়ে জরাসন্ধবধ-লীলায় অসুরত্ব জ্ঞানের মূল দেহাত্মবুদ্ধির নাশ করা। তৃতীয়ে রাজসূয় যজ্ঞে অসুরত্বের উপর দেবত্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করন। এরপর সুভদ্রা-বিবাহ ও দণ্ডীপর্ব্বাধ্যায় দ্বারা, সত্ত্বপ্রকৃতির লাভ, বিজয় ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন হইবে।

রাজ্যবিভাগ।

লীলা—ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদী সহিত পাণ্ডবদিগকে সাদরে আনয়ন করিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার অধিকার দান করিলেন, এবং নিজপুত্র অসুরগণের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, নিজের অধীন করিয়া রাখিলেন। পুত্রগণকে শাসন করিয়া রাখিবার জন্য বিদুর, কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে পরামর্শদাতা ও রক্ষক করিয়া রাখিলেন। প্রয়োজন হইলে পাণ্ডব-গণেরও সাহায্য পাইবার যোগার করিয়া দিলেন। ভীষ্ম, কৃপ আদি পাণ্ডবদিগকে স্বাধীন কর্ম্মোপযুক্ত দেখিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলেন ও বলিয়া দিলেন, যখনই যে কোন পরামর্শ বা অন্য সহায়তার প্রয়োজন

পড়িবে, পাণ্ডব জানাইলেই তাহারা প্রাণপণে পাণ্ডবের সহায়তা করিবেন। বড়ই আশ্চর্য্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বিদুরাদির নিকটে অবস্থিত, সর্ব্বদা অধীনতায় থাকিয়াও ইহাদিগের যুক্ততা হইতে বিচ্যুত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিয়া গেল। আর পাণ্ডব দূরে থাকিয়াও স্বাধীন হইয়াও, সারা জীবন ইহাদের সঙ্গে যুক্ততা রক্ষা করিয়া অশেষ মঙ্গল লাভ করিলেন।

তত্ত্ব—বাবা, ঐ রাজ্য বিভাগ রহস্য টুকুই সভাপর্ব্বের সমস্ত লীলা দ্বারা বিবৃত করা হইবে। ধৃতরাষ্ট্র যেইরূপ ভাবে রাজ্যবিভাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ রাজ্য বিভাগ করিতে পারিলেই, জীব অশেষ কল্যাণ লাভ করিয়া দৈব ও অসুর উভয় প্রকৃতি দ্বারা কর্ম্মরাজ্যে সর্ব্বদিকে বিজয় ও মঙ্গল লাভে সক্ষম হয়। দৈব প্রকৃতিবর্গকে কর্ম্মে স্বাধীনতা দিয়া, অসুর-প্রকৃতিকে আত্মজ্ঞান দয়া আদির অধীন করিয়া ধর্ম্মসাধনার সাহায্যকারী করিলেই, জীবের মানব জীবনের পূর্ণলীলা প্রদর্শিত হয়, এই লীলাই জীবের সত্বগুণাশ্রয়ী রজঃলীলা। ইহার শোভা ও সৌন্দর্য্যই এখন সভাপর্ব্বে পাণ্ডবলীলা দ্বারা দর্শন করিবে। এই রাজ্য বিভাগে, রাজ্য দুইভাগ করার মধ্যেও বেশ একটুকু রহস্য আছে। এক অংশ পাণ্ডব রাজত্ব দ্বারা পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মসাধনযুক্ত জীবরাজ্য, আর অপর অংশ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য দ্বারা সাধন হীন জীবরাজ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখন পাণ্ডবদের ধর্ম্মরাজ্য পত্তন রহস্য শ্রবণ কর, তাহাদের আশ্রয় স্থানের মূলভিত্তি-শোধনই খাণ্ডববন দাহন।

খাণ্ডববন দাহন।

লীলা—পাণ্ডবগণ রাজ্যার্থে শাসনভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, রাজ্য শ্রীহীন, প্রজাহীন, প্রায় স্থানই ভীষণ হিংস্রজন্তু পূর্ণ, দিবসেও রাত্রির মত অন্ধকারময় দারুণ বন হইয়া গিয়াছে। মানব সকল নানা ভয় উদ্বেগ লইয়া

সদা শান্তিতে দিন কর্ত্তন করিতেছে। তাই তাহারা কি করিয়া এই সকল নষ্ট করিয়া, এই দেশকেই সুখ শান্তিময় শোভার আধার করিবে ও মানবের ভয়, উদ্বেগ, অজ্ঞতা নাশ করিয়া দিতে পারিবে, সেই চেষ্টায় কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইল। এই সময় এক দিন অগ্নিদেবতা আসিয়া বলিলেন, "তোমরা কেউ কি আমার খাণ্ডব বন দাহনের সহায়তা করিতে পার? মরুতরাজার যজ্ঞে বহুদিন আহুতি খাইতে খাইতে আমার মন্দাগ্নি হইয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রাণিবর্গ ও বৃক্ষলতা সহিত এই খাণ্ডববন দাহন করিতে না পারিলে, আমার এই মন্দাগ্নি সারিবার আর ঔষধ নাই! তাই আমি বহুবার এইবন দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বনের প্রাণিবর্গ অল্প সময়ের মধ্যেই অগ্নি নিবাইয়া দেয়। তোমরা কি কেউ আমার এইবন দাহনের সহায়তা করিতে পার? বনে কেবল পশুপাখী আদি প্রাণীই নয়, অনেক অসুর, নাগ আদি প্রাণী ও দেবতা-অনুগৃহীত প্রাণীও বাস করিতেছে। তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দেবরাজ, অসুর রাজ, পক্ষীরাজ আদিও আসিয়া বনদাহনে বাধা দিবেন! তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াও কেহ আমার এই বন দাহনের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছ কি?" অর্জ্জুন বলিল, "অগ্নিদেব, আপনি সকল দেবতার মুখ স্বরূপ, আপনার অনুগ্রহেই সর্ব্বদেবতাকে তুষ্ট করা যায়, আপনি তুষ্ট না হইলে কোন যজ্ঞই পূর্ণ হয় না। তাই আপনার তুষ্টি ও মন্দাগ্নি নাশের জন্য, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি। এই জন্য জগতের সর্ব্বপ্রাণী, দেবতা ও অসুর আদির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও আমি ভীত নই! কিন্তু দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ধনু, অস্ত্রাধার, রথ, অশ্ব ও সারথীরই যে আমার অভাব! এই সব জোগার করিয়া দিতে পারিলে, আমি আপনাকে বন-দাহন করাইতে পারি।" অর্জ্জুনের এই সাহসপূর্ণ কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া অগ্নিদেব আনন্দে বলিলেন, "বাবা, আমি তোমায় এই সবই সংগ্রহ

করিয়া দিতেছি, আমার নিকট সেই যুদ্ধ জয়ের সব আয়োজনই প্রস্তুত আছে, আমি এইসব দিতেও প্রস্তুত হইয়া ঘুড়িতেছি, তবু এতদিন পর্য্যন্ত আমার সাহায্যকারী পাইতেছি না!” অগ্নিদেব অর্জ্জুনকে দেবলোকের দুর্জ্জয় গাণ্ডীব-ধনু আনিয়া দিলেন—এই ধনু ও তাহার ছিলা কিছুতেই কাটা যায় না। বাণ রক্ষার জন্য এমন অক্ষয়-তূন আনিয়া দিলেন, একবার বাণ ভরিয়া লইলেই তাহা কখনও ফুরায় না। এমন রথ আনিয়া দিলেন, তাহার গতি কিছুতেই বাধে না, রথের গর্জ্জনেই দানবাদি শত্রুগণ মুর্চ্ছিত হইয়া যায়। এমন অশ্ব আনিয়া দিলেন, এই অশ্ব অস্ত্রেও বিদ্ধ হয় না, কখন শ্রান্তও হয় না। এরপর সারথীর জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিতে দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, “অর্জ্জুন সর্ব্বত্র বিজয়ের পথ-নির্দ্দেশক এমন অভ্রান্ত সারথী, এই জগতেই আর কেহ নাই! তুমি ইহাকে সারথ্যে বরণ কর। আমিও ইহাকে অনুরোধ করিব, নিশ্চয় ইনি তোমার সারথী হইবেন।” অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সারথী করিয়া দৈবধনু, তূন ও রথের সহায়তায়, অগ্নিদেবের খাণ্ডব দাহন সম্পন্ন করিয়া দিলেন। বন রক্ষার জন্য, দেবগণ সহিত দেবরাজ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন, নাগরাজ, অসুররাজ ইত্যাদি আসিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সকলেই অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন, কেহই বনকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অগ্নিদেব মহাতুষ্ট হইলেন ও অর্জ্জুনকে সেই সব অস্ত্র, রথ, তূনাদি দান করিয়া গেলেন। এই বন-দাহে একটী নাগ কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল, এক ঋষি সন্তান-কামনায় পাখী হইয়া এই বনে ছিলেন, তাহার চারিটী সাবকও অগ্নিদেবের শরণ লইয়া রক্ষা পায়। আর একজন দানব শিল্পী অর্জ্জুনের শরণ লইয়া প্রাণ রক্ষা করে। এই দানব শিল্পীই পাণ্ডবের নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া দেয় ও দানব রাজগণের পরিত্যক্ত বহু ধনাদি এবং দুর্জ্জয় অস্ত্র ও শঙ্খ

আনিয়া পাণ্ডবগণকে দান করে। পঞ্চপাণ্ডবের শঙ্খ ও শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ এই অসুরের দত্ত, ভীমের ভীষণ গদাও এই দানবই আনিয়া দেয়।

ভক্ত—বৎস, খাণ্ডব-বন দাহন আধ্যাত্মিক-রাজ্যের একটী অদ্ভুৎ রহস্য। এই অগ্নিদেব, জীবের জ্ঞানদাতাশক্তি—জীবের অজ্ঞতা প্রসূত সর্ব্বকর্ম্মবীজ দগ্ধকারী জ্ঞানদেব। ইনি মন্দাগ্নিগ্রস্ত হইয়া থাকায়ইত জীবকে অজ্ঞানে আবরণ করিয়া, নানা জীব করিয়া খেলাইতেছে। কত সৎসঙ্গ, কত উপদেশ, বেদাদি অধ্যয়নে তাইত কিছুতেই জীবের কর্ম্মশক্তির বীজ দগ্ধ করিয়া, জ্ঞানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে না। কেন জ্ঞানের জাগরণ হয় না, এই তত্ত্বই এই খাণ্ডব-বনের বিবরণ, আর কেমন করিয়া জ্ঞান জাগরণ করা যায়, তাহাই এই বনদাহন বিবরণ, এবং জ্ঞান জাগরণে জীবের কি অবস্থা লাভ হয়, তাহাই দাহনের পর অর্জ্জুনের লাভ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

নানা প্রকার হিংস্রজন্তুপূর্ণ, দেব, দানব রক্ষিত দৃঢ়মূল বিশাল বৃক্ষের দ্বারা অন্ধকারময়, কণ্টকবৃক্ষ ও লতাদিতে অগম্য এই দারুন দণ্ডক বনটীকে চিনিলে কি বাবা? বৃক্ষ ও প্রাণীবর্গ সহিত এইবন দগ্ধ না করিতে পারিলে, সত্যই আর কিছুতেই জীবের পূর্ণজ্ঞানের জাগরণ হয় না! আবার এইবন দাহনও জীবশক্তির সাধ্যায়াত্ত নয়। জ্ঞানদেবের তৃপ্তির জন্য এই অর্জ্জুনের মত জীবন পণ করিয়া, সর্ব্বদেব ও অসুর শক্তির বিপক্ষেও যে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়, জ্ঞানদেব সত্যই তাহাকে যুদ্ধ জয়ের অস্ত্র, রথ, সারথী আদি যোগার করিয়া দেন। এই সংসার-রাজ্যে সর্ব্বত্র বিজয়ের এমন অদ্ভুৎ শক্তি, ধনু, রথ, অশ্ব ও সারথী এই জ্ঞানদেবের তুষ্টি বিনে কেহই কখনও লাভ করিতে পারে না। বাবা, পূর্ণজ্ঞানীর অভ্রান্তত্বই দুর্জ্জয় গাণ্ডিব-ধনু, অফুরন্ত জ্ঞানই অক্ষয়-তূন, অব্যর্থ গতিত্ব—অকর্ম্ম মধ্যেও যে কর্ম্মকে নির্ব্বাচন করিয়া চলিতে পারা, তাহাই

মায়ারথ, অশ্রান্তত্বই মায়া-অশ্ব, আর জ্ঞানের চরম ফল—জ্ঞানবিচার ছাড়িয়া ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করাই সারথী নির্ব্বাচন। এই সব অস্ত্রাদি জ্ঞানদেব না দিলে আর কোথাও মিলে না, এই সারথীও জ্ঞানদেব না চিনাইয়া দিলে, কখনও জীব ইহার খোঁজও পায় না। আবার এই দারুণ খাণ্ডব বন দাহন বিনে জ্ঞানাগ্নিও কিছুতেই মন্দাগ্নি হীন হইয়া জাগিয়া উঠে না। এখন এই বনটীর বিষয় শ্রবণ কর।

জীবের বুদ্ধিরাজ্যই এই খাণ্ডববন বাবা। অবিদ্যার অধিকারে জীবের বুদ্ধিরাজ্যের অবস্থা, সত্যই এই খাণ্ডববনের মতই ভীষণ ও শোচনীয় হইয়া উঠে। অসুররা এই স্থান মার্জ্জনার প্রয়োজনও বোধ করে না, কিন্তু বাবা, এই রাজ্যের মার্জ্জনা বিনে, কিছুতেই জীবের পূর্ণজ্ঞানের উদয় হইবে না—জীবও কিছুতেই অবিদ্যার হস্ত এড়াইয়া, সুখ শান্তিময় দেবত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারে না। অবিদ্যা মোহে জীবের বুদ্ধিক্ষেত্রে দুর্ব্বাসনারূপ নানা বৃক্ষ জন্মিয়া, অন্ধকারময় করিয়া তোলে, ভগবৎ রাজ্যের একটু জ্যোতির কণাও তথায় প্রবেশ করিতে দেয় না। সন্দেহ, কুটীলতা ইত্যাদি কত কণ্টকবৃক্ষ ও লতা তাহাতে জন্মিয়া, সত্যপথে চলিতে জীবকে পদে পদে বাধা দেয়, দারুণ অজ্ঞান অন্ধকারে সমস্ত ঢাকিয়া দেয়। সেই অন্ধকারের আশ্রয়ে নানা দুষ্প্রবৃত্তিরূপ হিংস্র পশুআদি আনন্দে বাস করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ভোগ বাসনাময় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুরাদি উপাসক পৃথক পৃথক জীবত্ব ভাবগুলিই সেইবনের দেবানুগৃহিত জীব ও অসুর, নাগ ইত্যাদি প্রাণিগণ। বাবা, এই দেব, অসুর অনুগৃহিত প্রাণী তত্ত্বটাই মরুতরাজার যজ্ঞাহুতীতে অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি হওয়ার তত্ত্ব। বেদোক্ত সকাম যজ্ঞাদিতেও অনেক সময় জীবের কর্ম্ম মুক্তি না আনিয়া কর্ম্ম বন্ধন আনয়ন করে। এই জন্যই গীতায় বার বার বলিয়াছেন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" বেদের ত্রৈগুণাত্মক বিষয় ছাড়িয়া নিগুর্ণতত্ত্ব

গ্রহণ কর। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধন।" যজ্ঞার্থে কর্ম্মও অন্যত্র (সকামভাবে) জীবের কর্ম্ম বন্ধের কারণ হয়।" "কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।" কামাত্মাদের স্বর্গপরা কর্ম্মও উচ্চ জন্মও ভোগাদি ফল প্রদান করে। মরুতরাজার সকাম যজ্ঞ হইতে, এই কর্ম্ম ফলপ্রদ দেবত্ব, নাগত্ব ইত্যাদি জন্মিয়া,মুক্তি জ্ঞান আবরণ করিয়া রাখাই জ্ঞানরূপ অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি হওয়া। সেই দেবত্ব অসুরত্ব ইত্যাদিকে রক্ষা করিবার জন্যই, দেবরাজ ও অসুর রাজ আদি আসিয়া অগ্নি নিবাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই যে জীবের প্রকৃতজ্ঞান ভগবৎভক্তির বাধক শক্তি, প্রকৃত জ্ঞান জাগিলে দেব-আরাধনা নষ্ট হইয়া মাত্র ভগবানের আরাধনাই থাকে।

বাবা, জীবের বুদ্ধিক্ষেত্র হইতে দুর্ব্বাসনা বৃক্ষের মূল পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিতে হইবে; সন্দেহ, কুটীলতা কণ্টকলতাগুলিকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা নিঃশেষ ভস্ম করিতে হইবে। তেত্রিশকোটী দেবভাব, অনন্ত যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগাদি ভাব ও অসুর ভাবের কামনাগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে, তবে জীবের সর্ব্বকর্ম্মদগ্ধকারী প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে; তখন জ্ঞানদেবের মন্দাগ্নি দূর হইয়া যাইবে। জীব ও তখন সত্যই এই অর্জ্জুনের দৈব-ধনু ও মায়া-রথের মত, অভ্রান্ত জ্ঞান, অব্যর্থ গতিহ ইত্যাদি লাভ করিয়া সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্‌কে কর্ম্ম-সারাথী প্রাপ্ত হইবে। বাবা, এই অবস্থাই গীতার "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই অবস্থা মাত্র পাণ্ডবদের মত খাণ্ডববন দাহন করিয়াই লাভ করিতে পারে। এই খাণ্ডব-বন দাহন বিনে কিছুতেই জীবের পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না, ভগবান্ আরাধনার উপযুক্ততাই জন্মে না। ততদিন, যক্ষ, রক্ষ ও দেবতাদির আরাধনা হয়। তাই গীতায় বলিয়াছেন, সাত্ত্বিক দেবতার আরধনা করে, রাজস যক্ষরক্ষের আরাধনা করে, তমোগুণী প্রেতের পূজা করে, গুণাতীত কামনা শূন্য হইলে আমার উপাসনা হয়। গীঃ ১৭শ ৪ শ্লোঃ ও ১৪ শ ১৯ শ্লোঃ।

এই বন হইতে একটী অসুর ও একটী নাগের জীবন রক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু এই বনের সকলেরই দগ্ধ হওয়া উচিৎ। এই দুই জন রক্ষা পাওয়ায় পাণ্ডবদের অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগের কারণ হইয়াছিল। লুক্কাইত নাগ, একটু হইলে অর্জ্জুনকে বধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কীরিট দান করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। কর্ণের নাগাস্ত্র আশ্রয় করিয়া এই নাগ অর্জ্জুনকে বধ করিতে আসিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ রথ মৃত্তিকায় প্রোথিত করাইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন, তাতে অর্জ্জুনের কীরিট নষ্ট হয়; পরে অর্জ্জুন নাগকে বধ করিয়া ফেলেন। এইবন হইতে কোন দুষ্প্রবৃত্তি পলাইতে পারিলেই হঠাৎ এমন বিপদের সম্ভাবনা। অসুরশিল্পী পাণ্ডবদিগকে সত্বগুণ হইতে রজোগুণে টানিয়া আনিয়াছিল। সুদৃশ্য রাজপুরী আদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়াতে, বহু রত্নাদি আনিয়া দেওয়াতে, এই সব দেখিয়া দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠে ও পরে সেইজন্য পাণ্ডবের ভাগ্যে কতপ্রকার অমানুষ অত্যাচার, অসম্মান ইত্যাদি দুঃখভোগ ঘটে। যন্ত্র-শিল্পাদিকে দেবমন্দির ইত্যাদি কাজে লাগিবে বলিয়া রক্ষা করিলে, সেজন্যও অশান্তি ভোগিতে হইবে। অসুরশক্তি দৈবপ্রকৃতির আয়ত্বে আসিলে তাহা দ্বারা কতপ্রকার ভোগ, সুখ, বিজয়ের-শক্তি লাভ করিতে পারে, অসুর শিল্পী দ্বারা তাহা দেখাইয়া, তাহার পরিণাম যে কখনও ভাল নয় তাহাই পরে প্রদর্শন করা হইয়াছে। নিবৃত্ত সত্বগুণ অবলম্বন বিনে, জীব কখনও প্রবৃত্তি পরা রজোগুণ আশ্রয়ে শান্তির অধিকারী হইতে পারে না। পাণ্ডবের রজোগুণ আশ্রয়ের ফল ক্রমে দর্শন করিবে।

জরাসন্ধ বধ।

লীলা—মহাভারতে বর্ণিত আছে, পাণ্ডবদের নূতন রাজ্য ধনে জনে পূর্ণ হইয়া সুখ শান্তির আধার ও অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন হইয়া উঠিলে, প্রজাগণ ও মিত্ররাজগণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া জগতের সম্রাট অর্থাৎ আদর্শ

হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। সর্ব্ব জগতকেই এমন শোভাময় করিতে ও প্রত্যেক মানবকেই ধর্ম্ম রাজ্যের বিমল সুখ শান্তির অধিকারী করিতে পাণ্ডবদের মনও আকর্ষিত হইল। এই যজ্ঞের পরামর্শ জন্য, তাহাদের পথ-প্রদর্শক সারথী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আনাইয়া তাহারা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি সর্ব্ববিষয়েই জগতের আদর্শ সম্রাট হইবার উপযুক্ত পাত্র, আর আপনার ভ্রাতা ভীমার্জ্জুন ও সর্ব্বজগত বিজয়ে সক্ষম। কিন্তু শুধু ক্রিয়া চেষ্টা দ্বারাই কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না, কালের ও পাত্রের বিষয়েও বিবেচনা করিতে হয়। অকালে অস্থানে বহু যত্নে বীজ বপন করিলেও তাহাতে ফল লাভ হয় কি? সেই যত্ন চেষ্টা সমস্তই বিফল হয়। তাই এই যজ্ঞ জন্যও বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। প্রথমে দেখিতে হইবে, আপনার রাজসূয় যজ্ঞ ও সম্রাট হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না—ভীষণ যুদ্ধানলে অসংখ্য নরনারী আহুতি দানের, জগত মঙ্গলকর কোনও সার্থকতা আছে কি না! কেবল নাম, যশ বা ধন লুণ্ঠন জন্য নর হত্যায় ব্রতী হওয়া ত মহাপাতক সঞ্চয় করা মাত্র! বর্ত্তমানে মগধরাজ জরাসন্ধই দেশের অভিষিক্ত সম্রাট, এবং দন্তবক্র, শিশুপাল, রুক্মি, ভগদত্ত, একলব্য, কালযবন, শৌভরাজ শল্য ইত্যাদি, সহস্র সহস্র অতিদুর্জ্জয়, অসুরপ্রকৃতি পরাক্রান্ত রাজা তাহার সাহায্যকারী, অনুবল! ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া এই সম্রাটকে বধ করিতে না পারিলে ত, আর কাহারও সম্রাট হওয়ার উপায় নাই। আবার এই সমস্তের সহিত প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধে ব্রতী হইলে, পাণ্ডব, ধার্ত্তরাষ্ট্র, যদুকুল একত্র হইয়া যুদ্ধে নামিলেও শত বৎসরে এই যুদ্ধের শেষ হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু বর্ত্তমানে জরাসন্ধ-সাম্রাজ্যের এই ভীষণ অসুর-আদর্শ ধ্বংস করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি এই সমস্ত রাজা যে ভীষণ মহাপাপ আচরণে ব্রতী হইয়াছে, আমরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তাহাতে বাধা দান না করি, সেই মহাপাপে আমাদের অংশী

হইতে হইবে। জরাসন্ধ সম্প্রতি একশত অষ্টজন ক্ষত্রিয়রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বন্দি করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে পাষণ্ড যজ্ঞীয় পশুর বদলে যজ্ঞে বলিদান করিবে। আরো ষোড়শসহস্র সুলক্ষণা, সুশীলা রাজকুমারীকেও পাষণ্ড বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যজ্ঞান্তে ইহাদের সতীত্ব নাশ করা হইবে। এই রাজাগণ ও কন্যাগণ এবং তাহাদের আত্মীয়গণ নিরুপায় হইয়া, আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছে। জরাসন্ধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছে, এখন এই যজ্ঞ সমাপনের পূর্ব্বেই যদি ইহাতে বাধা দান না করি ও রাজগণ এবং কন্যাগণকে উদ্ধার না করি, তবে আমাদের শক্তি বীর্য্যের সার্থকতা কি? ধর্ম্মরাজ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এত অল্প সময় মধ্যে কি করিয়া এমন দুর্জ্জয় বলকে জয় করিয়া, রাজগণ ও কন্যাগণকে উদ্ধার করা যাইবে, শ্রীকৃষ্ণ! যদি কোন উপায় থাকে বল, তোমার অনুগত পাণ্ডব, তাহাদের সর্ব্বস্ব দিয়া তোমার কার্য্যের সহায়তা করিতে প্রস্তুত।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছি, ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া, আমি ছদ্মবেশে জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইব, এবং তাহাকে নষ্ট করিয়া, তাহাররাজ্য জয় করিয়া ফেলিব। সমস্ত অসুর শক্তিকে একত্র হইবার সুযোগই দিব না। অসুর সম্রাট জরাসন্ধ নিহত হইলেই, অসুর রাজগণের একত্র হইবার-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিবে। তখন একে একে তাহাদিগকে জয় বা ধ্বংস করা যাইবে।" ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "এই বুদ্ধি অতি উত্তম বটে, কিন্তু সেই দুর্জ্জয় শত্রুর নিকট কেমনে ছদ্মবেশে গিয়া, কি করিয়া তাহাকে বধ করিবে নিশ্চয় করিয়াছ শ্রীকৃষ্ণ?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এই রাজা অসুরপ্রকৃতি হইলেও স্বকাম ব্রতপরায়ণ ও ব্রাহ্মণদিগকে বড়ই শ্রদ্ধা করে; তার নিকট ব্রাহ্মণদের অবারিত দ্বার। আমরা তিনজন মৌনব্রতধারী ব্রাহ্মণের বেশে, নিরস্ত্র হইয়া

তাহার পুরে প্রবেশ করিব। গভীর রাত্রিতে মৌনব্রত সাঙ্গ করিয়া, তাহাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিব ও তাহার কর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিয়া ভৎর্সনা করিব। পরে নিজেদের পরিচয় দিয়া, হয় রাজা ও কন্যাগণকে ছাড়িয়া দেও, নচেৎ আমাদের কাহারও সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর বলিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিব। সে যেইরূপ দাম্ভিক ও অহঙ্কারী, নিশ্চয় সে যুদ্ধকেই গ্রহণ করিবে ও এই বিশালকায় বলীশ্রেষ্ঠ ভীমকেই তাহার প্রতিযোদ্ধা নির্ব্বাচন করিবে। এই মধ্যম পাণ্ডবের হস্তে পড়িলে নিশ্চয় জরাসন্ধের প্রাণান্ত ঘটিবে।" ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "ব্রাহ্মণ অতিথির পূজা গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত শত্রুতা করিলে অধর্ম্ম ত অর্শিবে না শ্রীকৃষ্ণ?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তাহা যাহাতে না ঘটে, আমি সে বিষয়ে সাবধান হইয়াই করিব। তাহার সম্মান পূজাও গ্রহণ করিব না, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়ও দিব না! আর আমরা যে মিত্র নই কর্ম্মদ্বারা বুঝাইয়া দিব।" এর পরে ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ-বধে যাত্রা করিলেন।

ভক্ত—বাবা. এই জরাসন্ধ-বধ ও রাজসূয়-যজ্ঞ মধ্যে জীবের প্রকৃতি-রাজ্যের আরও একটী গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়া বুঝান হইবে। পাণ্ডবের রাজসূয়-যজ্ঞ ব্যাপারটী—পূর্ণ তমোগুণীয় অন্ধ-জীবত্বের অধিকার শেষ করিয়া, শুদ্ধা-প্রবৃত্তির রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা। এতদিন মলিনা প্রবৃত্তিগত অন্ধ রাজারাণীর রাজত্বে, অন্তর্রাজ্য কেমন ভীষণ খাণ্ডববন হইয়াছিল ও পাণ্ডব-গণ শ্রীকৃষ্ণ সহায়তায় কত কষ্টে তাহা দগ্ধ করিয়া, নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়াছ। এখন সেই রাজত্বের বহির্রাজ্যের দশা কি হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করা হইবে। খাণ্ডববন পরিষ্কারের ন্যায় পাণ্ডবের সেই বহির্রাজ্যের মার্জ্জনার চেষ্টাই এই রাজসূয়-যজ্ঞের মন্ত্রণা।

খাণ্ডববনের অভ্যন্তরের বাঘ ভাল্লুকের মত, বহির্জ্জগতেও তখন ভীষণ অসুর-প্রকৃতি নিষ্ঠুর, হিংস্র রাজগণেরই বিহার স্থান হইয়াছিল। জরাসন্ধ

নামে এক অসুর তখন সর্ব্ব দেশ বিজয় করিয়া সম্রাট হইয়াছিল। আর কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, রুক্মি, কাল যবন, পৌণ্ডরাজ শাল্য ইত্যাদি শত শত ভীষণবল অসুরপ্রকৃতি রাজা তাঁহার সহায় হইয়া, সর্ব্বদেশ বিজয় করিয়া তাহাদের অধিকার ও আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করিয়া, গুরুবর্গের অবাধ্য হইয়া, যথেচ্ছাচার পথে দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তির অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছিল। নিবৃত্তিপর-সাধন—ভগবানে নির্ভর ভক্তিধর্ম্মকে জগত হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। কর্ম্মরাজ্যের এহেন দুর্দ্দিন দেখিয়াই, পূর্ণ নরের আদর্শ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া, ইহাদের মার্জ্জনার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আদর্শ গ্রহণত দূরের কথা, অসুরেরা তাঁহাকেই বধ করিবার জন্য, বিপুল সৈন্যসহ বার বার আক্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তদশ বার আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হইয়াও ইহারা শ্রীকৃষ্ণ-আদর্শ গ্রহণ করিল না। ইহাদের ভয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোনঠাসা হইলেন, যদুরাজ্য রাজপুতনা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকাপুরী, বর্ত্তমান গুজরাটে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ এই অসুরদলকে বিজয় করিয়া, জগতে শ্রীকৃষ্ণ-আদর্শ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন। আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অদ্য তাঁহার আদর্শশিষ্য পাণ্ডবগণ দ্বারা কৌশলে জরাসন্ধ বধ ও দিগ্বিজয় করাইয়া, কি করিয়া জীবের এই অন্ধত্বের কারণ পৃথক পৃথক অহঙ্কারগুলিকে নাশ করিয়া, সুখ শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্য গঠন করিতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করিয়া লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই অন্ধতমরাজ্যে জরাসন্ধের দলের পরিচয় ও পরাজয় উপায় ক্রমে ক্রমে শ্রবণ কর।

এই জরাসন্ধের দলটী প্রত্যেকে জীবের তমোগুণ বর্দ্ধক আসুর-প্রবৃত্তি-গুলির এক একটী মূর্ত্তিমান স্বরূপ। পাণ্ডবগণ দৈব-প্রকৃতির এক একটী স্বরূপ, আর ইহারাই আসুরপ্রকৃতির পৃথক পৃথক স্বরূপ। ইহাদের প্রধান

মূলশক্তিই সম্রাট জরাসন্ধ। এই সম্রাট দেবতা হইতে বাসনা তৃপ্তি আশায়, নিজের মত ক্ষত্রিয়বংশীয় একশত অষ্টজন রাজাকে যজ্ঞীয়পশু করিয়া বলি দিবার জন্য, বান্ধিয়া রাখিয়াছিল। ষষ্টিসহস্র সুলক্ষণা, সুন্দরী ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে, যথেচ্ছা ভোগ্যাদাসী করিবার জন্য বলপূর্ব্বক আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার এক অনুবল রাজা কংস—বৃদ্ধ পিতাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে নামাইয়া, নিজে রাজা হইয়া বসিয়াছিল ও ভক্তপথী বলিয়া পিতৃবংশকেই ধ্বংস করিতে ব্রতী হইয়াছিল। আর এক অনুবল সৌভরাজ শল্য—সে কাঠের দুইটী হস্ত লাগাইয়া, চতুর্ভুজ হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করতঃ স্বয়ং ভগবানের অবতার হইয়াছিল। সে সৈন্যসহ একটী বৃহৎ আকাশ যানে উঠিয়া দেশে দেশে ঘুড়িয়া পূজা গ্রহণ করিতেছিল। পূজা না করিলে সর্ব্বনাশ করিত। আজকালও হিন্দুগণ পিতৃশ্রাদ্ধকালে, উর্দ্ধ দেয়ালে গোময় দ্বারা মূর্ত্তি গড়িয়া, পঞ্চকড়া কড়ি ও কাঁচা মৎস্য মাংস দিয়া ইহাকে পূজা করিয়া থাকে। এইরূপ নিজের বলদর্পে স্বজাতি মানবকে হীন ভাবিয়া পীড়ন করা, বলপূর্ব্বক দাস করিয়া সেবাদি গ্রহণ করা, স্ব-ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য, নিজের মত জীবের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যদৃচ্ছ ব্যবহার, অত্যাচার ও বধ করিবার প্রবৃত্তিই এই জরাসন্ধের দল। সাধারণ কথায় তমোগুণ অধিকারে জীবের দেহাত্মবুদ্ধি হইতে যে কতকগুলি বৃথা অহঙ্কারের জন্ম হয়, সেই দেহমদ, জ্ঞানমদ, দর্প, অভিমান ইত্যাদি অহঙ্কারগুলির মূর্ত্তিমান স্বরূপই জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্রাদি রাজগণ। ইহাদের নাম ও ক্রিয়াদির মধ্যেই ইহাদের প্রত্যেকের পরিচয় লাভ করা যায়। এখন ইহাদের মূলশক্তি—জীবের প্রধান মহাশত্রু সম্রাট জরাসন্ধের প্রকৃত পরিচয়, তাহার জন্ম কর্ম্মাদির মধ্যে বিস্তার ভাবে শ্রবণ কর। এই জরাসন্ধের পরিচয় ও তাহার বধ উপায় জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক জীবেরই বিশেষ প্রয়োজন।

লীলা—মহাভারতে বর্ণিত আছে, মগধরাজ বৃহদ্রথের সন্তান না হওয়ায়, তিনি পুত্র জন্য যজ্ঞ করিয়া, যজ্ঞাবশেষ চরু তাহার পত্নীদ্বয়কে ভোজন করাইলে, দুই পত্নীরই গর্ভ সঞ্চার হইল; কিন্তু প্রসবকালে এক পুত্রই দুই অর্দ্ধ হইয়া দুই রাণী হইতে প্রসূত হইল। প্রাণ হীন অংশদ্বয় রাজা দুঃখের সহিত শ্মশানে পরিত্যাগ করিলে, জরা নামে এক রাক্ষসী মৃতদেহ খাইতে আসিয়া, ক্রীড়াছলে দুই অংশ একত্র করিয়া দেখিতে গেলে, শিশু জীবন লাভ করিয়া উঠিল। তখন রাক্ষসী শিশুর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া রাজাকে পুত্র দান করিল। জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত হইয়াছিল বলিয়া বালকের নাম রাজা জরাসন্ধ রাখিয়াছিলেন।

তত্ত্ব—এই জরা কর্ত্তৃক সন্ধিত অসুরকে চিনিলে কি বাবা? এই অসুর জীবের দেহাত্মবুদ্ধি বা তনুমদ অহঙ্কার। জন্ম ও মৃত্যু এই দুইটী দেহের দুই অংশ, জীবের দেহ আদি ও অন্ত দুইকালেই অচেতন, তাহাই মৃত দুই অংশে প্রসব। দেহভোজি জরারাক্ষসী কালশক্তি (কালীকা দেবী)। এই দেবী খেলাইতেই জন্ম ও মৃত্যুকে একত্র গ্রথিত করিয়া, জীবের লীলারত সুন্দর জীবন দান করিয়া তোলেন—ইহাই দেহ যোজনায় প্রাণলাভ। এই রাক্ষসী দেহ ভোজন করেন, অর্থাৎ কালশক্তিতে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবের দেহের পূর্ব্ব আকার নাশ হইয়া রূপান্তরিত হইতেছে—শিশু দেহ মরিয়া কিশোর হয়, কিশোর যুবক হয়, যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হইতেছে। এই যোগ সংস্থান যেদিন ভগ্ন হইবে সেই দিনই দেহের পতন হয়। এই রূপান্তর রূপা কালশক্তি বা জরারাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অহঙ্কারই জীবের দেহকে আমি বোধ, অর্থাৎ দেহকেই আত্মা মনে করায়; তাই এই অহঙ্কারই সম্রাট জরাসন্ধত্ব। এই দেহ অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই, মানব ভগবান্ ও ধর্ম্ম-শাসন বিস্মৃত হইয়া যায় ও দম্ভে, দর্পে নিজের মত স্বজাতি ও প্রাণীবর্গের উপর প্রভুত্ব ও পীড়ন করিতে চেষ্টা করে। আত্মজ্ঞান হীন সমস্ত প্রকার আসুর দর্পের ইনিই মূল কেন্দ্র বা আশ্রয়

শক্তি। তাই সমস্ত অসুররাজা জরাসন্ধকে সম্রাট করিয়া সর্ব্বদেশ অধিকার করিয়াছিল। ইহাকে বধ করিতে পারিলেই, অন্য অসুরত্বগুলি মূলহীন বৃক্ষের মত হীনশক্তি হইয়া যায়। এখন এই শক্তির অধিষ্ঠান স্থান ও বধের উপায় জরাসন্ধবধ লীলার মধ্যে শ্রবণ কর।

লীলা—গিরীব্রজ নামে এক অতি দুর্গম পর্ব্বতে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া তার মধ্যে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া জরাসন্ধ বাস করিতেছিল। এই পুরী নানা দুর্ভেদ্য মায়াশক্তি দ্বারা রক্ষিত ছিল। শত্রু ভাবে কেহ প্রবেশ করিতে গেলে,আপনা হইতে সেই পুরীর সর্ব্বদ্বার বন্ধ হইয়া যাইত। এর পর পুরীদ্বারে এমন একটী দুন্দুভী ছিল যে শত্রু আসিলেই ভীষণ রবে বাজিতে থাকিত। দুর্গ শিরে শব্দকারী দুইটী ভেরী ছিল,গুপ্তভাবে শত্রুর আগমনেও শব্দ করিয়া জানাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিত,ছদ্মবেশেও শত্রুভাব লইয়া কেহ এরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন পূর্ব্বেই দুন্দুভী ছিন্ন করিলেন এবং ভেরীদ্বয় ছেদন করিয়া সেই তোরণযুক্ত শৃঙ্গই ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে অদ্বার দিয়া পথ করিয়া, সকলের অলক্ষে রাজপুরে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ ইহাদিগকে তেজস্বী, সুদর্শন মৌনব্রতী দেখিয়া তাপস মনে করিয়া আদরে সম্মান করিয়া গ্রহণ করিল ও নির্জ্জনে স্থান করিয়া সেবকাদি নিযুক্ত করিয়া দিল এবং ব্রত ভঙ্গ হইলে আলাপ করিতে উৎসুক হইয়া রহিল।

তত্ত্ব—এই গিরীব্রজপুরটী চিনিলে কি বাবা ? এই অপূর্ব্ব মায়াশক্তিতে রক্ষিত দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ জীবের দেহরাজ্য মধ্যস্থ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ। এই দেহ বাস্তবিকই এই গিরীব্রজপুরের ন্যায় মায়া রক্ষিত ও শত্রুর অতি দুর্গম্য স্থান। তার মধ্যে জীবত্বের অধিষ্ঠান স্থান—সেই ঊর্দ্ধমূল মধঃশাখ ছন্দ বৃক্ষের সন্ধানে,মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ আরও কঠিন ব্যাপার। সেই স্থানে অদ্বার বিনে প্রবেশের উপায়ই নাই। সেই অদ্বারের পথ দিয়া যোগীরাই মাত্র তথায় প্রবেশ করিতে পারেন,—তাই ভীমসেন অদ্বারে দ্বারা করিয়া

প্রবেশ করিয়াছিলেন। যোগীও ভক্তি ও ভগবান্ যুক্ত হইয়া তথায় প্রবেশ না করিলে, জরাসন্ধ বধে সক্ষম হয় না; যাইলে জরাসন্ধের অধীন হইয়া তাহার বন্দী হইয়া পরে। তাই ভীমসেন অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সহ তথায় প্রবেশ করিলেন। পুরদ্বারে দৈত্য-চর্ম্মাচ্ছাদিত ভীষণ শব্দকারী দুন্দুভী ও পুরশিখরে রবকারী ভেরীর বাধাও সত্য। দুন্দুভী শব্দপটহ ও ভেরী দ্বয় নাসিকার ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী দ্বয়। এই শব্দপটহ ভেদ যোগের কার্য্য, বায়ুযোগ শক্তি দ্বারাই স্বোহং ধ্বনি যে উলটা হইয়া, জীবের কানে অহং হইয়া বাজিতেছে তাহা সহজে নষ্ট হয়; তাই ভীমসেন এই দুন্দুভীর অসুরের চর্ম্মাচ্ছাদন ফাটাইয়া ফেলেন। অসুরস্বরূপ চর্ম্মে আচ্ছাদিত এই শব্দকারী দুন্দুভী দেবত্বের আগমন দেখিলেই, ভীষণ রব করিয়া দেবত্বের শব্দ ডুবাইয়া দেয়। তাহার অহং অর্থাৎ আমিত্বের ধ্বনিতে সর্ব্ব অসুরত্বকে জাগিয়া, দেবত্বের বিরুদ্ধাচার আরম্ভ করিয়া দেয়; জ্ঞান রাজ্যের দ্বার রোধ করিয়া দেয়। ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে যতদিন শ্বাস চলিতে থাকিবে, ততদিন জীবত্বের নাশ অসম্ভব! কোন দেব ভাবের আগমন হইলেই, এই নাড়ী দ্বয়ে ফোঁস ফোঁস করিয়া জোড়ে শ্বাস বহিতে বহিতে দেবত্বকে তাড়াইতে চেষ্টা করিবে। এই দুইকে নাশ করিয়া, সুষুম্না নাড়ীর পথে মেরুদণ্ড মধ্যে জীবের অধিষ্ঠান স্থানে প্রবেশ করা ভক্তির কার্য্য; তাই এই ভেরী দ্বয়কে অর্জ্জুন নষ্ট করিয়াছিলেন। ভক্তিতেই জীবের বহির্ম্মুখী বায়ুস্রোত অন্তরাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, তাই স্নেহাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠে—ইহাই ঈড়া পিঙ্গলার মুখ বন্ধ হইয়া সুষুম্নার মুখ খুলিয়া যাওয়া। সেই সুষুম্নার পথ খোলাই অদ্বারে দ্বার করিয়া অলক্ষে এই পুরে প্রবেশ। শ্রীকৃষ্ণাদি অন্ত ব্রত পরায়ণ, মৌনব্রতধারী হইয়া পুরে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপ ব্রতপরায়ণতা মৌনব্রত গ্রহণ বিনে, কিছুতেই জীবত্বের মূল সন্ধান লাভ হইবে না, তাহাই জ্ঞাপন করিলেন। এবার জরাসন্ধবধ লীলার মধ্যে দেহাত্ব অহঙ্কার নাশের উপায় শ্রবণ কর।

লীলা—ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণাদি অনেক রাত্রিতে ব্রত-নিয়ম সমাপন কারণে, রাজ অনুচর আহারের আয়োজন করিয়া দিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আহার গ্রহণ না করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। জরাসন্ধও এই সময় মধ্যে মৌনব্রতধারী তপস্বিগণের অদ্বারে প্রবেশ, দুন্দুভি আদি ভগ্ন করিবার কথা শ্রবণ করিয়াছিল, তাই আসিয়াই শ্রীকৃষ্ণাদির পরিচয় ও এই সব অপ্রিয় আচরণের কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধীর ও প্রশান্ত ভাবে উত্তর করিলেন, "প্রকাশ্য দ্বার দিয়া জীব মিত্র-গৃহে গমন করিয়া থাকে, আমরা মিত্রগৃহে মিত্র ভাবে আগমন করি নাই বলিয়াই অদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছি। আমরা যে সাধারণ শত্রু নই তাহা বুঝাইতেই, শত্রুর প্রবেশের বিঘ্ন দুন্দুভিআদি ভগ্ন করিয়াছি। অন্ন গ্রহণ করিয়া শত্রুতা করিতে প্রস্তুত নই, তাই এই পুরে প্রবেশ করিয়া অন্নাদি গ্রহণ করি নাই। ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণের মত সঙ্কল্প সাধন জন্য মৌনব্রতাদি ধারণ করিতে পারে, তাই আমরা ব্রতধারী হইয়া এতক্ষণ মৌন হইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্কল্প সাধন, নির্জ্জনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাই ব্রত ভঙ্গ করিয়াছি।" জরাসন্ধ এমন নির্ভীক উত্তর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমাদের শত্রু! আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া ত আমার স্মরণ হয় না।" শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "রাজা, তুমি আমাদের ব্যক্তিগত শত্রু হইলে, আমরা এইরূপে তোমার নিকট কখনও আসিতাম না। তুমি আমাদের জাতির শত্রু, দেশের শত্রু ও ধর্ম্মের শত্রু, তাই তাহার প্রতিবিধান চাহিতে আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" উত্তর শুনিয়া জরাসন্ধ একেবারে বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি জাতির শত্রু, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু, তোমরা এ কি কথা বলিতেছ?" তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, উন্নত মস্তকে তাহাকে এমন কথা বলিবার লোকও যে এই জগতে আছে, জরাসন্ধ জানিত না। শ্রীকৃষ্ণ আরও দৃঢ়স্বরে

বলিলেন, "রাজা, যে আমার একশত অষ্টজন স্বজাতি মানব ভ্রাতাকে যজ্ঞীয় পশু করিয়া বলি দিতে বন্দী করিয়া রাখে, সে কি মানব জাতির শত্রু নয়? যে রাজা নিজপ্রবৃত্তি তৃপ্তির জন্য, সর্ব্বদেশ হইতে বাছিয়া সুলক্ষণা, সৎকুলজাতা ষোড়শসহস্র কন্যাকে বলপূর্ব্বক মাতাপিতার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া আনিতে পারে, সে কি জাতি ও দেশের শত্রু নয়? স্বজাতীয় মানবকে যে পশু করিয়া, ধর্ম্মের নামে দেবতার নিকট বলি দিতে চায়, সে কি ধর্ম্মের শত্রু নয়? মহারাজ, ধর্ম্মের নামে এই সব অনাচার পরিত্যাগ করিয়া, এই রাজগণ ও কন্যাগণকে পরিত্যাগ করুন! নচেৎ উপস্থিত আমাদের এই তিনজনের যার সঙ্গে ইচ্ছা দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন। আমরা জীবিত থাকিতে কিছুতেই এই সব কুকার্য্য আর করিতে পারিবেন না।" জরাসন্ধও ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আমি একজন স্বাধীন রাজা, এই জন্মে কাহারও ভয়ে নির্ণীত কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হই নাই, অদ্যও হইতে ইচ্ছা নাই। বেশ, দ্বৈরথ যুদ্ধই হইবে, তোমাদের পরিচয় দাও, রাজা ত আর যার তার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করে না?" তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজের ও ভীমার্জ্জুনের পরিচয় দান করিলেন। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বয়সে ছোট ও হীনবলী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিয়া, বিশাল দেহ, বলশালী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ভীমকেই দ্বৈরথ যুদ্ধের পাত্র নির্ণয় করিলেন। পরদিন যুদ্ধ হইবে নির্ণয় করিয়া, জরাসন্ধ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণাদির সেবা ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা পুত্রকে রাজ্যভার বুঝাইয়া, একইরূপ অস্ত্র, শস্ত্র, বর্ম্ম, রথ ও সারথী দুইপ্রস্থ আনাইলেন ও ভীমসেনকে প্রথম একটী গ্রহণ করিতে বলিলেন। ভীমসেন একপ্রস্থ গ্রহণ করিলে, রাজা দ্বিতীয় প্রস্থ গ্রহণ করিয়া, দুইজনে ভীষণ দ্বৈরথ যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। অনাহারে অনিদ্রায় ক্রমে সপ্তাহ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইলে, রথ ভগ্ন হইল, অস্ত্র ফুরাইল, তখন অসি ও গদা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসি ও গদাও ভগ্ন হইলে,

বাহু যুদ্ধে ব্রতী হইয়া উভয়ে উভয়কে বধের চেষ্টা করিতে লাগিল। পবন-যোগ সাধনা থাকায় সপ্তাহ উপাবাস ও অবিশ্রামেও ভীমসেন কাতর হইলেন না বটে, কিন্তু জরাসন্ধ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে ভীমসেন রাজার জরা কর্ত্তৃক সন্ধিত অংশদ্বয়ের জোড়া স্থান পৃথক করিয়া ফেলিলেন, জরাসন্ধের মৃত্যু হইল। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও ভীমকে লইয়া রাজার অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া, তিনজনেই সসস্ত্র হইয়া রাজার আকাশগামী যুদ্ধ রথটীকে হস্তগত করিলেন। রথের উপরে নিজের নিদর্শন অসুরত্রাস গরুরচিহ্নিত ধ্বজা স্থাপন করিলেন ও উচ্চৈস্বরে নিজেদের নাম বলিয়া পরিচয় দিয়া, রাজপুত্রকে পুরীসহ আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। পুত্র পিতাকে সপ্তদশবার পরাজয়কারী, অদ্ভুৎবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় জানিত ও সম্মুখে ভীমসেনের বীর্য্যে পিতার মৃত্যু দর্শন করিয়া, সসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ বন্দিরাজগণকে মুক্ত করিয়া অস্ত্র শস্ত্র দান করিয়া স্বাধীনতা দিলেন; রাজগণ চিরকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবের অনুবল হইয়া রহিল। কন্যাগণকেও মুক্ত করিয়া দেশে পাঠাইতে প্রস্তুত হইলে, কন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে কামনা করায়, পরে একই দিবসে একই সময়ে পৃথক পৃথক স্থানে এই ষষ্ঠি সহস্র কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। রাজগণ ও কন্যাগণকে মুক্ত করিয়া জরাসন্ধের অনুবলগণ সংবাদ না পাইতে পাইতেই, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদ্বয়কে লইয়া আকাশরথে ধর্ম্মরাজের নিকট চলিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ এই রথ ও অর্জ্জুনের রথ বিনে এমন আকাশগামী রথ সেকালেও আর কাহার ছিল না।

ভক্ত্র—জরাসন্ধবধ শুনিলে ত বাবা! সে কি সহজে পরাজিত হইতে চায়! বহুদিন অনাহারে যুদ্ধের পর, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ সাহায্যে ইহাকে নিহত করিয়া ফেলিল। একেবারে নিহত করা চাই। শ্রীকৃষ্ণ এক এক বার তাহার

বিপুল বাহিনী, অসংখ্য সেনাপতি বধ করিয়া তাহাকেও পরাজিত বন্দী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন! কতদিন পর সে আবার তেমনি সৈন্য ও সেনাপতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ সপ্তদশ বার পরাজিত হইয়াও ত, সে অধীনতা স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-আদর্শ গ্রহণ করে নাই। এই বৃত্তি রক্ত বীজের মত, তাহার এক বিন্দু রক্ত হইতে শত শত অসুরের জন্মের মত, এই দেহাত্মবুদ্ধি হইতে শত শত জীব অহঙ্কারের জন্ম হইয়া, জীবকে ধর্ম্ম বিরোধী করিয়া তোলে। তাই ইহাকে একেবারে বধ করিয়া ফেলিতে হইবে। এই ভীম যোগশক্তি, অর্জ্জুন ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুযুক্ততাকে লইয়া, বহুদিন অনাহারে দিবারাত্রি যুদ্ধ করিতে হইবে। অনাহার বুঝিলে কি? ভোগ ত্যাগ করা। ভোগ ত্যাগ না করিয়া, নিদ্রা না কমাইয়া কিছুতেই দেহাত্ম বুদ্ধিকে নষ্ট করিতে পারিবে না। আর যোগ-শক্তি, ভক্তি ও ভগবৎযুক্ততার একটীর অভাব হইলেও জরাসন্ধ-বধ ঘটিবে না। আর ইহাকে বধ না করিতে পারিলে, তোমার ভগবান্ অভিমুখী বৃত্তি স্বরূপা সুলক্ষণা রাজকন্যাগণ ও সৎকর্ম্মে সাহায্যকারী বৃত্তিরূপ রাজগণ কিছুতেই অসুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার ভগবৎ ভক্তি ও ধর্ম্ম কর্ম্মের সাহায্যতা করিবে না। পাণ্ডবগণ জরাসন্ধবধ করিয়া পূর্ণরূপে অসুরত্ব মুক্ত হইয়া, দেবত্ব সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু দুর্য্যোধনাদি শিশুপালের প্ররোচনায়, মৃত জরাসন্ধের আদর্শকেই হৃদয়ে স্থান দান করাতে, পাণ্ডবের ও শ্রীকৃষ্ণের দেব-আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিল না। তাই পরে অসুর হইয়া পাণ্ডবদিগকে অশেষ দুঃখ দান করিল এবং দারুণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বাধাইয়া জরাসন্ধের মত অকালে নিহত হইল। এখন রাজসূয়-যজ্ঞ শ্রবণ কর।

রাজসূয়-যজ্ঞ।

লীলা—জরাসন্ধ বধ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রণায় ধর্ম্মরাজ চারি ভ্রাতাকে চারিদিকে দিগ্বিজয় ও নিমন্ত্রণ করিতে প্রেরণ করিলেন। হয় ধর্ম্মরাজকে সম্রাট স্বীকার করিয়া নিমন্ত্রণ লও, নচেৎ বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর, এই বলিয়া রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিতে হয়। ধর্ম্মপথিগণ ও পাণ্ডবদের আত্মীয়গণ আনন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। অনেকে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের বাহু বীর্য্যের ভয়ে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিল। দুই একজন দর্পের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, পাণ্ডব বীর্য্যের আস্বাদ পাইয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিল। শিশুপালাদি কতিপয় জরাসন্ধ পক্ষ রাজা, দুষ্ট বুদ্ধি করিয়া জড়াসন্ধের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে,—যজ্ঞস্থলে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলা, তাই মুখে ধর্ম্মরাজের অধীনতা স্বীকার করিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ হইতে পারে বুঝিয়াছিলেন, তাই নিজের যদুবীরগণ ও ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপাদিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, যজ্ঞ সম্পন্ন জন্য কর্ম্মভার দান করিয়া সকলে সসস্ত্র হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজের নিমন্ত্রণে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও ভ্রাতা দুর্য্যোধনাদি, কর্ণ, অশ্বত্থামাদি সকলেই আসিয়া এক এক কর্ম্ম ভার গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব রাজগণ নানা উপহার লইয়া আগমন করিতে লাগিল। শিশুপাল আসিয়াই সমস্ত অসুররাজা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব বিপক্ষে দুর্ম্মন্ত্রণা আরম্ভ করিল, এবং ইহাদের বিপক্ষে এক ভীষণ দল সঙ্ঘটন করিয়া, কোন ছলে যজ্ঞ পণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে বধ করিতে মনস্থ করিল। এদিকে অভিষেকের কাল উপস্থিত। সেই সময় একজনকে সর্ব্বজনের অধিপতি করিয়া, তাঁহার শাসন সকলে মানিতে হয় ও সকলের প্রতিনিধিত্ব তাহাকে দান করিতে হয়। সকলের বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, শক্তিশালী ভীষ্মকে পাণ্ডবগণ সভাপতি নির্ণয়

করিতে বলিলে,ভীষ্মদেব সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈস্বরে শ্রীকৃষ্ণকেই এই সমবেত সভায় সভাপতির উপযুক্ত বলিয়া নির্ণয় করিলেন। অসুর শিশুপালের তাহা সহ্য হইবে কেন? সে তাহার বিবাদ করিবার সূত্র প্রাপ্ত হইল। তাই এইকালে সে শ্রীকৃষ্ণ বরণে প্রতিবাদী হইয়া বলিতে লাগিল, "শ্রীকৃষ্ণ একজন রাজা পর্য্যন্ত নয়, সে কি করিয়া রাজগণের সভাপতি হইতে পারে? এই সভায় এমন মহৎ বংশীয় প্রবল প্রতাপ রাজগণ উপস্থিত থাকিতে,ভীষ্ম কি করিয়া, হীনবংশীয়, কপটাচারী, অরাজাকে রাজাদের সভাপতি নির্ণয় করিতেছে। রাজগণকে অসম্মান করিবার জন্যই কি ইহারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছে। এই নন্দঘোষের গাভীর রাখাল,অন্নদাতা মাতুল-ঘাতী, উগ্রসেনের দাস শ্রীকৃষ্ণ কোন গুণে পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যবর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূজ্য আসন লাভ করিবার যোগ্য হইল?" ভীষ্ম বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কোন গুণে সভাপতির উপযুক্ত,সত্যই কি তাহা জানিতে চাও? রাজসূয় যজ্ঞের সভাপতি বংশের বলে হয় না, অথবা রাজ্যের আয়তন বা রত্ন অলঙ্কারের মূল্য দ্বারাও নির্ণীত হয় না। সভার সকল হইতে জ্ঞানে বীর্য্যে যে বড়—কেহ বিপক্ষ হইলে যে শাসন করিয়া তাহাকে নমিত করিবার শক্তি রাখে, সেই সভাপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র। শ্রীকৃষ্ণের তেজে পরাভূত না হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে ভয় না করে, এমন রাজা এই সভায় কেউ আছে বলিয়া আমি জানি না। আমি সভার সকলেরই গুণ ও বীর্য্য-শক্তির বিষয় জানি, তাই উচ্চৈস্বরে বলিতেছি, এই সভায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি নির্ণয় করিয়া, তাঁর অনুশাসন গ্রহণ করা উচিত।" শিশুপাল দৃঢ় স্বরে ইহার প্রতিবাদ করিয়া, ভীষ্মকে শ্রীকৃষ্ণের স্তাবক বলিয়া নানা হীন গালী দিতে লাগিল ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের নানা কুৎসিত অপবাদ দিয়া নিন্দা আরম্ভ করিল। পরে বলিল, "পাণ্ডবদের যজ্ঞ আয়োজনের কারণ বুঝিয়াছি! তাহাদের ভ্রাতা, চাটুকার এই গোপনন্দন কৃষ্ণটাকে পূজা করাই তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পাণ্ডব কি মনে করিয়াছে

আমরা পরাজিত হইয়া তাহার সভায় আসিয়াছি। এখনি অস্ত্রানলে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ সহিত তাহাদিগকেও নিঃশেষ ধ্বংস করিয়া ফেলিব।” সমস্ত পাষণ্ড রাজগণ শিশুপালের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রোষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই সব যুক্তি দুর্য্যোধনের মনেও প্রবেশ করিয়া পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বেষের বীজ বপন করিল। ভীমসেন দুর্ব্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে শিশুপালকে আক্রমণ জন্য ধাবিত হইতেছিল, ভীষ্মদেব বাধা দিয়া বলিলেন, “এখন অধীরতার সময় নয়! যুদ্ধ করিতে হইলে আমরা কি পশ্চাৎপদ হইব!” পরে শিশুপালকে বলিলেন, “আমি যাহাকে উপযুক্ত বুঝিয়াছি তাহাকে সভাপতিত্বে বরণ করিতেছি। যদি তাহা হইতেও শক্তিশালী কেহ এ সভায় উপস্থিত থাকিয়া থাকে, এস তাহার উপযুক্ততা প্রদর্শন কর। হয় আমাকে, না হয় যাহাকে সভাপতি বলিয়া বরণ করিলাম তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত কর, তোমাকেই সভাপতিত্বে বরণ করিব। আমি এই সর্ব্ব রাজগণের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া বলিতেছি, এই সভায় সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বগুণে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ; তাই সকলের আদর্শ ও অধিপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র। যার আমার কথায় শ্রদ্ধা নাই, সে হয় আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত কর, নচেৎ পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া প্রাণত্যাগ কর।” দর্পে ক্রোধে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, যেন জরাসন্ধের দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রতিশোধ জন্যই এই দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্ত্ত মধ্যে শিশুপালকে বধ করিয়া, অসুর রাজাদিগকে একত্র হইয়া যুদ্ধারম্ভের সুযোগ নষ্ট করিয়া দিল। দুষ্ট রাজগণ শিশুপালের এত দ্রুত পরাজয়ে শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যে ভীত হইয়া পড়িল, তার উপর ভীষ্ম দ্রোণাদি সহিত পাণ্ডব ও যদুগণকেও সসস্ত্র দেখিয়া, সকলেই মস্তক নত করিয়া রহিল। এবার শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি করিয়া ধর্ম্মরাজের সম্রাট পদে অভিষেক সম্পন্ন হইল। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজগণ যার যার দেশে চলিয়া গেল।

ভদ্র—বাবা, পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ যাহা চাহিয়াছিলেন, নির্ব্বিবাদে যদি তাহা সম্পন্ন হইত, তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই সংঘটিত হইত না। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শে স্থাপন করিয়া, তাহার প্রদর্শিত প্রকৃত সত্বগুণীয় কর্ম্মসাধন গ্রহণ না করায়ই, শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জরাসন্ধ আদর্শের কণিকা পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া, আবার নূতন করিয়া সব গঠন করিয়াছিলেন। সমস্ত রাজগণ অন্ধ শিশুপালের মৃত্যু দেখিয়া, ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ শাসন ও ধর্ম্মরাজকে সম্রাট স্বীকার করিলেও, শিশুপালের শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষ পাষণ্ড যুক্তিগুলি, দুর্য্যোধনাদি অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই মূল হইতে গাছ উঠিয়াই দুর্য্যোধন আবার একদিন দ্বিতীয় জরাসন্ধ হইয়া সকল অসুরত্বের আশ্রয় হইবে। এবং শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ পঞ্চপাণ্ডবত্বের ধ্বংসের জন্য, আসুর পথে দারুণ চেষ্টা করিবে।

এই রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা পূর্ণরূপে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত না হওয়ার মধ্যেও রহস্য আছে বাবা! পাণ্ডব এখনও সত্বগুণীয় রাজ্যস্থাপনে চেষ্টিত হয় নাই। বদ্ধতমঃ হইতে শুদ্ধাপ্রকৃতির রাজ্য গঠন চাহিতেছে। কুন্তী দেবীর প্রকৃতি চায় নাই, তাহারা রজোগুণীয় মাদ্রীদেবীর প্রকৃতি চাহিতেছে। তাই তাহাদের যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইল না, যজ্ঞান্তেও শান্তির অধিকারী হইল না। পাণ্ডব এখনও আসুর-প্রকৃতিগুলিকে একেবারে নষ্ট করিতে রাজি নয়। তাহারা অসুরপ্রকৃতিগুলিকে উপদেশ, প্রলোভন, ভয় আদি দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া, দেবতা করিয়া তুলিতে চায়; তাহাদের ধর্ম্মের সুখ, শান্তি অসুর ভাইদিগকে লইয়া মিলিয়া ভোগ করিতে চায়। প্রবৃত্তিপথে কর্ম্ম লইয়া বিচরণ ই রজোগুণের কর্ম্ম, 'লোভ প্রবৃত্তি আরম্ভ' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা গীতায়ও ভগবান্ এইকথা বলিয়াছেন। তাই পাণ্ডবের ভাগ্যে শান্তি সুখ মিলিল না। অসুর কখনও দেবতা হয় না! ভগবানের বিরুদ্ধাচার জন্য ইহাদের জন্ম, কখনও তাহারা ভগবান্

অভিমুখী হইতে পারে না। তবু যাহারা রজোগুণে মত্ত হইয়া অসুর মার্জ্জনায় ব্রতী হইবে, তাহাদের দশা নিশ্চয় এই পাণ্ডবদের মত দুঃখপূর্ণ হইবে। ধর্ম্মরাজ দারুণ বন পরিষ্কার করিয়া অপূর্ব্ব রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন, জরাসন্ধ-বধ ও সর্ব্বদেশ বিজয় করিয়া, অসম্ভব আড়ম্বরের দান আদি করিয়া বিরাট যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। এই সব দ্বারা দেবত্বপথের সুখ, সৌভাগ্য, যশ দেখিয়া ভাই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ধর্ম্মপথে আনিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রিয় অসুরপ্রকৃতি ভ্রাতাগণ তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিয়া কিরূপ কর্ম্মে ব্রতী হইল, এখন সেই বিষয় একটু শ্রবণ কর।

লীলা—মহাভারতে বর্ণিত আছে, পাণ্ডবগণ দানবশিল্পীদ্বারা এমন অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধন ইহার দ্বারই ঠিক করিতে পারিল না। দ্বারকে আয়না ও আয়নাকে দ্বার মনে করিয়া, বাহিরের চেষ্টা করিয়া কপালে আঘাত পাইল। আবার, স্থলকে জল ও জলকে স্থল মনে করিয়া জলে পতিত হইল। তাহাতে ভীম আদি হাসিয়া উঠিলে, সে বড়ই লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইল। সে মনে করিতে লাগিল, তাহাকে লজ্জা দিবার জন্যই যেন পাণ্ডবগণ এইসব ষড়যন্ত্র করিয়াছে। এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে দান কর্ম্মে নিয়োগ ও রত্নপরীক্ষক করার অর্থও, পাণ্ডবের অফুরন্ত, অমূল্য-রত্নরাজী প্রদর্শন করান, তাহার যে এইরূপ ধন নাই মনে করিয়া দেওয়ান।

ভক্ত—এইরূপই হয় বাবা, "যেমন সর্পের বিষ বাড়ে দুগ্ধ দানে ; তেমন মূর্খের ক্রোধ উপদেশ দানে॥" অসুর প্রকৃতির স্বভাবই এই, দেবভাবের বিচার তার হৃদয়েই আসিবে না। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মপুরীর সৌন্দর্য্য, অফুরন্ত ধন ও অমূল্য-রত্নের সন্ধান দেখাইয়া, আসুর-পথ হইতে দেবত্বের দিকে আনিতে চেষ্টা করিলেও, অসুর তাহার স্বভাব দোষে, দারুণ ঈর্ষ্যার-দাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। হিংসার প্রেরণায়, অধর্ম্ম কুটীলতার আশ্রয়ে, নৃশংসতা ও

অধর্ম্মের পৈশাচিক-পথে, ধর্ম্ম-রাজ্যের সুখশান্তি ও সৌন্দর্য্যকে তিল তিল করিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। বাবা, অসুর-প্রকৃতি ধ্বংসের দূত, সন্দেহ হিংসাই তাহার প্রধান গুণ, পৈশচিকতাই তাহার কর্ম্ম শক্তি। অসুরপ্রকৃতিগণ তমঃপ্রকৃতি বশতঃ ধার্ম্মিকদের গতি পথের সন্ধানই পায় না, তাই গমনের প্রকৃত দ্বার ত্যাগ করিয়া, অদ্বারে বাহির হইবার চেষ্টায় তাহারা বার বার আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে, তাহাই দুর্য্যোধনের অদ্বারকে দ্বার ভাবিয়া বাহির হইতে চেষ্টায় আঘাত প্রাপ্তি। আর জলকে স্থল ভাবিয়া জলে পতন---বিষয় মরিচিকাকে সুখের জল ভাবিয়া, দুঃখ মধ্যে পতিত হওয়া; অজ্ঞান অসুরজীবের এই ভ্রান্তি নিত্যই ঘটিতেছে। তাহারা এইজন্য লজ্জিত বা দুঃখিত না হইয়া, নিজের অজ্ঞতা নাশের চেষ্টা মাত্র না করিয়া, সত্যই এই দুর্য্যোধনের মত অজ্ঞানজয়ী লোকগণকে শ্রেয়কারী মহাশত্রু মনে করে। তখন তাহাদের কি চেষ্টা হয় এখন তাহাই শ্রবণ কর।

লীলা—এইবার দুর্য্যোধন বাটীতে ফিরিবার কালে, পথ মধ্যে হঠাৎ রথ হইতে নামিয়া প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগে প্রস্তুত হইল। সকলকে ডাকিয়া বলিল "আর আমার বাঁচিয়া কি ফল; অদ্য আমি সর্ব্বদিকেই পরাজিত হইয়াছি! আমি শিশুকাল হইতে যাহাদিগের ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া আসিয়াছি, অদ্য দেখিলেত, তাহারা সর্ব্বদিকে আমা দিগকে পরাজিত করিয়াছে। আমাদিগের দর্প, অহঙ্কার, তেজ সমস্তই আজ পাণ্ডবগণের নিকট পরাজিত! তবে আর কিসের আশা লইয়া জীবন ধারণ করিব।" কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন আদি কত করিয়া বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু তবু দুর্য্যোধনের ক্ষোভ হীন হইল না, সে মরিতেই কৃতসঙ্কল্প হইল। 'অহঙ্কারীর অহঙ্কারই যদি না থাকে, তবে সে কি নিয়া বাঁচিয়া থাকিবে।" তখন শকুনি যাইয়া বলিতে লাগিল, "প্রাণত্যাগ করিলে তোমার কি লাভ হইবে দুর্য্যোধন? পাণ্ডবগণ এত অত্যাচার সম্মান দুঃখ

সহিয়া বাঁচিয়াছিল বলিয়া ত অদ্য এত সুখের অধিকারী হইয়াছে; বাঁচিলেই সুখের আশা। আর আজি যে তোমার এত দুঃখের বিষয় কি হইল, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না। পাণ্ডবের বিজয় যশ-গৌরব কি তোমার কৌরব-বংশের প্রত্যেকের গৌরব নয়? তবু যদি পাণ্ডবের কার্য্যে তোমার ঈর্ষ্যা হইয়া থাকে, তোমার পক্ষেও ত বীরের অভাব নাই! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা এক এক জনই সমস্ত পৃথিবী বিজয় করিতে পারেন, তার উপর তোমরা শত ভ্রাতা প্রত্যেকে মহারথ, পাণ্ডবের মত তুমিও দিগ্বিজয় করিয়া, কোনও মহৎ যজ্ঞ সম্পন্ন কর; পাণ্ডবগণও যে ইহাতে তোমার সহায়তা করিবে।" দুর্য্যোধন উত্তর করিল, "পাণ্ডব বিজিত দেশজয় করিয়া, পাণ্ডব লুণ্ঠনাবশেষ ধন আহরণ করিয়া কি পৌরুষ লাভ হইবে? এখন যদি সর্ব্বজয়ী পাণ্ডব জয় করিতে পারি, তবেই না বিজয়ের সার্থকতা। পাণ্ডবের পূর্ণ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে পারিলেই না যথার্থ ধনলাভ। অদ্য ভাগ্যলক্ষ্মী পাণ্ডবের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে, যদি সেই লক্ষ্মীকে কেহ আমার অঙ্কে আনিয়া দিতে পার তবেই জীবন রাখিব! নচেৎ অদ্যই সব শেষ করিব, বাঁচিয়া আর কি ফল।" অপরের বলবীর্য্য দেখিয়া, তাহা হইতে বলবীর্য্য অধিক সঞ্চয় জন্য যে চেষ্টা তাহার নাম ঈর্ষ্যা। আর অপরকে বলবীর্য্যে, গুণে আঁটীয়া না উঠিয়া, তাহাকে বধ করিয়া ফেলিয়া নিজের হীনগুণ বীর্য্যকে যে বড় করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহাই হিংসা। অদ্য দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যাপথ ত্যাগ করিয়া হিংসার অধীন হইয়া পাণ্ডব ধ্বংসে ইচ্ছান্বিত হইয়াছে। কর্ণ বলিয়া উঠিল, "ভীষ্ম দ্রোণাদি বৃদ্ধগণ ত অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে, এস, আমরা এখন পাণ্ডব রাজধানী আক্রমণ করি, শিশুপাল পক্ষ রাজগণও বোধ হয় আমাদের সহায়তা করিবে।" এই কথা শুনিয়া শকুনি বলিয়া উঠিলেন, "এখনই বৃদ্ধরাজা ও ভীষ্মাদি ফিরিয়া আসিয়া বাধা দিবেন, আর শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রুপদ পাণ্ডব

সাহায্য করিবেন। এই পাণ্ডব ভাগ্যের উন্নতিকালে বাধা দিতে গেলে, তুমিই শিশুপালের ন্যায় নিহত হইবে। আর বীরত্বে কাজ নাই! বীরত্ব দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়ই যথেষ্ট দেখাইয়াছ। আর শিশুপালের বধের সময়ও ভয়ে চুপ করিয়াছিলে কেন বাবা? ' তখন কিছু লাগাইয়া দিলেই ত হইত। আর বলে নয়! ইচ্ছা করিলে ছল পূর্ব্বক—ধর্ম্মের আবরণে কপটতা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করা যাইতে পারে। তাঁহারা সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ, ও জ্যেষ্ঠতাতের অত্যন্ত আজ্ঞাবহ, এই সবের মধ্য দিয়া কোন প্রকার প্রতিজ্ঞায় ঠেকাইয়া, অস্ত্র, শস্ত্র, রাজ্য, সম্পত্তি, এমন কি তাহাদের উন্নতির মূল ভাগ্যলক্ষ্মী স্বরূপা দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।" এই বুদ্ধিই সকলেরই মনঃপুত হইল, পৈশাচিক কপটপথে পাণ্ডবের সর্ব্বনাশের মন্ত্রণার জন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজধানীতে প্রস্থান করিল।

ভক্ত—বাবা, দুর্য্যোধনের এই বুদ্ধি অসুরত্বের স্বভাব প্রকাশ। স্বাভাব অর্থই স্ব+ভাব=স্বকীয় ভাবের বিকাশ। এই তত্ত্ব পরে আলোচিত হইবে। বর্ত্তমানে দেব-প্রকৃতির লীলা—সৌন্দর্য্য আরও একটু বর্ণনা করা যাউক। পূর্ণজ্ঞানী ধার্ম্মিকেরা কিরূপ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লীলা করেন, তাহারই কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এইস্থানে প্রদর্শন হইবে। পাণ্ডবের জীবন ভরিয়াই সাত্বিক ধর্ম্মক্রিয়া দর্শন করিবে বটে, বর্ত্তমানে দুইটী ক্রিয়া শ্রবণ কর। একটী সুভদ্রা-দেবীর বিবাহ, অন্যটী দণ্ডিরাজাকে আশ্রয়। এখন সুভদ্রা লাভ শ্রবণ কর।

সুভদ্রা বিবাহ।

লীলা—দ্রৌপদী-দেবীর বিবাহ কালে নারদ আদি ঋষিগণ, যাহাতে দ্রৌপদীর উপলক্ষে পাণ্ডবদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন না

হয়, সে জন্য তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। দ্রৌপদী-দেবীর সাহত প্রতি পাণ্ডবের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ মাত্র এক এক বৎসর করিয়া থাকিলেও, তার পরেও কোন পাণ্ডব নির্জ্জনে দ্রৌপদী-দেবীর সহিত বসিয়া থাকিলে, অন্য পাণ্ডব সেইকালে তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি কেহ প্রবেশ করে তবে তাহার দ্বাদশ বর্ষ নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মাতা, ভ্রাতা ও দ্রৌপদী চ্যুত হইয়া, তাহার দ্বাদশবর্ষ অন্য দেশে বাস করিতে হইবে। একদিন দ্রৌপদীদেবীর সহিত ধর্ম্মরাজ মাত্র অস্ত্রাগারে বসিয়াছিলেন, সেই সময় কতিপয় দস্যু এক ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া অর্জ্জুনকে জানাইলে, অর্জ্জুন দ্রুত সেই অস্ত্রাগারে যাইয়া অস্ত্র লইয়া দস্যুগণকে ধরিয়া আনিলেন, ও লুণ্ঠিত ধনাদি ব্রাহ্মণ গৃহে প্রেরণ করিলেন। পরে ধর্ম্মরাজের নিকট যাইয়া, পূর্ব্ব প্রাতজ্ঞা রক্ষার জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডও গ্রহণ করিলেন। প্রাতজ্ঞার কথা মনে থাকিলেও, দ্বাদশবর্ষ নির্ব্বাসনে যাইতে প্রস্তুত হইয়াও, অর্জ্জুন আজ ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য অস্ত্র গৃহে যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। দ্বাদশবর্ষ ঘুরিয়া আসিলেই ত এই অপরাধ খাণ্ডত হইবে, কিন্তু দস্যুশাসন ও ব্রাহ্মণের উপকার যদি জীবনে আর না পান! পাণ্ডব এমনই নিজের সর্ব্বপ্রকার দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তির উপরে, দয়া ও ধর্ম্মাচারকে গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্ম্ম রক্ষার ফলে অর্জ্জুন নির্ব্বাসনে যাইয়াও নানা আনন্দ ও মঙ্গললাভ করিলেন। এই নির্ব্বাসনেই শ্রীকৃষ্ণ ভাগনী সুভদ্রা দেবীকে পত্নীলাভ করিয়া অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

পাণ্ডবপুরী হইতে বাহির হইয়া অর্জ্জুন নানা তীর্থ ও দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-সখাকে অতি আদরে গ্রহণ করিলে, যাদব কুমারগণ অর্জ্জুনের নিকট যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই কালে, শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয়

ভগিনী, বলরামের সহোদরা সুভদ্রা-দেবী অর্জ্জুনকে বিবাহ জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দাদা বলরামের বড়ই ইচ্ছা ছিল, এই প্রিয়া ভগ্নীকে রাজা দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, ভগ্নীকে রাজমহিষী করাই তাঁহার সাধ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীদেবীর নিকট ভগ্নীর অভিপ্রায় জানিলেন ও অর্জ্জুনের নিকট তাহার অভিপ্রায়ও জানিয়া, ভগ্নীকে অর্জ্জুন হস্তে দান করিতেই মনস্থ করিলেন। ধর্ম্মরাজের সম্মতি জন্য তাঁহার নিকটও দুত প্রেরিত হইল, দাদার নিকটেও ভগ্নীর বিবাহ প্রস্তাব করিলেন। ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের সম্মতিতেই তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু বলরাম দুর্য্যোধনকেই বিবাহ করিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন, সুভদ্রাদেবী নিজেই অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্ব মতে বরমাল্য দান করিলে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সেই দুর্জ্জয়-রথে তাহাকে আরোহণ করাইয়া রাজ্যের দিকে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদে যাদব-সৈন্য ও কুমারগণ অর্জ্জুনকে যাইয়া আক্রমণ করিলে, অর্জ্জুন মুহূর্ত্তমধ্যে সকলকে পরাজয় করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সারথী যাদবগণ বিপক্ষে রথ চালাইতে অস্বীকার করায়, সুভদ্রাদেবী অর্জ্জুনের রথ চালনা করিতেছিলেন। তাই এই বিবাহে সুভদ্রাদেবীর সম্মতি জানিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে ভগ্নী দেওয়া উচিৎ বুঝাইয়া দিলে, বলদেব অর্জ্জুনের সহিতই ভগ্নীর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। পরে দুর্য্যোধনের নিকট সমস্ত জানাইয়া দুত প্রেরণ করিয়া, অর্জ্জুনকে সাদরে ফিরাইয়া আনিয়া, সুভদ্রাদেবীর সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। অর্জ্জুন এইরূপে নির্ব্বাসন দণ্ডভোগ করিতে যাইয়া রূপে গুণে অতুলনীয়া অপূর্ব্বরমণী রত্ন লাভ করিল; ইহার সন্তানই মহারথ অভিমন্যু। এই নির্ব্বাসনকালে অর্জ্জুন নাগরাজ-কন্যা উলুপি ও মণিপুররাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গ-দাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। একজনের পুত্র মহাবীর ইরারান ও অপরের পুত্র বব্রুবাহন। অর্জ্জুনের মত ধর্ম্মরাজ শিশুপাল-কন্যা, ভীমসেন

বিন্দ ও অনুবিন্দের ভগ্নী, নকুল জরাসন্ধ-কন্যা, সহদেব কাশীরাজ-কন্যাকে বিবাহ করেন, ইহাদের সন্তানও হইয়াছিল। পাণ্ডব সম্বন্ধান্বিত এই রাজগণ তাই কখনও দুর্য্যোধন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই।

ভত্ত্ব—ধর্ম্মার্থে জীব এইরূপে বিষয়-সুখ ভোগাদির দিকে সকল দ্বারবন্ধ করিতে পারিলেই, তাহাকে কোন দিকেই ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয় না বাবা? তাহারা আরও অভাবনীয়, অতুল সুখ ও যশের অধিকারী হয়। ধর্ম্ম ও ভগবানের জন্য, যাহারা বিষয় জগতের সুখ ভোগ আদি ও প্রবৃত্তির স্বাধীনতাকে বাধাদান করিতে পারে, অত্যাচার অবিচারকেও মস্তক পাতিয়া বহন করিতে প্রস্তুত হয়! ধর্ম্ম ও ভগবান্ তাহাদিগকে তাহার দশগুণ সুখ বিলাস, যশ, প্রশংসা কীর্ত্তি আদি দান করেন; পাণ্ডব জীবনে ইহার স্বার্থকতা পদে পদে দর্শন করিবে।

দণ্ডিপৰ্ব্বাধ্যায়।

লীলা—এই অধ্যায়ের বিষয় মহাভারতের বর্ণনায় না পাইলেও অন্য পুরাণে পাণ্ডবদের এই কীর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। পাণ্ডবের পূর্ণজ্ঞান ও শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নীকে লাভ করার যোগ্যতা, এই লীলা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া, উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। একটী স্বর্গ-নর্ত্তকী অপ্সরা গর্ব্বে অহঙ্কারী হইয়া তপোনিমগ্ন এক ঋষিকে উল্লম্ফন করিয়া গমন করিতেছিল। তাহাতে ঋষির তপোভঙ্গ হইয়া গেলে, তিনি ক্রোধে অপ্সারাকে অশ্ব হইতে অভিসম্পাৎ করেন। তখন অপ্সরা বহু মিনতি ও সেবা করিয়া তুষ্ট করিলে, ঋষি তাহাকে দিবসে অশ্বিনী থাকিয়া রাত্রিতে অপ্সরা হইতে পারিবে বলিলেন এবং কখনও জগতে অষ্টবজ্র মিলন হইলে, তাহার শাপ মোচন হইয়া স্বর্গে যাইবার অধিকার জন্মিবে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন; অপ্সরা অশ্ব দেহ প্রাপ্ত হইল। দণ্ডি নামে একজন ক্ষুদ্র রাজা, মৃগয়ায়

যাইয়া এই অশ্বিনীকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, পরে রাত্রিতে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে পত্নী করিয়া অতি যত্নে নিজ পুরে রাখিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। এই অপ্সরার শাপমোচন জন্য নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া অশ্বিনীর বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডিরাজার নিকট দিনে অশ্বিনী ও রাত্রিতে রমণী হয়, এই অপূর্ব্ব অশ্বিনীটি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইহার মূল্য স্বরূপ তাহাকে প্রচুর অশ্ব, রমণী ও রাজ্য দিতেও প্রস্তুত হইলেন। দণ্ডিরাজা প্রাণসম প্রিয়া অশ্বিনীত্যাগে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারিলেন না, অথচ শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবারও তাহার শক্তি নাই বলিয়া, তিনি পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অশ্বিনী লইয়া পলায়ন করিলেন। পৃথিবীর কোন রাজাই শ্রীকৃষ্ণকে বিপক্ষ করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইলেন না। এইরূপে সর্ব্ব দেশ হইতে নিরাশ ও তাড়িত হইয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্র-রাজ্যে আসিয়াও যখন আশ্রয় পাইলেন না,—মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণও যখন আশ্রয় দিলেন না, তখন তিনি অশ্বিনী সহিত প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলেন ও একদিন অশ্বিনী সহিত নিজ-শরীর দৃঢ়রূপে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে উদ্যত হইলেন। সেইকালে সুভদ্রাদেবীও গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। তিনি তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণত্যাগে বাধা দিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "প্রাণ রাখিয়া আর কি হইবে মা! এই জগতে যখন বৃথা অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার আশ্রয় মিলিল না, তখন অত্যাচারীর হস্তে মরিব কেন? নিজেই পবিত্র গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করি!" সুভদ্রা দেবী বলিলেন, "কি বলিতেছ! পাণ্ডবগণ বাচিয়া থাকিতে, বৃথা অত্যাচারের বিপক্ষে আশ্রয় মিলিল না? তাঁরাও কি তোমায় আশ্রয় দিলেন না?" রাজা বলিলেন, "তাঁহাদের নিকট যাই নাই বটে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই আমায় আশ্রয় দিল না। এক বলবান রাজা, আমার এই অশ্বিনীকে গ্রহণ

করিতে চায়, কিন্তু এই অশ্বিনী আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়া, ইহাকে হারাইয়া আমি প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তাই রাজ্য ছাড়িয়া আশ্রয় জন্য সর্ব্ব পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু সেই বলবানের বিপক্ষে কেহই আমায় আশ্রয় দান করিল না।" দেবী বলিলেন, "ভুল করিয়াছ রাজা, পাণ্ডবই যে এখন সর্ব্বদেশের সম্রাট, তাঁহাদের নিকটই তোমার যাওয়া উচিত ছিল! তাঁরা নিশ্চয় তোমায় আশ্রয় দিতেন। যাহা হউক তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমিই তোমায় আশ্রয় দিলাম। আমি সেই কুলেরই কুলবধূ! আজ হইতে তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার অমতে তোমার অশ্বিনী কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না।" রাজা বিস্মিত হইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বলিতেছ মা! কাহার বিপক্ষে আশ্রয় দিতেছ তাহা জান কি? সে অত্যাচারী কে, তাহাই আগে শ্রবণ কর!" দেবী বলিলেন, "আমার সেই তত্ত্বের কি প্রয়োজন! সে দেবরাজই কেন না হউক, আমি উৎপীড়িতকে অত্যাচারীর বিপক্ষে আশ্রয় দিতেছি, এইটুক জানিলেই হইল। তুমি কি অত্যাচারিত নও?" রাজা বলিলেন "তবু শুন মা! সেই অত্যাচারকারী পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব কি তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে আমায় আশ্রয় দান করিবেন! আমি যে অসম্ভব মনে করিয়া পাণ্ডবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি নাই।" দেবী হাসিয়া বলিলেন, "ভুল করিয়াছ রাজা, পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের দেহের উপাসক নয়! তাঁহারা ধর্ম্মের উপাসক, শ্রীকৃষ্ণের নীতি-আদর্শের উপাসক! শাস্ত্র সদাচার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে, বোধ হয় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইতেও সঙ্কোচিত হইবেন না। কেন না, শুননাই একদিন এই বংশের আদর্শ-পুরুষ ভীষ্মদেব, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য, নিজের অস্ত্রগুরু পরশু রামের সঙ্গেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তবে তোমার ভুল হইয়াছে মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী নন, তুমি তাঁহার শরণাপন্ন

তোমার বিপদ কাঁটিয়া যাইত। যাহাহউক আমিই তোমায় আশ্রয় দিলাম, আমি শ্রীকৃষ্ণেরই ভগিনী সুভদ্রা। পণ্ডাব আশ্রয় না দিলেও আমিই তোমার রক্ষার উপায় করিব, না পারি এই গঙ্গা মায়ের কোলে আমিও তোমাদের সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিব।"

দণ্ডিরাজাকে আশ্রয় দিয়া আনিয়া দেবী স্বামীকে জানাইলে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষে আশ্রয় দানে অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "সে পত্নীকেও ত্যাগ করিতে পারে, তবু শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষ হইতে পারে না।" তখন দেবী ধর্ম্মরাজের নিকট দণ্ডির আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, যুধিষ্ঠির ও তাঁর প্রাণ কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচারে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রাণের বিপক্ষতা যেমন দেহ করিতেই পারে না, পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষ হইতে পারে না!" এবার সুভদ্রাদেবী নিরাশা হইয়া দণ্ডিরাজাকে লইয়া পাণ্ডবপুরী পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। সেইকালে ভীমসেন সংবাদ পাইলেন ও দ্রুতপদে যাইয়া রাজাকে আশ্রয় দিয়া দেবীকে ফিরাইয়া নিয়া আসিলেন। ভীম বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনের ভুল হইয়াছে, নিশ্চয় তাঁহারা আশ্রয় দিবেন। আর তাঁহারা আশ্রয় না দিলেও আমি একাই দণ্ডিরাজকে আশ্রয় দান করিব।" বাস্তবিকই রাজসভায় ভীমের যুক্তি শুনিয়া ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুন দণ্ডিকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। প্রথমে বিরোধ বিনে রাজাকে রক্ষা করা যায় কি না তাহার চেষ্টায়, একজন সুচতুর মন্ত্রীকে উপহারাদি সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়া, রাজাকে ক্ষমা করিতে ও অশ্বিনীর বিনিময়ে, ধন রত্নাদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শুনিয়া পাণ্ডবদের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ ভাবই দেখাইলেন ও হয় যুদ্ধ, নচেৎ দণ্ডিরাজাকে অশ্বিনী সহিত তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলিলেন। পাণ্ডব জানাইল, "ক্ষত্রিয়ের আশ্রিতরক্ষণ ধর্ম্মের জন্য, পাণ্ডব দণ্ডিরাজকে পরিত্যাগ করিতে অশক্ত! এইজন্য

যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে হয় তাহাই না হয় শ্রীকৃষ্ণকে দিবে, তবু দণ্ডিরাজাকে দিতে বা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।" শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া, সমস্ত যাদব-সৈন্য ও দেবগণ সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পাণ্ডবগণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া, পূর্ব্বের সন্ধিমত ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত যুদ্ধের সংবাদ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদিকে যুদ্ধ সাহায্য জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। দুর্য্যোধনও আজ পাণ্ডব মহত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন! তাঁহারা যে আজ কুরুবংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষেও যুদ্ধে ভীত হয় নাই, তাহাতে বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া নিজের পূর্ণবল লইয়া, সত্যই ভ্রাতার মত আজ পাণ্ডবের পার্শ্বে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ভীষ্ম আজ পাণ্ডবের মহত্বে আত্মহারা, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য শিষ্যদের গৌরবে মহানন্দ লাভ করিলেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন আদি দেবগণের সাহায্য লইয়াও আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই পাণ্ডববল বিজয়ে সক্ষম হইলেন না। নারায়ণের সুদর্শন, রুদ্রের ত্রিশূল, কার্ত্তিকের শক্তি, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, ব্রহ্মার কমণ্ডলু ও দেবরাজের বজ্র, এই অব্যর্থ সপ্ত-বজ্র মিলিয়াও পাণ্ডবের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইল না। তখন অষ্টম বজ্র খর্গ লইয়া মা ভবানি আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অষ্টবজ্রের একত্র মিলন হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ অপ্সরার অভিশাপ মোচন হইয়া গেল। অশ্বিনী শাপ মুক্ত হইয়া অপ্সরা হইয়া প্রকাশিত হইল। তখন নারদ মুনি উভয় দলের মধ্যে দাড়াইয়া, অপ্সরার অভিশাপ ও মোচনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। দেবগণ পাণ্ডবদের ধর্ম্মরক্ষণ-দৃঢ়তা ও পূর্ণজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও বরদান করিয়া চলিয়া গেলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার আদর্শ-শিষ্য পাণ্ডবগণকে আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা দণ্ডিকে বুঝাইয়া বহু ধনরত্ন দান করিয়া স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

ভক্ত—বৎস, যোগীগণ শাস্ত্রবিধি পালন দ্বারা অসীম শক্তি আদি লাভ করিয়া, শাস্ত্র-বাক্যে অতি বিশ্বাসী হইয়া পড়ে। তাই তাঁহারা কখন কখন শাস্ত্র-বাক্যের সত্যতা দেখাইতে, ভগবানের বিরুদ্ধাচারেও কুণ্ঠিত হন না। বিপদাপন্নের বিপদ আদি উদ্ধার জন্য, যোগবল আদি দ্বারা বিধাতার বিধান নষ্ট করিতেও তাঁহারা চেষ্টিত হয়। কিন্তু এইজন্য তাঁহারা জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্মযোগ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হয় না। শাস্ত্র বিধি মতে, ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিয়া, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মবিধি মানিয়া কর্ম্ম করিয়াই, মরণোন্মুখ রোগী বা মহাবিপন্নকে রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে যোগী অহঙ্কার বশে, জ্ঞান, ভক্তি কি কর্ম্মবিধি হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদেরই যোগ-শক্তি ফল দান করে না। অগ্ন যোগীর সেই স্বভাবেই ভীম দণ্ডি-রাজাকে আশ্রয় দান করিল ও পরে ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনাদিকে লইয়া স্বধর্ম্ম পালন সাধনা দ্বারা, সর্ব্বদেবগণ সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াও বিজয় লাভ করিল। যোগীর এই ভাবটী পূর্ণ সাত্বিক নয়, "সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যজ্য মমেকং শরণং ব্রজ।" জ্ঞান ও ভক্তির যে এই চরম ফল তাও নয়! তাই দুর্য্যোধনের দল এই যুদ্ধে পাণ্ডবের সাহার্য্য করিল। এই ভাবটী শুদ্ধ রজোগুণীয় ভাব, তাই অসুরেরাও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল।

ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনের আশ্রয় দানে অস্বীকারের মধ্যে, জ্ঞান ও ভক্তির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাটুকু প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তি অনেক সময় জীবকে তত্ত্ব ফেলাইয়া, শুধু মূর্ত্তির উপাসক করিয়া তোলে। তাহাদের বিচার শক্তিকে আবরণ করিয়া, গুরু বা আদর্শ পুরুষের কর্ম্মের অন্ধ-অনুবর্ত্তনকারী করিয়া ফেলে; কর্ম্মের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিই করায় না। এই মোহটী প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির অজ্ঞান-আবরণ মহাশত্রু। জীবের পূর্ণজ্ঞান ও ভক্তিতেও এমন একটী অবস্থা হয় বটে, তখন জীব কর্ম্মের অতীত হইয়া যায়। গুণাতীত হইয়া সর্ব্ব বিষয়-কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইলে,

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাজ্য অনন্য শরণ লাভ হয়; তখন জীবের পূর্ণ সন্ন্যাসী অবস্থা। পাণ্ডব যে এখনও সেই অবস্থায় যায় নাই, তাই ভীমের সঙ্গে বিচারে তাহাদের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াছিল ও অন্ধ-অনুবর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ তোষণ লালসা ত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্মাচারণে,—তাঁহার বাক্য শাস্ত্র বিধি পালনের দ্বারা তাঁহাকে তোষণ করিতে চেষ্টা করিল। ভগবান্ যে আপনি ঋষিদের নিকট বলিয়াছেন, সদ্ধর্ম্ম পালনে তিনি তুষ্ট হন ও তাহাকে পুণ্য ও বিজয় দান করেন। পাণ্ডব শাস্ত্র বাক্য পালন দ্বারা সেই শাস্ত্র বর্ণিত ফলই লাভ করিল। সর্ব্বদেব বিজয়ী হইয়া অতুল কীর্ত্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইল। বাবা, ভগবান্ ও মহাপুরুষদের উপদেশ প্রতিপালন না করিয়া, তাহাদের অঙ্গসেবা ও মূর্ত্তি আদিকে আড়ম্বরে পূজা করিলেই, তাহাদের সেবা হয় না; ইহাতে তাহাদের পূর্ণ তুষ্টিলাভও হয় না। তাঁহাদের উপদেশ ও মতাদির যথার্থ অনুবর্ত্তন করিলেই, তাহাদের যথার্থ সেবা হয় ও তাঁহারাও তাহাতে অধিক তুষ্ট হন। তাঁহাকে মানি আর তাঁহার মতকে মানি না, মতের অনুবর্ত্তন করি না, এইরূপ সেবা পূজা যথার্থ সেবা পূজাই নয়, মূর্ত্তি পূজা মাত্র! এইরূপ তত্ত্বহীন মূর্ত্তিপূজার নামই পৌত্তলিকতা। অদ্য অর্জ্জুন এবং ধর্ম্মরাজ কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারিব না বলিয়াছিলেন, আবার আর এক দিন—পাণ্ডবের জীবনের শেষ অধ্যায়েও এই কথা বলিতে শুনিবে। এইবার নিষেধ করিয়াও আবার পরামর্শ করিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে পারিল, পূর্ণ তেজে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই দিন শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সংবাদ লাভ মাত্র, অর্জ্জুন আর গাণ্ডিব-ধনু তুলিতেও সক্ষম হইবে না, ধর্ম্মরাজ তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করিবেন, কর্ম্ম করিবার শক্তিই থাকিবে না। তখনই তাঁহারা যথার্থরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর করিয়া বুঝিবেন এবং সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যজ্য হইয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইবার উপযুক্ত হইবেন।

শিষ্য—সেইকালের আদর্শ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, দণ্ডিরাজার উপর এমন অন্যায় ক্রোধ কেন করিয়াছিলেন প্রভো!

গুরু—আর কেন বাবা, ভক্তি ও ভক্তের স্বভাব প্রকাশ করিয়া লীলা করিবার জন্য। তাঁহার প্রকৃতভক্ত জগতে কেহ আছে কি না, তাঁহার মহান্ ত্যাগ-ধর্ম্মের আদর্শে, জগতে এক জনের জীবনও গঠিত হইয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে এই মধুর লীলা করিয়াছেন। বাবা, তিনি লীলা না করিলে জীবসব কোন লীলা গাইয়া বা শ্রবণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিবে। পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ভীষ্ম শতমুখে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বলিয়া, তাঁহার চরিত্র-আদর্শকেই জগতের আদর্শ বলিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা কি যথার্থ অনুভূতি না শ্রীকৃষ্ণ তোষণ জন্য মিথ্যা চাটুতা প্রকাশ, অদ্য তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কেন তিনি পাণ্ডবগণকে এত ভালবাসেন, তাহাদের সারথী ও দুতাদি হইয়াও তাহাদের সেবা করিবেন, জগতের সমক্ষে তাহার পরীক্ষা দেখাইলেন। সেইকালের জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইচ্ছা করিলে যিনি ত্রিলোক সম্রাট হইতে পারেন, তবু ইচ্ছা করিয়া যিনি যদু কুলের রাজ-মুকুটও গ্রহণ করিলেন না। তিনি একটী অশ্বিনীর জন্য দণ্ডি রাজাকে পীড়ণ করিবেন, ইহাও কি সম্ভবের কথা বাবা। তাঁহার পত্নীগণের নিকট কি অপ্সরার সৌন্দর্য্য! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লীলায়ই দেখিবে বাবা, তিনি নিজের জন্য কোনও কাজই করেন নাই। জামাতা-কংসের জন্য তাঁহার প্রতি শত্রুতাকারী জরাসন্ধকে তিনি সপ্তদশবার পরাজয় করিয়া ধরিয়াও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন রাজগণকে বধ ও কন্যাগণের সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিল, আর ক্ষমা না করিয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার প্রতি শতবার অপরাধকারী শিশুপালকে সর্ব্বদা ক্ষমা করিয়া, যখন পাণ্ডবযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া অসুরত্ব প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করিল, তৎক্ষণাৎ বধ করিয়া ফেলিলেন! বাবা,

প্রত্যেক কর্ম্মই সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের আশ্রয়ে, তিন প্রকারে সম্পন্ন হয়। এক হত্যাকার্য্যই তামসে দস্যুতায় হত্যা করা,রাজসে অধিকার রক্ষার দ্বৈরথ যুদ্ধে হত্যা করা, আর সাত্বিকে বিপন্ন রক্ষায় যুদ্ধ করিয়া দস্যুহত্যা করা রূপে সম্পন্ন হইতেছে। মহাপুরুষ ও অবতার লীলার মধ্যে সমস্ত কর্ম্মই সাত্বিক ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে ; শ্রীকৃষ্ণও তাহাই করিয়াছেন জানিবে।

শিষ্য—গুরুদেব, সুভদ্রাদেবী, দণ্ডি রাজাকে আশ্রয় দিয়া পাণ্ডবদের নিকট লইয়া গেলেন কেন? এবং পাণ্ডবেরা আশ্রয় দিতে না চাহিলে, তিনি পাণ্ডব পুরীই ত্যাগ করিতেছিলেন কেন! ইহার মধ্যেও কি কোন প্রকার তত্ত্ব আছে প্রভো!

গুরু—ইহার ভিতর অতি সুন্দর রহস্য আছে বাবা! সুভদ্রা শব্দের অর্থ সু+ভদ্র=উত্তম কল্যাণ! ভগবানের প্রিয়পাত্র হইবার যোগ্যতা রূপ উত্তম কল্যাণ-শক্তিই, এই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধান্বিতা সুভদ্রাদেবী! কেবল পাণ্ডবদের মত ধার্ম্মিকদিগের অন্তঃপুরেই তিনি আপনি আসিয়া সেবা ভার গ্রহণ করেন। ইনি ভগবানের সৃষ্টি কারক শক্তি বলদেবের সহোদরা, অর্থাৎ জগতে উন্নতি আদি লাভের ভগবান্-সত্তা—বিষ্ণুর তোষণের প্রধান বলই এই শক্তি। এই কল্যাণদেবী জীবকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করিলেই, এই দণ্ডি রাজার মত, বিপন্ন, দীন ইত্যাদিকে গৃহস্থের নিকট লইয়া আসেন। যাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন বা দানাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন,তাঁহাদের ঘরেই থাকিয়া ইনি তাঁহাদিগকে অশেষ সু+ভদ্র, উত্তম কল্যাণ দান করেন। আর আশ্রয় দান না করিলে,অন্ত যেমন পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছিলেন,তেমনই জীবের ধর্ম্ম বলাদি সর্ব্ব কল্যাণ লইয়া ইনি অন্তর্হিত হন। এই দেবীকে আশ্রয় দিয়া রাখাতেই পাণ্ডব অন্ত ভগবান্ সহিত সমস্ত দেবশক্তি জয় করিয়া,সপ্তবজ্র আঘাত হইতেও বাঁচিয়া, ভগবানের প্রিয় পাত্র হইল ও জগতে অশেষ কল্যাণ ভোগ করিল। এই স্থানেই দেব প্রকৃতির সত্বগুণাশ্রয়ী রজোগুণের শোভা

শেষ করিয়া, দেব প্রকৃতি কেমন করিয়া তমোগুণের দারুণ আক্রমণ অত্যাচার অবিচারকেও অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, তাহা দেখাইতে তমোগুণের রাজোক্রিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইবে। তাহাই সভা পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরিচয়।

অসুরের রজোচেষ্টা।

আদিপর্ব্বে বিষদান, গৃহদাহ ইত্যাদি দ্বারা অসুরের ঘোরতামস চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া, সভাপর্ব্বে অসুরের রাজসচেষ্টা প্রদর্শিত হইবে।

অসুরাক্রমণ।

১। **জীব প্রকৃতিকে প্রথম আক্রমণ**—দেবপ্রকৃতির ধন, সম্পদ, প্রভুত্ব আদি বিষয় সৌভাগ্যকে, তাহারা অল্প চেষ্টায় মুহূর্ত্ত-মধ্যে আয়ত্ত করিয়া দিতে পারে! আর অকর্ম্মন্য, কেবল শাস্ত্র অধীন দেবপ্রকৃতি কি সেই সৌভাগ্যের যথার্থ ব্যবহার জানে! তাহাদের হাতে আসিলে এই সবের দ্বারা কত প্রভুতা ও সুখাদি জীবকে ভোগ করাইত

১। **দেবপ্রকৃতিকে প্রথম আক্রমণ**—অসুর কপট ভালবাসা, আনুগত্য ইত্যাদি দেখাইয়া ভুলাইয়া, তাহাদের সঙ্গে মিশে ও নানা প্রকার ভোগ বিলাস করাইতে করাইতে অসাবধান কালে, হঠাৎ খেলা ইত্যাদির ছলে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া ফেলে। সরল দেবপ্রকৃতি তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বুঝিয়া উঠিবার সময় পায় না।

ইত্যাদি বলিয়া, অসুরপ্রকৃতি জীবকে অসুরচেষ্টায় সম্মত করে। (ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদির অধীনতা ত্যাগ করিয়া আবার দুর্য্যোধনাদিকে স্বাধীনতা দিলেন।)

২। **জীবকে**—কোন দেব সম্পদশালী ব্যক্তিকে কপটতায় বাধ্য করিয়া তাহাদের ধন, সম্পদ ও শক্তি লইয়া জীবের ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্তির সুযোগ করিয়া দেয়।

(কপট পাশায় পাণ্ডবের ধন, সম্পদ ও তাহাদের সিদ্ধশক্তি সহিত তাহাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রের দাস করিয়া দিল।)

৩। **জীবপক্ষে**—এইবার অসুরত্বের সম্পদ ভোগ আরম্ভ হইল! শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করিয়া, পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। লজ্জা, নীতি, গুরুমর্য্যাদা আদি লঙ্ঘন করিয়া, ধার্ম্মিক ও সতী আদিকে পীড়ন—প্রলোভন, বলে অত্যাচার পর্য্যন্ত করিয়া, পৈশাচিক ভাবে ঈর্ষ্যা ক্রোধাদির তৃপ্তি আরম্ভ করিল। এরপর অধর্ম্মের যাহা

(পাণ্ডবদিগকে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কপট স্নেহ আদরে রাজধানীতে আনিয়া, নানা উপঢৌকন ধন আদি দান করিয়া ভুলাইল ও পণ রাখিয়া পাশাখেলা খেলিতে স্বীকৃত করাইল।)

২। **দেবতাকে**—কপট কৌশলে পণে আবদ্ধ দেবপ্রকৃতিকে জয় করিয়া, তাহাদের ধন সম্পদ শক্তি দ্বারা অসুরত্বের সেবা করিতে বাধ্য করিয়া ফেলে।

(কপট পাশার পণে জিতিয়া পাণ্ডবের সর্ব্বস্ব হরণ করিল ও তাহাদিগকে দাস পর্য্যন্ত করিল।)

৩। **দেবপক্ষে**—দেব-প্রকৃতি দেবতার মত সেই দুঃখ, দীনতা ও দাসত্বকে ভোগ আরম্ভ করে। কপটতার জয়কেই যথার্থ জয় অর্থাৎ ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করে। প্রকৃত দীনদাসের মত অসুর-প্রভুর, দারুণ পাষণ্ডতার অত্যাচার, অবিচার ও নির্য্যাতন নীরবে, বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিতে থাকে। অসুরত্বের আশু বিজয়,

প্রাপ্য ফল, সতীর ক্রোধে, ভগবানের অসন্তোষে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাপ্ত ধন, সম্পদ, শক্তি আদি অন্তর্হিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিজদের ও ধন, শক্তি, তেজ ও আয়ু ক্ষয় হইল; আরও অযশ অধর্ম্মভাগী হইল।

(পাশার পণে জয় করিয়াই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ গুরু মর্য্যাদা ও কুল ধর্ম্মাদি লঙ্ঘন করিয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, তাহাকে প্রলোভন দান, পরে বস্ত্র হরণাদির চেষ্টা দ্বারা প্রভুত্ব ও শক্তিপ্রদর্শন আরম্ভ করিল। হঠাৎ অমানুষ সত্তার বিকাশে অভিভূত ও ভীত হইয়া পাণ্ডবদিগকে সবস ম্পদ ও স্বাধীনতা ফিড়াইয়া দিল। কেবল তাহা নয়, নিজেদের ও বহু ধন দিয়া বিদায় করিল। পাপ জন্য আয়ু ও লক্ষ্মী ক্ষয় হইল, ভীষণ অনার্য্যত্বের কলঙ্কে ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল আপামর সাধারণের নিকট অযশ ও কলঙ্কের ভাগী হইল।)

তাহার সুখ সৌভাগ্যাদি দর্শন, কি অসুরের দত্ত ক্লেশে ও তাঁহাদের ধর্ম্মে ও ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভরতার হানী হয় না। তখন ধর্ম্মের প্রাপ্য ফলে অসুরদের দারুণ দুঃখ-বজ্রাঘাতও আঘাত না করিয়া ফিড়িয়া যায়। সাক্ষাৎ ভগবানের কৃপায় অমানুষ-সত্তার বিকাশে তাহাদের সকল দুঃখ নাশ করিয়া দেয়। অসুর আপনিই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

(পাণ্ডব কপটতার পরাজিত হইয়াও সত্যই পরাজয় স্বীকার করিল। রাজবেশ ত্যাগ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রও ত্যাগ করিল। ধর্ম্ম ও ভগবানের তুষ্টির দিকে চাহিয়া প্রকৃত দীনদাসের মত নীরবে প্রভু ধার্ত্তরাষ্ট্রদের অবিচার অত্যাচারাদি সহ্য করিল। অধর্ম্মের জয়, অধার্ম্মিকের ধন সম্পদ লাভ দেখিয়াও, পত্নীর উপর অমানুষ অত্যাচার দেখিয়াও ধর্ম্ম ও ভগবানে ভক্তি নির্ভর পরিত্যাগ করিল না। তাই ধর্ম্মের ফলে, ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই তাহাদের সর্ব্ব দুঃখ নষ্ট হইয়া গেল—দাসত্ব মোচন হইল, ধন সম্পদ ফিরিয়া আসিল, আরও নূতন ধন, বহু যশ গৌরবে যশস্বী ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।)

৪। **জীবপ্রতি দ্বিতীয় মায়া**—এইবার জীবকে বুঝায়, কেবল দেব-প্রকৃতিবর্গেরই যদি পোষণ করিবে, তবে আমাদের সার্থকতা কি করিলে? ভগবান্ কি আমাদিগকে বৃথা সৃষ্টি করিয়াছেন? এত দিন সাধন ভজন করিয়া শক্তি আদি লাভ করিয়াছ, এখন কতক দিনের জন্য ঐ সাধন ভজন একটু কমাইয়া, আমাদেরও একটু ব্যবহার করিয়া লও; পরে না হয় আবার তাহাদিগকেই গ্রহণ করিবে। জীব এই মত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম সাধনগুলিকে প্রথমে বনবাসে দেয়, অর্থাৎ কমাইয়া ফেলে, পরে অজ্ঞাত বাসে একেবারেই ত্যাগ করিয়া অসুরের কবলিত হইয়া পড়ে। তখন ধর্ম্ম সাধনকে আর ফিরিয়া গ্রহণ করিতেই তাহার শক্তি থাকে না।

(দ্বিতীয় বার পাশা খেলিয়া পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশবর্ষ বনে প্রেরণ করিল। দ্বাদশ বর্ষ বনবাস অর্থাৎ হীনভাবে সাধন রক্ষা করিল, একবর্ষ অজ্ঞাত বাস অর্থাৎ সাধন একেবারে ত্যাগ করিল। তাই ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হইয়া, পাণ্ডবকে আর গ্রহণ করিতে পারিল না।)

দেবতার প্রতি দ্বিতীয় মায়া—দেবপ্রকৃতিকে বলে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ধর্ম্ম সাধন দ্বারা, জ্ঞান শক্তি সম্পদ আদি লাভ করিয়াছ, এখন যৌবনে সেই সাধন ভজন কমাইয়া একটু ইন্দ্রিয় ভোগ আদি করিয়া লও; বার্দ্ধক্যে আবার সাধন ভজন করিও। দেবতা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হয় না, সে ধন সম্পদ প্রভুত্ব ছাড়িয়া যায়, তবু সাধনকে পরিত্যাগ করে না। তাই তাঁহারা বনে থাকিয়াও সাধন ভজন গুণে নানা সুখ সম্পদ আনন্দ লাভ করে। লুক্কায়িত অজ্ঞাত বাসকালেও সাধন গুণে নিরাপদে মঙ্গল লাভ করে। তাই তাঁহারা সর্ব্ব অসুরত্ব ধ্বংস করিয়া পরে পূর্ণ দেবত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়।

(দ্বিতীয়বার পাশায় হারিয়া পাণ্ডব প্রশান্ত ভাবে বনবাসে গেল, রাজ্য ফিরাইয়া দিলেও গ্রহণ করিল না। বনবাসেও অজ্ঞাত বাসকালে ধর্ম্ম সাধন রক্ষা করায়, নানা ব্রত আদি করিয়া সৎসঙ্গে আনন্দে দিন কর্ত্তন করিল। পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসুর কুল ধ্বংস করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিল।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অসুরত্বের রজোচেষ্টা।

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুম্।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তকঃ ॥

গুরু—বৎস, জীবত্বটী চিরকালই ধর্ম্ম ও ভগবানের বিমুখী ভাব-যুক্ত, তাই জীব নানা প্রকারে জীবত্বকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও, সেও সর্ব্বদা জীবকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। এই জীবত্ব ও মুক্তির বিরোধ টুকুইত জীবের জীবত্ব লীলা; এই বিরোধ না থাকিলে যে লীলাই হয় না। তাই এইবার দুর্য্যোধনেরদল ধৃতরাষ্ট্রকে আয়ত্ত করিবার জন্য, নূতন কৌশলজাল বিস্তার করিল। ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইল, পাণ্ডবের এই সব গৌরবত, দুর্লভ অস্ত্রাদি ও রাজ্য সম্পদ লাভ করিয়াই হইয়াছে! তাহারা কত কষ্টে কতদিনে তাহা লাভ করিয়াছে। আমরা অতি অল্প সময় মধ্যেই এই সব লাভ করিতে পারি। আর এই সবের সৎব্যবহার কি তাহারা জানে? এই সব আমাদের হস্তে আসিলে, জগতকে এই সকলের সৎব্যবহার দেখাইতাম! কেমনে সুখ, সম্পদ, প্রভুত্ব ভোগ করিতে হয় তাহাও শিখাইতাম। আর আমরাই কি এই সব সংগ্রহ করিতে পারি না! কেবল স্বাধীনতা পাই না, নচেৎ অল্প আয়াসেই পাণ্ডবদের অস্ত্র-শস্ত্র-শক্তি আদি আয়ত্ত করিয়া লইতে পারি। একটু কিছু করিলেই বিদুর ফোঁস করিবেন, ভীষ্ম, কৃপ ফোঁস করিবেন, তাইত আমরা জীবিতে ও মৃত হইয়া আছি! ধৃতরাষ্ট্রের মন আবার টলিল,

তাই আবার ইহাদিগকে কর্ম্ম স্বাধীনতা দান করিল। আর অসুর দুর্য্যোধন কপটতা আশ্রয়ে, প্রতিজ্ঞা আদিতে ঠেকাইয়া, দেবশক্তিশালী ব্যক্তিকে আয়ত্ত করতঃ, তাহাদের সেই বীর্য্যের সেবা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিল। বাবা, এই মায়াতে অভিভূত হইয়াই রাক্ষস-রাজা রাবণাদি ও অসুর রাজগণ, সকাম তপস্যায় দেবগণকে আয়ত্ত করতঃ, বরবাধ্য দেবগণকে দাসের মত নিজ সেবায় নিযুক্ত করিয়া, দেবতাদ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয় সেবা গ্রহণ করিয়াছিল। সেইরূপ দুর্য্যোধনেরদলও পাশা খেলার পণে পাণ্ডবকে আয়ত্ত করিয়া সেবা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিল।

বাবা, এই পাশা খেলা শুধু সেইকালে পাণ্ডব বিপক্ষেই হয় নাই! বিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়া সেবা গ্রহণ জন্য, অবিদ্যার এই পাশা খেলা নিত্যই ঘটিয়া থাকে। অনেক ধর্ম্মপথার ধর্ম্মজ্যোতিঃ এই কপট-পাশায় অসুরগণ হরণ করিয়া লয়। তাই এই পাশার আয়োজন ও খেলাদির প্রত্যেক অংশ অতি মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার করিয়া গ্রহণ করিও। অবিদ্যার ধন সম্পদ কি, তাহারা শক্তি বীর্য্যের ব্যবহার কেমনে করে, বুদ্ধির চালনা কেমনে করে, তাহাদের স্বাধীনতার অর্থ কি, প্রভুত্বই বা কি তাহাও দেখিবে। আবার দৈবপ্রকৃতির বিদ্যারাজ্যের ধন সম্পদ, শক্তি বীর্য্যের ব্যবহার, বুদ্ধি চালনা, স্বাধীনতা ও প্রভুতা কেমন তাহাও পাশাপাশি দেখিতে পাইবে। এখন অসুরের পাশা খেলার কারণ শ্রবণ কর।

বৎস, জীবের যে সন্তোষ চাইই। তাইত দ্রৌপদী দেবীর স্বয়ম্বরে তাহাকে লাভের আশায় পৃথিবীর সমস্ত রাজাই গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই কি কর্ম্মদ্বারা সন্তোষকেই অনুসন্ধান করিতেছেন না? দেবতা দেবত্ব-পথে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া, জীবনের লক্ষ্য ভেদ করিয়া দেবীকে লাভ করেন। আর অসুর লক্ষ্য ভেদে অশক্ত হইয়া, দ্রব্য বিনিময়ে কিনিতে চেষ্টা করে, তাতে অশক্ত হইলে বলপূর্ব্বক

গ্রহণের চেষ্টা করে। অসুর তাহাতেও অশক্ত হইয়া যখন ফিরিয়া আসে, তখন সে সন্তোষ লাভের জন্য তাহাদের শেষ-শক্তি ছলপথ—কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে। দেবপ্রকৃতি-পাণ্ডব জতুগৃহদাহ, তাপস ব্রত গ্রহণ ও দুর্জ্জয় মৎস্য-চক্র ভেদ করিয়া দেবীকে হস্তগত করিয়াছে। দারুণ খাণ্ডববন দাহন করতঃ, নূতন রাজধানী গড়িয়া, তাহাতে দেবীকে স্থাপন করিয়াছে। ভীষণ অত্যাচারী অসুর-সম্রাট জরাসন্ধকে বধ করিয়া, সর্ব্ব পৃথিবী বিজয় করিয়া, অসুরত্বের উপর শ্রীকৃষ্ণ-আদর্শ দেবত্বকে স্থাপন করতঃ, জগৎ-সম্রাজ্ঞী করিয়া দেবীকে পূজা করিয়াছে। আর্ত্তের ত্রাণ, অত্যাচার দমন, অকাতরে দান ও যজ্ঞ দ্বারা দেবীপূজার দক্ষিণা দান করিয়া যেই দেবীকে আয়ত্ত করিয়াছ, সেই সন্তোষ দেবীকে লাভের জন্য অন্ধ অসুরের চেষ্টা ও পূজার আয়োজন শ্রবণ কর। স্বয়ং অসুরত্ব অহঙ্কার —দুর্য্যোধন এই যজ্ঞের কর্ত্তা, মূর্ত্তিমান কুটিলতা—শকুনি যজ্ঞের পুরোহিত, ঈর্ষ্যা—কর্ণ এই যজ্ঞের রক্ষক ও অবাধ্যতা—দুঃশাসন এই যজ্ঞের পশুবলি-দাতা—ছেত্তা। আর বলির পশু—শাস্ত্র, সদাচার, লজ্জা, কুলসম্ভ্রম ও মর্য্যাদা। এইরূপে পূজা করিয়া তাহারা দেবীকে দাসী করিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে ও যজ্ঞের ফল অকৃতকার্য্যতা, অভিসম্পাত এবং শ্রী ও আয়ু-হীনতা লাভ করিবে; এখন পাশা খেলার বিষয় শ্রবণ কর।

পাশা—অবিদ্যা-জ্ঞানের বিশ্বাস, জলের শীতলতা, অগ্নির উষ্ণতা ইত্যাদি দ্রব্যের গুণের মত, ধন, সম্পদ, প্রভুত্ব ইত্যাদির মধ্যেই শান্তি ও সন্তোষ বিরাজিত আছে। যে কোন প্রকার ধন, সম্পদাদি লাভ করিতে পারিলেই, সুখ শান্তি, সন্তোষ হস্তগত হইল। দেবশক্তির ধন, সম্পদ এত কষ্ট করিয়া সাধনাদি দ্বারা সংগ্রহের প্রয়োজন কি? কপটতা আশ্রয়ে, কর্ণ যেমন গুরু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিল তেমনই ভাবে, কোনও দেব শক্তিধরকে আয়ত্ত করিয়া, দেবশক্তির সেবা গ্রহণ করিলেই হয়। সত্যবাদী

সরল-বিশ্বাসী ধর্ম্মপন্থীদিগকে ছলনায় মুগ্ধকরাও কঠিন ব্যাপার নয়। তাই ধার্ত্তরাষ্ট্রদল পাণ্ডবদের ধন, সম্পদ, বীর্য্য, শক্তি সকল আয়ত্ত করিবার জন্য, কপট পাশা খেলার আয়োজন করিল। পাণ্ডবের স্বজন প্রীতি, গুরুমর্য্যাদা, সরলতা ছিদ্রগুলিকে আশ্রয় করিয়া, নিজেদের মধ্যে আনিয়া নানা প্রীতি ব্যবহারে তুষ্ট ও অসাবধান করিয়া, হঠাৎ খেলার ছলে পাশা খেলায় ফেলিয়া, পণ প্রতিজ্ঞার মধ্যদিয়া, তাহাদের বীর্য্যের মূল দুর্লভ অস্ত্রশস্ত্র, রাজ্য সম্পদ ও কর্ম্মস্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইবে; এমন কি তাহাদের সৌভাগ্যের মূল দ্রৌপদীদেবীকেও তাহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে। তাঁহারা যখন সত্যবাদী ও ধর্ম্মবিধির অধীন, একবার পণ করিয়া বসিলে আর লঙ্ঘন করিবে না; তাই ফিরিয়া গ্রহণের ভয়ও নাই। জয়ের নিশ্চয়তা জন্য কপটপাশা প্রস্তুত করিয়া, পাণ্ডবদিগকে আনিতে দূত প্রেরিত হইল। পাপমতি দুর্য্যোধন শৈশব হইতে পাণ্ডব ধ্বংসের চেষ্টায় বিফলকাম হইয়া, অদ্য ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের পাশায় পাণ্ডবকে জীবন্তে মারিবার জন্য পরামর্শ করিল।

বহুদিন পরে অদ্য পাণ্ডবপুরে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাতের সাদর আহ্বানের নিমন্ত্রণপত্র ও নানা স্নেহ উপহার লইয়া একজন ব্রাহ্মণমন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পত্রের ছত্রে ছত্রে স্নেহঢালা মধুর ভাষা। যেন আজ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে স্নেহের বান্ ডাকিয়া উঠিয়াছে। "ভ্রাতা পাণ্ডুর চিহ্ন-স্বরূপ, বংশের গৌরব, ধর্ম্মের ধ্বজা, পাণ্ডবদিগকে বহুদিন না দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে; পাণ্ডবগণ মাতা ও দ্রৌপদী দেবীর সহিত আসিয়া কতকদিন যেন মিলনবারি সিঞ্চণ করিয়া যায়।" নিস্পাপবুদ্ধি সরল-হৃদয় পাণ্ডব, বহুদিন ধরিয়া জ্যেষ্ঠ তাতের ও তাহাদের পুত্রদের কোন প্রকার শত্রুতা না দেখিয়া এবং যজ্ঞকালে ও দণ্ডিপর্ব্বে প্রাণপণ সহায়তা পাইয়া, নিশ্চিন্ত মনে মহা আনন্দিত হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

পিতৃসম, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রকে ভ্রাতা-দুর্য্যোধনের সহিত মিলিয়া সেবা করিবে, ইহা যে তাহাদের বহুদিনের সাধ, এতদিনে বুঝি বিধাতা তাঁহাদের সেই সাধ পূর্ণ করিবেন। তাহাদের শৈশবের ধূলিখেলার স্থান, বাল্য সহচর ও শৈশবের আশ্রয়—যাহাদিগকে পিতা বলিয়া কোলে কাকে উঠিয়া কত প্রাণঢালা স্নেহ ভালবাসা ভোগ করিয়াছেন, সেই কৃপাচার্য্য ভীষ্ম বিদুরাদির সঙ্গ আবার পাইবেন বলিয়া, মহা হৃষ্ট হইয়া পাণ্ডব হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন বহু কপট ভালবাসা এবং আদর ভোগ সুখ দিয়া পাণ্ডবদিগকে আরও তুষ্ট করিয়া তুলিল। ভীষ্ম, বিদুর ও কৃপের ত আনন্দের সীমাই নাই, পাষণ্ডদের দুর্ম্মন্ত্রণার বিষয় আজ সেই জ্ঞানবৃদ্ধগণ কল্পনাও করিতে পারিলেন না। কতদিন আনন্দ ভোগ করিলে, একদিন রাজসভার মধ্যে, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে নানা স্নেহের কথা বলিতে বলিতে, হঠাৎ পাশাখেলিবার আদেশ করিয়া বসিলেন। বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, তুমি একটু পাশা খেল না! আমি দেখি তুমি কেমন পাশাখেলিতে পার।" এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মরাজের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়া,যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার কথা বলিয়া দিল। তিনি পাশা-খেলার নানা দোষ প্রদর্শন করিয়া নানা ইতিহাস বলিতে লাগিলেন; বিদুরও আশঙ্কা করিয়া পাশাখেলার বিপক্ষে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বলিল, "সভাতে আমি ও ভীষ্মদেবদাদি গুরুবর্গ উপস্থিত থাকিতে, কি অনর্থ হইতে পারে? একটুক পাশা খেল!" এমন সময় মাতুল শকুনি ধর্ম্মরাজকে পাশা-খেলায় আহ্বান করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মামা ভাগিনা যেথানে, আপদ বালাই নাই সেথানে। এস, আমরা মামা ভাগিনায় পাশাখেলি! মহারাজের বাসনা পূর্ণ হউক।" ধর্ম্মরাজ খেলার অহ্বানে খেলিতে বাধ্য হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এত এত পাশাবিদ্ সভায় উপস্থিত থাকিতে কি না, কপট পাশাবিদ্ মাতুলের সঙ্গে আমার পাশাখেলিতে

হইবে।" পরে মাতুলকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "মাতুল, আমার মত অর্থাদির পণ কি তুমি ধরিতে পারিবে?" দুর্য্যোধন বলিয়া, উঠিল "মাতুলের পণের প্রতিভূ আমি হইব! তিনি যাহা হারিবেন আমি দিব, বিজয়ের দ্রব্যও আমার হইবে।" রাজসূয় যজ্ঞের পর ধর্ম্মরাজ ভ্রাতাগণের সহিত একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট যে যাহা চাহিবে, বিশেষ-জ্ঞাতি ধার্ত্তরাষ্ট্রের দল যাহা চাহিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ বিনা প্রতিবাদে তাহাই দান করিবেন; সেই দানে অন্য পাণ্ডবগণ বাধা প্রদানও করিবেন না। অদ্য সেই প্রতিজ্ঞায় ঠেকিয়া ধর্ম্মরাজ পাশাখেলিতে বাধ্য হইলেন। এমন কি শকুনি যেই যেই পণ ধরিতে লাগিল, পরাজয় নিশ্চয় জানিয়াও সেই সেই পণ রাখিয়া হারিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্য, সম্পত্তি পণে জয় করিয়া, পাষণ্ডগণ পাণ্ডবদের দুর্লভ অস্ত্রশস্ত্র রথ ও অলঙ্কারাদি পণে জয় করিল। ইহাতেও হইল না, পরে অন্য চারি পাণ্ডবের দাসত্ব পণ করিয়া জয় করিল। এর পরে ভারত সম্রাট ধর্ম্মরাজকে ও দাসত্বের পণে জয় করিল। তারপর মানুষে ভাবিতেও বুঝি পারিবে না, পাষণ্ডগণ এমন এক পণের কথা বলিয়া উঠিল, "দ্রৌপদীদেবীর দাসীত্বপণ"—দ্রৌপদী দেবী দাসী হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদের সেবা করিবে, এই পণ প্রার্থনা করিল।" এইবার ধর্ম্মরাজের হস্ত হইতেও পাশা পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি আবার তুলিয়া পাশা চালিয়া তাহাও হারিলেন; পাষণ্ডগণের বাসনা পূর্ণ হইল। ভীষ্মাদি বৃদ্ধগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, শ্বাসরহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, বাধাদানেরও যেন কেহ অবসর পাইলেন না। পাষণ্ড ধার্ত্তরাষ্ট্রের দল অতি আনন্দে যেন দিশাহারা হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণ নিজেরা বিনা প্রতিবাদে সত্যই সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাহাদের দাস হইয়া পড়িয়াছে, এত আনন্দ কি অসুর সম্বরণ করিতে পারে? আনন্দে গোল লাগাইয়া দিল— যেন পূজার শেষ পশুবলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রও

প্রতি দানের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতি উচ্চৈস্বরে "কিংজিত, কিংজিত" বলিয়া অনন্দ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে লাগিল; আর হৃদয়ের ভাব যেন গোপন থাকিতে চাহিতেছে না। দুর্য্যোধনাদি এতক্ষণ মাতুলের আড়ালে থাকিয়া পাশা খেলাইলেও, এখন প্রকাশ্যেই নিজেদের বিজয় বুঝিয়া লইতে ব্যস্ত হইল। প্রসাদ বিতরণের বিলম্ব আর সহেনা, প্রসাদ লুণ্ঠন করিয়া খাইতেই উদ্যত হইল। অমনি পাণ্ডবের অস্ত্র, শস্ত্র ও রত্নালঙ্কারাদি কাড়িয়া লইতে আদেশ করিল। সেই দিন স্ত্রীধর্ম্মান্বিতা হইয়া দ্রৌপদীদেবী অন্তঃপুরে ছিলেন, তখনি তাঁহাকে সভায় আনিতে লোক প্রেরিত হইল। আসিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং দুঃশাসনই বলপূর্ব্বক সভায় আনিতে ধাবিত হইল। কেবল যাওয়া নয়! আর্য্যগণ যাহা কখন ভাবিতেও পারেন না, পাষণ্ড দুঃশাসন তাহাই করিয়া বসিল। সর্ব্বভারতের পূজ্যা সম্রাজ্ঞী, বীরপত্নী, বীর-পুত্রবতী রমণী, তাতে স্ত্রীধর্ম্মান্বিতা কুলবধু, আবার তাহাদেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধু, সেই দ্রৌপদীকে অসুর-দুঃশাসন বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করিয়া, রাজ সভায় গুরুবর্গের মধ্যে লইয়া আসিল। বলিদানের ভার যে তার উপরে ছিল, তাই সে এই কালে কুলধর্ম্ম, লজ্জা ও আর্য্যত্বকে বলিদান করিল। ধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগকে আজ কর্দ্দমে আবদ্ধ হস্তীর ন্যায় ধর্ম্মপণে বদ্ধ, আত্ম চেষ্টায়ও অশক্ত জানিয়া, অসুরেরদল তাহাদের মস্তকে উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পাণ্ডবগণকে ও দ্রৌপদীদেবীকে নানা অকথ্য বাক্য বলিয়া অবমাননা আরম্ভ করিল।

ভক্ত—এইরূপই বাবা, কর্ণরূপ ঈর্ষ্যার অধীন হইলে অসুর যে কি পর্য্যন্ত পাষণ্ডতা করিতে পারে, দেবপ্রকৃতিগণ তাহা ভাবিয়া উঠিতেও সক্ষম হয় না। তাহাদের কুটিলতা শকুনির চক্রভেদ করিতে বিদুর ভীষ্মের ন্যায় জ্ঞানবানও অক্ষম হন। আর তাহাদের ধৈর্য্যহীনতা দুঃশাসনত্বের কর্ম্ম এই দুঃশাসনের মতই এত দ্রুত কাজ করিয়া বসে যে,

তাহাকে বাধা দিবারও যেন কেহ সময় পায় না। এই দুঃশাসনের ধৈর্য্যহীনতা হঠকারিতা দোষেই অসুর সর্ব্বদা কর্ম্মের সুফল ভোগে বঞ্চিত হয়। কত ধৈর্য্যে ধৃতরাষ্ট্রকে আয়ত্ত করিয়া, পাশা খেলার মন্ত্রণা করিয়া, নিজেরা আড়ালে থাকিয়া শকুনির দ্বারা পাণ্ডবকে পণ-প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিয়াছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, পরম-ধার্ম্মিক পাণ্ডব যাহা বলিয়াছে নিশ্চয় তাহাই করিবে জানে, কিন্তু অসুরের দলের সেই বিলম্বটুকু আর সহিতেছে না। বাবা, এইটুকু যে তাহাদের জন্মগত দোষ! এই অধৈর্য্যতার গর্ভস্রাবেই যে ইহাদের জন্ম। তাই ইহাদের সকল কর্ম্ম এই দোষেই পণ্ড হইয়া যাইবে। এই দোষ না থাকিলে অসুর দেবশক্তির ভোগে বঞ্চিত হইবে কিরূপে?

রাজসূয়-যজ্ঞান্তে ব্যাসদেব বিদায় চাহিলে, ধর্ম্মরাজ তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারিদিকে ভীষণ লোকক্ষয়ের ও মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার দুর্লক্ষণ দেখিয়াছিলাম। শিশুপালাদির মৃত্যুতেই কি তাহার শেষ হইল?" ব্যাসদেব বলিলেন, "না বাবা, তোমাকে নিমিত্ত করিয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবে যুদ্ধ হইয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইবে।" ধর্ম্মরাজ সেই কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ব্যাসদেবকে বিদায় দিয়া, ভ্রাতাদিগকে আহ্বান করিলেন। ভ্রাতাদিগকে ব্যাসদেবের কথা জানাইয়া বলিলেন, "ব্যাস দেবের কথা নিশ্চয়ই সত্য হইবে। তাই আমি বলিতেছি, তোমরা আমায় পরিত্যাগ করিয়া ভীমকে রাজা করিয়া রাজত্ব কর! আমি তপস্যা জন্য বনে গমন করি।" কিন্তু অন্য পাণ্ডবগণ ধর্ম্মরাজকে ফেলিয়া কিছুতেই রাজত্ব করিতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বলিল, পঞ্চভূতের একটীর অভাবে যেমন জীবের দেহই রক্ষা হয় না, পঞ্চ প্রাণের একটীর অভাবে যেমন আত্মা দেহে থাকিতে পারে না, পঞ্চপাণ্ডবদের একটী বিনেও পাণ্ডব পৃথিবীতে থাকিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরই

বিষয় ভোগের স্পৃহা নাই, বনে যাইয়া তপস্যা করিতে হয়, চলুন, আমরাও তথায় যাইব।” এক পাণ্ডবও ধর্ম্মরাজকে ফেলিয়া রাজ্য ভোগে স্বীকৃত হইল না দেখিয়া, ধর্ম্মরাজ, সকলকে বলিলেন, “আচ্ছা তবে এস আমরা সকলেই বিষয় সংসার হইতে বিদায় লইয়া, বিষয় ভোগ করিতে প্রস্তুত হই। লোকে যাহা চায় তাহা না পাইলেইত বিবাদ করিয়া থাকে? তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার নিকট যে যাহা চাহিবে, বিশেষ জ্ঞাতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যাহা চাহিবে তাইই তাহাদিগকে দান করিব, তাহাতে তোমরা কখনও বাধা দিতে পারিবে না।” সকল পাণ্ডবই আনন্দে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। সেইদিন হইতে পাণ্ডব অকাতরে ধন সম্পদ বিতরণ আরম্ভ করিল। ইচ্ছা সব বিতরণ করিয়া তাহারা বনে চলিয়া যাইবে। ইহাই ইচ্ছা করিয়া, ধর্ম্মরাজ বিধাতার নিয়তির জাল ছিন্ন করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জালে পতিত মৎস্য যেমন জাল ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া, আরও জালের দৃঢ়-পাশে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়! ধর্ম্মরাজও আজ এই প্রতিজ্ঞার জালে আবদ্ধ হইয়াই, দারুণ কপটপাশা খেলিতে বাধ্য হইলেন। অভাবনীয় ঘৃণিত পণেও স্বীকৃত হইয়া, নিজেদের ধন সম্পত্তি, অস্ত্র, শস্ত্র ও নিজেদের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইয়া, পত্নীর সহিত পাষণ্ড অসুরের দাস হইলেন।

কিন্তু কি মহত্ব পাণ্ডবের, কি ধৈর্য্য পাণ্ডবের! কিছুতেই এক পাণ্ডব ও প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইল না। নিয়তি দেবীর এমন অগ্নি পরীক্ষায় ও পাণ্ডব স্থির ধীরভাবে টিকিয়া রহিল। অদ্য যে পাণ্ডবের মহাপরীক্ষার দিন— অদ্য তাঁহাদের ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণের পরীক্ষা, তাঁহাদের সন্তোষ লাভের যোগ্যতার পরীক্ষা, সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞানের পরীক্ষা, ভগবৎভক্তি ও ঈশ্বর নির্ভরতার চরম-পরীক্ষা হইবে। আবার অদ্য এই সভাস্থ সকলেরও পরীক্ষা হইবে—এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত কাহারা তাহা

নির্ব্বাচিত হইবে, পবিত্র কুরুবংশের আর্য্যরক্তকে কলুষিত করিয়াছে কাহারা তাহা প্রদর্শিত হইবে। এই সভাস্থ যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, আর বাধা না দিয়া এই দারুণ অনার্য্যত্ব যাহারা দর্শণ করিয়াছে, সকলেরই অকালে কুরুক্ষেত্রে প্রাণ বলিদিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ভীষ্ম দ্রোণাদিও এই ফল হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।

লীলা—দ্রৌপদীদেবীকে বলপূর্ব্বক সভায় আনা হইলে, তিনি দৃঢ় স্বরে নিজকে অজিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ও পাণ্ডবগণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ যখন আগে নিজকে হারিয়াছিলেন, তাহার পরে অন্য কোনও দ্রব্য দানে তাঁহার কোনই অধিকার থাকিতে পারে না। আর দ্রৌপদী যখন পঞ্চ পাণ্ডবের সম্পত্তি, তাহাকে এক পাণ্ডবের দানের অধিকারই নাই; দান করিলেও সেই দান অসিদ্ধ।" রাজ বিধানে সত্যই এইরূপ দান অসিদ্ধ, তাই বিদুর ও দুর্য্যোধন-ভ্রাতা বিকর্ণ দ্রৌপদীর এই মত স্বীকার করিয়া দ্রৌপদীকে অজিত বলিতে লাগিলেন; পাণ্ডব কিন্তু শব্দও করিল না। রাজবিধানে দ্রৌপদী অজিত হইলেও, পাণ্ডব কিছুই বলিতেছে না দেখিয়া, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উঠিয়া বলিলেন, "মা আমাদের জ্ঞানমতেত তোমায় অজিতই দেখিতেছি, কিন্তু ধর্ম্মের গতি যে অতি সূক্ষ্ম। অনেক সময় যথাযথ ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে ঋষিগণ ও অক্ষম হইয়া পড়েন। আমরা জানি বর্ত্তমানে ধর্ম্মরাজই মাত্র ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার করিতে সক্ষম। এখন তিনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই স্বীকার করিব।" তবু ধর্ম্মরাজ শব্দ করিলেন না। তখন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ আর কি বলিবেন? ইনি আমাদের সর্ব্বাবস্থার প্রভু! তিনি আমাদিগকে যে কোনও অবস্থায় যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাঁহার বাক্য চিরসিদ্ধ, তাহাতে আর কিন্তু নাই।" এই উত্তর শুনিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদের আনন্দ আর ধরে না। বিদুর, বিকর্ণাদিকে নিন্দা করা হইতে লাগিল।

আর দ্রৌপদীকেও নানা প্রকারে অবমাননা আরম্ভ হইল। পাণ্ডবেরা শস্ত্রহীন ষণ্ডতিল, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া এখন তাহাদের কাহাকেও বরণ করিতে দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিল। পঞ্চটী হইলে আর ষষ্ঠটীতে দোষ কি, এখন দুর্য্যোধনকে বরণ কর! এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধনকে দেখাইয়া দিল। পাষণ্ড দুর্য্যোধনও তাহার বাম উরুতে বসিবার জন্য দ্রৌপদীকে ইঙ্গিত করিল। কর্ণও যেন আজ সময় পাইয়া, লক্ষ্যভেদ কালে যে সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না বলিয়া তাহার অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধের জন্য অস্ত্র মর্ম্মচ্ছেদক বাক্যদ্বারা দ্রৌপদীকে পীড়ন করিতে লাগিল। ইহাতেও হইল না, পাষণ্ডগণ শুধু হিংসাবৃত্তির তৃপ্তিজন্য এবার যাহা করিতে উদ্যত হইল, তাহা বুঝি কেহ কখন ভাবিতেও পারে না! দাসীর অঙ্গে আবার রত্নালঙ্কার ও বহুমূল্য অঙ্গাবরণ কেন বলিয়া, দুঃশাসন দ্রৌপদীদেবীর অঙ্গাবরণ বস্ত্র বলপূর্ব্বক খুলিয়া লইতে উদ্যত হইল। হিন্দুরমণী স্ত্রীধর্ম্মকালে, নিজকে অপবিত্রা বোধ করিয়া নির্জ্জনগৃহে সামান্য বস্ত্রে নিম্নাঙ্গ আবরণ করিয়া, একটী গাত্রবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করিয়া থাকিবার নিয়ম। তাই এই অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া লইলে তাহাদের সর্ব্বঅঙ্গই একরূপ আবরণ হীন হইয়া পড়ে। পাপমতি দুঃশাসন রাজসভায় এত লোকের মধ্যে, সেই একমাত্র অঙ্গাচ্ছাদন টানিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলে, দ্রৌপদী-দেবী লজ্জায় একরূপ মরিয়া গেলেন এবং অন্য আত্মচেষ্টায় আর উপায় নাই ভাবিয়া, অগতির গতি, ধর্ম্মপথীগণের একমাত্র আশ্রয় ভগবান্‌কেই অনন্যশরণা হইয়া কাতরে ডাকিতে লাগিলেন। কায়মনোবাক্যে শরণ লওয়ায় একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। অমনি চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ভীষ্মাদিবৃদ্ধগণ ও ব্রাহ্মণগণ চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া সভাপরিত্যাগ করিয়া গেলেন, বিদুর তারস্বরে "ভস্ম হইলি ভস্ম হইলি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কৌরবদের যজ্ঞাগারের অগ্নি হঠাৎ প্রজ্বলিত

হইয়া গৃহদাহ করিতে লাগিল, গৃধিনী সকল গৃহচূড়ায় বসিয়া বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, শৃগাল সকল চীৎকার করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, রাজকুলবধূগণ ভয়ে উদ্বেগে রোদন করিতে করিতে রাজসভার দিকে ধাবিত হইল। এইদিকে দুঃশাসন, শত আকর্ষণ করিয়াও দ্রোপদীর গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে পারিতেছে না! সে একটী বস্ত্র টানিয়া লইতেই, কে যেন দ্রোপদীর অঙ্গে আরও সুন্দর, মহামূল্য বস্ত্র পরাইয়া দিতেছে। সে রাশি রাশি বস্ত্র টানিয়া স্তুপায়মান করিয়া শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। এই অমানুষি শক্তির বিকাশ, তাতে চারিদিকে হাহাকার, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যেন কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এমন সময় ধৃতরাষ্ট্র বেগে উঠিয়া একেবারে দ্রোপদীর সম্মুখে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিলেন ও কাতর কান্দিতে কান্দিতে নিজের হতভাগা পুত্রগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড পুত্রগণকে শত শত ধিক্কার দিতে দিতে, দ্রোপদী ও পাণ্ডবগণকে শত মুখে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ যুক্ততায় বিশুদ্ধচিত্ত দ্রোপদী-দেবীর ও তখন আর মনে ক্রোধ বা দ্বেষ ছিল না। তিনি অম্লান-বদনে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ক্ষমা করিয়া, শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সস্নেহে মিনতি করিয়া বলিলেন "মা, এমন পাষণ্ডকেও ক্ষমা করা, কেবল তোমরাই করিতে পার! যখন বলিয়াছ তখন নিশ্চয় করিয়াছ, কেন না তোমরা রহস্য ছলেও যে মিথ্যা কথা বল না। কিন্তু মা, আমি নিজে ডাকিয়া আনিয়া তোমাদিগকে এমন দুঃখ দান করিলাম বলিয়া, আমার মনে বড়ই তাপ হইতেছে। তুমি আমার নিকট কিছু বর গ্রহণ কর! তবেই আমার প্রাণ কিছু তৃপ্ত হয়। দ্রোপদী দেবী শ্বশুরের আত্মগ্লানি ও বিনয়ে বাধ্য হইয়া এক বর গ্রহণ করিলন, "বলিলেন কনিষ্ঠ চারি পাণ্ডব দাসত্ব মুক্ত হউক। রাজা বলিলেন, "ইহাতেও তোমার পূর্ণ সৎকার হইল না মা! যদি যথার্থই ক্ষমা করিয়া থাক, আরও কিছু প্রার্থনা কর।" এইবার দ্রোপদী

ধর্ম্মরাজের দাসত্ব মোচন প্রার্থনা করিলেন। যেইরূপ ভাবে এক এক পণে হারিয়াছিল, সেইভাবে এক এক পণের বিষয়ই দেবী প্রার্থনা করিলেন; তাই একবারে সব চাহিলেন না। রাজা আরও বর প্রার্থনার জন্য মিনতি করিলে, দ্রৌপদী- দেবী বলিলেন "শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ানীকে দুইবার মাত্র বর গ্রহণের আদেশ দান করিয়াছেন, আমার ত আর বর গ্রহণের অধিকার নাই।" পণে দাসীত্ব প্রাপ্তি হেতু অদ্য দ্রৌপদী ক্ষত্রিয়ানী মাত্র, রাণীর অধিকার তিন বর প্রার্থনা করিবারও তাহার অধিকার নাই। কি মহত্ব দ্রৌপদীর, যেই স্বামীর জন্য শত্রুর দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়া আজ কত অসম্মান প্রাপ্ত হইল, অদ্য নিজের দাসীত্ব মোচন না করিয়া তিনি সেই স্বামীরই দাসীত্ব মোচন করিয়া দিলেন। কত ধর্ম্মজ্ঞান ও সাত্ত্বিকতা! এমন পাষণ্ড অসুরদের অত্যাচারের আস্বাদ পাইয়াও, ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় হাতে পাইয়াও, শাস্ত্রবাক্যে অধিকার নাই বলিয়া সে উপায়কে দ্রৌপদী ব্যবহার করিলেন না। এমন সাত্ত্বিক-ভক্তকে কি ভগবান্ রক্ষা না করিয়া পারেন! ভগবানের ইচ্ছায় তাই ধৃতরাষ্ট্রের পাষাণ মনও আজ করুণায় গলিয়া গেল।

দ্রৌপদী নিজ দাসীত্ব মোচন ও প্রার্থনা করিল না দেখিয়া, রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নিজেই তার দাসীত্ব মোচন করিয়া দিলেন ও ইহার উপরেও সর্ব্বরাজ্য সম্পদও ফিরাইয়া দিলেন। আরও বহু ধন রত্ন নিজ হইতে দান করিয়া, পাণ্ডবদের প্রত্যেককে বহু আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিতে করিতে তাহাদিগকে রাজ্যে যাইতে আদেশ দান করিলেন। কি এক দৈব শক্তিতে অভিভূত হইয়া, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ইহাতে বাধা দানেরও সময় পাইল না। রাজাও যেন কিসে অভিভূত হইয়া অনিচ্ছায়ও পাণ্ডবদিগকে সব ফিরাইয়া দিয়া দিলেন। এইরূপে প্রথম বারের পাশাখেলার শেষ হইল।

তত্ত্ব—এইরূপই বাবা, ধার্ম্মিক যদি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ না করেন, তবে যত

বিপদই কেন চারিদিক অন্ধকার করিয়া, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া না আসুক, তাহারা তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। যদি ধার্ম্মিক ভক্ত, সত্যই ভয়ে বিচলিত না হইয়া, উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া, ভক্তি ও বিশ্বাস সহ শুধু ভগবানে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে, তবে নিশ্চয় অমানুষি ভগবৎসত্তা বিকশিত হইয়া ও তাঁর বিপদ রাশি নষ্ট করিয়া দিবে। বৎস,সন্তানগণকে খেলায় মগ্ন দেখিলে, মাতা যেমন বেশ নিশ্চিন্তে দূরে বসিয়া থাকেন। কিন্তু ছেলে হঠাৎ ব্যথা আদি পাইয়া কান্দিয়া উঠিলেই মাতা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার দুঃখ দূর করিয়া দেন। ভক্তের ক্রন্দনেও তেমন ভগবানের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অবস্থার নাশ হইয়া, গুণময় লীলাময় অবস্থার প্রকাশ হয়। তখন সত্যই প্রাকৃতজগতে অপ্রাকৃত ভগবৎসত্তার বিকাশ হইয়া উঠে। এই দ্রৌপদী-দেবীর বস্ত্রবর্দ্ধন একটুকুও কল্পনা নয় বাবা! অদ্যও সর্ব্বদেশে ভগবৎভক্তদের জীবনে এইরূপ কত অমানুষ ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে,ইহা নিত্য ও সত্য ঘটনা। ভক্ত হইতে ঈশ্বর-নির্ভর বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে, অসুরেরা যতই কেন টানা টানি না করুক, ভক্ত যদি ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি ত্যাগ না করে, তবে কেহই সেই বস্ত্র খুলিয়া শেষ করিতে পারে নাই। এখানে দ্রৌপদীর গাত্র হইতে নানা প্রকারের বিচিত্র বস্ত্র বাহির হইতে লাগিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সত্যই এইরূপ এক এক দয়ারূপ এক এক বস্ত্র প্রকাশিত হইয়া ভক্তকে আবরণ করিতে থাকে। যেমন প্রহ্লাদের ঈশ্বর নির্ভর ধরিয়া আকর্ষণ করাতে হস্তিদলন, সাগরে ক্ষেপণ, অস্ত্রাঘাত, অগ্নিদাহণ ইত্যাদি নানা লীলা প্রকাশিত হইল। অসুরেরা তাঁর ভক্তি নাশ করিতে পারিল কি? আরও ভগবানের নানা দয়া দর্শনে তাঁর প্রাণে ভগবৎ-সত্তা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। কিন্তু অসুরগণ দৈব শক্তি দর্শনে ক্ষণিক মোহিত হইয়া আবার বিস্মৃত হইয়া গেল, অদ্যও ঠিক তাহাই হইল। পাণ্ডব ও দ্রৌপদী ধর্ম্ম ও ভগবানের বিভূতি ও বিপদ্‌বারণ শক্তি দেখিয়া আরও দৃঢ়বিশ্বাসী ও ভক্ত হইয়া

উঠিল, আর অসুর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এইসব দেখিয়াও দেখিল না, বুঝিয়াও বুঝিল না। ব্যাঘ্রের মুখ হইতে শিকার ছুটিয়া গেলে সে যেমন আরও ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হইয়া তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে, তাহারাও পাণ্ডবকে চূর্ণ করিতে আরও কৃতনিশ্চয় হইল।

লীলা—পাণ্ডবগণ চলিয়াগেলেই সূর্য্যঅস্তগতে হিংস্রজন্তুগণের জাগরণের মত, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সেই হিংসাদি আবার জাগিয়া উঠিল। "হায়, একি করিলাম! এত কষ্টে রত্নলাভ করিয়া একটু মনের দুর্ব্বলতায় সব হারাইল! বস্ত্র বাড়িয়াছিল তাতে কি হইয়া ছিল, বাজিকরেরাও এমন কত অদ্ভুৎ খেলা দেখায়! তারপর এমন হৈ চৈ হাহাকার, দুঃশাসন বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া ছিল কি না ধরিয়া ছিল, তারই বা ঠিক কি? এমন করিয়া সব পাইয়া হারাইলাম! আরও সর্পকে পদাঘাতে জাগ্রত করার মত, পাণ্ডবদিগকে দারুণ অপমান করিয়া, আমরা যে তাহাদের কত বড় মহাশত্রু তাহা জানাইয়া দিলাম। কল্যই তাঁহারা এই অপমানের প্রতি-শোধ লইতে, সমস্ত বলের সহিত আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় পাণ্ডবের এই অপমান সহ্য করিবেন না! রাজা দ্রুপদও নিশ্চয় দ্রৌপদীর প্রতি এই অসম্মান উপেক্ষা করিবে না! এর পর পাণ্ডব মাতুল, তাহাদের শ্বশুর-কুল সকলেই স্ববলে প্রতিবধান লইতে আমা-দিগকে আক্রমণ করিবে! পাণ্ডব রাজ্যে না ফিরিতে ফিরিতে ইহার প্রতিবিধান করা উচিৎ।" ধৃতরাষ্ট্রও ইহাদের যুক্তিতে ভীত হইয়া পড়িলেন। ভীষ্মাদি বিরক্ত হইয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা এই বিরোধে সহায়তা করিবে না ভাবিয়া, সে পাণ্ডব ভয়ে আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাই ভীষ্মাদিকে না জানাইয়া একজন চতুর মন্ত্রীকে নানা বাক্যে ভুলাইয়া পাণ্ডবকে ফিরাইয়া আনিতে প্রেরণ করিল। এই দিকে রাজ্যাদি হরণ পণ করিলে এইবার নিশ্চয় ভীষ্মাদি বাধা দান

করিবেন ভাবিয়া, কৌশলে রাজ্য হরণ ও আক্রমণ নাশের উপায় করিয়া পণ নির্ব্বাচন করিল। এইবার পাশায় যেই পক্ষই হারিবে, তাহারা রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর তাপস-ভাবে বনবাসে যাইতে হইবে। ও শেষ বৎসর অজ্ঞাত ভাবে বাস করিতে হইবে। কোন প্রকার কেহ প্রকাশ পাইলেই, আবার ত্রয়োদশ বৎসর এই নিয়মে বনে বাস করিতে হইবে। আর অজ্ঞাত বাস করিতে পারিলে, তাহাদের সমস্ত রাজ্য ও স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। পাণ্ডবকে কোনরূপে একবার বনে পাঠাইতে পারিলেই, আর রাজ্যাদি দান করিবে না দুর্য্যোধনের প্রকৃত ইচ্ছা ছিল।

দ্রুতগামী দূত পথিমধ্যেই পাণ্ডব শিবিরে গমন করিয়া, জ্যেষ্ঠতাতের আহ্বান জানাইল। পাণ্ডব ভয়ে মৃত প্রায় হইয়াও আবার আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করিলেন। আবার রাজ সভায় পাশা খেলার আয়োজন হইল। বিদুরের শত শত বাধা দান, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাদির অসম্মতি ও বিরক্তি উপেক্ষা করিয়াও, এই নূতন পণে পাশা খেলিতে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে আদেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজও বিনা প্রতিবাদে পাশা খেলিয়া তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিলেন। এই পণে হারিয়া পাণ্ডবের একটুকুও কষ্ট হইল না! কেন না, তাহারা যে এইরূপ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার জন্য, কোন দিন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এত আয়োজন ও অধর্ম্ম না করিয়া, মুখে চাহিলেই যে পাণ্ডব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে রাজ্য দান করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহারা প্রশান্ত ভাবে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসীর বল্কল-বসন ধারণ করিলেন। দ্রৌপদীও অলঙ্কার খুলিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে স্বামিগণ সহিত বনে যাইতেই প্রস্তুত হইলেন। এমন দুঃখের সময়েও পাণ্ডব সদাচার ভ্রষ্ট হইল না; একটু কাতরতাও প্রকাশ করিল না। ধর্ম্মরাজ ভীষ্মাদি বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া, তাহাদের নিকট বনে গমনের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কান্দিয়া আকুল হইলেন, কেহই কিছু বলিতেও

সক্ষম হইলেন না। কেবল বিদুর ধৈর্য্য ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে নানা আশীর্ব্বাদের সহিত, বনবাস কালের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিলেন এবং কুন্তীদেবীকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বিদুরের কাতর অনুনয়ে ও কুন্তীদেবী স্বীকৃতা হইলে, মাকে বিদুরের নিকটই রাখিয়া, ধর্ম্মরাজ সভাস্থ সাধারণের নিকটও বিনয় সহ বনে গমন জন্য আদেশ চাহিয়া, জেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে ও গান্ধারী-দেবীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা লজ্জায় মুখ তুলিতেও পারিল না। দ্রৌপদী দেবী সন্ন্যাসিনী বেশে কুলবধুগণের নিকট বিদায় চাহিলে,ধার্ত্তরাষ্ট্র-বধুগণ স্বামিগণকে ধিক্কার দান করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ এইরূপে চরিত্র বলে সভাস্থ সকলকে কান্দাইয়া,যেন ধার্ত্তরাষ্ট্র গণের সমস্ত তেজ ও পুণ্যরাশি হরণ করিয়া, বিজয়ী বীরের মত সভা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রদের একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা যেই রাজ্য সম্পদকে এত যত্ন চেষ্টা করিয়া গ্রহণ করিল, সেই সম্পদকে পাণ্ডব ছিন্নবস্ত্রখণ্ডের মত উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়; মুখে একটু বিষণ্ণতাও আসিল না! ইহাতে পাষণ্ডের মনে সুখ হইবে কেন? যাহাকে আঘাত করিলাম সে যদি একটুকু যাতনা প্রকাশ না করে, তবে আঘাতের সার্থকতা কি? মরাকে মারিয়া কে কবে আনন্দ পায়। আরও সভার মধ্যে কেহই তাহাদিগকে অভিনন্দন না করিয়া, কেবল পাণ্ডবগণকেই প্রশংসা করিতেছে দেখিয়া তাহাদের গাত্র দাহ হইবে না কেন? হীনমতি দুঃশাসন পাণ্ডবগণকে আবার বাক্য যন্ত্রণা দ্বারা অসম্মান করিতে ইচ্ছা করিল। ভীমসেন ধৈর্য্য ধারণ করিলেও, ধর্ম্মের প্রতি পাষণ্ডদের এই অত্যাচার সহ্য করা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে ক্রোধে টলিতে টলিতে গমনোদ্যত হইলে, তাঁহার সেই গতির অনুকরণ করিয়া, দুঃশাসন অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে 'গরু গরু' বলিয়া

উঠিল! আর অন্য পাষণ্ডগণ উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। অমনি অগ্নিগিরি বিদীর্ণ হইয়া অগ্নিশ্রাবের মত, মহাযোগী ভীমসেনের অতি কষ্টে রক্ষিত ক্রোধরাশি অভিশাপরূপে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। ভীমসেন দণ্ডাহত স্বর্পের মত ফিরিয়া দাড়াইয়া, সিংহের মত গর্জ্জনে সমস্ত সভা কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন। "সত্যই আমি গরু! অতি অধম পশু হইতেও পশু! তাই না এমন নির্ব্বৈর ধর্ম্মরাজের উপর অত্যাচার করিয়া তোরা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছিস্। থাক আরও ত্রয়োদশ বৎসর এই ঘৃণিত জীবন লইয়া, সকলের নিন্দাভাজন হইয়া বাঁচিয়া থাক। দুঃশাসন তোর সমস্ত কর্ম্ম হৃদয়ের মধ্যে ঋণের খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছি। ত্রয়োদশ বর্ষ পরে যুদ্ধক্ষেত্রে এই কর্ণ, দুর্য্যোধন তোর সমস্ত বলের চক্ষের সম্মুখে তোকে পাতিত করিয়া, তোর উপরে বসিয়া যে দিন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তোর বক্ষ ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে পারিব, সেইদিন তোর ঋণ পরিশোধ হইবে। তোর স্পর্শে দ্রৌপদীর চুল অপবিত্র হইয়াছে! অদ্য হইতে এই চুল এলাইত থাকিবে, তোর বক্ষের উষ্ণ রক্তে এই কেশ ধৌত করিতে পারিলে, আবার এই কেশ সংস্কার হইবে। সেই বস্ত্রাকর্ষণের হস্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া যে দিন কাটিতে পারিব, সেইদিন তাহার শোধ হইবে। দুর্য্যোধন! তোমার সেই উরু সঙ্কেত ভুলি নাই! যুদ্ধস্থলে আমার এই দারুণ গদার আঘাতে, তোর সেই পাপ-উরু যদি ভঙ্গ করিতে না পারি, তবে যেন আমার সমস্ত ধর্ম্মবল নষ্ট হয়, আমার পিতৃগণ যেন স্বর্গভ্রষ্ট হন। যুদ্ধস্থলে তোকে পাতিত করিয়া তোর মস্তকে উঠিয়া নৃত্য করিয়া জানাইয়া দিব, পাণ্ডব কেমন শস্যহীন ষণ্ডতীল। আর হীন সূত-পুত্র, এহেন অধর্ম্ম পীড়নকালে যেই সব দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, রণক্ষেত্রে একমাত্র অর্জ্জুনের শরে সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করিয়া তাহার প্রতিফললাভ করিবে। দুরাত্মা শকুনি, অধর্ম্মের কপট পাশায় সরল ধার্ম্মিককে পরাজয় করিয়া বিজয় গর্ব্ব প্রকাশ,

করিতেছ! নকুলের বাণাঘাতে এই পাশার মত সবান্ধবে রণক্ষেত্রে গড়াইয়া ইহার প্রতিশোধ করিতে হইবে। ধার্ম্মিক যোগীর ক্রোধ, যাহাতে দেবগণকে পর্য্যন্ত স্বস্থান চ্যুত করিয়া দেয়, ভগবান্ পর্য্যন্ত যে ভয়ে কম্পিত হন, সেই বীর্য্য হীন পাষণ্ডগণ ধারণ করিতে পারিবে কেন? ধার্ত্তরাষ্ট্রদের সব তেজ দর্প তখনই অন্তর্হিত হইল! ভীমের এই সমস্ত বাক্য যেন সত্যই মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের নিকট দর্শন দিল। দুঃশাসন ভয়ে চিৎকার করিয়া কর্ণের পশ্চাতে লুক্কাইত হইল, দুর্যোধনাদিও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পাণ্ডবগণ সভা পরিত্যাগ করিয়া বনের দিকে প্রস্থান করিলেন। দুঃশাসন নাকি বহুদিন পর্য্যন্ত শয়নে স্বপনে, ভীম তাহার বক্ষ ভেদ করিতেছে এইরূপ দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত।

পাণ্ডবের সভাত্যাগ মাত্র বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের দেব-মন্দিরের চূড়া ভগ্ন হইল, পৃথিবী বার বার কম্পিতা হইতে লাগিলেন, বিনা বাতাসে রথের পতাকা সমূহ খসিয়া পড়িতে লাগিল, শৃগালকুল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দিবসেই ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। সেইকালে হঠাৎ রাজ-সভায় নারদ মুনি প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "এই পাপে ত্রয়োদশ বর্ষ পরে ধার্ত্তরাষ্ট্র কুল সমূলে ধ্বংস হইবে।"

নারদের বাক্য, নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন, কুলবধূগণের ক্রন্দন, আপামর সাধারণের নিন্দা ও ভীমের প্রতিজ্ঞার ভয়ে দুঃশাসনের আহার নিদ্রা নষ্ট হইলে, পাণ্ডবগণকে ফিরাইয়া আনিতে বা রাজার মত বনবাস করিতে স্বীকৃত করিবার জন্য, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে প্রেরণ করিলেন; পাণ্ডবগণ কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইতে স্বীকৃত হইল না। তখন পাণ্ডব ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া দুর্যোধনাদির পরামর্শে, অস্ত্রধারী-প্রধান দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার পুত্রকে হস্তগত করিবার জন্য, ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণাচার্য্যকে আনিয়া তাঁহার চরণে রাজমুকুট অর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলিলেন "গুরুদেব, আজ

হইতে ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলের রক্ষাভার আপনার চরণে প্রদত্ত হইল! আপনি আমাদিগকে অভয় দান করুন্ আমরা নিশ্চিন্ত হই!" দ্রোণাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন "আমি জানি, আমায় আমার প্রাণাধিক প্রিয় পাণ্ডবের বিপক্ষই হইতে হইবে! নচেৎ আমার মৃত্যু-জন্য জাত ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমার শত্রুতার সুযোগ কি করিয়া পাইবে! ইহা জানিয়াই আমি অর্জ্জুনকে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্ব ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষাদান করাইয়াছি; ইহা আমার নিয়তির খেলা। কিন্তু দুর্য্যোধন! কি আমরা পিতাপুত্র, কি ভীষ্ম, কৃপ কেহই তোমাকে পরম ধার্ম্মিক দেব-পুত্র পাণ্ডবের সহিত বিরোধ করিলে রক্ষা করিতে পারিবেন না। অধর্ম্মপথে চলিলে, ধার্ম্মিক ও ভগবৎ ভক্তের প্রতি পীড়ন করিলে, দেবতাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না; তাই মহাদেব রক্ষিত রাবণ ও বান্ আদি রাজাও নিহত হইয়াছেন। আশ্রয় যখন প্রার্থনা করিয়াছ, আশ্রয় দিলাম বটে, পাণ্ডব বিরোধে মতি থাকিলে এই ত্রয়োদশ বর্ষ যত ইচ্ছা সুখভোগ করিয়া লও এবং যজ্ঞ ধর্ম্মাদিও করিয়া লও, তারপরে নিশ্চয় মরিতে হইবে।" ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পিতাপুত্রকে রক্ষক লাভ করিয়া, পাণ্ডব ভয় হইতে নিজদিগকে মুক্ত মনে করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যের ভয় প্রদর্শনকে, ধর্ম্মে মতি জন্য কপট বাক্য মনে করিয়া কানেও ধরিল না। পাণ্ডবদের রাজ্য দ্রোণাচার্য্যকে ভোগ জন্য দান করিয়া, তাহারা তাহাকে বিত্তভোগী করিলে। দ্রুপদ রাজ্যের অর্দ্ধাংশের রাজা বলিয়া এতদিন এই পিতাপুত্র স্বাধীন ছিলেন, এই দিন হইতে ধার্ত্তরাষ্ট্র দলভুক্ত হইলেন। এইরূপে পাশা পর্ব্বাধ্যায়ের শেষ হইল।

ভক্ত—বাবা, এই পাশা-পর্ব্বাধ্যায়ের দ্রৌপদীদেবীর অস্পৃশ্যা হওয়া, সভায় না যাওয়া, বলপূর্ব্বক সভায় নিতা হওয়া, সভায় যাইয়া ধর্ম্মরাজের নিন্দাকরা, নিজকে অজিত বলিয়া বাকচাতুর্য্য করা, কেশাকর্ষণ, এবং দুঃশাসন

কর্ত্তৃক বস্ত্রালঙ্কার হরণ চেষ্টা সর্ব্বত্রই নানা গভীর তত্ত্ব মাখা। আজ সন্তোষ-দেবীর সর্ব্বপরিচয় ও তিনি কাহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া সেবা ভার গ্রহণ করেন, সেই সমস্ত,এই সকলের মধ্যে জীবন্ত করিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। পাশা খেলা ও অত্যাচার আদির মধ্যে সর্ব্বত্র কেবল পাণ্ডবের ধর্ম্মপ্রাণতার মহা অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কেবল ধর্ম্মরাজ বলিয়াই এমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। এখন একে একে পরীক্ষাগুলি শ্রবণ কর,প্রত্যেক ধর্ম্মপথীরই ইহার প্রত্যেকটী বিষয় বিশেষ করিয়া মনে রাখা প্রয়োজন।

(১) সন্তোষদেবী চিরকালই অসুরদের অস্পৃশ্যা—এই দেবীকে স্পর্শ করিতে পারিলে কি আর অসুরের অসুরত্ব থাকে! তাই দ্রোপদীদেবী অস্পৃশ্যা হইয়াছিলেন। আর অসুরের সভায় সন্তোষদেবীর আসন কোথায়! তাই তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্র সভায় গমন করেন নাই। সন্তোষ উপস্থিত থাকিলে অসুরের অসন্তোষই যে আসিতে পারিত না? অসুরেরা চিরকালই অধর্ম্ম কপটতা দ্বারা ধার্ম্মিকদিগকে পীড়ন করিয়া, বলপূর্ব্বক সন্তোষের সেবা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। তাহাই দ্রোপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া টানিয়া সভায় আনয়ন ও দাসী করিবার চেষ্টা। জানকীদেবীকে বলপূর্ব্বক অধর্ম্ম-পথে ভোগ করিতে চাহিয়া, যেমন রাবণের সর্ব্বশক্তির ক্ষয় হইয়া গেল, দ্রোপদীর প্রতি সেই চেষ্টা করিয়া দুর্য্যোধনেরও তাহাই হইল। নচেৎ ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের মৃত্যুইচ্ছাই হইত না, কর্ণের কবচ কুণ্ডল হৃত হইত না, মাতৃবরে বজ্রঅঙ্গ দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইয়া মৃত্যুর উপায় হইত না, ধার্ম্মিক পাণ্ডব কিছুতেই দুর্য্যোধনের উরুতে আঘাতই করিত না। এরপর বস্ত্র ও অলঙ্কার হরণ চেষ্টা রহস্য আরও মধুর তত্ত্ব।

(২) সন্তোষ সত্তাটীর স্বরূপ জান কি বাবা! বিপদে, দুঃখে কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া সহিয়া যাওয়া সন্তোষ নয়! বা বিপদ ও দুঃখকে উপেক্ষা করাও সন্তোষ নয়! সং+তোষ=আনন্দের সহিত যে দুঃখ বিপদকে

বহণ করা তাহারই নাম সন্তোষ। দুঃখ বিপদে আনন্দ কখন আসে? অতি ভালবাসা ও নির্ভর—দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে এই অবস্থা হয়। যেমন বিবাহাদি ব্যপারে কঠিন পরিশ্রমের কাজ লোকে নিকট আত্মীয়কেই দান করে। যাহারা সেই অতি ক্লেশের কাজ পায় তাহারা মনে করে, নিশ্চয় সে আমায় খুব ভালবাসে, তাই এমন কাজের ভার দান করিয়াছে। এই ভাবিয়া সেই কঠোর শ্রমকেও আনন্দে বহন করে। ইহার ভালবাসাটুকুই সন্তোষদেবীর অলঙ্কার,* আর বিশ্বাস—নির্ভরটুকুই তাহার বস্ত্র। সন্তোষ হইতে এই দুইটী কাড়িয়া লইতে পারিলে, সন্তোষ ধৈর্য্য মাত্র হইয়া পড়িবে, তাহাই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ রহস্য। অন্ধ অসুর দ্রৌপদীদেবীর অলঙ্কার ও বস্ত্র কাড়িয়া লইতে চাহিয়া, পাণ্ডবের সন্তোষকেই ভক্তি ও নির্ভরহীন উলঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অসুরগণ বার বার নানা উপায়ে, পাণ্ডবের ভগবৎভক্তি ও ঈশ্বর নির্ভরযুক্ত সন্তোষকে নষ্ট করিতেই চেষ্টা করিয়াছে, তাই যত অত্যাচার কেবল দ্রৌপদী দেবীর প্রতিই দেখান হইয়াছে।

(৩) এখন দ্রৌপদীর বাকচাতুর্য্যের রহস্য শ্রবণ কর! তিনি সভায় আসিয়াই দৃঢ়তা সহিত নিজকে অজিত বলিয়াছিলেন। তাহাকে ধর্ম্মরাজের দান করিবার অধিকার নাই, এইকথাও বলিয়াছিলেন। ইহার একটীও মিথ্যাকথা নয় বাবা! তিনি চিরকাল অসুরের অজিত—অসুররা কিছুতেই এই দেবীকে আয়ত্ত করিতে পারে না। আর তিনি ধার্ম্মিকদিগের দাসীস্বরূপা হইলেও, তাঁহাকে দান করিবার অধিকার তাহাদের নাই। প্রাণের সন্তোষ দানের দ্রব্য নয়। ঋষি কি দেবগণ তুষ্ট হইয়া বরআদির দ্বারা দ্রব্য দিতে পারেন, সিদ্ধশক্তি দান করিতে পারেন, কিন্তু সন্তোষ দানের অধিকার কাহারই নাই। তাই দ্রৌপদী দেবীকে স্বয়ম্বরা—নিজে পতি নির্ব্বাচন-কারিণী করা হইয়াছে। দ্রৌপদী দেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সখি ছিলেন, সত্যই শ্রীকৃষ্ণের

ভক্ত দাস বা সখা বিনে আর কেহই এই সন্তোষকে লাভ করিতে পারেন না।

(৪) দ্রৌপদী দেবী এই সভাতে ধর্ম্মরাজকে কিছু কটু কথা বলিয়াছেন। দ্রৌপদী দেবীর জীবনেই আর এমন ধর্ম্মরাজের বিপক্ষতা ও স্বামীদিগকে কটুবাক্য বলার কথা পাওয়া যায় না। আবার "আমি পঞ্চ পাণ্ডবের, এক ধর্ম্মরাজ আমায় দান করিতে পারেন না।" ইত্যাদি বাক্যেঅন্য পাণ্ডবগণকেও যেন ভ্রাতৃদ্রোহী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বুঝা যায়। এই সমস্তই অন্ত সন্তোষের পাণ্ডব পরীক্ষা। সন্তোষদেবী আজ পাণ্ডবের সন্তোষ যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এতদিন রাজভোগ,সুখ সম্পদ ভোগ মধ্যে পাণ্ডব সন্তোষকে ভোগ করিয়াছে, তাহাত অসুরেও পারে। যদি দুঃখ, দরিদ্রতা অসম্মান, অত্যাচারের মধ্যেও পাণ্ডব সেইরূপ সন্তোষ রক্ষা করিতে পারে, তবেই না পাণ্ডব যথার্থ সন্তোষ লাভের যোগ্য। যদি এই অবস্থায়ও পাণ্ডব অপরের সন্তোষে বাধা না দেয়, ভগবানে ও ধর্ম্মে ভক্তি নির্ভরতা রক্ষা করিতে পারে, তবেই না তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষদেবীর সেবা লাভের অধিকারী হইবে। তাই আজ পাণ্ডবের উপর, যত বিপদ, দৈন্যতা, অসম্মান, অত্যাচার বর্ষণ হইতে লাগিল, ধন সাম্রাজ্য প্রভুত্ব, স্বাধীনতা পর্য্যন্ত গেল, শত্রুর দাসত্ব লাভ হইল, ভ্রাতাদের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল, পত্নী কেশধৃতা হইয়া আসিল, তবু পাণ্ডব, ধর্ম্ম ও ভগবানের দিকে চাহিয়া স্বকর্ত্তব্য পথে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। শত্রুকে এই সবের কর্ত্তা না ভাবিয়া এই সবও ভগবানই করিতেছেন মনে প্রাণে বোধ করিয়াছিল। তাই দ্রৌপদীদেবী সেই বিপদ ও নির্য্যাতন হইতে কুটপথে উদ্ধারের উপায় ধরিয়া দিলেও, কুটরাজবিধান আইন মতে রক্ষার বেশ উপায় আছে দেখাইলেও প্রকৃত ধর্ম্মপথী পাণ্ডব সেই কপটপথ গ্রহণ করিল না! ধর্ম্মপথে যে সন্দিগ্ধ দ্রব্যও বর্জ্জনীয়। তাই পাণ্ডব শুধু ধর্ম্ম ও ভগবানের দিকে চাহিয়া রহিল, এই সবকেও ভগবানের দান বলিয়া আনন্দে বহন করিতে উদ্যত

হইল। শত্রু সভামধ্যে পত্নীকে উলঙ্গ করিবার চেষ্টাকরিলেও, তাই পাণ্ডব স্ব স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া, রক্ষার চেষ্টাও করিল না। কুলধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিল না, ধর্ম্ম ও ভগবানে নির্ভর করিয়া রহিল। কুলধর্ম্মমতে গৃহের বিবাদের বিচারক (রাজা) গুরুবর্গ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীর উপর অত্যাচার করিলে, গুরুবর্গ উপস্থিত থাকিতে তাহাদের ত কিছুই করিবার নাই! তাইই পাণ্ডব চুপ করিয়া রহিল। এইরূপে সন্তোষদেবীর পরীক্ষায় পাণ্ডব উত্তীর্ণ হওয়ায়—এমন দারুণ দুঃখ অসম্মানকে পাণ্ডব ঠিক সম্পদ ও সম্মানের মতই সন্তোষে ভোগ করিতে পারায়, সন্তোষদেবী সেই দিন হইতে পাণ্ডবের সর্ব্বাবস্থার সঙ্গিনী ও সেবিকা হইলেন। সেইদিন হইতে কি বনবাসে, কি অজ্ঞাত বাসে, কি স্বর্গারোহণে, কোন অবস্থায়ই দ্রৌপদীদেবী পাণ্ডবগণকে কথনও পরিত্যাগ করেন নাই। প্রথম-পাশায় বিপদ রক্ষা করিয়া দিলেন দ্রৌপদীদেবী, বনে আহার ভার গ্রহণ করিবেন দ্রৌপদীদেবী, অজ্ঞাতবাসেও সম্মান রক্ষার ভার নিবেন দ্রৌপদীদেবী। অন্ত এই পরীক্ষায় না টিকিলে, পাণ্ডব দ্রৌপদীদেবীকে হারাইতেন। পাণ্ডব পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে, সাম্রাজ্যে, মহাবনে সর্ব্বত্র সন্তোষের অধিকারী হইলেন। এই অবস্থাই মানব জীবনের পূর্ণতা বা দেবত্ব লাভ করা।

(৫) এই পাশাখেলায় পাণ্ডবের কত দিকে পরীক্ষা গ্রহণ হইল, একটু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? অসুরত্ব আজ কত দিক দিয়া দেবত্বকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখিতে হইবে। (ক)—অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মের উপরে বিজয় দ্বারা, ধর্ম্মপথে কেবল পরাজয়, হীনতা ও কষ্ট লাভ হয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। (খ)—ধর্ম্ম ও ঈশ্বর নির্ভরতার উপর অধর্ম্মের আত্মচেষ্টার বিজয় ও সম্পদ লাভ দেখাইতে চাহিয়াছিল। (গ)—শাশ্বত ধর্ম্ম ভগবৎভক্তি ও ঈশ্বর নির্ভরযুক্ত সন্তোষ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল। (ঘ)—কুলধর্ম্ম,-গুরুমর্য্যাদা ও স্বজন প্রীতি হইতে

চ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। (ঙ)—জাতিধর্ম্ম, শাস্ত্র সদাচার হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অসীম জ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে পাণ্ডব সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ভগবৎ কৃপা ও চির সন্তোষকে লাভ করিলেন। এখন বর লাভ রহস্য শ্রবণ কর।

(৬) ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রথমবার এত যত্ন চেষ্টা অধর্ম্ম করিয়াও পাণ্ডবের সম্পত্তি আদি গ্রহণ করিয়া, আবার হঠাৎ অনিচ্ছায়ও কিসে যেন অভিভূত হইয়া পাণ্ডবগণকে সব দিয়া দিল। এই চেষ্টাও বরদানের মধ্যে বেশ রহস্য আছে বাবা! অসুর ও দৈবপ্রকৃতির ধন সম্পদ জ্ঞান ও শক্তির বিষয় পাশাপাশী করিয়া প্রদর্শন করা হইল। অসুর মনে করে, জড় বিষয় ধন ও রাজ্যই জীবের প্রকৃত ধন ও সম্পদ। অধিকারিত্ব, প্রভুত্ব ও ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাসই সুখশান্তি। পরপীড়ন ও বধ করিবার সামর্থই জীবের বীর্য্য। গ্রহণ সামর্থই শক্তি। গ্রহণের কৌশল আবিষ্কারই জ্ঞান। কিন্তু দৈব প্রকৃতির ধন সম্পদ, সুখ, শান্তি, জ্ঞান ও শক্তি ইহার একটীও নয়। তাই শৈশবকাল হইতে এই সমস্তকে লাভ করিতে ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল কত চেষ্টা করিতেছে, পাণ্ডবগণ কিন্তু এই সব লাভের জন্য কোন দিনই চেষ্টা করেন নাই। দৈবপ্রকৃতি জানে, অগ্নি জ্বালিতে পারিলে, তার স্বভাবেই জ্যোতির বিকাশ হয়, আর কীট পতঙ্গের দল আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবের ভিতরেও ধর্ম্মজ্ঞান, ভগবৎভক্তি ও ঈশ্বর নির্ভর জাগিয়া উঠিলে, ভগবানের কৃপায় রাজ্যধন প্রভুত্ব যশ, সুখ সন্তোষ আপনি আসিয়া উদয় হইবে, সেইজন্য জীবের আর কষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। সেই জন্যই একদিন দেখিয়াছ ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া আনিয়া পাণ্ডবকে রাজ্য দান করিয়াছিল। আবার প্রথম-পাশায় কিসে যেন অভিভূত হইয়া পাণ্ডবদিগকে সমস্তই ফিরাইয়া দিল। পাণ্ডবদিগকে পরাজিত অপমানিত হীন করিতে যাইয়া, তাহাদিগকে আরও যশের গৌরবের সিংহাসনে

তুলিয়া দিল। আর নিজ হাতে নিজেদের মুখে অযশ নিন্দার কলঙ্ক কালিমা লেপিয়া মলিন করিয়া লইল।

শিষ্য—দ্বিতীয়বার পাশা খেলার মধ্যে কি রহস্য আছে প্রভো!

গুরু—বৎস, দ্বিতীয়বারের পাশাখেলা, অসুরদের একটী মহামায়া। এই মায়ায় মহৎ মহৎ ব্যক্তিদিগেরও দেবত্ব হইতে পতন হইয়া অসুরত্ব লাভ হইয়াছে। রাবণাদি অসুর রাজগণ, এই মায়ায়ই দেবত্ব ভ্রষ্ট হইয়া রাক্ষস ও অসুর হইয়া পরিয়াছিল। ইহারা পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বেদবিহিত পথে যোগাদি আচরণে অসীম সিদ্ধশক্তি ও দেব কৃপার অধিকারী হইয়াছিল। পরে এই মায়ার বশীভুত হইয়াই বেদজ্ঞান ও ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া, অসুরত্ব—দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তিপথে ধাবিত হইয়াছিল। তাই পাণ্ডবদের দ্বারা সর্ব্ববিজয়ী সম্রাটপদ ও অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী হীন সুখ সম্পদ লাভ করিয়া কৌরবগণও অদ্য ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মসাধন ও সত্বগুণকে ত্রয়োদশ বর্ষের পরে স্থান দিবে বলিয়া পরিত্যাগ করিল। জীব যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষা সমাপন করতঃ বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মসাধন করিবে বলিয়া যৌবনের ভোগবিলাসে মত্ত হয়। পরে ভোগাসক্ত হইয়া উঠিলে আর সে বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মসাধন গ্রহণে সক্ষম হয় না; ধৃতরাষ্ট্রের দশাও তাহাই হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ অসুরত্বের সেবা করিলে, অসুরত্ব তাড়াইয়া দেবত্ব স্থাপনের শক্তি আর ধৃতরাষ্ট্রের থাকিবে না। তখন অসুরত্বের ধ্বংসবিনে আর দেবত্ব স্থাপিত হয় না। তাই রাবণাদি অসুরত্ব লইয়া ধর্ম্ম ও ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিল, তবু আর ধর্ম্মসাধন গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। অসুর প্রকাশ্যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হইলে জীব যে তাহাকে অসুর বলিয়া চিনিয়াই ফেলে। তাই অসুরত্ব কৌশলে দেবত্ব তাড়াইতে চেষ্টা করে, তাহাই বিষদান, জতুগৃহ ও পাশাখেলাদি, এই সমস্তেরই পূর্ণ উদ্দেশ্য কাহাকেও জানিতে দেওয়া

হয় নাই। দ্বিতীয় পাশাখেলায় পাণ্ডব তাড়ান উদ্দেশ্য হইলেও, একটু কৌশল করিয়া বনবাস ও অজ্ঞাতবাস নাম করা হইয়াছে। বনবাসটী ধর্ম্মসাধনারূপ পাণ্ডবকে হীনবেশে, বনমধ্যে স্বাধীনতা দান, অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাদি সামান্য ভাবে সাধনযোগ রক্ষা করা; আর অজ্ঞাত বাস সেই যোগটুকুও পরিত্যাগ করা। দ্বাদশবর্ষ হীন সাধনা মাত্র ত্রিসন্ধ্যাদি করিয়া এক বৎসর তাহাও ত্যাগ করিলে, জীব পূর্ণরূপে অসুরের আয়ত্ত হইয়া যায়। এখন বনপর্ব্বে হীনসাধনা রক্ষায় জীব কেমন ফল লাভ করে দেখাইয়া, বিরাট পর্ব্বে একেবারে ত্যাগের ফল বর্ণিত হইবে। এইরূপে ত্রয়োদশবর্ষ কাটাইলে কি অবস্থা হয় তাহাই উদ্যোগ-পর্ব্বে শ্রবণ করিবে।

শিষ্য—ভগবান্ প্রথমবার পাণ্ডবদিগকে সর্ব্ব সম্পদ সহিত রক্ষা করিয়াও, দ্বিতীয় পাশার বনবাস দুঃখ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন না কেন প্রভো!

গুরু—ধার্ম্মিকের ধন সম্পদের তত্ত্ব প্রকাশের জন্য! ধার্ম্মিকদের সুখ শান্তির কারণ ধন সম্পদ এই বহির্জগতের কিছুই নয়; তাই তাহাদের ধন সম্পদ কেহই হরণ করিতে পারে না। প্রথমবার পাশাখেলায় দেখাইয়াছেন, জড় বিষয় অর্থাদি তাঁহারা না চাহিলেও, কেমন শত্রুকর্ত্তৃক দত্ত হইয়াও সেই সব আপনিই আসে। আবার দ্বিতীয় বারে দেখাইলেন, রাজ্য সম্পদ, ধন অলঙ্কার না থাকিলেও তাঁহাদের দুঃখ হয় না। তাঁহারা বনেও আনন্দ সম্মান ভোগ করিয়া, জগতে সম্রাটের মত প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে উঠিতে পারেন। দেখিবে বনবাসকেও পাণ্ডব সাম্রাজ্যের মত গৌরবে ভোগ করিবেন। আর অসুর দেবতার দেওয়া অতুল ধন সম্পদ সম্মান বিজয় হাতে পাইয়াও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। এই তত্ত্বই পাণ্ডব-রাজ্য এত কষ্টে লাভ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে তাহা দান কবিয়া দিল।

শিষ্য—দ্রোণাচার্য্যকে রাজ্যদানের মধ্যেও কি কোন প্রকার রহস্য আছে প্রভো!

গুরু—অসুরদের এই দশাই হয় বাবা! তাহারা ধর্ম্মজ্ঞান দেব-প্রকৃতির অধীন না হইয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়া, লোভ কামনার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পরে। লোভ কামনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহার পুত্র ক্রোধকেই সর্ব্বস্ব দিয়া সেবা করিতে থাকে। নিষ্কামী দেবপ্রকৃতির অধিকার অদ্য সকাম লোভের হস্তগত হইল, ইহাই দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবরাজ্য দান করা। আর অসুরগণ ধর্ম্ম সাধন ত্যাগ করিয়া পূর্ণরূপে কাম ও ক্রোধের অধীনতা গ্রহণ করিল তত্ত্বই, গুরু ও গুরুপুত্রের চরণে আত্মসমর্পণ। এখন হইতে এই সকল প্রকৃতিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টায়ই অসুর তাহার ধন সম্পদ ও কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিয়া দিনরাত খাটীয়া মরিবে। দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাদির সেবা তৃপ্তি করিতেই রাজ্য বিলাইয়া দিবে, ইহাই অসুরের আত্মতৃপ্তি ও স্বাধীনতা।

শিষ্য—প্রভো! দুঃশাসন আদিকে বধের জন্য ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহার সার্থকতা কি?

গুরু—এইসব প্রতিজ্ঞা নয় বাবা! যোগীদিগের অভিসম্পাৎ। বৎস, যোগীগণ ক্রুদ্ধ হইলেও তাঁহারা কাহারও অনিষ্ট হউক এমন ইচ্ছা করেন না। ক্রোধযুক্ত হওয়ায় পাষণ্ডদের পাপ কর্ম্মের ভবিষ্যৎ ফল পূর্ব্বেই বলিয়া দেন মাত্র; তাহাকেই মানব যোগীর অভিসম্পাৎ বলিয়া থাকে। পবিত্র কুরুবংশকে অদ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রের দল যেইরূপ অনার্য্যত্বের কলঙ্কে অপবিত্র করিয়াছে, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞাগুলিও তাহাদের প্রত্যেকের কৃতকর্ম্মের যথার্থ ফল বলা হইয়াছে মাত্র জানিবে। পাষণ্ড-দুঃশাসন রমণীর উপর, নিজের কুলের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ বধুর উপর, যেইরূপ ব্যবহার করিয়াছে। এমন হৃদয় কি তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ না হইয়া পারে? এমন রমণী নিগ্রহের হস্ত

কি দারুণ আঘাতে খণ্ড খণ্ড না হইয়া থাকে। কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন সভায় গুরুবর্গের সম্মুখে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ বধুকে উরুতে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল, এমন উরু দারুণ বেদনা সহিত ভঙ্গ না হইলে কর্ম্মের ফল কোথায়! পবিত্র রাজসভায় প্রকাশ্যে গুরুবর্গের অমার্য্যাদা করিয়া, যেমন ভাবে পাষণ্ড ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নৃত্য করিয়াছে, তাহার মস্তকে পরাজয় ও শত্রুর পদাঘাত বিনে কি লাভ হইতে পারে। দুর্ম্মতি কর্ণ শতধর্ম্মাচারী হইলেও, এমন কুকর্ম্মে বাধা না দিয়া যখন উৎসাহ দান করিল, আবার বিপন্ন ধার্ম্মিকদিগকে কটুবাক্যও প্রয়োগ করিল। শত্রুর হস্তে পরাজয় ও মৃত্যুই কি তাহার যথার্থ প্রাপ্যফল নয়! ধর্ম্মের নামে কপটতা আশ্রয়ে যাহারা ধার্ম্মিকদিগকে বঞ্চনা করিয়া কষ্ট দেয়, দারুণ অস্ত্রাঘাতে রণক্ষেত্রে পড়িয়া ছটফট করাই তাহার যথার্থ কর্ম্ম ফল নয় কি? অন্ধরাজা আজ যেমন বিদুরের শত শত নিষেধ না শুনিয়াও, প্রতি পণ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিংজিত কিংজিত বলিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। দেখিবে এই হতভাগা আবার এমনই, কে মরিল কে মরিল বলিয়া, বার বার দারুণ শোকের আঘাত পাইয়া ক্রন্দন করিবে। বাবা, ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক আদি বৃদ্ধগণ সভায় থাকিয়াও এমন দারুণ অনার্য্যত্বের বিপক্ষে বাধাদি দান না করায় তাহাদেরও অকালে কুরুক্ষেত্রে প্রাণ দান করিতে হইবে। বাবা এই স্থানেই সভাপর্ব্বের শেষ করা যাউক।

বন-পর্ব্ব

পরিচয়।

সাত্ত্বিক সাধনা ও রাজস সাধনা সংবাদ।

এই পর্ব্বে সাত্ত্বিক সাধন পথের বিঘ্নাদি ও তাহার ফল এবং রাজস সাধনার বিঘ্নাদি ও তাহার ফল পাশাপাশী করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

রাজস-জীবপ্রকৃতি।

১। **প্রথম অবস্থা**—ভক্ত সাধকদিগকে অশ্রদ্ধার জন্য, সাধন ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়া উঠে। দর্পরূপ রাক্ষসের কবলিত হইয়া, অভিমানে অধর্ম্মাচার করিতে যাইয়া দেবকোপে পতিত হইয়া ধ্বংস্ হইতে উদ্যত হইবে, তখন কেবল হীনভাবে ধর্ম্ম সাধনার ফলেই ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া দেন।

(দর্পভরে, পাণ্ডব হিংসায় যাইয়া গন্ধর্ব্ব সহিত বিরোধ করিয়া দুর্য্যোধন পরাজিত ও বন্দী হইল, পরে পাণ্ডবই ভাই বলিয়া রক্ষা করিয়া দিলেন।)

সত্ত্বিক দেবপ্রকৃতি।

১। **প্রথম**—অত্যাচারিত পাণ্ডব বনে প্রবেশ করিতেই এতদিনের ভোগের স্বভাবরূপ ভোগস্পৃহা ঈর্ষ্যাদি রাক্ষসের মত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ক্রোধ প্রতিহিংসাদি জাগিয়া আত্মচেষ্টা জাগাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু দৈবপ্রকৃতি জ্ঞান ও ধর্ম্মযোগে সেই স্পৃহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

(পাণ্ডব বনে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে ক্রোধাদিতে অভিভুত হয় কিন্তু ধর্ম্মরাজের উপদেশে শান্ত হয়, এবং বনবাসের বিঘ্ন ক্রিমী নামক ভীষণ রাক্ষসের আক্রমণ রোধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলে।)

২। দ্বিতীয় অবস্থা— সাধনশক্তি দ্বারা বিপদাদি নষ্ট হওয়ায়, ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সকাম সাধনা যজ্ঞাদি আচরণ আরম্ভ করে।

(পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্ব জয় করিয়া দুর্য্যোধনকে রক্ষা করায়, দুর্য্যোধন তেমন শক্তি আদি লাভের জন্য, সকাম যজ্ঞাদিও সাধনায় ব্রতী হইল। ধার্ত্তরাষ্ট্র নারায়ণ যজ্ঞাদি ও দুর্ব্বাসা তোষণ করিল।

৩। অসুরের ফল লাভ— সকাম সাধনার প্রাপ্ত ফলও অসুরত্বের দোষে বিফল ও কুফলের কারণ হইয়া যায়। কতকষ্টের, বহুদিনের যত্নের সাধনা ও ফলের বেলায় হিংসাদি দোষে দুষ্ট হইয়া নষ্ট হয়।

(অমানুষ অত্যাচার সহিয়া দুর্ব্বাসা ঋষিকে তুষ্ট করিয়া, বরের বেলায় পাণ্ডব হিংসা চাহিয়া বসিল। ঋষি কত বুঝাইলেন তবু সে বুঝিল না। তাহাতে পাণ্ডবের অনিষ্ট দূরে থাক্ আরো ঋষি ও ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ ঘটিল, আর দুর্য্যোধন ভক্ত দ্বেষ করিয়া ধর্ম্মের, ভগবানের ও ঋষির বিরক্তি ভাজন হইল।)

২। দ্বিতীয়—ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হইয়া নানা ব্রত ও সাধনাদি দ্বারা, বহুজ্ঞান, যোগশক্তি ও অসুরত্ব বিজয়ী দেবত্ব-শক্তি লাভ করে।

(ধর্ম্মরাজ বহুঋষির নিকট জ্ঞান উপদেশ শিক্ষা করিলেন ও ব্রতাদি সাধন করিলেন! অর্জ্জুন সর্ব্বদেব তোষণ করিয়া ত্রিলোকজয়ী শক্তি লাভ করিলেন। দ্রৌপদী অফুরন্ত রন্ধন শক্তি লাভ করিলেন ইত্যাদি।)

৩। দেবতার ফল— নিষ্কাম ভক্ত শত্রুর ও অমঙ্গল কামনা না করায়, শত্রুর আরাধনা তুষ্ট দেবরোষ, ব্রাহ্মণ ক্রোধ হইতেও ভগবান্ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া, আরও আশীর্ব্বাদ লাভ করাইয়া দেন।

(দুর্য্যোধনের সেবাতুষ্ট দুর্ব্বাসা-ঋষি দ্বাদশী দিন দ্রৌপদীর ভোজনান্তে ষষ্টি সহস্র শিষ্য সহিত আসিয়া অতিথি হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে পাণ্ডব সকলকে সেবা করাইয়া তুষ্ট করিলেন। ঋষি আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।)

বন-পর্ব্ব।

সাত্ত্বিক সাধনা ও রাজস সাধনা সংবাদ।

তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য দেবং বন্দে জগতগুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম ॥

গুরু—বৎস! এই পর্ব্বে দেব-প্রকৃতির সাত্ত্বিক সাধনের বিঘ্ন ও তাহার ফললাভ এবং অসুর-প্রকৃতির রাজস সাধনার বিঘ্ন ও ফল প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথমে দেব প্রকৃতির শুদ্ধ সাত্ত্বিক সাধনা গ্রহণের বিঘ্নাদি শ্রবণ কর।

ক্রিমী-রাক্ষস বধ।

লীলা—পাণ্ডবগণ চরিত্র মহত্ত্বে রাজ্যবাসিগণকে কান্দাইয়া বনে প্রস্থান করিলে, সেই দিনই বনমুখে এক ভীষণ রাক্ষস তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। রাক্ষস দিবসেও মায়ায় সমস্তদিক অন্ধকার করিয়া হঠাৎ তাহাদের পথরোধ করিলে, পুরোহিত ধৌম্য রাক্ষসী-মায়া বুঝিয়া মন্ত্র দ্বারা মায়া নাশ করিয়া দিলেন, পরে ভীমসেন বাহুবলে রাক্ষসকে বধ করিয়া ফেলিলেন। এই রাক্ষস অতি বলশালী ও ভীষণ মায়াবী ছিল। বহু সাধক ঋষিকেও না কি এই রাক্ষস বধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই বাসনা থাকিলেও এই রাক্ষসের

ভয়ে কেহ তপস্যা করিতে বনে প্রবেশ করিত না*; তপোবন রাক্ষসে আয়ত্ত করিয়া বাস করিতেছিল। এই রাক্ষস বধ করায় ঋষিগণও পাণ্ডবগণকে প্রশংসা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয় নামক মহর্ষি বহু ঋষি সঙ্গে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডব হিংসা হইতে নিবৃত্ত করিতে যাইয়া, এই ক্রিমী-রাক্ষস বধের কথা বলিয়া ভীমের বীর্য্যের প্রশংসা করিতে থাকেন। দুর্য্যোধন ভীমের প্রশংসায় ঈর্ষ্যান্ধ হইয়া দর্পে উরুতে চপেটাঘাত করিল ও ঋষিগণকে অগ্রাহ্য করিয়া হঠাৎ সভা হইতে উঠিয়া গেল। ইহাতে মৈত্রেয় ঋষি ক্রোধভরে দুর্য্যোধনকে অভিশাপ দান করিলেন। তিনি বলিলে "এমন মহৎ কুরুবংশে জন্মিয়া তুমি এতদূর অসুর হইয়াছ! ঋষি ও গুরুবর্গকেও সম্মান কর না, ঋষিদের কথায় অবিশ্বাস কর! যেমন অগমতা দেখাইয়া উরুতে চপেটাঘাত করিয়া উঠিয়া গেলে, ভীমসেনের দারুণ গদাঘাতে তোমার সেই উরু বিদীর্ণ হইয়া তোমার দর্প চূর্ণ হইবে।" ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের জন্য অনেক মিনতি করিলে ও দুর্য্যোধনও আসিয়া অনেক করিয়া ক্ষমা চাহিলে, ঋষি বলিলেন, "তাহাদের সঙ্গে বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া মিশিয়া থাকিলে আমার বাক্য অন্যথা হইবে, বিরোধ করিলে তোমার রক্ষা নাই।" ঋষিদেরও ভয় স্বরূপ এমন ক্রিমী রাক্ষসকে পাণ্ডব বন প্রবেশেই নিহত করিলেন।

তত্ত্ব—এই ক্রিমী-রাক্ষস জীবের ভোগস্পৃহা ঈর্ষ্যাদির উদ্দীপনা! বিষ্ঠাভোজী ক্রিমী যেমন কিছুতেই বিষ্ঠারাশিকে ত্যাগ করিতে চায় না, যেই প্রবৃত্তি জীবকে সেইরূপ অপবিত্র দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তিতেই ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সেই প্রবৃত্তিই তপ রাজ্যের মহাবিঘ্ন এই ক্রিমী রাক্ষস। কত তপ-পথীকে প্রথম গমন পথেই এই রাক্ষস আক্রমণ করিয়া, তাহাদের তপ স্পৃহাকে ভোজন করিয়া ফেলে। আবার কত সিদ্ধশক্তি-সম্পন্ন যোগী ঋষিকেও এই রাক্ষস আয়ত্ত করিয়া, রাবণাদির মত মহারাক্ষস করিয়া নাচায়। পাণ্ডবগণ এই রাক্ষসকেই বধ করিয়া বন নিরুপদ্রব করিয়াছিল। তাই মহর্ষিগণও

ইহাদিগকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। পাণ্ডব যে এই রাক্ষসকে বধ করিতে পারিয়াছিল এখন তাহার প্রমাণ শ্রবণ কর।

লীলা—পাণ্ডব বনবাসে গমন জন্য দুঃখিত না হইলেও, ধার্ত্তরাষ্ট্রদের কৃত অবমাননা ও অধর্ম্ম অত্যাচার সহ্য করা ভীম ও অর্জ্জুনাদির পক্ষে বড়ই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। বনে প্রবেশ করিয়াই তাই ভীমসেন ক্রোধভরে কনিষ্ঠগণকে লইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল ধ্বংস করিয়া আসিয়া বনবাস করিবে বলিয়া, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হইলেন, অর্জ্জুনাদিও প্রস্তুত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ বুঝাইয়া সবকে ক্ষান্ত করিলেন। তিনি বুঝাইলেন, "এখন কেন ভাই! ক্রোধ করিবার হইলে, কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণকালে করিলেই পারিতে, সেরূপত কোন পণ ছিল না। তাহা যখন কর নাই, এখন ক্ষান্ত হও। ত্রয়োদশ বর্ষ পরেও যদি তাহারা শত্রুতাই করে তখন প্রতিবিধান করা যাইবে। আরও কথা আছে ভাই! ধার্ত্তরাষ্ট্র বিজয় যত সহজ মনে করিতেছ তত সহজে তাহা পারিবে না! দেখিলেত সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বহ্লিক আদি উপস্থিত থাকিয়াও কেহই তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিলেন না। এই সকলেই অন্নদাতা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষ গ্রহণ করিবেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র জয় করিতে হইলে ইহাদিগকেও বিজয় করিতে হইবে। আর মহাবীর কর্ণ অস্ত্র বিদ্যায় অর্জ্জুনের সমকক্ষ না হইলেও, অক্ষয় কবচ কুণ্ডল দ্বারা রক্ষিত, এই দুই থাকিতে তাহাকে বিজয় অসম্ভব। ধার্ত্তরাষ্ট্র বিজয়ের ইচ্ছা থাকিলে অগ্র হইতে আমাদিগকে এই সব বিজয়ের শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে।" সত্যই পাণ্ডব বনবাস কালে সাধনা ইত্যাদি দ্বারা, সেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ বিজয় শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের পরামর্শে ধর্ম্মরাজ মন্ত্র সাধনা করিয়া, সেই সিদ্ধমন্ত্র অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুন সেই মন্ত্র সাধনায় সর্ব্বদেব তোষণ করিয়া, ঐন্দ্র, রৌদ্র, ব্রাহ্ম, বারুনাদি সর্ব্ব দৈব অস্ত্র গান্ধর্ব্বঅস্ত্র এমন কি বজ্র ও পাশুপত আদি মহাস্ত্র পর্য্যন্ত

লাভ করেন। এত প্রকার মহাস্ত্র শক্তি কোন মানবই আর কখনও লাভ করিতে পারে নাই। স্বয়ং ভীষ্মদেব উদ্যোগ পর্ব্বে এই কথা বলিয়াছেন।

পাণ্ডবগণের এই সর্ব্বনাশের সংবাদ দূত মুখে শ্রবণ মাত্র, পাণ্ডব রাজধানী হইতে তাহাদের অন্য পত্নীগণ, পুত্রগণ ও নিতান্ত বাধ্য ভৃত্যগণ সকলেই বনে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। তাহাদের নিকট-আত্মীয়গণ দ্রুপদ আদি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণ দ্রুত পাণ্ডবের নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীর মুখে সেই দারুণ পাশবিক-অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহারা দুঃখে ক্রোধে একরূপ মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এমন নির্বৈর দেব-স্বভাব পাণ্ডবের উপর এমন অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, সেই মুহূর্ত্তে ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলকে রাজপুরী সহিত ভস্ম করিবার জন্য, অমানুষ ভগবত সত্তা সুদর্শন চক্র ত্যাগে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সেই বিশ্ব-ধ্বংসকর মূর্ত্তি দেখিয়া, পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ এমন ধার্ত্তরাষ্ট্রের ও মঙ্গল চিন্তা করে দেখিয়া, ভক্তের ত্যাগ মহিমা ভাবিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ শান্তি হইল। দ্রুপদ আদি পাণ্ডবের আত্মীয়গণ ও সাত্যকি আদি যাদবগণ এই অত্যাচারের প্রতিশোধ জন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিতেই উদ্যত হইলে, ধর্ম্মরাজ মিনতি করিয়া ত্রয়োদশবর্ষের জন্য ক্ষমা করিতে বলিলেন। তখনও যদি তাহারা বৈরতাই করে, তখন সকলেই একত্র হইয়া অক্ষরে অক্ষরে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইব বলিলেন। এই সময় বিদুর আসিয়া পাণ্ডবগণকে জানাইল, "ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে রাজ্য গ্রহণ জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার দুর্বৃত্ত পুত্রগণকে ক্ষমা করিয়া পাণ্ডব ফিরিয়া রাজত্ব করুক্।" পাণ্ডব কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হইল না। বিদুর পুনঃ বলিলেন, "কপট পাশার জয় জয়ই নয়।" পাণ্ডব বলিল, "আমরা জানিয়াছি হারিয়াছি, এই মাত্র আমাদের প্রয়োজন, কেমনে হারাইয়াছে

তাহা তাহারা জানে।" বিদুর পরে বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র আরও বলিয়া দিয়াছেন, নচেৎ বনেই তোমরা রাজার মত হইয়া থাক। তোমাদিগকে নিয়মিত মতে ধনাদি ও সেবকাদি প্রেরণ করা হইবে।" পাণ্ডব তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না। পাণ্ডবের মহত্ব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। বিদুর আনন্দে পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। দ্রুপদ আদিও শান্ত হইয়া এই কালে তাহারা পাণ্ডবদের কোন প্রকারে সাহায্য করিবে জিজ্ঞাসা করিলেন। পাণ্ডবগণ তাহাদের পত্নী ও পুত্রগণকে এবং প্রিয় বাহন ও ভৃত্যগণকে আশ্রয় দিয়া উপকার করিতে বলিলেন। তখন দ্রৌপদীর পুত্রগণকে দ্রুপদ, সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য পাণ্ডব শ্বশুরগণ পুত্র সহিত কন্যাগণকে লইয়া চলিয়া গেলেন। পাণ্ডব ঋষিদিগের সঙ্গে বনবাসে মনোনিবেশ করিলেন।

তত্ত্ব—পাণ্ডব এই যে এত সুবিধা পাইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলকে ধ্বংস করিয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তি করিল না, ফিরাইয়া দিলেও ভোগ বিলাসকে গ্রহণ করিল না! ক্রিমী-রাক্ষস বধ করাই তাহার কারণ। এই ক্রিমী বধ না হইলে, তাহাদিগকে লালসায় টানিয়া আবার বিষয় বিষ্ঠা-গর্ত্তের ক্রিমী করিয়া রাখিত। তাহাদের এমন প্রতিহিংসার তৃপ্তি—শ্রীকৃষ্ণ রোষে শত্রুগণ স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সহিত নিঃশেষ ধ্বংস হইবে, এই কার্য্যে পাণ্ডব কখনও বাধা দিত না। শত্রু আপনি কপট জয় বলিয়া সম্পদ ফিরাইয়া দিতেছিল, তাহাও ইহারা পরিত্যাগ করিতেন না। বাবা, তপক্ষেত্রে যাইতে হইলেই প্রথমে এই ক্রিমী-রাক্ষস বধ করিয়া লইতে হইবে, এখন পাণ্ডবের তাপস জীবনের গৃহস্থালী কিছু শ্রবণ কর!

লীলা—গুরু ব্যাসদেব ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত পরামর্শ করিয়া, ধর্ম্মরাজ কিরূপে বনবাস যাপন করিবেন নিশ্চয় করিয়া লইলেন। পাণ্ডবদের আশ্রয়ে থাকিলে রাক্ষসাদি দ্বারা সাধন ভঙ্গের আশঙ্কা নাই। তাপস

জীবনের আহারত সামান্য ফল মূল, ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কেহ কেহ মৃগমাংস ভোজন করেন। ভীমাদি চারি ভ্রাতা উভয় কর্ম্মেই বেশ দক্ষ, আর নিজেদেরও সংগ্রহ করা কঠিন নয়। তার উপর পাণ্ডব নিজেরাও শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধন পটু, তাতে সর্ব্বদা মহর্ষিদের আগমন হইতেছে,সর্ব্বদা সৎ প্রসঙ্গ হইতেছে। তাই বহু সাধন-পথী তাপস ও সিদ্ধ-ঋষিগণ পর্য্যন্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস আরম্ভ করিলেন। তাই পাণ্ডবের বাসস্থান তপোবনের মত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মরাজ অন্ন চিন্তা দুর করিবার জন্য, ব্যাসদেবের পরামর্শে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া একটী পাকপাত্র লাভ করিলেন। তাহাতে দ্রৌপদী-দেবী একবার যাহা পাক করিবেন, তাঁহার ভোজন না হওয়া পর্য্যন্ত যত ইচ্ছা ব্যয় করিলেও অন্নাদি ফুরাইবে না। বাবা, এইরূপ সৎকার্য্যের সহায়তার জন্যই সাধন-শক্তির প্রয়োজন হয়। ভরদ্বাজ ঋষি তপশক্তি দ্বারা শ্রীরাম অন্বেষণে আগত ভরতকে সসৈন্য, যার যার ইচ্ছামত সেবা করিয়াছিলেন, জমদগ্নি বিশ্বামিত্রের সেবা করেন। আজও হিন্দু ও ইসলাম বহু সাধক এইরূপ ঘটনা দেখাইয়া থাকেন। যিশুখ্রীষ্টও এক খানা রুটী দিয়া বহু লোককে তৃপ্ত করিয়া ভোজন করান বলিয়া বর্ণিত আছে। এইরূপে আহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া, সর্ব্বদা ব্রত সাধনাদি গ্রহণ, পুরাণাদি শ্রবণ এবং ঋষিদিগের তপোবন ও তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডব দিন কাটাইতে লাগিলেন। পুণ্যশ্লোক বিশ্বব্যাপীযশ পৃথিবী-সম্রাট পাণ্ডব জ্ঞাতির কপটপাশার পন রক্ষা করিতে তপস্বী হইয়া ঘুরিতেছেন, তাই যেথানেই যাইতেন সকল দেশবাসী আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন করিয়া পূজা করিয়া কৃতার্থ হইত। এইরূপে পাণ্ডব বনের মধ্যেও নানা সুখ সম্মান লাভ করিয়া, সম্রাটের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। বাবা, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, মহাপুরুষরাই মাত্র দান না পাইয়াও প্রশংসা করিতে পারেন, অভাবের মধ্যেও দান করিতে পারেন, আর দুঃখ বিপদকে সম্পদের মত গৌরবে

আনন্দে ভোগ করিতে পারেন; পাণ্ডব ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আর অসুর, দান পাইয়াও কৃতজ্ঞতা জানাইতে কাতর হয়, পূর্ণ সম্পদেও দান করিতে পারে না, সুখ সম্পদকেও দুঃখী দীনের মত অতৃপ্ত হইয়া ভোগ করে। এখন সেই অসুর ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বিষয় শ্রবণ কর।

ঘোষযাত্রা—ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলের বিষয় জগতে কোন দিকেই কিছুর অভাব ছিল না। পাণ্ডবই কুরুকুলকে জগতে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সর্ব্বদিকে অভাবহীন করিয়া দিয়া গিয়াছেন; তাহারা জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুখী। কিন্তু তবু তাহারা পাণ্ডব হিংসার জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগকে ধন সম্পদ হীন করিয়া, বনে নির্ব্বাসন দিয়া জগতের নিকট ঢাকিয়া ফেলিবে ইচ্ছা করিয়াছিল। আজ সেই পাণ্ডব, আরও মহত্বের জ্যোতি মণ্ডিত হইয়া জগতে প্রকাশিত হইতেছে। বনের মধ্যেও তাহারা সহস্র সহস্র ঋষিকে রোজ রোজ প্রতিপালন করিতেছে, রাজাদের অসাধ্য বড় বড় যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছে। তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া সর্ব্বদেশে ধার্ত্তরাষ্ট্রের কুকীর্ত্তির ঘোষণা ও নিজেদের মহত্বের প্রচার করিতেছে! তবে তাহারা পাণ্ডবের কি হরণ করিল? বুঝিয়াছি পাণ্ডব বাঁচিয়া থাকিতে কেহই তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। এইজন্য পাষণ্ডগণ পাণ্ডব ধ্বংস করিতেই পরামর্শ আটিল। কর্ণ পরামর্শ দিল, "চল তীর্থ দর্শনের ছল করিয়া যাইয়া, বনের মধ্যে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলি! এখন মাত্র পঞ্চজন আছে, পরে সহায় সম্পন্ন হইয়া দাড়াইলে বধ করা সহজ হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সঙ্গে থাকিলে এ কাজ করা যাইবে না, তাই তাহাদিগকে রাখিয়া কতিপয় বাছা বাছা বাধ্য সৈন্য লইয়া, মৃগয়া বা তীর্থযাত্রা ছলে বাহির হই এস।" দুর্য্যোধনের এই পরামর্শ মনে ধরিল। সেই সময় পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন। সেই বনের নিকটেই কৌরবদের একটী বড় গোশালা* এবং শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থস্থান। তাই গোশালা দর্শণ ও দেশভ্রমণ, তীর্থকরণ নাম করিয়া, পিতার নিকট হইতে

দুর্য্যোধন অনুজ্ঞা গ্রহণ করিল। এই তীর্থযাত্রা শুনিয়া রাজবধূগণও তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুর্য্যোধন ভাবিল মন্দ নয়! বধূগণ সঙ্গে যাত্রা করিলে বৃদ্ধদের মনে অন্য সন্দেহ আসিবে না! আর বধূগণও অন্ত সেই বল্কলধারী পাণ্ডবগণকে দেখিলে, আমাদের হাতে পড়িয়া তাহারা কত সুখে আছে বুঝিবে। আর দ্রৌপদী সুসজ্জিতা বধূগণকে দেখিয়া পাণ্ডবগণকে বরণের ফল ও ধর্ম্মের পথের সুখ সৌভাগ্যের খবরটুকু বেশ পাইবে। যখন কর্ণ, শকুনি, অশ্বথামা ও দুর্য্যোধন এক বিরাট বাহিনী লইয়া গোশালা দর্শনে প্রস্তুত হইল, তখন বিদুর সংবাদ পাইয়াই রাজ সভার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন "এই দুষ্টমতি পুত্রগণকে কোথায় প্রেরণ করিতেছেন? শুনিয়াছি গোশালার নিকটেই পাণ্ডবগণ বাস করিতেছে। তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট বুদ্ধিত ইহারা করে নাই? মহা তপশক্তি সম্পন্ন পাণ্ডবগণ, ঋষিগণ বেষ্টিত হইয়া তথায় বাস করিতেছে। তাহাদের প্রতি কোনপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিলে, এই পুত্রগণ কিন্তু আর ফিরিয়া আসিবে না! পাণ্ডবসঙ্গী ঋষিগণ ক্রোধভরে তপশক্তি দ্বারা সমস্তকেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহা না হইলেও পাণ্ডবগণও এখন মহা তপসম্পন্ন, অর্জ্জুন সর্ব্বদেব আরাধনা করিয়া তুষ্ট করতঃ, সর্ব্বপ্রকার দৈবঅস্ত্র লাভ করিয়া দেবতারও অজেয় হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে বিরোধ করিলে ইহাদের কি দশা হইবে বুঝিতেই পারেন।" দুর্য্যোধন অনেক ছলবাক্যে রাজা ও বৃদ্ধগণকে ভুলাইয়া, ভীষ্মাদিকে রাখিয়া কেবল কর্ণাদির সহিত বধূগণকে লইয়া সসৈন্যে প্রস্থান করিল।

এইদিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রদের পাপ মন্ত্রণা দেবরাজ বুঝিতে পারিয়া, ভগবৎভক্ত ও প্রিয় পাণ্ডবগণের প্রীতিকর কার্য্য করিয়া সেবা করিবার জন্য, চিত্ররথ নামক একজন গন্ধর্ব্বরাজাকে সৈন্যসহ দ্বৈতবনে প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, "পাষণ্ড দুর্য্যোধন তাহার প্রতি বা পাণ্ডবদের প্রতি

বৈরাচরণে ব্রতী হইলেই, যেন তাহাকে রমণীগণ সহিত বন্দী করিয়া লইয়া আসে।” চিত্ররথ দ্বৈতবনের নিকটেই আসিয়া একটী সুন্দর সুবিধাপূর্ণ স্থানে সসৈন্যে তাবু স্থাপন করিলেন; চিত্ররথের সহিত অর্জ্জুনের বন্ধুতা ছিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অন্য একেত বৃদ্ধ-অভিভাবকদের শাসন রজ্জুর বাহিরে, তাতে আবার মহাদর্পী কর্ণ, অশ্বত্থামাদি মহাবীর ও দুর্জ্জয় সৈন্যগণ পরিবৃত হইয়া, অহঙ্কারে একেবারেই আত্মহারা হইয়া পরিয়াছিল। তাহারা দ্বৈতবনের নিকট আসিয়া চিত্ররথের আশ্রয় স্থানটুকুকে বড়ই সুন্দর ও সুবিধাজনক দেখিয়া, ঐ স্থানকেই দর্পভরে বলপুর্ব্বক অধিকার করিতে ইচ্ছা করিল। প্রভুদের আদেশে সৈন্যগণ চিত্ররথের সৈন্যগণকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে বলিয়া, তাহাদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছল্য ব্যবহার করিয়া বিরোধ লাগাইয়া বসিল। গন্ধর্ব্ব-সৈন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরব-সৈন্যগণকে তাড়াইয়া দিল। তখন দর্পভরে প্রভুগণই যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, চিত্ররথের বাসনা পূর্ণ হইল; সে যে এই বিরোধের সুযোগই চাহিতেছিল। চিত্ররথ দৈব অস্ত্রদ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে অতিদর্পী কর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি আদিকে পরাজয় করিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহারা বার বার প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও গন্ধর্ব্বের অস্ত্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। দুর্য্যোধনের ভ্রাতাগণও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, কেবল দুর্য্যোধন বার বার পরাজিত হইয়াও রাজবধূগণের বিষয় ভাবিয়া কিছুতেই যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিল না। তাই সে বধূগণ সহিত গন্ধর্ব্ব হস্তে বন্দী হইল। চিত্ররথ বধূগণ সহিত দুর্য্যোধনকে লইয়া স্বর্গপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। দুর্য্যোধন ও বধূগণকে শত্রুতে লইয়া যায় দেখিয়া, কতিপয় বৃদ্ধ কর্ম্মচারী দ্রুতগতিতে ধর্ম্মরাজের নিকট যাইয়া কান্দিয়া পরিল ও কৌরব কুলের ভীষণ পরাজয় ও অসম্মানের বিষয় জ্ঞাপন করিল। সমস্ত শুনিয়া ধর্ম্মরাজ হাঁহাঁ কার করিয়া উঠিলেন ও ভ্রাতাদিগকে আহ্বান করিয়া শীঘ্র বধূগণ ও

দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রদের অসম্মান ও দুঃখ দানের জ্বালা ভীমসেনের হৃদয়ে বড়ই বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহার প্রতি অত্যাচারও কিছু অধিকই হইয়াছিল! তাই তিনি প্রথমে ধার্ত্তরাষ্ট্র দলের পরাজয় ও দুর্য্যোধনের বন্দী হওয়ার বিষয় শুনিয়া বেশ সুখবোধই করিয়াছিলেন। আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "আমরা সৈন্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া যে কার্য্য সাধন করিব ভাবিয়াছিলাম, অদ্য ভাগ্যবলে দৈবই সে কার্য্য সাধন করিয়া দিল।" কিন্তু ধর্ম্মরাজ যখন ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "এ কি কর ভীম! আজ কৌরবকুলকে পরাজয় করিয়া, সেই কুলের কুলবধূগণকে শত্রুতে হরণ করিয়া লইতেছে দেখিয়াও, কৃতাস্ত্র কৌরব-কুমার তাহা দাড়াইয়া দেখিতেছ! ইহাতেও তোমার মত ব্যক্তির আনন্দ হইতেছে? দুর্য্যোধন যে আমাদের ভ্রাতা! আমাদের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে, আমরা তাহার শাস্তি দান করিব, তাই বলিয়া অপরকে শাস্তি দান করিতে দিব কেন? আমরা আমরা বিরোধ করিলে তাহারা শত ও আমরা পঞ্চ ভ্রাতা বটে, কিন্তু অন্যের সহিত বিরোধে আমরা শতপঞ্চ ভ্রাতা! শীঘ্র মনের হীনতার পরিহার কর! শৈশব হইতে ভাই ভাই কত বার না বিরোধ করি ও মিলিত হই। যাও শীঘ্র ধাবিত হও! আহা কি দুঃখ! কি কলঙ্কের কথা! পাণ্ডব বাঁচিয়া থাকিতে, কৌরবকুলের বধূ শত্রুতে অপহরণ করিয়া লইবে! আমি ব্রতধারী নচেৎ আমিই যাইতাম, অর্জ্জুন শীঘ্র ধাবিত হও, নকুল সহদেব শীঘ্র যাও। প্রথমে মিনতি, পরে ভয় প্রদর্শন, তাহাতে না হইলে বলপূর্ব্বক ভ্রাতা সুযোধন ও বধূগণকে উদ্ধার করিয়া আন।" অমনি ভীমাদি অর্জ্জুনের মায়ারথে উঠিয়া যুদ্ধে ধাবিত হইল। গন্ধর্ব্ব তাহাদের আগমন দেখিয়া শূন্যপথে স্বর্গে প্রস্থানের চেষ্টা করিলে, অর্জ্জুন দৈবঅস্ত্রে গতিরোধ করিয়া গন্ধর্ব্বের নিকট উপস্থিত হইলেন। দাদার আদেশ মত অর্জ্জুন মিত্র

গন্ধর্ব্ব পতিকে দুর্য্যোধন ও বধূদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তখন গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনের পাপ অভিসন্ধি ও দেবরাজের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া, কিছুতেই এমন পাষণ্ডকে ছাড়িয়া দিবে না বলিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিল, "তবে আমাদিগকেও পরাজয় করিতে হইবে। আমাদের প্রাণ থাকিতে আপনার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে না। আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া কৌরবকুলের পরাজয় ও কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিব।" এর পর চিত্ররথাদি গন্ধর্ব্বগণের সহিত চারি পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ হইল, গন্ধর্ব্ব কিছুতেই পাণ্ডবগণকে অতিক্রম করিতে পারিল না। অর্জ্জুন মিত্র গন্ধর্ব্বরাজের আক্রমণই কেবল নিরোধ করিল, বিজয়ের চেষ্টা করিল না, অথচ মায়া করিয়া পলায়নের সুযোগও দান করিলেন না। গন্ধর্ব্বরাজ পাণ্ডব বিজয়ে অসক্ত হইয়া বলিলেন, "অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজের নিকট চল, তিনি সমস্ত জানিয়া যাহা বলেন তাহাই করিব।" দুর্য্যোধন ও বধূগণ সহিত গন্ধর্ব ধর্ম্মরাজের নিকট আসিয়া, দুর্য্যোধনের সমস্ত পাপ অভিসন্ধি, পাণ্ডব নাশের মন্ত্রণা পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিলেন। আরও এই দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাত হইয়াই যে দেবরাজ পাষণ্ডদের শাস্তি দান জন্য, তাহাকে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাও বলিলেন। দেবরাজের আদেশেই ইহাদিগকে বন্দী করিয়া নিতেছেন তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। ধর্ম্মরাজ দেবরাজের প্রতি অসীম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, গন্ধর্ব্ব-রাজকে বলিলেন, "দেবরাজের আমাদের প্রতি এত স্নেহ জানিয়া বড়ই কৃতার্থ হইলাম। তাঁহাকে বলিবেন, কৌরব-কুলের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধের মীমাংসার জন্য, তাহারা অপরের সাহায্য প্রার্থনা করে না। আর তাহাদের কুলের অপমান পাণ্ডব বাঁচিয়া থাকিতে কখনও হইতে দিবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিন ও দেবরাজকে আমাদের শত শত প্রণিপাত জ্ঞাপন করিবেন।"

পাণ্ডবের ক্ষমা ও মহত্ব দেখিয়া, গন্ধর্ব্ব আনন্দে, বিস্ময়ে ধর্ম্মরাজকে প্রণাম করিলেন ও সকালের বন্ধন মোচন করিয়া স্বর্গপুরে প্রস্থান করিলেন।

অভিমানী দুর্য্যোধনের অন্তকার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া, ধর্ম্মরাজ সামান্য দুইটী উপদেশ দান ও ভোজন করাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দান করিলেন। বলিয়া দিলেন, "ভাই! বিরোধে যখন জয় ও পরাজয় দুইই হইতে পারে, তখন পার্য্যমানে বিরোধে ব্রতী না হওয়াই ত মঙ্গল। শুধুশুধি বিরোধ অনেক সময় ভীষণ মহা বিপদকে আনয়ন করে! তাই দেবগণ ও কখন কখন অসুরগণ দ্বারা পরাজিত হন। যাও, এখন শীঘ্র পলাইত সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া, রাজধানীর দিকে প্রস্থান কর। কেন না, কেহ যদি রাজধানীতে সংবাদ দিতে গমন করিয়া থাকে। তবে বৃদ্ধগণ দারুণ মনোদুঃখ পাইবেন?" দ্রৌপদী দেবী আদর করিয়া বধূগণ ও দুর্য্যোধনকে আহার করাইয়া বিদায় দিলেন, বধূগণ, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দ্রৌপদীকে প্রণামাদি করিয়া, নিজেদের স্বামীদের দুর্ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে কান্দিয়া, আকুল হইলেন। দুর্য্যোধন এইরূপে সকল দিকে অকৃত কার্য্য ও হতমান হইয়া গোশালায় ফিরিয়া আসিল।

ভক্ত—বৎস! অদ্য দুর্য্যোধন বিষয়-নিবৃত্ত তপধর্ম্মা ভগবৎ ভক্তগণকে শুধুশুধি হিংসা করিতে যাইয়া যেইরূপ ফললাভ করিয়াছে, ইহার একটুকুও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নয়। মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থমা রক্ষিত এমন অজেয় দুর্য্যোধন বীর্য্যও যেমন আজ পাণ্ডব হিংসায় যাত্রা করিয়া, গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক পরাজিত লাঞ্ছিত হইল ও ধ্বংস হইতে হইতে পাণ্ডবের করুণায় রক্ষা পাইয়া ফিরিতে পারিল; নিবৃত্তি-ধর্ম্মা ভক্ত হিংসার এই ফল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিবৃত্তিধর্ম্মা ভক্তের স্বরূপ দেখিলেত, এমন প্রাণঘাতী আততায়ী, দারুণ অত্যাচার অসম্মান ও ক্লেশ দানকারী ব্যক্তিকেও তাঁহারা

কুলধর্ম্ম বিধি রক্ষা করিবার জন্য, দেবতার সঙ্গে বিরোধ করিয়াও রক্ষা করিয়া দিলেন। কুরু কুলের গৌরব রক্ষার অহঙ্কার হইতে পাণ্ডব এই যুদ্ধ করেন নাই। তার প্রমাণ বিরাট পর্ব্বে দেখিবে, সেইদিন তাহাদের এত প্রিয় কৌরব কুলকেও বিরাট পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া পরাজয় করিয়া দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইবেন না। পাণ্ডব ধর্ম্মের উপাসক, তাহারা অহঙ্কারের উপাসক ছিল না। কৌরব সভায় দ্রৌপদীর উপর দুর্য্যোধন যে অত্যাচার করিয়াছিল, কুল ধর্ম্মের জন্য পাণ্ডব সে অত্যাচার উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই অত্যাচার অন্য রমণীর প্রতি হইলে, পাণ্ডব উপেক্ষা করিয়া সহ্য করিতেন না, নিশ্চয় তাহার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে ও কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন ব্যক্তিই প্রকৃত নিবৃত্তি সাধক ও ভগবান্ ভক্ত। ইহাদের প্রতি শত্রুতা করিলে যে ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি! না হওয়াই আশ্চর্য্য। সর্ব্ব-দেবতা, উপদেবতা ও ঋষিগণও ইহাদের উপর অত্যাচার শ্রবণ করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অত্যাচারীর অনিষ্ট করিয়া থাকেন। তাই দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব-দ্বারা দুর্য্যোধনের পরাজয় করিয়াছিলেন। এই অশরীরীদের যুদ্ধ এখনও জগতে হয় বাবা! সামান্য শত্রুর সঙ্গে বিরোধে, মোকদ্দমাদিতে হারিয়া যাওয়া, অভাব নিম্ন উপায়ে ক্ষতি, অসম্মান আদি প্রাপ্ত হওয়াই, গন্ধর্ব্বাদি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া পরাজয় করিয়া দেওয়া। ভগবান্ ও দেবতাগণ ক্রুদ্ধ হইলে জীবের জ্ঞান বীর্য্য যথাযথ ভাবে স্ফূর্ত্তি না হইয়া, তাহারা অকর্ম্মণ্য ও পরাজিত হয়। এই তত্ত্বই মহাবীর কর্ণ, অশ্বত্থামা আদির মুহূর্ত্ত মধ্যে গন্ধর্ব্ব হস্তে পরাজিত হওয়া। তাহারা মানুষের অজেয় ছিল বটে দেবতার নয়। বাবা, ঋষিগণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, মহতের অমার্য্যাদা করিলে, আয়ু, শ্রী, যশ ধর্ম্ম ও লোক-আশীর্ব্বাদ বর আদি নরের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই নষ্ট হইয়া যায়, এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্য সামান্য কিছু ফল দেখিলে, পরে দেখিবে, এই শুধুশুধি

পাণ্ডব হিংসা ও অমর্য্যাদা হইতে, ধার্ত্তরাষ্ট্রদের যত অমোঘ দৈবশক্তি, অজেয় মঙ্গলসত্তা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। কর্ণের অজেয় মঙ্গলকর অক্ষয় কবচ কুণ্ডল অপহৃত হইবে, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মেরও মরিতে ইচ্ছা হইবে, অজেয় দ্রোণাচার্য্য নিহত হইবে। ধার্ম্মিক মহতের পীড়নে সর্ব্বদেবতা ও উপদেবতা রুষ্ট হইয়া, সেই পীড়ণকারীর সর্ব্বমঙ্গল, সুখ, শান্তি, যশ নষ্ট করিয়া দেন। যথা—আয়ু শ্রীয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ। হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বানি পুংসো মহদতি ক্রমো॥ (ভাগবত ১০-৪-৪৫ শ্লোঃ) দুর্য্যোধন যে পাণ্ডব বধূর অসম্মান করিয়াছিল, তাই অদ্য তার কুলবধূও শত্রু হস্তে অসম্মান লাভ করিল। এখন কোন পুণ্য ফলে অদ্য দুর্য্যোধন পাণ্ডব সহায়তা লাভ করিয়া মুক্ত হইল তাহাই শ্রবণ কর।

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদিগকে বনবাস দান করিয়াছিল। একেবারে ত্যাগ করে নাই বলিয়া, সেই পুণ্য ফলে অদ্য প্রাণে রক্ষা পাইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বনবাস অর্থ পূর্ণতার হানী করিয়া ধর্ম্মসাধনকে হীন করিয়া রাখা, অর্থাৎ সাধনকে ত্রিসন্ধ্যা বন্দ্যনায় পরিণত করিয়া ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়া। এই সামান্য ধর্ম্মসাধনার ফলকেই অদ্য পাণ্ডব হস্তে বিপদ উদ্ধার দ্বারা দেখান হইয়াছে। দেবরাজ ইচ্ছা করিলে পাণ্ডবদের নিকটে না করিয়া, অন্য দূর স্থানেই ধার্ত্তরাষ্ট্র পরাজয় করিয়া বন্দী করিয়া নিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে ধার্ম্মিকের মহত্ব পাণ্ডবের ধর্ম্মজ্ঞান ও ক্ষমাগুণের পরিচয়ত জগত পাইত না। তাই আজ পাণ্ডবের নিকটেই এই খেলা খেলাইয়া জগতে ধার্ম্মিকের মহিমা প্রচার করিলেন। প্রকৃত মহত্ব দর্শন করাইয়া অদ্য অসুরেরও চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন? এই দিন হইতে দুর্য্যোধনের জীবনের গতি অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইল, তাহাকে বধ করিলেও বুঝি তাহার এত মঙ্গল হইত না। এখন দুর্য্যোধনের পরিবর্ত্তন শ্রবণ কর।

লীলা—ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে বধূগণ সহ দুর্য্যোধন গোশালায় গমন করিলে, একে একে পলাইত সৈন্যগণ, কর্ণ, শকুনি ও ভ্রাতাদি আসিয়া তথায় মিলিত হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল দুর্য্যোধনই গন্ধর্ব্ব বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। পরে সমস্ত শুনিয়া নিজেদের হীনত্ব ও পাণ্ডবের মহত্বে বড়ই বিস্মিত ও লজ্জিত হইল। দুর্য্যোধনেরও অন্ত সুমতি দেখা দিল। পাণ্ডবের অন্তকার ভ্রাতৃস্নেহ মহত্ব ও তাহাদের শক্তি বীর্য্যের প্রমাণ পাইয়া, তাহার হৃদয়ও স্নেহে দ্রব হইয়া উঠিল। সত্যই আজ সে নিজের কুবুদ্ধি ও বৃথা পাণ্ডব হিংসার জন্য বিশেষ দুঃখিত হইয়া উঠিল। নিজের বৃথা অহঙ্কার ও হীন শক্তিতে বিশ্বাস করাকে বার বার ধিক্কার দিয়া বলিল, "এতদিনে বুঝিলাম, আমার প্রকৃত মূল্য কি! পাণ্ডবের শতাংশের একাংশও আমার সর্ব্ব শক্তি নয়! আমি এই সামান্য শক্তির গৌরবেই এত অহঙ্কার করিতাম? বৃথাই পাষণ্ড আমি আমার স্বভাব মিত্র,—এত শত্রুতায় আজও যাহারা আমায় শত্রু ভাবে না, এমন ভ্রাতা পাণ্ডবগণকে শত্রু ভাবিয়া দুঃখ পাইলাম। শুধুশুধি কত অধর্ম্ম, পিশাচের অধিক কর্ম্ম করিয়া, দেব পরাক্রম, দেবস্বভাব এমন ভাইদিগকে, আমি মহাঅন্ধ জন্ম ভরিয়া পীড়া দিলাম। আমি এই কলুষিত জীবন আর রাখিব না, তোমরা সকলেই রাজ্যে ফিরিয়া যাও।" এই বলিয়া দুর্য্যোধন পবিত্র আসনে যোগাসনে বসিল ও মরণ সঙ্কল্প করিয়া প্রয়োপবেশনে সামাধিস্থ হইল। দুঃশাসন আদি ভ্রাতাগণ কান্দিতে লাগিল, কর্ণ, শকুনি আদি কত করিয়া বুঝাইতে লাগিল; সে কাহারও কথাই কানে তুলিল না। কথিত আছে সেইকালে অসুর আত্মারা আসিয়া দুর্য্যোধনকে নানারূপে আশা ও সাহস দিয়া এই মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা দুর্য্যোধনের আত্মাকে পাতালে অসুর পুরীতে নিয়া আশ্বাস দিয়া বলিল, "আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই সর্ব্বশক্তি

দিয়া আমরা তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা করিব, তুমি দেহত্যাগ করিও না। যুদ্ধ কালে আমরা আমাদের অজেয় শক্তি লইয়া, তোমার পক্ষের কর্ণ ভীষ্ম, ও দ্রোণাদির দেহে আবির্ভূত হইয়া তোমার শত্রুগণকে বধ করিয়া দিব।" এই অসুর আশ্বাসকে দুর্য্যোধন দেবতাদের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিল, তাই আনন্দে সমাধি ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইল ও সকলকে লইয়া রাজপুরে প্রস্থান করিল। এই পরাজয়ের পরেই দুর্য্যোধন কিছু তপশক্তি সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। কেবল গায়ের জোর বুদ্ধি চাতুর্য্যের আশ্রয়ের উপরে, তপশক্তি দৈব-সাহায্য লাভের প্রয়োজনীয়তা এইবার বোধ করিয়া, যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রতী হইল। প্রথম, নারায়ণ যজ্ঞ করিল, পরে বলরামের শিষ্যত্ব লইয়া গদা যুদ্ধ শিক্ষার ছলে তাহাকে সেবায় পরিতুষ্ট করিল। তৃতীয়ে লৌহ ভীম প্রস্তুত করিয়া, ভীমমারণ-ব্রত গ্রহণে সেই মূর্ত্তির সহিত রোজ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। চতুর্থে দুর্ব্বাসা ঋষিকে সেবায় তুষ্ট করিয়া তাহা দ্বারা পাণ্ডব ধ্বংসের চেষ্টা করিল। পরে জয়দ্রথ ও রাক্ষস দ্বারা দ্রৌপদীহরণ চেষ্টাও করিয়াছিল।

ভক্ত—দুর্য্যোধনকে অসুর শক্তির আশ্বাস দানটুকু কল্পনা নয় বৎস! ধর্ম্ম-পথে দেবশক্তিগণ যেমন সহায়তা করিয়া, জ্ঞান ও শক্তি বিধান করেন, আবার অধর্ম্ম পথে অসুর শক্তিগণও তেমন সহায়তা করিয়া, জ্ঞান ও শক্তি বিধান করিয়া থাকে; আজকালের প্রেততত্ত্ব (স্পীরিট তত্ত্ব) আলোচনা দ্বারা, সৎ আত্মা ও অসৎ আত্মার এই সহায়তা ও শক্তি দান বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে। অসৎ কর্ম্মে—আত্মহত্যা ও পর হত্যাদি কার্য্যে অশরীরী শক্তি উৎসাহ দিয়া কৌশল শিখাইয়া দেয়। সেই পরামর্শে উৎসাহে আত্মহারা হইয়া জীব আত্মহত্যাদি করিয়া বসে। আবার ধর্ম্মকার্য্যে সাধন ভজনেও তেমন ধার্ম্মিকদিগকে সৎ আত্মারা স্বপ্নে বা ছদ্ম মূর্ত্তিতে আসিয়া নানা রূপে সহায়তা করেন। এই অশরীরী সত্তাগুলির অসুর ও দেবতা নির্ণয় বড়ই কঠিন

ব্যাপার অনেকে না চিনিয়া তাহাদের আদেশ পালন করিতে যাইয়া, দেবতা বোধে অসুর তৃপ্তিতে ধাবিত হয় ও অতি হীন মহাপাপ পর্য্যন্ত করিয়া বসে। দুর্য্যোধনেরও আজ সেই দশাই ঘটিয়াছিল, সে অসুরকে দেবতা ভাবিয়া আবার পাণ্ডবের বিপক্ষতায়ই ধাবিত হইল। এই অবস্থায়ই অহল্যা দেবী ইন্দ্রকে স্বামী ভাবিয়া সতীত্ব হীনা হন ও জানকী দেবী রাক্ষসের শব্দকে শ্রীরামের শব্দ মনে করিয়া রাক্ষসের আয়ত্ত হন।

মহাভারতে পূর্ণ তমেরক্রিয়া জরাসন্ধ, শিশুপাল ইত্যাদি ও দুর্য্যোধনের প্রথম জীবনের কর্ম্ম, আর এই সভাপর্ব্বের ধার্ত্তরাষ্ট্র ক্রিয়া তমঃ রজঃ মিশ্রিত ক্রিয়া, এখন সেই অসুর শক্তির সত্ত্বমিশ্র ক্রিয়ার লীলা প্রদর্শিত হইবে। অসুর এইবার সত্ত্বযুক্ত অবস্থায় নিজের দেহেন্দ্রিয় শক্তির উপরে, শাস্ত্রবিধির তপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই শাস্ত্র বিধি তপশ্চরণও হিংসা, ঈর্ষ্যা ও কুটীলতা প্রসূত স্বার্থ সাধন উদ্দেশে, সকাম সাধন গ্রহণ মাত্র; অসুরের যে এই সত্তার উর্দ্ধে উঠিবার আর শক্তিই নাই। অসুরশক্তি অদ্য গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও পাণ্ডব তপশক্তির দ্বারা গন্ধর্ব্ব জয় করিল দেখিয়া, নিজ দেহেন্দ্রিয় শক্তি চেষ্টার উপরে দৈববল গ্রহণ চেষ্টায় ব্রতী হইল। কিন্তু তাহাদের সমস্ত সাধনাই ঈর্ষ্যা, দর্প ও মহৎ দ্বেষ আদি দোষে দুষ্ট হওয়ায়, কিছুতেই তাহারা সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না; সকল কর্ম্মেই তাহাদের অমঙ্গল আনয়ন করিবে। এখন নারায়ণ যজ্ঞ শ্রবণ কর।

নারায়ণ যজ্ঞ লীলা—গন্ধর্ব্ব পরাজয়ের অপমান-কলঙ্ক ধৌত জন্যই বুঝি, এক কর্ণ দ্বারা দিগ্‌বিজয় করাইয়া নারয়ণ যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। এই যজ্ঞে যদিও দিগ্‌বিজয় নাই, নিমন্ত্রণ করিতে হয়। কিন্তু দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণকে দর্পের সহিত আদেশ ভাবে করিতে কর্ণকে প্রেরণ করিল। দুর্য্যোধনের দিগ্‌বিজয় থাকে এমন যজ্ঞ করিতেই বাসনা ছিল। কিন্তু এই বংশেরই একজন সম্রাট্ জীবিত থাকিতে, আবার একজন সম্রাট হইতে পারে না তাই নারায়ণ

যজ্ঞ করিয়াই দিগ্‌বিজয় করিয়া নিমন্ত্রণ করিল। অসুর রাজগণ বিনাযুদ্ধেই আনন্দে দুর্য্যোধনের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিমন্ত্রণ লইল, আর পাণ্ডবপক্ষগণও মিত্র বলিয়াই নিমন্ত্রণ মানিল। তাই নির্ব্বিবাদে কর্ণের দিগ্‌বিজয় সাধিত হইলেও, দুর্য্যোধন কর্ণের বিক্রমে নিজকে কৃতার্থ বোধ করিল। পাণ্ডবের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থেই সেই যজ্ঞ মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। পাণ্ডবদিগকে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল, পাণ্ডব বনবাস ত্যাগ করিয়া আসিতে অক্ষমতা জানাইয়া, যজ্ঞ জন্য বহু ধন্যবাদ করিয়া পাঠাইলেন।

ভক্ত—বাবা, মহাপুরুষদের ধন,রত্ন,এমন কি তাহাদের ত্যক্ত বসনাদির মধ্যেও মহত্ত্বের বীজ নিহিত থাকে। সাধকের বস্ত্রাংশাদি ধারণ করিয়া ভজনাদি করিলে তাই সহজেই মন একাগ্র হয়। তাঁহাদের অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাও দেব ভাবে ব্যয় করিতে মতি জন্মে। তাই পাণ্ডবের অর্থ দ্বারা অসুর দুর্য্যোধনও নারায়ণ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া বসিল। কিন্তু অসুরের যজ্ঞে তাহাদের অসুরত্বের পূজাই হয়, দেবতার পূজা আর হয় না। ভক্তির সহিত ভগবান্ তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ না হইয়া, নিজেদের ঈর্ষ্যা তৃপ্তি ও প্রতিষ্ঠা যশাদি লাভের জন্যই হইয়া থাকে। দুর্য্যোধন ঈর্ষায় পাণ্ডবের মত বা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিব বলিয়া যজ্ঞ করিয়াছে, রাজসূয় যজ্ঞ হয় না বলিয়া ঠেকিয়া নারায়ণ যজ্ঞ করিয়াছে, ইহাতে নারায়ণ কেমন তুষ্ট হইলেন বুঝিতেই পার? যজ্ঞে উৎসব দান আদি, যেন পাণ্ডবদের যজ্ঞ হইতেও অধিক হয় কেবল সেই দিকেই মতি ছিল। এমন যজ্ঞের কিফল হয়, পরের কর্ম্ম দুর্ব্বাসার পারণ লীলায়ই তাহা বুঝিতে পারিবে।

দুর্ব্বাসার পারণ লীলা—সেইকালে দুর্ব্বাসা নামে একজন মহাতপ শক্তি সম্পন্ন মহর্ষী ছিলেন। তিনি কখন কখন রাজাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেন, "আমাকে কে তৃপ্ত করিয়া সেবা করিতে পার?"

সেবায় তাঁহাকে পরিতোষ করিতে পারিলে, ঋষি তাহাকে বর আদি দিয়া নানা মঙ্গল দান করিতেন। আর দর্প করিয়া সেবা করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইলে, অভিশাপ দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণী ইহাকে তুষ্ট করিয়া অপূর্ব্ব রন্ধন শক্তি লাভ করেন। কুন্তীদেবী দেব আনয়ণ মন্ত্র লাভ করেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেবীও ইহাকে তুষ্ট করিয়া বর লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেইরূপ অমানুষ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহারই বিবৃত পরিচয় মাত্র পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত আছে যেইকালে যাহা ইচ্ছা তিনি ভোজন করিতে চাহিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে হইত। যাহা ইচ্ছা হয় করিতেন তাহাতে বাধা দিলেই সর্ব্বনাশ। ইচ্ছা মাত্র সুন্দর উপবন ধ্বংস করিয়াছিলেন, সুন্দর গৃহে অগ্নি দিয়া সর্ব সামগ্রী ও দাসীগণ সহিত ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে ভোজন জন্য মিষ্টান্ন আনাইয়া, তাহার সামান্য কিছু খাইয়াই সেই উচ্ছিষ্ট মিষ্টান্ন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মাখাইতে লাগিলেন। সমস্ত অঙ্গে মাখাইয়া পদে মাখিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সরিয়া গেলেন। তখন ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে ঋষি রুক্মিণী দেবীকে কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়া, সর্ব্ব অঙ্গে সেই মিষ্টান্ন মাখাইলেন ও রথের অগ্রে ঘোড়ার স্থানে জুড়িয়া লইলেন। পরে রথে উঠিয়া তাঁহাকে চাবুক দিয়া তাড়না করিয়া, তাঁহার দ্বারা রথ টানাইতে লাগিলেন। রুক্মিণী দেবী কতটুক টানিয়াই শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পরিলে, ঋষি দারুণ ক্রোধ করিয়া রথ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কতদূর যাইয়া ফিরিতেই দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী তাঁহার পশ্চাতেই আসিতেছেন। অমনি সহাস্য বদনে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ, কেন পদে অন্ন মাখাইতে দিলে না? তোমার সর্ব্ব শরীরই অস্ত্রের অভেদ্য হইয়াছিল কিন্তু পদ দুইটী ভেদ্য রহিল।" রুক্মিণীকে বলিলেন, "দেবী, তোমার সর্ব্ব অঙ্গে অপূর্ব্ব পদ্ম গন্ধ হইবে ও তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া হইবে।"

ঋষি এইরূপ বর দান করিয়া, আনন্দে নষ্ট উপবনও গৃহ সামগ্রী সহিত ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। এ হেন দুর্ব্বাসা ঋষিকে দুর্য্যোধন নিজে সেবা করিয়া তুষ্ট করিয়াছিল। ঋষি তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে, দুর্য্যোধন তাহার অসুরত্ব দোষে, ঋষি দ্বারা পাণ্ডবের অনিষ্ট করিতে বাসনা করিল। সে বর চাহিল, "আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করুন। একাদশীর পর দিন পারণার জন্য সকল শিষ্য লইয়া আপনি পাণ্ডবদের অতিথি হইবেন। কিন্তু পারণার দিন দ্রৌপদীর ভোজনের পর আপনার তথায় উপস্থিত হইতে হইবে; এই আমার প্রার্থনা।" প্রকাশ ছিল যে, ধর্ম্মরাজ সূর্য্য আরাধনা করিয়া যে অক্ষয় ভাণ্ড লাভ করিয়াছিলেন, তাহার শক্তি দ্রৌপদীর ভোজনের পরই নষ্ট হইয়া যাইত। তাই পাষণ্ড দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর ভোজনের পর, ঋষিকে তাঁহার ষষ্ঠি সহস্র শিষ্য সহিত তথায় অতিথি হইতে বলিল। তাহার বিশ্বাস তাহাতে পাণ্ডব অতিথি সেবায় অক্ষম হইয়া সর্ব্ব পুণ্য হইতে চ্যুত হইবে! আর ঋষির তোষণে অশক্ত হইলে, ঋষিও তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়া নষ্ট করিবেন। ঋষি তাহার এই দুষ্ট বুদ্ধির অদ্ভুত বর প্রার্থনা করিতে শুনিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "মূর্খ,একি বর চাহিতেছ! কেন নিজের মঙ্গল লাভে বঞ্চিত হও? নিবৃত্তি-পন্থী, পরম ধার্ম্মিক, অবিরোধী, সর্ব্বত্যাগী, বনবাসী পাণ্ডবের প্রতি, অনর্থক তোমার এই শত্রুভাব কেন? পাণ্ডবের ত্যাগ, মহত্ব, ধর্ম্মজ্ঞান ও তপস্যাকে আমিও সম্মান করি। ইহাদের প্রতি শত্রুতা বুদ্ধি করিয়া অনিষ্ট আচরণ করিলে, তাহার কখনও কোন দিকে মঙ্গল হইতে পারে না। দ্রৌপদীর ভোজনান্তে আমি অতিথি হইলেও তাঁহাদের কোনও ক্ষতিই হইবে না। যে সব মহর্ষিরা পাণ্ডবের নিকট উপস্থিত আছেন, তাঁহারা তপ শক্তিতেই আমায় ভোজন করাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের সহায়তা বিনে পাণ্ডবগণও মহা তপশক্তি সম্পন্ন, তাঁরা নিজেরাও আমায় শিষ্যসহ পারণা করাইয়া দিতে

পারিবে। ইহার উপরেও ভক্তবৎসল ভগবান্‌আছেন! তিনি যে তাঁহার নিবৃত্ত ভক্তগণের বিপদ, আপদ, যোগক্ষেম সর্ব্বদা আপনি বহন করিয়া থাকেন; পাণ্ডবকে এবিপদে তিনিই রক্ষা করিবেন। নিশ্চয়, তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি হইবে না! কেবল তুমিই মঙ্গল লাভে বঞ্চিত হইবে। তোমার সেবায় তুষ্ট হইয়াছি, তাই তোমায় বলিতেছি. এখনও নির্ব্বিরোধ নিবৃত্তিধর্ম্মা পাণ্ডব হিংসা পরিত্যাগ কর! নিজের কোনপ্রকার মঙ্গল হয় এমন কোনও বর প্রার্থনা কর।" পাপমতি দুর্য্যোধন, বার বার এই বরই প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি মহা দুর্ভাগা, তাই এই বুদ্ধি জন্মিয়া তোমায় মঙ্গল লাভে বঞ্চিত করিল।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঋষি সশিষ্য একাদশীর পরদিন, পারণা জন্য দ্রৌপদীর ভোজনের পরে যাইয়া, বনবাসী পাণ্ডবের আশ্রমে অতিথি হইলেন। পাণ্ডবগণ ঋষিকে যথাযথ অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন ও তাঁহাদিগকে স্নান সন্ধ্যায় প্রেরণ করিয়া, দ্রৌপদীর নিকট যাইয়া দেখিলেন দ্রৌপদী ভোজন করিয়া উঠিতেছে। এখন উপায়! ষষ্টিসহস্র শিষ্য সহিতে এমন কোপন স্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা অতিথি, তাতে একাদশীর পারণা করিবেন! পাণ্ডব এখন কি করিয়া এই অতিথি সৎকার করিবে। আজ পাণ্ডবের সবই যাইবে! অতিথি বিমুখের যে সব পুণ্যবল নষ্ট হইয়া যায়। তারপর ক্ষুধাতুর ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসার অভিসম্পাৎ, পাণ্ডবের আর এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার শক্তি নাই; যদি ভগবান্ রক্ষা করেন তবেই আজ পাণ্ডব বাঁচিবে। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী দেবীর সহিত কাতরে, জীবের শেষ আশ্রয়, ভক্তের একমাত্র সম্বল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া, কাতরে তাঁহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "কৌন্তেয় প্রতি জানিহ নমেভক্ত প্রণশ্যতি।" নিজের মুখে বলা এই কথাকি মিথ্যা হইতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডব এই

বিপদ হইতে অনায়াসে উদ্ধার হইয়া গেলেন। মাঝ হইতে দুর্য্যোধনই ঋষির বর লাভ-মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইল।

কথিত আছে, পাণ্ডব অনন্যশরণ লইয়া ভগবানকে ভাবিতে থাকিলে, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দ্রৌপদীর নিকট যাইয়া, অতি কাতরতার সহিত নিজের দারুন ক্ষুধাতৃষ্ণা জানাইয়া আহার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী দেবীও আজ খাবার জিনিষের অভাবেই যে তাঁহাকে কাতরে ডাকিতেছিলেন। তাই তিনিও কাতরে বলিতে লাগিলেন "ওগো, তোমায় কি খাইতে দিব! আজ যে গৃহে একটু ক্ষুদকণাও নাই।" শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বাধা দিয়া আরও কাতরে, যেন ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যায় এই ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সখি, আজ যাহা কিছু হউক শীঘ্র দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর, নচেৎ প্রাণ যে যায়?" দ্রৌপদী তাঁহার প্রাণের সখার প্রাণ যায় দেখিয়া, অমনি নিজের ভোজন পাত্রের মধ্যে যাহা কিছু লাগিয়াছিল, সেই উচ্ছিষ্টই লইয়া তাড়াতাড়ি সখাকে খাওয়াইয়া দিয়া হাতে জল তুলিয়া দিলেন। ভগবান্ সেই সামান্য উচ্ছিষ্ট খাইয়াই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পরম তুষ্টি লাভ করিলেন। অমনি তৃপ্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত তৃপ্ত হউক। সখি, আজ আমায় কি রক্ষাই না করিয়াছ, আর কিই না মহাবস্তু আজ ভোজন করাইয়াছ! আমি সুস্বাদের এমন জিনিষ বুঝি জীবনেও আর খাই নাই! এখন বল দেখি তোমাদের মুখ বিষন্ন কেন?" তখন পাণ্ডব দুর্ব্বাসার অতিথি হওয়ার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অভয় ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমিই ঋষির সেবাভার গ্রহণ করিলাম, যাও তোমরা ঋষিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আস।"

এদিকে 'তস্মিণ তুষ্টে জগত তুষ্ট!' ভগবান্ যেই জগত তৃপ্ত হউক বলিয়া নিজে ভোজন করিয়াছেন, তখনি দুর্ব্বাসা ও তাঁহার শিষ্যগণের হঠাৎ

ক্ষুধা শান্তি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবের তপস্যা বলেই এমন হইয়াছে বুঝিয়া, সেইস্থান হইতেই পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময় পাণ্ডবগণ যাইয়া আহ্বান করায় ভয়ে পলাইতেও সাহসী হইলেন না, তাঁহাদের সঙ্গে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া প্রিয় দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা আনন্দে তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ও তাঁহার ভক্তবৎসলাতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহারা যে কেন এইকালে অতিথি হইয়াছেন তাহার কারণ, দুর্য্যোনের বর প্রার্থনার বিষয় বর্ণনা করিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা আরও বলিলেন, "অদ্য এবিপদে যদি পাণ্ডব উদ্ধার না পাইত, তবে বুঝিতাম ধর্ম্ম সাধনের ফল নাই! ভক্তবৎসল ভগবানেরও ভক্ত রক্ষার শক্তিও নাই! আমি সমস্ত সৃষ্টিকেই তাহা হইলে আজ ধ্বংস করিয়া ফেলিতাম!" ইহার পরে পরদিন মহর্ষি সশিষ্য উত্তমরূপে ভোজন করিয়া পাণ্ডবদিগকে শত শত আশীর্ব্বাদ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিয়া গেলেন।

ভক্ত—অসুর প্রকৃতির দেব আরাধনার ফল এইরূপই বিফল হইয়া যায় বাবা! দুর্য্যোধনাদির জন্মই যে গর্ভশ্রাবে, তাহাদের পিতা জীবনেও তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। তাই এই প্রবৃত্তির কর্ম্মের ফলও ঠিক এইরূপ। সাধনাদিতেও পূর্ণ ফল দেয় না ও দেখিবার উপযুক্ত সুফলও প্রসব করে না। যেমন পাণ্ডব হইতে রাজ্য কারিয়া লইয়া দ্রোণকে দান করিয়া দিল, তাহাদের ধনরত্নরাশি স্পর্দ্ধা ও দম্ভতৃপ্তি জন্য যজ্ঞকালে দান করিয়া ফেলিল, তেমন তপস্যাদির ফললাভ কালেও অসুর বুদ্ধি আসিয়া, এই দুর্ব্বাসা পারণার বর লওয়ার ন্যায় বিপরীত প্রার্থনা করাইয়া বসিবে; সুফল লাভে বঞ্চিত করিবে। আর দুর্ব্বাসার পারণে পাণ্ডব যেমন অভিসম্পাৎ না পাইয়া ঋষির আশীর্ব্বাদই লাভ করিয়াছিল। দুর্য্যোধন হিংসাবুদ্ধিতে যত কিছু করিয়াছিল, সেই সমস্তই তাহার অনিষ্টকর ও পাণ্ডবের মঙ্গলের কারণই হইয়াছিল।

১। দুর্য্যোধনের ভীমপ্রমাণ লৌহভীম প্রস্তুত করিয়া ভীমারণ সাধনা গ্রহণের ফলে, যুদ্ধ শেষ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত হইতে ভীম সেনের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেন মনে করিয়া এই লৌহ ভীমকে চূর্ণ করিয়া ফেলেন।

২। কর্ণের অর্জ্জুনবধ জন্য পাশুপত ব্রত গ্রহণ ও অপ্রত্যাখ্যান দানব্রতে, তাহার বলহ্রাস এবং অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়া, তাহারই বধের উপায় হইয়াছিল।

৩। জয়দ্রথ দ্বারা দ্রৌপদী হরণ চেষ্টা করিয়া, জয়দ্রথের প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। কেবল ভগ্নী বিধবা হইবে ও বৃদ্ধ রাজা রাণী দারুণ শোক পাইবে বলিয়া, দয়াবান্ ধর্ম্মরাজ প্রাণ রক্ষা করিয়া দিয়াছিলেন। পাবণ্ডেরা বুঝিয়াছিল, এখন যে কষ্টে দ্রৌপদী আছেন, গোপনে তাঁহার নিকটে যাইয়া রাজঐশ্বর্য্যোদির প্রলোভন দেখাইলে, এখন বোধ হয় সে পাণ্ডব ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে। তাই ভগ্নীপতি জয়দ্রথকে সৈন্যবল সঙ্গে দিয়া এই কর্ম্মে প্রেরণ করিয়াছিল।

৪। শিষ্যত্বের ভান করিয়া বলরামকে ভোগবিলাস ও মদ্য দিয়া সেবা করিয়া তোষণের চেষ্টায় দুর্য্যোধন দ্বারকায় গিয়াছিল। তথায় নানা মিথ্যা উক্তি ইত্যাদি দ্বারা নিজেরা যে পাণ্ডবের প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই, বনবাসাদিতে তাহারা দোষী নয়, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া, যদুকুল যাতে পাণ্ডবের সাহায্য না করে সেজন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এই চেষ্টায় কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাই যদু রাজ্যের কৃতবর্ম্মা, ভুরিশ্রবা আদি কয়জন তাহার বশীভূতও হন ও বলরামও কতক বশীভূত হন। এই বলরামের আদেশেই তাঁহাদের বংশ পাণ্ডবপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণও অস্ত্রধারণ করেন নাই। কিন্তু তাহাতেও ধার্ত্তরাষ্ট্রের পূর্ণফল লাভ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবের অগ্রে দাড়াইয়া, তাঁহার তেজে

পাণ্ডবের তেজবর্দ্ধন ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের তেজ হরণ করিয়া দিয়াছিলেন। শরশয্যায় ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তবের মধ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। (ভাগবত) এখন বনপর্ব্বে পাণ্ডবের লীলা শ্রবণ কর।

লীলা—সিংহিকা নামে একজন ভীষণ বলশালী রাক্ষস, তপস্বীর ছদ্মবেশে পাণ্ডব সঙ্গে কতক দিন বাস করিয়া, একদিন দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া হরণের চেষ্টা করিল ও ভীমের হস্তে নিহত হইল। আরো এক রাক্ষস ভীমার্জ্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডব ও দ্রৌপদী বধের চেষ্টা করিয়া নিহত হয়। বনবাসে এইরূপ বহু বিপদ হইতে ধর্ম্মবলে ও ভগবৎ কৃপায় পাণ্ডব রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ভীমসেন একবার বনে দারুণ অজগরের কবলিত হইয়া মরিতে বসিয়াছিলেন। সেই অজগর সর্প অভিশপ্ত রাজা নহুষ ছিলেন। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মবলে তাঁহার শাপ মোচন করাইয়া ভীমের উদ্ধার করেন।

আর একবার হিমালয়ে এক যক্ষপুরী দেখিয়া ভীমসেনের নিজেদের রাজঐশ্বর্য্যের বিষয় মনে পড়িয়া দারুণ ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তখন দুর্য্যোধনের অমানুষ অত্যাচার ও সেই সুখকে ছলপূর্ব্বক হরণ করার কথা মনে পরায়, তিনি ক্রোধে, দুঃখে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পুরীরক্ষকগণ একজন অস্ত্রধারী নরকে অস্ত্র ধরিয়া গর্জ্জন করিতে দেখিয়া যুদ্ধে আহ্বান মনে করিল ও পরে বধ করিবার জন্য আক্রমণ করিল। ভীমসেন ভীষণ যুদ্ধে যক্ষ সেনাপতি পর্য্যন্ত নিহত করিয়া ফেলিলেন। তখন স্বয়ং যক্ষরাজ ধর্ম্মদেব যুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইদিকে যুদ্ধের কোলাহলে যুধিষ্ঠিরও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ধর্ম্মদেবকে প্রণাম করতঃ নিজেদের পরিচয় দান করিয়া, ভ্রাতা ভীমকে ক্ষমা করিতে বলিলেন। ধর্ম্মদেব তখনই যুদ্ধ থামাইয়া ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়াছে বলিয়াইত আমার অনুচরও নিহত হইয়াছে! নচেৎ জগতে কি মানব হইয়া যক্ষ

সেনাপতি বধ করিতে পারে! পাণ্ডব নিশ্চয়ই ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া পুরী আক্রমণ করে নাই, কেন না তারাত পুরীর আকাঙ্ক্ষী নয়। আমার এই সেনাপতি দর্পান্ধ ছিল, তাই সে এক ঋষি কর্তৃক অভিশপ্তও হইয়া ছিল। সেই দর্পভরে ভীমকে আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মশাপের ও দর্পের ফলভোগ করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ, তোমাদের মত নিবৃত্তপথীভক্ত যে হঠাৎ কোনপ্রকার অপরাধ করিলেও, চিরকাল ক্ষমার পাত্র; তোমাদের অপরাধ সন্তানের আবদারের মত রক্ষার বিষয়।" এই বলিয়া তিনি পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর একবার বাহুবল দর্পে একটী নিষিদ্ধ দেবস্থানে প্রবেশ করিয়া ভীম কদলী বন ভগ্ন করিতে উদ্যত হইলে। হনুমানজি ভ্রাতার শিক্ষার জন্য প্রথমে ছদ্মবেশে তাহার বলদর্প ভঞ্জন করিলেন, পরে তাহাকে দর্শন দিয়া নানা উপদেশ, আশীর্ব্বাদ করিয়া, বিপদে ও যুদ্ধকালে সাহায্য করিবেন বলিয়া বর দান করিয়া গেলেন।

ভক্ত—এইরূপই বাবা, নিবৃত্ত ভক্ত সাধারণতঃ অপরাধ করিতেই পারে না, তাই ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনাদির অপরাধ বড় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সিদ্ধাইশক্তি হস্তগত থাকায় যোগীগণের কোন কোন সময়ে বলান্ধতা ও ত্রুটী আদি ঘটিয়া থাকে; তাইই ভীমসেনের ত্রুটী হওয়া। এমন নিবৃত্ত-পথী যোগী অপরাধের পথে ধাবিত হইলে, সত্যই দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি আদি তাহাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মদেবের ও হনুমানজির সহায়তা আশীর্ব্বাদ একটুও অস্বাভাবিক নয়।

বাবা, কল্পবৃক্ষ যেমন দেখিতে বৃক্ষের মত হইলেও বৃক্ষ নয়! কামধেনু যেমন গাভীর আকার স্বভাব হইলেও গাভী নয়! শালগ্রাম শীলা ও বান্-লিঙ্গাদি যেমন প্রস্তর হইয়াও প্রস্তর নয়! নিবৃত্ত সাধক ভক্তও তেমন মানব

হইয়াও মানব নয়। মানবের মত আকার প্রকার ক্ষুধা তৃষ্ণা, রাগ দ্বেষ স্বভাব যুক্ত হইলেও তাঁহাদের কল্পবৃক্ষত্ব, কামধেনুত্ব শক্তির মত অনেক অমানুষ সত্তাও থাকে। তাই মানুষের মত ধৈর্য্য, ক্ষমা ও দয়া আদিও দেখাইয়া আবার মাঝে মাঝে অমানুষ ভাবে বিপদ আদি হইতেও উদ্ধার পাইয়া থাকে। ঈশ্বর সাধকের জীবনের কোন কথাই, সাধারণ মানবের সঙ্গে তৌল করিয়া বুঝিতে যাইও না। পাণ্ডব জীবনে যে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার একটীও অসম্ভব বা অবাস্তব মনে করিতে নাই। অজগরের শাপ মোজন, যক্ষযুদ্ধ হনুমান দর্শনাদি সবই সত্য।

এই বন পর্ব্বে ধর্ম্মদেব মায়া করিয়া দুইবার ধর্ম্মরাজের জ্ঞানের পরীক্ষা করেন এবং বহু ঋষি পাণ্ডবদিগের বিষয়-আকাঙ্ক্ষা নাশের জন্য, বহু বহু পুরাণ কথা মহৎচরিত্র বর্ণন করেন, এই সমস্তই ঈশ্বর সাধক মানবের অতি মঙ্গলকর বিষয়ে পূর্ণ। এই স্থানেই বনপর্ব্বের আলোচনা শেষ করা যাউক।

শিষ্য—গুরুদেব! পাণ্ডবগণ ভোগরাজ্য বিষয় সম্পদ ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াও, এত প্রকার অশান্তির আক্রমণ প্রাপ্ত হইল কেন? ভগবানই বার বার আসিয়া তাহাদিগকে বিপদ মুক্ত করিলেন, বিপদ না ঘটিলেইত তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

গুরু—বাবা, পাণ্ডব যে এখনও নিবৃত্তি-পথী। এই পথ ছাড়াইয়া নিবৃত্তি রাজ্যে না পৌছিলে, জীব তাপের ও অসুর আলোড়ণের অতীত হয় না। পাণ্ডব যে এখনও ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল লইয়া রাজত্ব করিতে বাসনা করে, তাহাদের অত্যাচার সহিয়াও অসুরত্বকে রক্ষা করিতে যত্নবান। ত্রয়োদশবর্ষ পরে রাজত্ব গ্রহণ করিবে, তখনও বিরোধ করিলে অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে বাসনা রাখে। তাই বনপর্ব্বে অশান্তি উদ্বেগ কিছু সহিতে হইল। বাবা, প্রবৃত্তি রাজ্যের দিকে লৌহ অর্গল স্থাপন করিতে হইবে। ব্যাঘ্র হইতে পলায়নের মত বিষয়ী সঙ্গ হইতে পলায়ন করিতে

হইবে। ইহকাল পরকাল সকলের উপরে ভগবানকে ধরিয়া লইতে হইবে, তবে না পূর্ণ ভগবৎ ভক্তি লইয়া সর্ব্ব তাপের অতীত হইবে। বাবা, নিবৃত্তি রাজ্যে প্রবেশ না করিতেই নিবৃত্তপথীকেও ভগবানের কৃপা দ্বারা আবরণ করিয়া তাপ জ্বালা হইতে সদা রক্ষা করেন, তাহা দেখাইতেই বনপর্ব্বের লীলা প্রদর্শিত হইল। এই পর্ব্বে দেখিলেত, ধার্ত্তরাষ্ট্র অসুরকুল এমন বিপুল রাজ্যধন, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভ করিয়াও বৃথা ঈর্ষ্যাদির তাপে জ্বলিয়া, সেই জ্বালা নিবাইতে কত অতৃপ্তি ও দারুণ চেষ্টা লইয়া পাণ্ডবের বিপক্ষতা করিয়া মরিয়াছে। আর দেবতা-পাণ্ডব ধন সম্পদ হীন, বৃক্ষতলবাসী, ভীক্ষাজীবী ও ফলমূল আহারী হইয়াও মহা আনন্দে পূর্ণ তৃপ্তি লইয়া, ঋষিগণ সঙ্গে ভগবানের গুণ গাহিয়া গাহিয়া দিন কাটাইয়া দিয়াছে। বিপদরাশী কোন দিক দিয়া আসিয়া কোন দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা যেন তাহার সংবাদটুকুও পায় নাই।

বাবা! সংসারে দেখিতে পাও না কি! যে ছেলে দাসীর সঙ্গে খেলায় মাতিয়া মাকে ভুলিয়া থাকে, মাতাও তাহাকে নিশ্চিন্তে ভুলিয়া থাকেন। যে ছেলে অনেক খেলিয়াই আবার মা মা বলিয়া কান্দে, মাতা তাহার নিকটেই থাকেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া কান্নার কারণ নাশ করিয়া দিয়া যান। আর যে ছেলে কিছুতেই দাসীর সঙ্গে না থাকিতে চাহিয়া, ঘোরতর রোদন আরম্ভ করে, মাতা তাহাকে কোলে তুলিয়া ঘরে লইয়া যান। অসুর ছেলে ভগবানের দাসী মায়াদেবীর অসুরত্ব খেলায় ভুলিয়া থাকে, ভগবানও তাহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে, তাহারা খেলিতে আছাড় পরিয়া নিজেরাই উঠিয়া আবার খেলাইবে। নিবৃত্তিপথী ক্ষণে খেলে ও ক্ষণে কান্দে বলিয়া প্রায়ই তিনি আসিয়া কান্না থামাইয়া যান। আর পূর্ণ নিবৃত্ত-ভক্ত তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই চায় না বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে নিজ রাজ্যে লইয়া যান। এই মহাভারতে এই তিন অবস্থাই জীবন্ত লীলার মধ্যে দর্শন করিবে।

শিষ্য—গুরুদেব! আমার আরও একটী জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে! দ্রৌপদীদেবী নিজের উচ্ছিষ্টই ভগবানের মুখে তুলিয়া দিলেন, আর ভগবান্‌ও সেই উচ্ছিষ্টই সেবন করিয়া আনন্দে এত তৃপ্ত হইলেন যে, সমস্ত বিশ্ব তৃপ্ত হইয়া গেল। সেই খাদ্যের শত মুখে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এমন খাদ্য আর খান নাই। ইহার মধ্যে কি রহস্য আছে প্রভো!

গুরু—বাবা! ভগবান্‌কেও নিশঙ্ক চিত্তে উচ্ছিষ্ট তুলিয়া দিতে পারা গুণাতীত ভক্তের অবস্থা; তাহা গুণ রাজ্যের জ্ঞান বিচারের দ্বারা বুঝিবার শক্তিই নাই। শ্রীরাম অবতারে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অস্পৃশ্য চণ্ডাল শবরকন্যা শবরীর উচ্ছিষ্ট এমনই আদর করিয়া ভোজন করিয়া, এমনই প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারেও তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট দিয়া সেবাকারী ব্রজগোপ ও গোপীগণই তাঁহার প্রাণসম প্রিয় হইয়াছিলেন। এই উচ্ছিষ্ট দান ভক্তির চরম অবস্থায়ই জীব লাভ করিতে সক্ষম হয়। জগতেও দেখিতে পাও, স্বজাতির নিতান্ত মমত্ব অর্থাৎ আপন জন বোধ না হইলে, কেহই কাউকে লইয়া এক পাত্রে ভোজন করে না, বা ভুক্তাবশেষ দিয়া ভোজন করায় না। তাই জগন্নাথ ভগবানের সহিত যাহার তেমন অবস্থা লাভ হইয়াছে, ভগবানকে স্বজাতি নিতান্ত আপনজন বোধ হইয়াছে, সেই ভগবান্‌কে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইতে পারে। তাই যে উচ্ছিষ্ট দিতে পারিয়াছে, তাঁর কি আর মানবত্ব আছে বাবা! সে জীবত্বের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায়ই জীবের "সর্ব্ব ধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অবস্থা লাভ হয়। তখনই দেহধর্ম্ম, মনধর্ম্ম, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জীব একমাত্র ভগবানের শরণে সামর্থ পায়। তখনই "অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।" ভগবান্ আপনি তখন তাহাকে সকল প্রকার পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া শুচি করিয়া দেন; অর্থাৎ সে জীবত্ব মুক্ত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যে ধাংসি

ভস্মসাৎ। তথা মদ্বিষয়াভক্তি রুদ্ধবৈ নাংসি কৃৎস্নশঃ॥ (ভাঃ ১ স্ক ১৪অঃ ১৮ শ্লোঃ) যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠকে ভস্ম করিয়া ধ্বংস করে, আমার বিষয়ে ভক্তিও তেমনি জীবের সকল কর্ম্মফলকে ভস্ম করিয়া ফেলে। এই কর্ম্মফল দগ্ধ হওয়াই ষষ্ঠিসহস্র শিষ্য সহিত দুর্ব্বাশা ঋষির ক্ষুধা শান্তি হওয়া। অন্য যেন অসুরত্বের ষষ্ঠিসহস্র ক্ষুধাতুর কর্ম্ম প্রবৃত্তি পাণ্ডবকে ভোজন করিতে আসিয়া, ভগবানের ইঙ্গিত মাত্রে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এখন এমন ভক্তের মহিমাই শ্রবণ করিবে। এই ভক্তকে যাঁহারা আশ্রয় দেয় তাঁহারাই বা কি ফল লাভ করেন, আর যাহারা ইহাদিগকে ত্যাগ করে তাহারাই বা কি লাভ করে, পর পর্ব্বে তাহাই শ্রবণ করিবে।

বিরাট পর্ব্ব

পরিচয়।

ধর্ম্ম সাধন হীন রাজ্য সংবাদ।

বিরাট রাজ্যের অবস্থা দ্বারা-ধর্ম্ম-সাধন হীন সাধারণ জীবের সংসার লীলার সর্ব্বদিকের চিত্র প্রদর্শন করিয়া, তথায় পাণ্ডবের প্রবেশ ও কীচকাদি বধ দ্বারা সেই রাজ্যের মার্জ্জনার বিষয় বর্ণনা করা হইবে। পরে ধার্ত্তরাষ্ট্রদের অবস্থা দ্বারা ধর্ম্ম সাধনে শক্তি লাভ করিয়া, অহঙ্কারে সেই সাধনযুক্ততা ত্যাগ করিলে জীবের কি অবস্থা হয় তাহাই প্রকাশ করা হইবে।

ধর্ম্মের সংসার লীলা

(পাণ্ডব রাজ্য।)

ধর্ম্মের আশ্রয়—জ্ঞানে আত্মজ্ঞান ও শক্তিতে সন্তোষ। তাই সুখ দুঃখ সর্ব্ব অবস্থাই প্রভু ভগবানের দান বলিয়া আনন্দে বহন করে। কিছুতেই শাস্ত্র ও সদাচার লঙ্ঘন করিয়া আত্মচেষ্টা গ্রহণ করে না। (পাণ্ডবের আশ্রয় বিদুর ও দ্রৌপদীদেবী।)

জীবের সংসার লীলা

(বিরাট রাজ্য।)

জীবের আশ্রয়—জ্ঞানে দেহাত্মজ্ঞান ও শক্তিতে কামনা। তাই সর্ব্বাবস্থাই বহু ইন্দ্রিয় তৃপ্তি খুজিতে যাইয়া, অতৃপ্ত সন্দিগ্ধ কামনার বসে, আত্মতৃপ্তি জন্য শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়াও আত্মচেষ্টা করে; ঈশ্বর নির্ভর ত্যাগী হয়। (বিরাটের আশ্রয় কীচক ও তার ভগ্নী সুদেষ্ণা।)

ধর্ম্মের কর্ম্মসহায়— জ্ঞানযোগী, রাজযোগী, ভক্তিযোগী ও কর্ম্মযোগীগণ। (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব ও ঋষিগণ।)

জীবের কর্ম্মসহায়— ক্রোধ, অহঙ্কার ঈর্ষ্যা, কুটীলতা, আদি কুপ্রবৃত্তিবর্গ। (বিরাট রাজার কর্ম্মচারিগণ অর্থাৎ কীচক,তার শত ভ্রাতা ও তার অনুচরগণ।)

এই আশ্রয় ও সাহায্যের বিপর্জ্জয়ে জীবের কর্ম্মক্ষেত্রেরও সর্ব্বদিক বিরূপ হইয়া উঠে। তাহাই বিরাট রাজ্যের কর্ম্মলীলার দুদ্দশা বর্ণনা।

ধর্ম্মের সংসার লীলা —গৃহ নাট্যশালার মত সুন্দর জীবের আচার ব্যবহার শান্তি ও আনন্দ ময়। নাট্যাভিনয়েব মত আনন্দকর সব লীলা অভিনীত হয়। রমণীগণ, সরল ও স্নেহ ভালবাসাময়ী, পূর্ণ মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, কন্যাত্ব ও ভগ্নীত্ব লইয়া ক্রিয়া দ্বারা পুরুষগণকে তৃপ্ত করিতেছে। পুরুষগণও পূর্ণ পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, স্বামীত্ব, প্রভুত্ব, দাসত্ব ও বন্ধুত্ব লইয়া জগতের সেবা করিয়া লীলা করিতেছে। তাহাদের স্নেহ প্রীতির অঙ্গ চেষ্টা নৃত্যের মত সুন্দর, স্নেহ প্রীতিভরা আলাপন সঙ্গীতের মত মধুর, তাহাদের লীলা কাব্য ও নাট্যাভিনয়ের মত সুন্দর। (যেমন পাণ্ডবের লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা।)

জীবের সংসার লীলা —হীনতা, বিশৃঙ্খলতা, অপবিত্রতা ও নিরানন্দময়। জীবের আচার ব্যবহারে ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মে। তাই জীবের প্রকৃত গীত অভিনয় বিস্মৃত। রমণীগণ কুটীলা, স্নেহ ভালবাসা হীনা, তাই পূর্ণ মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, কন্যাত্ব ও ভগ্নীত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট,কেবল আত্মতৃপ্তিরত। পুরুষগণও পূর্ণ পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, স্বামীত্ব, প্রভুত্ব, দাসত্ব ও বন্ধুত্ব হীন। তাই নিস্নেহ, কপটতা, দম্ভ, ইত্যাদি লইয়া হীন পশুর মত কেবল স্বতৃপ্তি লীলা করিতেছে। তাহাদের লীলা, অঙ্গ চেষ্টা, আলাপন সকলই বিরূপ, বিশ্রী ও বিরক্তিকর। (বিরাটপুরে সুদেষ্ণা কীচকাদির লীলা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে।)

ধর্ম্মের খেলা—ধর্ম্মপথী খেলার সঙ্গে ঈশ্বর আরাধনা, দান আদি যুক্ত করিয়া, ব্রত যজ্ঞাদি দ্বারা দশজন লইয়া উৎসব করে; স্বর্গ অপবর্গ সুখ কামনা করে।

খেলা—ব দশজন লইয়া পশু আদি প্রাণীর মত ছুটাছুটী আদি করিয়া বা তাস, পাশা আদি খেলিয়া, আনন্দ উৎসব করে। অর্থলাভ, উত্তম ভোজন, অসম্মান আদি পণ করিয়া দ্যুত-খেলে।

ধর্ম্মের সজ্জা ও অনুলেপন—ধার্ম্মিক ভগবৎ ভক্তের সাজে, দেব-প্রসাদি মালা অনুলেপন ধারণ করিয়া আনন্দিত

জীবের সজ্জা ও অনুলেপন—জীব ধনগর্ব্বাদি প্রকাশক ভাবে সজ্জিত হয়, দেবতাকে না দিয়া মালা, গন্ধাদি ধারণ করে।

ধর্ম্মের রন্ধনশালা—আধ্যাত্মিক শক্তিবর্দ্ধক পবিত্র সাত্ত্বিক দ্রব্য, দেবতার জন্য রন্ধন হয়; তাহারা প্রসাদ খাইয়া তৃপ্ত হয়।

জীবের রন্ধনশালা—পশুশক্তির বর্দ্ধক, অপবিত্র তামস-দ্রব্য স্বীয় জিহ্বার তৃপ্তির জন্য রন্ধন হয়। লোভে পরউচ্ছিষ্টও সেবন করে।

ধর্ম্মের যজ্ঞ শালা—সাধনাগ্নি জ্বালিবার প্রকৃত ইন্ধন পাইয়া, সর্ব্বদা প্রজ্জলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কখনও নির্ব্বাপিত হয় না।

জীবের যজ্ঞশালা—প্রকৃত ইন্ধন অভাবে, যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত প্রায় বা অধিক সময়ই নির্ব্বাপিত।

ধর্ম্মের মল্লক্রীড়া—পশু আদির অধিভূত দৈহিক শক্তির উপরেও, মানবত্বের সেই মানসিক

জীবের মল্লক্রীড়া—কেবল দৈহিক অধিভুত শক্তির জাগরণের চেষ্টা করে ও যেই পশু

আধ্যাত্ম-শক্তির জাগরণ করিয়া, তাহার প্রতিযোগিতা প্রদর্শন দ্বারা মল্লক্রীড়া করে। তাহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকা, ভোগ বিলাস ত্যাগ, বৈরাগ্য, দুঃখ সহন ইত্যাদি দ্বারা শক্তি প্রদর্শন করে।

ধর্ম্মের সাহিত্য—ধার্ম্মিক গল্প ও আলাপনের স্পৃহাকে ধর্ম্মালোচনা, আধ্যাত্মিক জাগরণ-কারী ধার্ম্মিকও ভক্তজীবন, ঈশ্বর মহিমা—জীবের প্রতি তাঁহার করুণার কথা শুনিয়া সার্থক করে।

ধর্ম্মের বিচার—দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য অধর্ম্মনাশ ও মহৎকে রক্ষা করিতে বিচার ভার গ্রহণ করে।

ধর্ম্মের অশ্বশালা—জীবের বিচরণশক্তির সাহায্যকারী অশ্বের ন্যায় কর্ম্মশক্তির রাজ্যে, ধার্ম্মিকের কুঅশ্ব অধিভুত শক্তিবর্গ ক্ষীণ হইয়া, আধ্যাত্মিক দেব-

আদির যে শক্তি শ্রেষ্ঠ তাহার সঙ্গে সেই শক্তির প্রতিযোগিতা করিয়া মল্লক্রীড়া করে। তাহারা অশ্বের মত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও দ্রুত গমনের প্রতিযোগিতা করে, হস্তীর ভার বহন, ব্যাঘ্রের জীব-মারণ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা দ্বারা শক্তি প্রদর্শন করে।

জীবের সাহিত্য—জীব দেহেন্দ্রিয় ভোগ বিলাস উত্তে-জক, আত্মচেষ্টা বর্দ্ধক—ঈশ্বর ও ধর্ম্ম-হীন, অর্থ ও বিষয় জ্ঞানদ জীবন শ্রবণ এবং পরের হিংসাতৃপ্তি, ক্রোধতৃপ্তি, কামতৃপ্তির কৌশল আলোচনায় গল্পস্পৃহা সার্থক করে।

জীবের বিচার—প্রভুতা প্রকাশ, অত্যাচারবৃত্তির পোষণ, নিজ ও আত্মীয়বর্গের স্বার্থ-রক্ষণ জন্য বিচার ভার গ্রহণ করে।

জীবের অশ্বশালা—জীবের অধিভুতশক্তি কুঅশ্বগুলি পুষ্ট, বলবান ও বংশে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে ও আধ্যাত্ম দৈবঅশ্ব সব মৃত-প্রায় হইয়া পরে। আর সেই

অশ্বগুলি পুষ্ট, বলবান হইয়া বংশে বর্দ্ধিত হয় ও জীবকে ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করায়; কথনও শ্রান্ত বা মুগ্ধাদি হয় না।

কুঅশ্বগুলিকে সৎপথে নিতেই সে শ্রান্ত হয়। পদাঘাতে, দন্তাঘাতে, গর্ত্তাদিতে ফেলিয়া কষ্ট দেওয়ার মত, তাহাকে কুস্থানে নিয়া দুঃখ দিয়া নিন্দা ইত্যাদির ভাজন করে।

ধর্ম্মের গোশালা— নানা সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য—ক্ষীর ছানা প্রসবকারিণী গাভীর মত,জীবের নানা মঙ্গলকর সুখ শান্তি প্রসব-কারিনীশক্তি—কামনাগুলি,ধার্ম্মিকের হস্তে পরিলে, সৎকামনাগুলি পুষ্টা, বর্দ্ধিতা ও দুগ্ধবতী হইয়া উঠে। তাহাদের সৎকর্ম্মফল দুগ্ধাদি সেবনে জীব জরা মরনের অতিত হইয়া, মঙ্গল ও অমানুষ সুখের অধিকারী হয়

জীবের গোশালা— সুকামনা আধ্যাত্মিক গাভীগুলি যত্নাভাবে ক্ষীণা, দুগ্ধহীনা, বৎসহীনা। আর কুকামনাগুলি পুষ্টা এবং বংশে বর্দ্ধিতা হইয়া উঠে। দুগ্ধহীনা বন্ধ্যা গাভী সেবায় বৃথা সময় যাওয়ার মত, অফলপ্রসু, কুফলপ্রসু কমনার সেবা করিয়া জীব বৃথা শ্রান্ত হয়। আর কুগাভীর তাড়ণা, শৃঙ্গাঘাত ইত্যাদির ন্যায় কুকামনার তাড়নায় কুকার্য্যাদি করিয়া নানা দুঃখ ও কলঙ্ক লাভ করে।

এই বিরাট রাজার মত যে জীবের ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা থাকে, ধর্ম্মকাজই প্রকৃত মানবত্ব বলিয়া যাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, ধর্ম্মরাজের রাজ্যের মত আমার রাজ্যও হউক বলিয়া যাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে, এবং ব্রত পরায়ণ ধর্ম্মানুরতগণকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া, সুহৃদ বলিয়া গ্রহণ করতঃ তাহাদের হস্তে ক্রীড়া, গল্প (সাহিত্য) পাঁক, মল্লতা, যজ্ঞাগ্নি রক্ষা, বেশভুষা, নৃত্য গীত, অশ্বপালন, গোপালন, ইত্যাদি কর্ম্মভার ছাড়িয়া দিতে পারে; তাহারই জীবরাজ্য সর্ব্বদিকে মার্জ্জিত হইয়া, আবার পবিত্র সুখশান্তির আধার ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠে! তখন জীব সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ করিয়া

ভগবানকে পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। (পাণ্ডবগণ বিরাটরাজ্যে আশ্রয় লইয়া, তাহার জীবত্বের মূল কীচকাদিকে ধ্বংস করিয়া, তাহার রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্য করিয়া দিলেন। শেষ উত্তরার বিবাহে শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত আনিয়া দর্শন করাইলেন)।

দুর্য্যোধন বলদর্পে ক্ষুদ্ররাজা বিরাটের গো হরণ করিতে যাইয়া, একজনের নিকট মুহূর্ত্তমধ্যে সবলে পরাজিত হইয়া আসিল। তাহার অজেয় শক্তি ভীষ্ম দ্রোণাদিও অভিভূত ও পরাজিত হইয়া, তাহার ধর্ম্মসাধন অজ্ঞাতবাস দেওয়ার ফল প্রদর্শন করিল।

বিরাট পর্ব্ব।

ধর্ম্মহীন রাজ্য সংবাদ।

অগত্যেক গতিং নত্বাং হীনার্থাধিক সাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য কৃপালেশ বদান্যতা ॥

গুরু—বৎস! এই পর্ব্ব টী মহাভারতের একটী ক্ষুদ্র অংশ হইলেও, ইহার নামটী অতি বৃহৎ "বিরাটপর্ব্ব" নাম রাখা হইয়াছে; এই নামের মধ্যেও বেশ বিশেষত্ব আছে। এই পর্ব্ব টী হিন্দুদের বড়ই আদরের ও সম্মানের সামগ্রী! পিতৃ শ্রাদ্ধাদি প্রত্যেক পিতৃ ও দেব কার্য্যেই হিন্দু এই "বিরাট" পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার পাঠেই নাকি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র

পাঠের ফল লাভ হয় ও সেই পূজাদি কর্ম্মের সর্ব্বদোষ ও বিঘ্ননাশ হইয়া, ফলের পূর্ণতা দানের অধিকারী করে। সত্যই এই বিরাটপর্ব্ব এমনই বিরাট জ্ঞানময় বিষয় বটে! সর্ব্বপুরাণময় বিরাট-মহাভারত গ্রন্থের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এই বিরাট পর্ব্বের মধ্যে অতিসংক্ষেপতঃ, অথচ সরলভাবে, সুন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে। তাই বুঝি এই পর্ব্বের বিরাটপর্ব্ব নাম রাখা হইয়াছে এবং তাই বুঝি আর্য্য ঋষিগণ এই পর্ব্বকে এত উচ্চ সম্মান দান করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতে যেমন শত ভ্রাতা দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে আয়ত্ত করতঃ, ধর্ম্মস্বরূপ পাণ্ডবদের অধিকার হরণ করিয়া, অধর্ম্মপথে ধার্ম্মিকপীড়া অত্যাচার আদি আত্মচেষ্টা দ্বারা, সন্তোষ লাভ করিয়া ক্রিয়া করিতে ধাবিত হইয়াছে। এই অধ্যায়েও দেখিবে, শত ভ্রাতা কীচক বিরাটকে আয়ত্ত করতঃ, রাজ্য হইতে ধর্ম্মকে তাড়াইয়া পূর্ণ অধর্ম্মের রাজত্বই স্থাপন করিয়াছে। তাহারাও ধার্ম্মিক পীড়ণাদি দ্বারা সুখের অন্বেষণে, শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করিয়া, আত্মচেষ্টাই গ্রহণ করতঃ লীলা করিয়াছে! মহাভারতেও যেমন ভীমসেনের হস্তে শতভ্রাতা দুর্য্যোধনের দলের নিধনের পরে, শ্রীকৃষ্ণ-আদর্শ সুখশান্তির ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল। এখানেও দেখিবে, সেই ভীমসেনের হস্তে শতভ্রাতা কীচকের ধ্বংস হইলে, বিরাট রাজ্যও শ্রীকৃষ্ণভক্ত সুখ, শোভার ধর্ম্মরাজ্য হইয়া পরিবে।

এই বিরাটপর্ব্বে সাধারণতঃ—ধর্ম্মসাধন বর্জ্জিত জীবের বিষয় সংসারের সমস্ত দিকের অবস্থা কেমন হইয়া পরে, তাহার প্রত্যেকদিকের সত্যস্বরূপ এই অধ্যায়ে অতি সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে। অসুরের সংসার লীলার এমন জীবন্ত বর্ণনা, আজ পর্য্যন্ত আর কোন গ্রন্থেই বোধ হয় কেহ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। ইহার পরে এমন অবিদ্যাগ্রস্থ দারুণ বিষয় সংসারকে কি করিয়া, জীব আবার দেবরাজ্য করিয়া

তুলিতে পারে, জীবের সেই মহৎগুণটী কি, তাহাও অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ধর্ম্মদেব কৃপা করিয়া কেমনে, সেই অজ্ঞান অধারের দেশকে সবদিকে মার্জ্জনা করিয়া, জীবের অজ্ঞাত ভাবে, তাহার অতি ভালবাসার বন্ধু অসুরত্বের মোহালিঙ্গন হইতে জীবকে তুলিয়া আনেন, তাহাও অতি সুন্দর সরল করিয়া প্রদর্শন হইয়াছে। ধর্ম্মের কোনশক্তি বা সাধনা জীবের কোন দিক মার্জ্জনা করিয়া দেন, সেই তত্বও দেখিবে। ইহার পর মার্জ্জিত রাজ্যের সর্ব্বদিক ও জীব রাজ্যের সর্ব্বদিক পাশাপাশি প্রদর্শনে, তাহা বড়ই শিক্ষনীয় বিষয় হইয়াছে। এইরূপে বিরাট রাজ্যদ্বারা অবিদ্যাগ্রস্থ বিষয়ী জীবের সকল স্বরূপ দেখাইয়া, তাহাকে নাশ করতঃ আবার ধর্ম্মরাজ্য করণ ও তাহার সুখ সৌভাগ্য পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে।

পরে এই পর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রদের ভীষ্ম দ্রোণাদি সহিত এক রথীর নিকট পরাজয় দ্বারা, ধর্ম্মসাধনে দুর্জ্জয় শক্তি আদি লাভ করিয়া সাধন ছাড়িয়া দিলে কি ফল লাভ হয়, তাহাও প্রদর্শন করিয়া বিরাটপর্ব্ব শেষ করা হইয়াছে।

লীলা—পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞাত দ্বাদশবর্ষ বনবাস শেষ হইয়া, অজ্ঞাত বাসের সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বিনীত ভাবে ঋষিগণের নিকট অজ্ঞাত বাসের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তাপস ও ঋষিগণ এতদিন পাণ্ডব-সঙ্গে সর্ব্বদা ধর্ম্মসাধন ও সৎপ্রসঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার গুণে সুখে নিশ্চিন্তে দিন কাটাইয়া, সকলেই পাণ্ডবের প্রতি অতি মমতাতুর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই পাণ্ডবের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়া, সর্ব্বত্যাগী, নিঃসঙ্গ ঋষিগণও আজ দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না। এমন সংসার বিরক্ত, সর্ব্বভুতে নির্ব্বৈর, দেব চরিত্র পাণ্ডবের প্রতি অযথা শত্রুতাকারী ধার্ত্তরাষ্ট্রদের প্রতি, আজ আবার তাঁহাদের ক্রোধের উদয় হইয়া উঠিল। রূপেগুণে অমানুষ পাণ্ডবদের এই অসুরের রাজ্যে লুকাইয়া

থাকিতে যে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে, তাহা ভাবিয়াও তাঁহারা বড়ই দুঃখিত হইয়া পরিলেন! তাই ঋষিগণ বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, কি ভাবে যে দ্বাদশবর্ষ কাটিয়া গিয়াছে তাহার সংবাদও পাই নাই! এই কালে তোমাদের সেবাদিতে আমরা বড়ই আনন্দে ধর্ম্ম সাধন করতঃ পরম উপকৃত হইয়াছি! এখন বল দেখি, তোমাদের এই অজ্ঞাত বাসকালে আমরা তোমাদের কি সহায়তা করিতে পারি? তোমাদের মত স্বভাবের লোক অজ্ঞাত বাস করিতে ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বল যদি আমরা আমাদের তপশক্তিতে, তোমাদিগকে আমাদের মধ্যেই লোক-চক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিয়া দেই। অথবা এই বনকে অপরের অগম্য করিয়া রাখি। অথবা বল যদি, তোমাদের প্রতি অযথা দ্বেষ ও অত্যাচারকারী পাপাত্মাদিগকে অভিশাপ দ্বারা নষ্ট করিয়া দেই। এমন ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদ্বেষীর নাশ হওয়াই উচিত!" ধর্ম্মরাজ নানা মধুর বাক্যে তাঁহাদের অপার পাণ্ডবস্নেহের প্রশংসাদি করিয়া, তাঁহাদের দুঃখ ও ক্রোধের লাঘব করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদের শক্তিতেই, আমরা নির্ব্বিঘ্নে অজ্ঞাতবাস প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। এই সামান্য কার্য্যের জন্য আপনাদের তপশক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন কি! আপনাদের আশীর্ব্বাদই যে জীবকে মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। আপনারা প্রশান্ত চিত্তে, মাত্র এক বৎসরের জন্য আমাদিগকে বিদায় দান করুন। এক বৎসর পরে আবার আসিয়া, আপনাদের চরণ সেবা গ্রহণ করিব। আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম্প্রতি ত আমাদের প্রতি কোন প্রকার বৈরতাই করিতেছেন না। আর করিলেই কি, তাহারা আপনাদের ক্রোধের উপযুক্তই নয়।" ইহা শুনিয়া সেই মায়ামুক্ত ঋষিগণও পাণ্ডবের মহত্বে কান্দিতে কান্দিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এমন যে শত্রুরও মঙ্গল চিন্তা করে, নিবৃত্ত ভগবৎভক্ত, স্বয়ং ভগবানই যে তাঁহাদের সর্ব্বভার গ্রহণ করেন।

তাঁহাদের আবার দুঃখ বিপদ কোথায়? আর জগতে কেই বা তাঁহাদের অমঙ্গল করিতে সক্ষম হয়! তোমাদের প্রতি অত্যাচারীকে ভগবানই নষ্ট করিবেন! আমরা করিতে পারিলে আমাদের তপশক্তির সার্থকতা হইত, আমরাও ভগবৎ ভক্ত সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতাম।" ইহার পরে রাত্রিতে পাণ্ডবগণ রথারোহণে হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। ঋষিগণও ধার্ত্তরাষ্ট্র নিন্দা করিতে করিতে অন্য তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবগণ কত দূরে যাইয়া দ্রৌপদী দেবীকেও দ্রৌপদরাজ্যে যাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই এই অবস্থায় পাণ্ডবগণকে ত্যাগে স্বীকৃতা হইলেন না। তখন সারথিগণকে রথ সহিত দ্রৌপদ রাজ্যে পাঠাইয়া, তাঁহারা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। অজ্ঞাত বাসের জন্য বিরাট রাজ্যকেই ধর্ম্মরাজ নির্দ্দেশ করিলে, সকলে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবদের দুর্লভ অস্ত্র সস্ত্র সমূহ না লুকাইলে, এই সব দেখিয়াইত সকলে তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে! তাই সেই গুলিকে একত্র করিয়া দৃঢ় বস্ত্র দ্বারা মৃত দেহের মত করিয়া বান্ধিলেন ও রাজ্যপ্রান্তে বনমধ্যস্থ একটি বৃহৎ সমীবৃক্ষের উচ্চ ডালে তাহাকে বন্ধন করিলেন। তাহার নিকটে মৃতপশুর মাংসও কতক বান্দিয়া রাখিয়া, বৃক্ষ গাত্রে লৌহ-শলাকা দ্বারা লিখিয়া দিলেন, এই বৃক্ষে আমাদের মায়ের মৃত দেহ বন্ধন করিয়া রাখিয়া গেলাম, কেহ স্পর্শ করিয়া অপবিত্র করিবেন না। আমরা তীর্থ যাত্রী, তাই সহযাত্রি মায়ের পথে মৃত্যু হওয়ায়, বন্ধন করিয়া রাখিয়া গেলাম। তীর্থ যাত্রা শেষ করিয়া আসিয়া তাঁহার অন্তেষ্টি করিব।" নিকটবর্ত্তী অধিবাসীগণকেও এই কথা বলিয়া গেলেন। সেই কালে সাধারণতঃই কেহ মিথ্যা কথা বলিত না, তাহাতে পাণ্ডবদের তেজঃপুঞ্জ অঙ্গ দেখিয়া কেহই তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তাতে সমীবৃক্ষ ফলবান বৃক্ষ নয়, তাহার কাষ্ঠও যজ্ঞ বই অন্য কাজে হিন্দু ব্যবহার করে না, তাতে

এই বৃক্ষে অপদেবতা বাস করে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তাই পাণ্ডবের অস্ত্র নিরাপদেই রহিয়াছিল।

ইহার পরে কে কিরূপে আত্ম গোপন করিবে নির্ণয় জন্য, ভ্রাতাগণ ধর্ম্ম-রাজকে বলিলেন, "দাদা! আমরা জীবিত থাকিতে, আপনি পরের দাসত্ব ও পরসেবা গ্রহণ করিয়াছেন, কিছুতেই দেখিতে পারিব না! তাহাতে অজ্ঞাতবাস প্রতিজ্ঞা রক্ষা হউক, আর নাই হউক।" ধর্ম্মরাজ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভাই! আমি কখনও পর দাসত্ব লইব না! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ পরিচয়ে বিরাটের সভাসদ হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিব। বনে ঋষিরা আমাকে অজয় অক্ষয় ক্রীড়া শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাহা দ্বারা নিশ্চয় রাজাকে তুষ্ট করিয়া, সেই পণজিত অর্থ দ্বারা নিজের তাপস জীবন যাপন করিয়া দিব। সর্ব্বদা পুরাণ প্রসঙ্গাদি শুনাইয়া, রাজাকে আনন্দ ও দিতে পারিব। রাজসূয় যজ্ঞে বিরাটরাজের আমার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা দেখিয়া ছিলাম, আমি ধর্ম্মরাজের সভাসদ ও পাশা ক্রীড়ক ছিলাম বলিয়া পরিচয় দিলে, সে নিশ্চয় আমাকে আশ্রয় দিবে। আমি ব্রতপরায়ণ ও অপ্রতি-গ্রাহী হইয়া দিন কাটাইতে পারিব। কিন্তু ভাই, তোমরা কিরূপে আত্ম-গোপন করিবে? তাহাতে ভীমসেন তার বিরাট দেহ ও অসম্ভব বীর্য্যকে সে কি করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে!" ভীম বলিলেন, "আমার জন্য বড় চিন্তা নাই দাদা! সাধারণ রাজাদের আনন্দের কারণ প্রধান দুইটী কর্ম্মই আমি বেশ জানি! একটী ভোজন জন্য উৎকৃষ্ট পাক, দ্বিতীয় মল্লযুদ্ধ। আমি ভীমসেনের পার্শ্চর ও সুপকার ছিলাম বলিয়া পরিচয় দিব। পাণ্ডবরা বনে যাওয়ায় ধার্ম্মিক রাজ্য খুজিতে খুজিতে, বড় নাম শুনিয়া এই রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া, রাজার একটু স্তুতিও করিব, তবেই আমার আশ্রয় জুটীয়া যাইবে। পাক্‌ শালায় থাকিব বলিয়া আমায় সাধারণে বড় দেখিবে না এবং আমি সর্ব্বদা আপনার ইঙ্গিত

বুঝিয়াই চলিতে সুবিধা পাইব।” ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে বলিলেন, “ভারতের অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুন, তুমি কি করিয়া আত্ম-গোপন করিবে ভাই ?” অর্জ্জুন বলিলেন, “আমার জন্য চিন্তা নাই দাদা! ভগবান্ আমার সেই উপায় করিয়া দিয়াছেন। আমি স্বর্গপুরে বাস কালে অপূর্ব্ব নৃত্য গীত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি! আবার সেই কালে, স্বর্গ অপ্সরা উর্ব্বসী দেবী আমায় এক বৎসরের জন্য নপুংষক হইতে অভিশাপ দান করিয়াছেন। আমি সেই অভিশাপ গ্রহণ করতঃ নপুংষকত্ব লইয়া, নর্ত্তকী বেশে রাজসভায় প্রবেশ করিব। এবং দ্রৌপদী দেবীর সঙ্গীত শিক্ষক ছিলাম বলিয়া পরিচয় দিয়া, বিরাটের কন্যাদির সঙ্গীত শিক্ষক হইব। আমার বীণা কি সঙ্গীত একবার শুনিলেই, বিরাট রাজা আমায় আশ্রয় না দিয়া পারিবেন না!” আমি অন্তঃপুরে থাকিব বলিয়া আমার সংবাদ কেহই পাইবে না।” ধর্ম্মরাজ সজল নয়নে কনিষ্ট ভ্রাতা দ্বয়ের হস্তধারণ করিলে, নকুল বলিলেন—“আমারও লুকাইবার উপায় আছে! আমি উত্তম অশ্ববিদ্যা জানি। অশ্বপরিচয়, তাহাদের শাসন, শিক্ষাদান ও রোগের ঔষধ আমার বেশ জানা আছে! আমি ধর্ম্মরাজের অশ্বরক্ষক ছিলাম পরিচয় দিব! পাণ্ডবদের মত প্রভু আর পাইতেছি না বলিয়া ঘুরিতেছি বলিয়া, রাজার আশ্রয় প্রার্থনা করিব!” সহদেব বলিলেন—“আমি গোপালন বিদ্যাজানি! গোশালায় গোগণের পরিচর্য্যা, দুগ্ধবর্দ্ধন করা সমস্তই আমার বেশ জানা আছে! আবার জ্যোতিষও জানি! আমি পাণ্ডবদের জ্যোতিষ ও গোরক্ষক ছিলাম বলিয়া পরিচয় দিয়া, রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিব।” এই বার ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর কথা ভাবিয়া অতি দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “আমাদের সর্ব্বধর্ম্ম ও সম্মানের আশ্রয়, দ্রৌপদ ও কৌরব কুলের গৌরবের-ধ্বজা, আজ কি করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা হইবে

দ্রৌপদী ?” দ্রৌপদীদেবী কান্দিয়া বলিলেন, “মহারাজ ! অধর্ম্মের কপট পাশার পণরক্ষার জন্যও, যখন আপনি শুধু ধর্ম্মেরদিকে চাহিয়া অতুল রাজ্যলক্ষীকে পরিত্যাগ করতঃ বনবাসের দারিদ্রতাকে বরণ করিলেন, সেই দিন হইতেই দুঃখভোগের ধৈর্য্য দর্শন করিতে ও শিক্ষা করিতে আপনাদের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছি। দ্রৌপদী আজ সেই শিক্ষার পরীক্ষা দান করিবে। মহারাজ ! রমণী রাজরাণী হইলেও, তাহারা চিরদিনই সংসারের সেবিকা দাসী মাত্র। আমার দাসীকার্য্যে একটুকও দুঃখ বা অপমাননা বোধ নাই। আপনাদের কোন প্রকার কষ্ট লাঘবের জন্য, আমি বিরাট রাণীর দাসীত্ব করিতেও দুঃখিত নই ! কিন্তু দ্রৌপদ ও কৌরব কুলের সম্মানের কথা যখন তুলিলেন, আমিও তাহা রক্ষা করিয়া চলিব। আপনাদের চরণ সেবার হস্ত অন্যের চরণে লাগাইব না, অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনও করিব না। ব্রতধারিণী ব্রাহ্মণের কন্যা পরিচয়ে, অন্তঃপুরে রাজরাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিব। পূর্ব্বে পাণ্ডবপুরে দ্রৌপদীর সখীছিলাম বলিয়া পরিচয় দিব। সত্যভামা দেবীর নিকট, আমি অপূর্ব্ব কেশ রচনা, অনুলেপন ও পুষ্পমালা গ্রন্থন শিক্ষা করিয়াছি, তাহাদ্বারা রাণীর মনোরঞ্জন করিব। আরও বলিব, দেববীর্য্য পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী আছেন। তাঁহারা সম্প্রতি দেব কোপে এক বৎসরের জন্য একটু দুর্ভাগ্য গ্রস্ত হইয়া, কোনও ব্রতগ্রহণ করিয়া আছেন ; আমিও তাই ব্রত পরায়ণা। আমাকে আশ্রয় দিলে গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা এই রাজ্যের অশেষ মঙ্গল করিবেন। মহারাণীর নিকট এক বৎসরের জন্য নির্জ্জনে বসিয়া ব্রত যাপনের আশ্রয় প্রার্থনা করিব। বলিব আমার ব্রতের জন্য, পুরুষের নিকট যাইব না, পরের পদ স্পর্শ করিব না, পর উচ্ছিষ্ট সেবন করিব না ও পর শয্যায় শয়ন করিব না। রাণী নিশ্চয় আমায় আশ্রয় দিবেন !” এইরূপে কোন প্রকার হীনতা ও অধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াও

আত্মগোপনের উপায় নির্ণয় করিয়া, পাণ্ডবগণ আনন্দে অজ্ঞাতবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তাঁহাদের পুন্যবলে, ভগবানের কৃপায়, ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে এবং পাণ্ডবদের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, বিরাট সভার সকলেই মোহিত হইল। আর সত্যই বিরাট রাজা ধর্ম্মরাজকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন! তাই ধর্ম্মরাজের সভাসদ ছিল ইত্যাদি শুনিয়া, বিরাট অতি আনন্দে পাণ্ডবগণকে ইচ্ছামত কাজগ্রহণ করিয়া, বা কর্ম্ম না করিয়াও শুধু বন্ধুভাবে তথায় বাস করিতে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিলেন। সম্মানে ভোগ-স্বাধীনতা লইয়া বন্ধুভাবে বাসজন্যও অনুরোধ করিলেও, পাণ্ডব কেন অপরের দান গ্রহণ করিবেন! তাঁহারা প্রত্যেকে পূর্ব্ব প্রস্তাব মত কর্ম্মগ্রহণ করতঃ, বিরাটরাজ্যের সেবা করিয়া তথায় বাস কবিতে লাগিলেন। সেইকালে ধর্ম্মসাধনের বড়ই সম্মান ছিল। কেহ ধর্ম্মসাধনের নাম করিলেই, সকলে যথাসাধ্য তাঁহার সহায়তা করিত! তাই দ্রৌপদীদেবী ধর্ম্মসাধনা জন্য অন্তঃপুরে আশ্রয় চাহিলে, রাণী প্রথমে সন্দেহ করিয়াও তাঁহার তেজে সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে আদরে সহচরী বলিয়া গ্রহণ করিলেন ও ব্রতাচরণের সুযোগ করিয়া দিলেন। পাণ্ডবগণ এইরূপে ছদ্মবেশে ছদ্ম নামে বিরাট রাজার রাজপুরে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন ও চরিত্রে ও গুণে সকলের প্রিয় পাত্র হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ভক্ত—বাবা! পাণ্ডবের ধর্ম্মজ্ঞান ও ত্যাগধর্ম্মের স্বরূপ দেখিলে কি? ঋষিগণ অজ্ঞাত-বাস কথার অর্থ, মাত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাত ধরিতে চাহিয়াছিলেন; ধার্ত্তরাষ্ট্রদের এই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল বটে! কিন্তু পাণ্ডব অজ্ঞাত বাসের সরল অর্থ ধরিয়া, জগতের সকলের অজ্ঞাত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তাই ঋষিগণের জ্ঞাত হইয়া, তপশক্তিতে অন্যের অজ্ঞাত হইয়া থাকিতেও তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন না। যদুরাজ্য

বা দ্রৌপদাদি মিত্র রাজ্য তাঁহাদের সাহায্যে লুকাইতেও চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা শত্রুমিত্র সকলের নিকটই যথার্থরূপে অজ্ঞাত হইয়া লুকাইয়াছিলেন। পাণ্ডব একদিন গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে মহাশত্রু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ হইতেও রক্ষা করিয়াছিলেন, আবার বনে ঋষিদের ক্রোধ হইতেও তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন দেখিলেত? এত মহত্ব গুণেই যুধিষ্টির ধর্ম্মরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাই মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর তুল্য আদর্শ-জীবন আর নাই।

এরপরে অজ্ঞাত বাস কালের কর্ম্মনির্ব্বাচন মধ্যেও পাণ্ডবের স্বধর্ম্ম রক্ষণ মহত্ব প্রদর্শন দেখিবে। পাণ্ডব যেমন গৌরব আনন্দে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিল, তেমনি গৌরবে আনন্দে বনবাস ভোগ করিয়াছে, আবার তেমনি আনন্দে অন্য দাসত্বও ভোগ করিতে ব্রতী হইলেন! যাহাদিগকে জগতের সমস্ত রাজগণ বন্দনা করিয়া মনোরঞ্জন করিত। তাঁহারা আজ সামান্য রাজা বিরাটের মনোরঞ্জন জন্য পাশাখেলা, মল্লক্রীড়া, পাঁচকক্রিয়া ও নৃত্যগীতাদি দেখাইয়া আনন্দে মনোরঞ্জন আরম্ভ করিল। ইহাদের নামই পূর্ণ মানব! ইহারাই পূর্ণজ্ঞানী। পাণ্ডব এত মহৎ বলিয়াই গৃহী হইয়াও তাঁহারা ঋষিদেরও পূজ্য হইয়াছিলেন। এখন পাণ্ডবগণ কেন অন্য সমস্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া, কেবল বিরাটরাজ্যই আশ্রয় করিলেন ও একে একে রাজ সভায় প্রবেশ করিয়া, এক এক রূপ কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, সেই সব লীলার আধ্যাত্মিক রহস্য শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ কেন ব্রতধারী তাপস হইয়া, পুরাণ-কথক ও পাশা-ক্রীড়ক হইলেন। ভীম কেন সূপকার, মল্ল ও ইন্ধনরক্ষক হইলেন। অর্জ্জুন কেন নপুংষকের মত নৃত্যগীত শিক্ষক হইলেন। নকুল অশ্বরক্ষক, সহদেব গোরক্ষক, দ্রৌপদীদেবী ব্রত পরায়ণা সৈরিন্ধ্রী হইয়া রাণীর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সকলের মধ্যে ও অতি মধুর রহস্য আছে বাবা! প্রথমে ধর্ম্মরাজের প্রবেশ, দ্বিতীয়ে

ভীমসেন, এর পরের দিন দ্রৌপদী, তার পর ক্রমে অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ মধ্যেও মধুর রহস্য আছে!

বিরাটগৃহে বাস তত্ত্ব—অবিদ্যার সংসারী, কামক্রোধ-দাস বিষয়ীজীব কিরূপে ধর্ম্মদেবের কৃপাভাজন হয়। ধর্ম্মদেব কাহাকে কৃপা করিয়া, তাহার নরকতুল্য বিষয় রাজ্যকে মার্জ্জনা করিয়া দেবরাজ্য করিয়া দিবার জন্য, নিজের ছয় শক্তিকে গোপনে প্রেরণ করিয়া দেন, তাহাই এই বিরাট রাজ্যের প্রবেশ রহস্য বাবা! বিরাটরাজ্য রাজ শালক কীচকের শিক্ষা ও শাসনে কি জঘন্য রাজ্য হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ পরিচয় পরে দর্শন করিবে! এখন এই রাজ্যেও কিরূপে ধর্ম্মরাজ অজ্ঞাত বাসজন্য প্রবেশ করিলেন, সেই টুকু বড়ই প্রয়োজনীয় ও জানিবার বিষয় বাবা! ধর্ম্মরাজ নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন, "রাজসূয় যজ্ঞকালে আমি দেখিয়াছি, আমার প্রতি এই রাজার বড়ই শ্রদ্ধা! তাই ইহার পুরেই আমরা প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতবাস কর্ত্তন করিব।" শ্রদ্ধার প্রমাণও দেখা গেল। ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ ধর্ম্মরাজের কর্ম্মচারী ছিল বলা মাত্রই, রাজা সন্দেহমাত্র না করতঃ, আর কাহারও সঙ্গে পরামর্শমাত্র না করিয়া, তাহাদিগকে অতি আদরে সুহৃদ বলিয়া গ্রহণ করিল এবং সসম্মানে স্বাধীন ভাবে সুখে বাস করিবার অধিকার দিয়া, প্রার্থিত কর্ম্মভার সকলও দান করিয়া দিল; এইটীই পূর্ণশ্রদ্ধার লক্ষণ। বাবা, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি এমন শ্রদ্ধা না জন্মিলে, কোন বিষয়ী জীবই ধর্ম্মলাভে সক্ষম হয় না। ব্রত পরায়ণ ধর্ম্মপথিগণকে ধর্ম্মরাজের প্রিয় কর্ম্মচারী মনে করিয়া, তাঁহাদের নিকট সেই রাজ্যের ক্রীড়া, গল্প, রন্ধন, আহার বিহার সর্ব্ব বিষয়ের শিক্ষা আরম্ভ করিলেই, জীবের অবিদ্যারাজ্য মার্জ্জিত হইয়া বিদ্যাময় ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠে। তাই ধর্ম্মপথে প্রথমেই, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপথীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই জন্যই শ্রদ্ধাকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়াছেন

"আদৌ শ্রদ্ধা।" গীতায় ও ভগবান বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়" তৎপর শ্রদ্ধা হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। আর 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' সংশয়ী বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রমণীর স্বামী-শ্রদ্ধার নিদর্শন যেমন, স্বামীর দেশের লোককেও সে ভালবাসিবে, আদর করিবে। ধর্ম্ম শ্রদ্ধার পরিচয়ও ধর্ম্মপথী শুনিলেই বা দেখিলেই অতি আনন্দে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণকরা দ্বারা বুঝিবে। তাই ভক্তিশাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ।" সাধকের প্রতি প্রীতি না হইলে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাই হয় নাই। অত্র শুধু এই শ্রদ্ধার গুণেই বিরাট রাজার এমন কীচক রাজ্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের-আগমন যোগ্য ধর্ম্মরাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমে প্রবেশ ও কর্ম্মভার গ্রহণ তত্ত্ব—ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে হইলেই প্রথমে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাই ধর্ম্মরাজের প্রথমে প্রবেশ। ইনি ধর্ম্মপথিগণের ক্রীড়া স্বরূপ ব্রত যজ্ঞাদি শিক্ষাদেন ও গল্প ও আলোচনার মধ্য দিয়া, জীব জীবনে ধর্ম্মের ও ভগবৎ কৃপার ফলের ইতিহাস আদি শ্রবণ করাইয়া, জীবের হৃদয়ে ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন। এইজন্যই ধর্ম্মরাজ পাশা ক্রীড়ন ও গল্প কথন কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই শরীর সাধনার প্রয়োজন, তাহাই যোগ ক্রীড়া লইয়া ভীমসেনের প্রবেশ। শরীর সাধন আহার ও ব্যয়াম—মল্লক্রীড়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই ভীমসেন রন্ধনশালা ও মল্লশালার ভার গ্রহণ করিলেন। সাধকদের আহার ও ব্যায়াম গ্রহণ করিলেই, অবিদ্যার কর্ম্মশক্তি কীচকের দল নষ্ট হইয়া যায় ও সাধন যজ্ঞশালার নির্ব্বাপিত প্রায় ভগবৎ-যোগাগ্নি আবার অবিচ্ছেদে জ্বলিতে থাকে। এইজন্যই ভীমসেন শত ভ্রাতা কীচক নাশ করেন ও যজ্ঞশালার অগ্নি রক্ষা করেন। অনেকে কতদিন সাধকের ক্রীড়া ব্রতাদি করতঃ, সাধকের গল্প পুরাণাদিও শুনিয়া, তাঁহাদের বৈষভোজন গ্রহণ ও যোগাভ্যাসাদি করিয়া, আবার

সকল ছাড়িয়া অবিদ্যাগ্রস্থ হইয়া পরেন। তাই এই দুই সত্তার উপরেও, এই সবকে রক্ষা করিবার জন্য তৃতীয় সত্তার প্রয়োজন। সেই শক্তিই তৃতীয়ে দ্রৌপদীদেবীর প্রবেশ। জীবের অন্তর যদি ধর্ম্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত না হয়, ধর্ম্ম সাধন ও ভোজনাদিতে অতৃপ্ত অসন্তুষ্ট থাকে, তবেই ধর্ম্ম সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয় না। তাই গীতায় বলিয়াছেন, "প্রসন্ন চিত্ততা না জন্মিলে জীবের বুদ্ধিই প্রতিষ্ঠিত হয় না, জীবের দুঃখেরও শেষ হয় না। যথা — প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানি রস্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতাসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে। (গীঃ ২য়—৬৫ শ্লোঃ)। সাধকে প্রীতি, দেব উচ্ছিষ্ঠ মালা ও অনুলেপন ধারণ এবং প্রসাদ নির্ম্মাল্য গ্রহণে আনন্দ জন্মিলেই, ধর্ম্মে সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই দ্রৌপদীদেবী এই সব কার্য্য গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে ছিলেন। এই তিন শক্তি দ্বারা রাজা মার্জ্জিত হইলে,আরও তিনটী সত্তা আসিয়া এক সত্তায় সংসার নাট্যশালার প্রকৃত নৃত্যগীত ও অভিনয় লীলা শিক্ষা দেন; একজন সুখে কর্ম্ম সম্পাদনের সাহায্যশক্তি আধ্যাত্মিক বল সংগ্রহ করিয়া দেন; আর একজন নানা প্রকার সুখস্বাদ বাহির করিবার উপায় সুকামনা সংগ্রহ করিয়া দেন। তাঁহারাই ভক্তি, বিশ্বদর্শীতা ও ভবিষ্যৎদর্শীতা শক্তিত্রয়—ইহারাই অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিলেন। স্নেহ প্রীতি ভালবাসাময়, নিরহঙ্কার ও নির্লিপ্ত লীলাই জীবের প্রকৃত মধুর লীলা প্রকাশ। আর এই স্বভাব শুধু ভগবৎ ভক্তেরই লাভ হয়। তাই অর্জ্জুন নপুংষক হইয়া নৃত্যগীত শিক্ষা ভার গ্রহণ করিলেন। কর্ম্মরাজ্যে সুখে বিচরণ শক্তিদাতা অশ্বের মত, আধ্যাত্মিক কর্ম্মশক্তিগণের জাগরণ করা বিশ্বদর্শীতা শক্তির কর্ম্ম, ইহাই নকুলের অশ্বশালার ভার গ্রহণ। আর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির নামই সুখ! এই আকাঙ্ক্ষাগুলিই জীবের ক্ষীর ছানা ননীআদি নানা সুখাদ্য প্রসবকারিণী গাভীর ন্যায়, নানা সুখ শান্তি ভোগকারক সত্তা। ভবিষ্যৎদর্শীতা-শক্তি

এই কামনা রাজ্যের মার্জ্জনা করিয়া, আধ্যাত্মিক অক্ষয়-সুখ প্রসবকারক কামনা সকলের জাগরণ করিয়া দেন, তাহাই সহদেবের গাভীশালার ভার গ্রহণ। এখন কীচক অধিকারে বিরাট রাজ্যের দশা ও তাহার মার্জ্জনার বিষয়, বিরাট রাজ্যের লীলার মধ্যে দর্শন কর। বৎস! এই পাণ্ডবগণ যেই প্রকারে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার পর্য্যায়ের অর্থাৎ পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ না হইয়া, ভীম প্রবেশ করিলে, কি অর্জ্জুন পূর্ব্বে প্রবেশ করিলেও ধর্ম্ম স্থাপন করিতে পারিবে না। আর পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী, এই ছয় সত্তার একটীর অভাব হইলেও ধর্ম্মরাজ্য গঠিত হইবে না। জ্ঞান, যোগ, সন্তোষ, ভক্তি, বিশ্বদর্শিতা ও ভবিষ্যৎদর্শিতা এই ছয় সত্তা, মানব দেহের দুই হস্ত, দুই পদ, মস্তক ও হৃদয় এই ছয় অঙ্গের মত ধর্ম্মদেবের ষড়অঙ্গ; তাই একটীর অভাবেই ধর্ম্মের পূর্ণতার হানী হয়। কর্ম্মের মূল প্রথম অহঙ্কারতত্ত্ব. ইহার মার্জ্জনা সন্তোষ দ্বারা হয়। দ্বিতীয়ে চিত্ত, তাহার মার্জ্জনা জ্ঞান দ্বারা হয়। তৃতীয়ে বুদ্ধি, তাহার মার্জ্জনা যোগ দ্বারা হয়। চতুর্থে মন, ইহার মার্জ্জনা ভক্তি দ্বারা হয়। পঞ্চমে কর্ম্মশক্তি দৈহিক বলাদি, তাহার মার্জ্জনা বিশ্বদর্শিতা দ্বারা হয়। ষষ্ঠে আকাঙ্ক্ষা বা কামনা, ইহার মার্জ্জনা ভবিষ্যৎদর্শিতা দ্বারা হয়। তাই ইহাদের একটীর অভাবে বা বিপর্য্যয় দ্বারাও ধর্ম্ম লাভ হয় না।

লীলা—পাণ্ডবগণ বিরাটের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোথায় পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ—ধর্ম্মরাজ্য, আর কোথায় বিরাট রাজার পূর্ণ অবিদ্যার অধীন জীবরাজ্য! রাজ্যের সকলদিকেই সৌন্দর্য্য হীনতা, বিশৃঙ্খলতা ও অপবিত্রতা। বিরাট রাজা কীচক নামক অতি দুর্জ্জয়, অসুর প্রকৃতি ব্যক্তির ভগ্নীকে প্রধানা পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়া, সেই রাণীর হস্তে অন্তঃপুরের ভার দান করিয়াছে। আর সেই দুর্জ্জয় কীচককে তাহার বহিঃরাজ্যের সর্ব্ব ভার দান করিয়াছে। সেই কীচক তাহার দুর্জ্জয় অনুচর ও তার মত

দুর্জ্জয় শত ভ্রাতাকে আনিয়া, রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের কর্তৃত্ব ভার দান করতঃ, তাহার জ্ঞান ও কর্ম্ম কৌশল শিক্ষা দিয়া, রাজ্যকে সর্ব্বদিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। সে-ই একরূপ রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু, তার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার শক্তি এইরাজ্যে কাহারই নাই। রাজা সর্ব্বপ্রকারে ইহার আয়ত্ত হইয়া, ইহার প্রদর্শিত পথে চলাকেই সুখবোধ মনে করিতেছে, এই শ্যালকের ও পত্নীর তৃপ্তি সাধনই এখন তার জীবনের সার্থকতা হইয়াছে।

এই অসুরের অবিদ্যা-শিক্ষায় সংসার নাট্যশালা শ্রীহীন, অভিনেতাগণ দর্শকের আনন্দকর প্রকৃত নৃত্যগীত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। সাধনশালার অগ্নি নির্ব্বাপিত প্রায়, ভোজনশালা পবিত্রতা শাস্ত্রবৈধতা বর্জ্জিত! জীবের খেলিবার প্রবৃত্তি, পাশাখেলা বা জুয়াখেলায় পরিণত হইয়াছে। বিচার-শক্তি পক্ষপাত ও স্বার্থপরতায় দুষ্ট! মল্লপ্রবৃত্তি পশুর সঙ্গে ভোজন, ভার-বহন, হিংস্রতার প্রতিযোগিতা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেছে। দাম্পত্য প্রণয়, ভালবাসা মাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপে রমণীর রমণীয়তা—মাতৃত্ব, ভগ্নীত্ব, কন্যাত্ব, বধূত্ব, পত্নীত্ব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পুরুষের পুরুষত্ব—পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব, প্রভুত্ব, দাসত্ব, বন্ধুত্ব সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জীবের কর্ম্ম-সাহায্যকারী শক্তি পশুপ্রধান অশ্ব ও গো, তাহাদের দশাও তেমন হইয়াছে। অশ্বশালায় উত্তম অশ্ব সকল যত্নাভাবে ক্ষীণ পঙ্গু হইয়া আছে, আর অপকৃষ্ট অশ্বগণ বলবান, পুষ্ট হইয়া পদাঘাতে দন্তাঘাতে লোককে জর্জ্জরিত করিতেছে। গাভীশালায়ও উত্তম দুগ্ধবতী গাভী, যাহাদের দুগ্ধ ও মূত্র পান করিলে মানব রোগহীন জরাহীন হয়, তাহারা যত্নাভাবে বন্ধ্যা, মৃতপ্রায়, আর অল্পদুগ্ধা ও বন্ধ্যা কু-গাভীগণ বৎসবতী ও পুষ্টা হইয়া, কু-দুগ্ধে পদাঘাতে শৃঙ্গাঘাতে সকলকে কষ্ট দিতেছে।

ভক্ত—বৎস, মহাভারতের এই বর্ণনা একটুকুও অপ্রাকৃত বা অতিরঞ্জিত নয়। এই অবিদ্যার অধীন জীব-রাজ্যের এমন সঠিক বর্ণনা, আর

কোন গ্রন্থেই এমন জীবন্ত দেখিতে পাইবে না। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র যেমন পুত্র দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হইয়া তার হাতে রাজ্যের সর্ব্ব ভার সমর্পণ করায়; দুর্য্যোধন তাহার দুর্জ্জয় অনুবল ও শত ভ্রাতার সহায়তায়, পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া, পাণ্ডবের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান সব ভুলাইয়া, নূতন ভাবে লীলা কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল। সেই অবিদ্যার অহঙ্কার দুর্য্যোধনত্বই কীচক মূর্ত্তিতে বিরাট রাজাকে আয়ত্ত করিয়া, অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ভগ্নীরূপা অতৃপ্তি কামনাদেবী এখন এই রাজ্যের অন্তঃপুরের পাটরাণী, আর সে, তার কাম তৃপ্তির শত শত অহঙ্কাররূপ অনুচর ও শত ভ্রাতা লইয়া বহিঃরাজ্যের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছে। অবিদ্যা মায়ায় প্রবৃত্তির দাস হইয়া জীব কিরূপে সংসার লীলা করিতেছে, এখন ক্রমে সেই লীলা জীবন্ত ভাবে দর্শন কর।

লীলা—প্রথমে সংসারের প্রধান আশ্রয় দাম্ভ ও স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর। ব্রত পরায়ণা ব্রাহ্মণী বেশে, হাতে পুষ্পমালা ও গন্ধ দ্রব্য লইয়া দ্রৌপদীদেবী রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই, রাজার প্রধানা মহিষী দ্রুত আসিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রৌপদী সেই কল্পিত পরিচয় বলিয়া, কাতরতা সহিত এক বৎসরের জন্য মহারাণীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, রাণী আতঙ্কে শিহরিয়া বলিলেন, "একি বলিতেছ? আমি তোমায় আশ্রয় দিব! তোমার রূপ দেখিয়া যে আমার রমণীর মনই মোহিত হইয়া যাইতেছে! তুমি মহারাজের দৃষ্টিতে পরিলে তিনি কি তোমায় ত্যাগ করিবেন! তোমার দাস হইয়া তোমার সেবাই গ্রহণ করিবেন, আমাদের দিকে ফিরিয়াও আর চাহিবেন না। সাধ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ কে ডাকিয়া আনে? আমি তোমায়ত আশ্রয় দিতে পারিবই না! আর এই রাজ্য হইতেই আমি তোমাকে শীঘ্র দূর করিয়া দিতেছি!". রাজার প্রধানা রাজমহিষীর স্বামীর প্রতি ভালবাসা

ও বিশ্বাস দেখিলেত ? তাহারা কেমন ভাবে সাবধান হইয়া, সর্ব্বদা নিজের অধিকার রক্ষায় চেষ্টান্বিতা, ও কেমন আশঙ্কা, উদ্বেগ ও অপবিত্র ভাব লইয়া দিন কাটায়, দেখিলেত ? কেবল মিথ্যাকপট ভালবাসা দেখাইয়া স্বামীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করতঃ, নিজে যেন সুখে আছে দেখায় ; ভিতরে একটু সুখ শান্তি নাই। এইটী অসুর পরিবারের জীবন্ত দাম্পত্য-প্রণয়ের স্বরূপ। দয়ারও স্বরূপ ঠিক এইরূপ! বিপন্না, নিরাশ্রয়া, সুন্দরী যুবতিকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, নিজের কল্পিত বিপদের আশঙ্কায়, আরও তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ব্রতী হইতে প্রস্তুত। সময় বুঝিয়া দ্রৌপদীদেবী রাণীকে বলিলেন, "ওগো! সেই ভয়েই ত তোমার নিকট আশ্রয় লইতে আসিয়াছি! আমায় পুরুষের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখ মা? মাত্র একটী বৎসর! তার পরে আমার স্বামীগণ আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন। আজ দ্রৌপদী দেবী রাজ্যে থাকিলে তোমার নিকট আসিতাম না? তুমিও দ্রৌপদীদেবীর মত ধার্ম্মিকা শুনিয়াই, বড় আশা করিয়া তোমার নিকট আশ্রয় লইতে আসিয়াছি। দ্রৌপদীর এইরূপ কাতরতাময় মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া না হউক, স্বামীর চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্যও, রাণী দ্রৌপদীকে গোপনে অন্তঃপুরে আশ্রয় দান করিলেন। রমণীর স্বরূপত দেখিলে, এখন পুরুষের সর্ব্বদিকের স্বরূপও একটু শ্রবণ কর।

একদিন রাজশ্যালক, রাজ্যের প্রধান সেনাপতি কীচক মহাশয়, হঠাৎ অতর্কিত ভাবে ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া,দ্রৌপদীকে দেখিয়া ফেলিল, ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, বহু পত্নী থাকিতেও সে ইন্দ্রিয় বিহ্বল হইয়া পড়িল। দ্রৌপদী দেবী দ্রুত প্রস্থান করিলে, কীচক ভগ্নীর নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর পবিত্র ব্যবহারে,এই কয়দিন মধ্যেই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই আনন্দে দ্রৌপদীকে নিরাশ্রয়া, তপস্যাপরায়ণা, ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া পরিচয় দান করিলেন ও তাঁহার শত

মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কামমুগ্ধ কীচক ভগ্নীর নিকট হইতে ইহাকে ছাড়াইয়া নিতে মনস্ত করিয়া, কপটতা দ্বারা ভগ্নীকে দ্রৌপদীর প্রতি সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে হাসিয়া বলিল, "ইহার মধ্যেই তোমায় মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে! ভগ্নি, তুমি প্রতারিত হইয়াছ! এই রমণী কখনও সৎ নয়, তাহার বাসনাও সৎ নয়। তোমায় সরলা পাইয়া তোমারই সর্ব্বনাশে বাসনা করিয়াছে। সে ব্রতের জন্য আসিলে রাজপুরে কোন প্রয়োজন ছিল? তপোবনে যাইলেই পারিত। সে তোমার সর্ব্বনাশের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে! হঠাৎ রাজাকে মুগ্ধ করিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করাই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তুমি এমন কাল-সর্পকে পালন করিতেছ! শীঘ্র ইহাকে দূর কর। তুমি কলাবতী রমণীর কৌশল কি বুঝিবে! ইহার চলিবার ভঙ্গী, কটাক্ষ সমস্তই অতি দুষ্টা রমণীদের মত। আমি ইহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি, শীঘ্র ইহাকে পরিত্যাগ কর।" রাণীও ভ্রাতাকে চিনেন, তাই তাহার কথায় পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও, দ্রৌপদীর উপরেও কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধা হইয়া পরিলেন। অসুর রাজ্যে, এমনই পুরুষরা রমণীদিগকে সর্ব্বদা সন্দেহ করিয়া থাকে। আর রমণীগণও পুরুষদিগকে সর্ব্বদা সন্দেহ করিয়া থাকে। যেখানে সন্দেহ অবিশ্বাস, সেই স্থানে প্রকৃত প্রণয় কি করিয়া আসিতে পারে। এই বার কীচক সন্দিগ্ধা ভগ্নীকে আয়ত্ত করিবার জন্য, দ্বিতীয় উপায় গ্রহণ করিল। বলিল, "অন্ততঃ পক্ষে একটু পরীক্ষাই গ্রহণ কর না! তুমি কিছু আনিবার ছলে আমার নিকট প্রেরণ কর, আমি প্রলোভন আদি দিয়া একটু পরীক্ষা করিয়া দেখি। যদি তেমন হয় দূর করিয়া দিব, নচেৎ তোমার নিকটই থাকিবে।" সন্দিগ্ধা ভগ্নী ইহাতে সহজেই স্বীকৃতা হইলেন। কীচক ভাবিল আমার নিকটে যাইলেই হয়। আমার রূপ, গুণ, বীর্য্য; সম্পদ কিসের অভাব। এই সব ভোগের প্রলোভন কি

রমণী কখনও ত্যাগ করিতে পারিবে? অসুর পুরুষ সত্যই রমণীকে এমন অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া থাকে। এর পরে মধু আনিবার ছলে দ্রৌপদীকে রাণী ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। দ্রৌপদীর কাতরতা, বিনয় কিছুতেই অন্যকে প্রেরণ না করিয়া, রাণী দৃঢ়তাসহ তাহাকেই মধু আনিতে পাঠাইলে, নিরুপায়া দ্রৌপদী ভগবানের চরণে শরণ লইয়া, একরূপ কাঁপিতে কাঁপিতে যাইয়া, কীচকের নিকট রাণীর জন্য মধু প্রার্থনা করিলেন। কীচক কৌশল সফল হইয়াছে দেখিয়া, মহানন্দে দ্রৌপদীকে অভ্যর্থনা করতঃ, নানা চাটুবাক্যে তাহার রূপ গুণের প্রশংসা আরম্ভ করিল। নির্লজ্জ্য, পাষণ্ড মহাপ্রেমিকের অভিনয় করিয়া, দ্রৌপদীর মন হরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। জোড়হস্তে পায়ের নিকট বসিয়া বলিতে লাগিল, "সুন্দরি, তুমি কি পরের সেবা করিবার যোগ্য! তোমার এই রূপ, এমন কোমল অঙ্গ, এই উজ্জ্বল বর্ণ কথনও দাস্যতার জন্য জন্মে নাই! মধু আমি এখনই অন্য দ্বারা পাঠাইয়া দিতেছি! তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমায় দাস বলিয়া গ্রহণ কর। আমার সকল সম্পদ, দাসদাসী লইয়া আমি তোমার সেবা ভার গ্রহণ করি! ওগো, তোমাকে ভগ্নীর নিকট দেখিয়াই, আমি তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছি। তোমার না পাইলে আমি বাচিবই না! তোমায় আমার হত্যার ভাগী হইতে হইবে। সুন্দরি, তুমি আমার গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষাকর; তোমার আর দাসীত্ব করিতে হইবে না।" দ্রৌপদী লজ্জায়, অপমানে যেন মরিয়া গেলেন। তখন তিনি ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, কীচকের ভাব ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "ছিঃ, ছিঃ, এ কি বলিতেছেন! মহারাণী আমাকে ভগ্নীর মত স্নেহ করেন, তাঁহার দাদা আপনি। তাই আপনি যে আমারও দাদার তুল্য! তাইত আমি আপনার নিকট নিঃসঙ্কোচে আসিয়াছি। আপনার

কি এমন কথা বলা শোভা পায়? আমি বিপন্না নিরাশ্রয়া নারী, আপনাদের আশ্রয়ে বাস করিতেছি, আমার প্রতি এ কি বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? আপনি কৃতদার, সুন্দরী বহু পত্নী আপনার অন্তঃপুরে রহিয়াছেন, তাহারা শুনিলে আপনাকে কি বলিবেন? আর এমন অন্যায় অধর্ম্ম করিলে আপনার যশ কি কলঙ্কিত হইবে না? আমার মধু দিয়া বিদায় করিয়া দিন! ছিঃ, লোকে দেখিলে কি বলিবে।" কামাহত অসুরের কি ধর্ম্মভয় থাকে! কীচক দ্রৌপদীকে বলিল "সুন্দরি! আমি রাজা নই বলিয়া বুঝি, তুমি আমায় গ্রহণ করিতে চাহিতেছ না? তুমি জান না, আমিই যে এই দেশের প্রকৃত রাজা! রাজসিংহাসনে বসিলে, রাজকার্য্যাদির জন্য অনেক সময় ভোগ ত্যাগ করিয়া কাটাইতে হয়, তাই সিংহাসনে বসি নাই। অকর্ম্মণ্য পুতুলের মত এই রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছি। তুমি যদি রাজসিংহাসনে বসিতে চাও, বল, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজাকে পদাঘাতে দূর করিয়া, তোমায় লইয়া সিংহাসনে বসি। সুন্দরি! এই রাজ্যের সর্ব্ব সৈন্যবল, কর্ম্মচারী বল সবই যে আমার লোক! তুমি আমার হও, তুমি যাহার সেবা করিতেছ, সেই রাণী সুদেষ্ণা আসিয়া তোমার চরণ সেবা করিবে; আমার পত্নীগণ তোমার মনোরঞ্জন করিবে, তুমি এই রাজ্যের মহারাণী হইবে। কিসের ধর্ম্মের ভয়! বলবানের আবার ধর্ম্মের ভয় কি? দেখ না, অগ্নি সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও পবিত্রই থাকেন। লোকনিন্দা! তাহাও দুর্ব্বলের জন্য! আমাদের নিন্দা করিবে কাহার শক্তিতে কুলাইবে? তার কি মৃত্যুর ভয় নাই।" অসুর পুরুষের সর্ব্বদিকের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল বাবা! তাহার দাসত্বের স্বরূপ দেখিলে কি? বিশ্বাস করিয়া সৈন্যগণের ভার দিয়া, যেই প্রভু দাসের প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া বসিয়া আছেন। অসুর ঠিক কীচকের মত তাহাকে অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া, যে কোন মুহূর্ত্তে

পদাঘাতে দূর করিতে প্রস্তত। যতক্ষণ তাহার কথায় চলিবে, ততক্ষণই প্রভু স্বীকার করিবে। তাহার তৃপ্তির বিরোধি, সার্থের বিপক্ষ হইলেই প্রাণ নাশক শত্রু হইতেও, সে তাহার অধিক সর্ব্বনাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। অসুরের আত্মীয় প্রীতি, ভগ্নী স্নেহের স্বরূপ দেখিলে? শ্যালক হইয়া ভগ্নীপতীকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত নয়! ভগ্নী ও পত্নীকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য দাসী করিয়া দিতেও প্রস্তুত। সত্যই অসুর পুরুষ সামান্য একটু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, তাহার ধর্ম্ম, ভালবাসা, ধন, সম্পত্তি এমনই মুহূর্ত্ত মধ্যে বলিদান করিতে পারে।

দ্রৌপদীদেবী, নিরুপায় দেখিয়া, নিজের গন্ধর্ব্ব স্বামিগণের ভয় দেখাইয়া ভৎসনা আরম্ভ করিলেন, ও কৌশলে পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কীচকও তাহা বুঝিতে পারিয়া, "দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতেই চেষ্টিত হইল। তাই সে স্পষ্টই বলিল, "সুন্দরি, ইচ্ছায়ই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, তোমাকে আমার হইতেই হইবে। এই রাজ্যে আমার কার্য্যে বাধা দেয় এমন লোক কেহই নাই। তোমাকে হাতে পাইয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না।" এই বলিয়া দুর্ব্বৃত্ত দ্রৌপদীদেবীর পথ রোধ করিয়া হাতে ধরিতেই, দেবী বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া আশ্রয়ের জন্য, বেগে রাজসভায় স্বামিগণের নিকট ধাবিত হইলেন। ব্যাঘ্রের মুখ হইতে শিকারের পশু পলাইয়া গেলে, সে যেমন আরও হিংস্র হইয়া দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া তার পশ্চাতে ধাবিত হয়, কীচকও তেমনই ভাবে দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া রাজসভায়ই প্রবেশ করিল, এবং রাজা ও সভাসদগণের সম্মুখেই তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া পদাঘাত করিতে চেষ্টা করিল। তখন কোনও ধার্ম্মিক সহায় অদৃশ্য দেবশক্তির দ্বারা আঘাত পাইয়া, দুরাত্মা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া আহত হইল! আঘাতে বোধ হয় কামের মোহ কিছু নাশ হইল, তাই উঠিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে

চলিয়া গেল। সভাস্থ রাজা ও সভাসদগণ সকলেই কীচকের এই রমণী নিগ্রহ দেখিল, দ্রৌপদীর দুঃখের রোদন শ্রবণ করিল, কিন্তু একজনও একটুকু শব্দও করিল না। অসুরের রাজসভার এইরূপই সত্য স্বরূপ। তাহারা বলবানের, আত্মীয়ের ও রাজকর্ম্মচারীদের দোষ দেখিয়াও দেখিবে না। তাহাদের দ্বারা অত্যাচারীত বিপন্নকে একটুকু সহানুভূতির কথাও বলিবে না। বরং তাহাকে ধ্বংস করিয়া, বা মিথ্যা দ্বারা ঢাকিয়া সেই আত্মীয় ও রাজকর্ম্মচারীর মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করিবে।

এমন বিপদকালেও স্বামিগণ রক্ষা করিতেছেন না, পাষণ্ডকে শাস্তি দিতেছেন না দেখিয়া, দ্রৌপদীদেবী দুঃখে ক্রোধে রাজ সভার নিন্দা করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্ব স্বামীদের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। সেই তিরস্কারের লজ্জায় রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কেন এই রমণী রোদন করিতেছে? এই পুরুষের সঙ্গে তাহার কিসের বিরোধ, তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। তাহাকে বল, উভয়ের প্রমাণাদি লইয়া নিশ্চয় আমরা ইহার বিচার করিব।" কিন্তু আজ কাল করিয়া সেই বিচারের কেবল বিলম্বই হইয়াছিল, বিচার আর হয় নাই। এই দিকে সেই সময়ে ধর্ম্মরাজ ভীম নকুল সহদেব এই চারি পাণ্ডবই রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। আজ সভায় রমণীর উপর আক্রমণ ও অত্যাচার দেখিয়া, তাহাদের ধৈর্য্যধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল। আজ তাহাদের অজ্ঞাত বাস ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছিল। কনিষ্ঠদ্বয় ক্রোধে শ্বাস রহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের ইঙ্গিতের জন্য, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ভীমসেন এই পাপ সভার সকলকেই নিঃশেষে বধ করিবার জন্য, সভার বাহিরের একটী বৃক্ষ উৎপাটনের জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। অসীম জ্ঞান ধর্ম্মরাজ অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া, কনিষ্ঠদ্বয়কে ইঙ্গিতে নিরস্ত করতঃ, ভীমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বল্লভ, তোমার বুঝি কাষ্ঠের প্রয়োজন, বাহিরে যাইয়া অপেক্ষ্যা কর, আমি জোগার করিয়া দিতেছি।" এই

বলিয়া কৌশলে তাহাকেও নিরস্ত করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন, "সৈরিন্ধ্রি! আমি তোমাকে চিনিয়াছি! তোমাকে আমি পাণ্ডবপুরে দ্রৌপদীদেবীর সহচরী সখীরূপে দেখিয়াছি। তোমার ব্রতের কথাও জানি! তোমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীর কথাও জানি। তুমি বলবান গন্ধর্ব্ব রাজকুমারের পত্নী হইয়াও, দেব রোষে আজ আশ্রয়হীনা হইয়া কষ্ট পাইতেছ! কি করিবে সতি! তোমার স্বামিগণও কি কম কষ্ট পাইতেছেন? আরও তুমিত জান তাঁহারা তোমায় কত ভালবাসেন। অধিক কাতরে ডাকিলে তাঁহারা ব্রত ভঙ্গ করিয়াও তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আর তোমার ভয় কি সতি! তুমিত জান,তোমার বিপদের রক্ষাভার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াই আছেন। তোমার উপর অত্যাচারীর কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। তোমার উপর এই অত্যাচার কি তাহারা দেখিতেছেন না। আর রাজসভায় মহারাজই যখন স্বয়ং দেখিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় ইহার বিচার করিবেন। তাহা না হইলে, তোমার স্বামিগণই কি ইহার প্রতিবিধান করিবেন না? তুমি রোদন সম্বরণ করিয়া অন্তঃপুরে গমন কর। সতী হইয়া পতির ব্রতের বিঘ্নকারিণী হইও না। পরিণামে নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে।" ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া কৌশলে দ্রৌপদীকেও প্রবোধ দিলেন ও ভীমকেও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ভীমকে বলিলেন, প্রকাশ্যে নয়, গোপনে কীচককে প্রতিফল দান কর। দ্রৌপদীকেও বলিলেন কীচককে আমরাই প্রতিফল দিব, এখন একটু ধৈর্য্যধারণ কর। দ্রৌপদী প্রস্থান করিলেন।

এমন কুকার্য্য করিয়াও পাষণ্ড কীচক একটু লজ্জিত বা সঙ্কুচিত না হইয়া, আরও স্পর্দ্ধার সহিত নিকটে যাইয়া দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিল, "কেমন দেখিলেত! আমার কার্য্যের প্রতিরোধী এরাজ্যে কেউ নাই। আমার কথা রাখ, নচেৎ বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।" তখন নিরুপায় দ্রৌপদী ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহাকে রাত্রিতে নাট্যশালায় আসিতে বলিয়া

দিলেন। কীচক রাত্রিতে আসিলে, ভীমসেন আক্রমণ করিয়া তাহাকে মল্লযুদ্ধে বধ করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন ভীষণ ক্রোধে কীচকের কেশাকর্ষণের হস্ত, পদাঘাতের পদ শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, কুদৃষ্টির চক্ষু উৎপাটন করতঃ কুষ্মাণ্ডের আকার করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। দ্রৌপদী পুররক্ষকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া গন্ধর্ব্ব হস্তে কীচকের দশা প্রদর্শন করিলে, কীচকপুরে হাঁ হাঁ কার পড়িয়া গেল। তাহার অসুর ভ্রাতাগণ ও অনুচরগণ সসস্ত্র হইয়া রাজপুরে প্রবেশ করতঃ, ভ্রাতার হত্যাকারীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল; ইহাদিগকে বাধা দেয় কাহার সাধ্য। পরে সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব্ব স্বামীর হস্তে মৃত্যু শুনিয়া, সৈরিন্ধ্রীকেই কীচকের সহিত দগ্ধ করিবার জন্য বান্ধিয়া লইয়া চলিল। ভীমসেন এই দারুণ সংবাদ পাইয়া, বিকট মূর্ত্তি ধারণ করতঃ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া,অন্ধকার মধ্যেই শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার একটী বৃহৎবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, তাহার আঘাতে কীচকের ভ্রাতা ও অনুচরগণকে সমূলে বধ করিলেন; দ্রৌপদীরও বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। পরে আবার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পাকশালায় যাইয়া শয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে কীচকের দলের নাশ হইয়া গেল, এবং গন্ধর্ব্বের ভয়ে কেহই দ্রৌপদীকে কু-নজরে চাহিতেও সাহসী হইত না। এইবার কীচকের আদর্শ ও কর্ম্মপ্রাধান্য নাশে, বিরাটরাজ্যে ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন আরম্ভ হইল। নির্ব্বাপিত সাধনাগ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। পাকশালা পবিত্র হইল। মল্লক্ষেত্রের প্রতিযোগী পশুর দল নিহত হইল। এতদিনে বিরাট রাজ্যবাসী বুঝিল, জীব সংযম সাধনায় এমন এক অবস্থা লাভ করিতে পারে যে, তাহা সৃষ্টিরাজ্যের পশুআদি সকল শক্তিরই অতীত। সেই শক্তিদ্বারা হস্তী হইতেও অধিক ভার বহনে শক্তি হয়, সিংহ, ব্যাঘ্রাদিকেও নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করিয়া ফেলিতে পারে। খেলা প্রবৃত্তিও এইবার সকাম যজ্ঞাদিতে উত্থিত হইল। যজ্ঞে, রাজস—আড়ম্বরাদি, তামস—নৃত্য, গীত,

ভোজন উৎসবাদির সহিত, সাত্ত্বিক—দান, সংযম, ব্রতধারণ মিশিয়া রাজাকে বিদ্যারাজ্যে লইয়া চলিল। সামান্য অর্থাদি পনের স্থানে, এবার স্বর্গ অপবর্গাদি অদৃশ্য সুখ লাভ কামনা জন্মিয়া উঠিল। অন্তঃপুরের নৃত্যশালাও এইবার পবিত্র হইয়া উঠিল। সকলেই স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ের সংযম করায়, পরতৃপ্তি ভালবাসার জন্ম হইল। প্রকৃত মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, পত্নীত্ব, স্বামীত্ব, ইত্যাদির জাগরণ হইয়া, সংসার সুখ শান্তির আধার আনন্দময়, হাস্য কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল। সংসার হইতে কীচকের অধর্ম্মপথে অত্যাচার অবিচার করিয়াও নিজের তৃপ্তি চেষ্টা উঠিয়া যাওয়ায়, অত্যাচারীর কাতর চিৎকার, অত্যাচারকারীর কীচকের মত বিকট গর্জ্জন, আক্রমণ, পাষণ্ডতাও অন্তর্দ্ধত হইল। অর্জ্জুন রাজ অন্তঃপুরে এই নূতন নৃত্য গীতই শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। কীচকের শিক্ষার কপট রমণীস্তবের স্থানে, এখন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল স্তব গান আরম্ভ হইল। অশ্বশালা ও গোশালাও মার্জ্জিত হইল। অশ্বের ন্যায় কর্ম্মের সাহায্যকারী-শক্তি বহু কর্ম্মপ্রবৃত্তি, এতদিন ব্যবহারের অভাবে মৃত প্রায় হইয়া গিয়াছিল। উত্তম অশ্বরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি ত মরিতেই বসিয়াছিল। যত কু-অশ্বরূপ অবিদ্যা কর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলি পুষ্ট হইয়া জীবকে নানাপ্রকারে দুঃখ দান করিতেছিল। কীচকের মত বহু রমণীও ধনসম্পদ থাকিতেও, পর রমণী ধনাদি দর্শনে আত্মহারা হইয়া কুকার্য্যাদিতে ধাবিত হইত। অদ্য বিশ্বদর্শিতারূপ নকুলের কর্ম্মযোগের হাতে পড়িয়া, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি আদির সহায়তায় উত্তম-অশ্ব আধ্যাত্মিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমে বলশালী হইয়া, বিরাটবাসিগণকে নূতন কর্ম্মশক্তি দান করিল। এইরূপ গাভীশালারূপ কামনারাজ্যেও, যত কু-গাভীরূপ কুবাসনাগুলি পুষ্ট ও বংশে বর্দ্ধিত হইতেছিল। আর সৎকামনাগুলি, যাহারা জীবের দৈহিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিয়া দিতে পারে। জীবকে দেহেন্দ্রিয় অতীত প্রকৃত সুখের অধিকারী করিয়া তোলে, সেই কামনাগুলি বন্ধ্যা ও

মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। আর যত কু-গাভীরূপ দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি আদির বাসনাগুলি পুষ্ট হইয়া উঠিয়া, ইহাদের সুখতৃপ্তিরূপ কু-দুগ্ধ দানে, তাহাদের তাড়নায় জীবকে নির্লজ্জ্য ও হিংস্র স্বভাব করতঃ, পশুর মত লীলা করাইতে ছিল। তাই জীব লীলা করিয়া পশুর মতই তৃপ্ত হইতে পারিতে ছিল না। অন্ত সহদেবের ভবিষ্যৎ দর্শিতা সাধনায়, মৃতপ্রায় আধ্যাত্মিক-কামনা গাভীগুলি অমৃতময় দুগ্ধাদি দান করিয়া, বিরাট রাজের শ্রী ফিরাইয়া দিল৷ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী দেবীকে আশ্রয় দিয়া, কীচকের অধীন বিরাটরাজ্য ক্রমে ধর্ম্মরাজের ইন্দ্রপ্রস্থ হইয়া উঠিল। এই রাজ্যের সুখ শান্তি সম্পদ দর্শনে প্রতিবেশী অসুর রাজগণের গাত্র দাহ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে কীচক কর্ত্তৃক পরাজিত প্রতিবেশী রাজগণ সানুচর কীচকের মৃত্যু শ্রবণ করিয়া, বিরাটরাজ্যটী নিজেরা ভাগ করিয়া লইতে মনস্ত করিল। আবার গন্ধর্ব্বের, সংবাদ শুনিয়া পূর্ণ সাহসও পাইতে ছিল না, তাই তাহারা দুর্য্যোধনের সহায়তা প্রার্থনা করিল। বিরাট রাজের অপূর্ব্ব গোধনের প্রলোভন দিয়া দুর্য্যোধনকে আয়ত্ত করিয়া তুলিল। বিরাট রাজার প্রতিবেশী সুশর্ম্মা নামক রাজা, কীচক কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বড়ই দুঃখিত ছিল, সে আবার রাজা দুর্য্যোধনের বড়ই প্রিয়পাত্র বন্ধু, ইহার পরামর্শে দুর্য্যোধন বিরাট রাজার গোধন হরণের জন্য প্রস্তুত হইল। কর্ম্ম করিবই নিশ্চয় হইলে, তাহার স্বপক্ষে যুক্তির আর অভাব হয় না। চোর দস্যুও যুক্তি দ্বারা মনকে বুঝাইয়া, দলের সকলকে বাধ্য করিয়া হীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। দুর্য্যোধনও দেশ জয় বল সংগ্রহ, ইত্যাদির ধুয়া দিয়া ভীষ্ম দ্রোণ সহিত সাজিয়া বিরাটরাজ্য আক্রমণে ধাবিত হইল। বাবা! তত্ত্বতও এই আক্রমণ সত্য।

তত্ত্ব—দেবত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিলেই অসুরত্ব নিত্যই সর্ব্ব বল লইয়া সেই দেশ আক্রমণে ধাবিত হয়। এই আক্রমণ রাজ্য জন্য নয়, কেবল

গাভীগুলি হরণের জন্য। অর্থাৎ দেবতারা সৎ কামনার সাধনায় যেই সব আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে লাভ করিয়াছে,—পাণ্ডবের রাজ্য কাড়িয়া লইবার মত কেবল সেই সৎ কামনার ফলগুলিই অসুর ভোগ করিতে চায়। এইটুকুই দুর্য্যোধনের বিরাট রাজার গোধন হরণের চেষ্টা। অন্য ভীষ্ম দ্রোণাদিও দুর্য্যোধনের অনুবল হইলেন, এইটুকুতেও রহস্য আছে বাবা। বনপর্ব্বে গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে ইহারা কেহই ছিলেন না, অন্য গোহরণে কিন্তু সকলেই গমনে স্বীকৃত হইলেন। সামান্য বিরাট রাজার বিপক্ষে, এমন ভীষণ অভিযান, তাহাতে সুশর্ম্মার নিকট শুনিয়াছে বিরাটের প্রধান সেনাপতি কীচক নিহত। তাতে আবার গোহরণরূপ হীনকর্ম্মে বৃদ্ধ, মহাবীর ভীষ্ম দ্রোণাদি স্ব সাধীনতা দেবত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যুদ্ধে গেলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষক না হইয়া আরও মহাবাধক হইয়া দাড়াইলেন, এই টুকুবড়ই আশ্চর্য্য ব্যপার। ধর্ম্মসাধন হীন হইয়া কতকদিন উচ্ছৃঙ্খলতা অসুরত্ব লইয়া বিচরণ করিলেই, জীবের মন নিবৃত্তি মার্গ ত্যাগ করিয়া কেবল প্রবৃত্তিপর হইয়া উঠে, তাই ভীষ্মও আজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে গরুচুরি করিতে চলিলেন। লোভ প্রবৃত্তি ও আন্যান্য লোভ বিস্মৃত হইয়া, অভিভূত, কেবল দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি অন্বেষণ হইয়া উঠে, তাই বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্যও আজ দুর্য্যোধনের গাভী হরণে সহকারী। দয়াবৃত্তিও মমত্ব—আমিও আমার সংজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া উঠে, তাই আজ মমতায় বাধা হইয়া কৃপাচার্য্যও গাভী হরণে প্রস্তুত হইলেন। দেখিবে এই দোষেই একদিন মহাজ্ঞানী ভীষ্ম, ঋষি তুল্য দ্রোণ, কৃপ ও ধর্ম্ম-পাণ্ডবের বিপক্ষে অধর্ম্ম-দুর্য্যোধন রক্ষার জন্য, প্রকাশ্যে দারুণ যুদ্ধে ব্রতী হইবেন! এইজন্যই মন, কামনা ও দয়াবৃত্তিকেও প্রকৃত ধর্ম্ম ও ভগবৎ প্রাপ্তির শত্রু বলা হয়। অতি ক্ষুদ্র বিরাট রাজার বিপক্ষে এই বিশ্বজয় সক্ষম মহাশক্তির আক্রমণ মধ্যে ও অতি মধুর মধুর রহস্য আছে বাবা। অন্য দর্পান্ধ অসুর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সম্পদ ও বীর্য্যে বিশ্বজয়ী শক্তিশালী—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ

আদি ধর্ম্ম সাধনা দ্বারাই অজেয় শক্তিশালী, এইসবের বলেই দুর্য্যোধন নিজকে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিতেছে, নয় ? বাবা, হিরণ্যকশিপু আদিও যেমন সাধন শক্তি দ্বারা, দেববীর্য্য ও অজেয়ত্ব বর লাভ করিয়া, পরে সাধন ভজন সব ত্যাগ করিয়া অবিদ্যার তৃপ্তিতে, সেই সব শক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিল। দুর্য্যোধনও সেইরূপ আজ পাণ্ডবরূপ পঞ্চ ধর্ম্মসাধনকে অজ্ঞাত বাস দিয়া, অধর্ম্মপথে সুখ লাভরূপ গাভী হরণে সর্ব্বশক্তির ব্যবহার আরম্ভ করিল। আর বিরাট রাজা ধর্ম্মদেবের অনুগ্রহে অজানত ভাবে অসুরত্ব মুক্ত হইয়া, ধর্ম্ম সম্পদের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছে। সে যে কি শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার সংবাদও সে জানে না। সুশর্ম্মা রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছে শুনিয়া, সে মৃত শ্যালক কীচকের জন্য আক্ষেপ করিয়াছে! ধর্ম্মরূপ মহাশক্তি ও ভগবৎ কৃপারূপ মহাবন্ধু যে তাহার সহায়, সে তার সংবাদই রাখে না। ইহারাই নিষ্কাম ভক্ত বাবা, সাধন করে, ফলের দিকে লক্ষ নাই, ধর্ম্ম সাধন করিতেছি বলিয়া অভিমানও নাই, ধর্ম্ম সাধনে যে মানবের সুখ শান্তি স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়াছি এইইত যথেষ্ট বোধ করিতেছে। অত্র নিষ্কাম ভক্তের বিপক্ষে অসুরের বিশ্বজয়ী শক্তির আক্রমণ আসিতেছে, এখন এই যুদ্ধের ফল দর্শন কর।

লীলা—প্রতিবেশী শত্রু সুশর্ম্মা দক্ষিণ দিক হইতে বিরাট রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাজা সর্ব্ব সৈন্য বল লইয়া সেইদিকে যুদ্ধে ধাবিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ, ভীম ও নকুল সহদেবকেও অস্ত্র সস্ত্র রথ দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তখন বৎসর চলিয়া গিয়াছে কিন্তু ধর্ম্মরাজ তাহা জানিতেন না। তাই ধর্ম্মরাজ ভাইদিগকে হীনভাবে যুদ্ধ করিতে বলিয়া দিলেন, যেন কেহ না চিনিয়া ফেলে; কেন না, সুশর্ম্মা যে দুর্য্যোধনের বন্ধু। কিন্তু যখন সুশর্ম্মা দারুণ যুদ্ধ করিয়া বিরাট রাজাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। তখন ধর্ম্মরাজ শীঘ্র রাজাকে উদ্ধার করিতে ভীমকে আদেশ দিয়া, কনিষ্ঠদ্বয় লইয়া দারুণ

যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একা ভীমসেনই তাহার অমানুষ বীর্য্য দ্বারা, মুহূর্ত্ত মধ্যে সুশর্ম্মার সমস্ত বলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া রাজাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন; সুশর্ম্মাকেও কেশাকর্ষণ করিয়া দাদার নিকট আনিয়া দিলেন। পরম কৃপাবান ধর্ম্মরাজ বিরাটরাজাকে বলিয়া সুশর্ম্মার জীবন রক্ষা করিয়া বিদায় দিলেন। বিরাট রাজা উদ্ধার কর্ত্তা ভীমাদিকে শত মুখে প্রশংসা করিয়া, নানা উপহার দান করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর্ত্তা সখা বলিয়া বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দক্ষিণের যুদ্ধ বিজয় করিয়া রাজা আনন্দে রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন।

বিরাট রাজা দক্ষিণের যুদ্ধে চলিয়া যাইবার পরেই দুর্য্যোধনের দল উত্তরদিক হইতে আক্রমণ করিয়া, রাজার উত্তর গো-গৃহের সমস্ত গাভীগণ বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইল। গোরক্ষকগণ দ্রুত আসিয়া রাজধানীতে খবর জানাইল। কিন্তু রাজধানী তখন রাজা ও সৈন্য শূন্য-পুর রক্ষার জন্য সামান্য সৈন্য মাত্র এক রাজপুত্রের অধীনে রাখিয়া গিয়াছেন। দুর্য্যোধনের মত প্রবল শক্তিকে কে এখন বাধা দেয়! রাজপুত্র পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া, অন্তঃপুরে মায়ের নিকট বসিয়া এই দুর্য্যোধনের আক্রমণ সংবাদ জ্ঞাপন করিল ও বালকের মত নিজের বল বীর্য্যের বড়াই করিতে লাগিল। বলিল "কেবল গত যুদ্ধে আমার সারথিটী মরিয়া গিয়াছে, নচেৎ আমি একাই দুর্য্যোধনকে এই গরুচুরির মজাটী দেখাইয়া দিতাম। ভীষ্ম, দ্রোণাদি কয় বেটা অতি বৃদ্ধের বলেইত তার বল! কি বলব মা, কেবল সারথির অভাব, নচেৎ যুদ্ধের এমন একটা সুযোগ কি এমনই যায়।" দ্রৌপদীদেবী নিকটে বসিয়া, বিরাট রাজ্যের এই দারুণ বিপদের কথা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। পাণ্ডবগণের এমন উপকারী বান্ধবের যদি এমন সর্ব্বনাশ হয়, তবে পাণ্ডবের বাঁচিয়া কি ফল! ধর্ম্মরাজ আদিও দূরে, এখন অর্জ্জুনের

বীর্য্য বিনে আজ বিরাটরাজ্য রক্ষার আর উপায় নাই। অপরাজেয় ভীষ্ম দ্রোণাদির পরাজয় মাত্র অর্জ্জুনের দ্বারাই সম্ভব। তাই দ্রৌপদীদেবী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কুমার, আমি তোমার উত্তম সারথির যোগার করিয়া দিতে পারি। এমন সারথি এই জগতেই আর আছে কিনা সন্দেহ। তোমাদের অন্তঃপুরেই সে আছে, তোমরা তাহাকে চিন না, আমি তাহাকে বিশেষ চিনি। এই লোকটি মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনের সারথি ছিল, পাণ্ডবপুরে থাকিতে আমি দেখিয়াছি। ইহার সহায়তায়ই অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দাহনে. সমস্ত দেবতাকে যুদ্ধে পরাস্থ করেন। তুমি তাহাকে সারথি করিয়া যাও, কৌরবগণের কি কথা, স্বয়ং দেবরাজ যুদ্ধে আসিলেও তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না।" রাজকুমার আনন্দে তাহার পরিচয় চাহিলে, দ্রৌপদীদেবী উত্তরার নৃত্যশিক্ষক ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিলেন; অমনি উত্তরা তাহার নৃত্যশিক্ষককে লইয়া আসিল। রাণী ও উত্তরা অর্জ্জুনকে মিনতি করিয়া অনুরোধ করিতে থাকিলে, অর্জ্জুন হাসিয়া সারথ্য স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে মা! কুমার যদি সেই প্রতিজ্ঞায় স্বীকৃত হন, তবে তাহার সারথি হইতে পারি। আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যুদ্ধ জয় না করিয়া ফিরিবনা। কখনও পশ্চাৎ দিকে রথ চালাইব না।" রাজপুত্র দম্ভের সহিত সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া, নপুংসক-বেশী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া, একাই দুর্জ্জয় কৌরবগণের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিল।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি সর্ব্ববল পরিবৃত দুর্য্যোধনের সহিত এক রথে যুদ্ধ করা যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা জানিয়াও অর্জ্জুন একটুকু ভীত না হইয়া ঠিক যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন অদ্য এই যুদ্ধে বিরাটরাজ্য রক্ষা তাহারই করিতে হইবে। সেই অসংখ্য সৈন্যরাশি পরিপূর্ণ বিপুল সৈন্যের নিকটে রথ উপস্থিত হইতেই,

বিরাটপুত্রের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সে ডাকিয়া সারথিকে বলিল, "এ কোথায় আনিলে! সম্মুখে একি দেখিতেছি?" অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন, "এই যে কৌরব সৈন্যবল কুমার! তোমার যে ইহাদের সহিতই যুদ্ধ করিতে হইবে।" কুমার বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ কিসের সৈন্য বল, এ যে সমুদ্র। গর্জ্জন শুনিতেছ না, ঐ দেখ তরঙ্গ দেখা যায়! মাঝে মাঝে জলযান, হাঙ্গর কুম্ভীরও দেখা যাইতেছে।" অর্জ্জুন বুঝাইয়া দিলেন, সাগর গর্জ্জন নয়, অসংখ্য সৈন্যের কোলাহল! তরঙ্গ নয়, সৈন্যদের অসংখ্য বস্ত্রাবাস! জলযান নয়, রথ সকল! জলজন্তু নয়, অশ্ব ও হস্তিগণ। অমনি কুমার বলিল, 'রথ ফিরাও, অর্জ্জুন বলিলেন, "সে কি! যুদ্ধ করিবে না? তুমি না প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ, যুদ্ধ জয় না করিয়া ফিরিবে না। কুমার বলিল "রেখে দাও তোমার প্রতিজ্ঞা! এদের সঙ্গে আমি কেন, আমার বাবাও যুদ্ধ করিতে পারিবেন না; শীঘ্র রথ ফিরাও, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব, আমায় বাঁচাও।" অর্জ্জুন ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "ছিঃ, তুমি না ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, তোমার মরিতে এত ভয়? যুদ্ধে না মরিলে কি মরিবে না? আসিত আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছি আমি পশ্চাৎ দিকে রথ ফিরাইব না।" কুমার তখন প্রাণ ভয়ে ব্যকুল হইয়া, রথ হইতে লম্ফ দিয়া নামিয়া বেগে পশ্চাৎ দিকে দৌড়িতে লাগিল। অর্জ্জুন রথকে তথায় রাখিয়াই নামিয়া, দ্রুত যাইয়া কুমারকে বল পূর্ব্বক ফিরাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই কুমার! আমিই যুদ্ধ করিব, তুমি স্থির হইয়া আমার সারথি হও।" কুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি যুদ্ধ করিবে! তুমি যুদ্ধ জান? তুমি না নপুংসক!" অর্জ্জুন বলিলেন, "প্রয়োজনের জন্য নংপুসক সাজিয়াছি। কুমার, আমিই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। শীঘ্র উঠ, শত্রু গাভী লইয়া চলিয়া না যায়। তোমার এই সামান্য অস্ত্রেত আর কৌরব জয় হইবে না। আমার গাণ্ডিব ধনু অক্ষয় তূণ আদি শীঘ্র বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া

দেও, পরে তোমায় আর সব পরিচয় দিব।" কুমার কি সহজে বিশ্বাস করিতে চায়! পরে যখন অর্জ্জুন অন্য পাণ্ডব ও দ্রৌপদীকেও চিনাইয়া দিলেন তখন বিশ্বাস হইল। পরে সমীবৃক্ষে উঠিয়া অর্জ্জুনের অস্ত্র শস্ত্র দেখিয়া আর সন্দেহই রহিল না। তখন অর্জ্জুন অগ্নিদেবদত্ত মায়ারথ ও গন্ধর্ব্ব দত্ত অশ্ব আনিয়া, যোজনা করতঃ রাজপুত্রকে সারথি করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে সম্মুখীন হইলেন। অর্জ্জুন জানিত যে তাহাদের অজ্ঞাত বাস বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই গুরুবর্গকে অস্ত্র দ্বারা প্রণাম করিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করতঃ, একে একে সমস্ত প্রধান রথীকে যুদ্ধ করিয়া বিমুখ করিলেন। হৃত গোধন সকল ফিরাইয়া আনিলেন; সমস্ত অনুবলের মধ্যেও দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহার রাজমুকুট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন ভালবাসা প্রবল বলিয়া, পর কার্য্যে জ্ঞাতি গণকে বধ না করিয়া, দৈব অস্ত্রে মোহিত করতঃ পরাজিত ও লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পরাজিত, হৃতদর্প, ছিন্নবেশ ও হতসৈন্য হইয়া দুর্য্যোধন স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেল। কৌরব সৈন্য যুদ্ধ বিমুখ হইলে, অর্জ্জুন আনন্দে বিজয় শঙ্খ বাজাইয়া, আবার বাণ দ্বারা গুরুবর্গকে প্রণাম করিলেন, গুরুগণও বাণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন; মহারথিগণ কেহ কেহ এই বাণের নমস্কার ক্রিয়া জানিতেন। একজোড়া বাণ গুরুবর্গের চরণ নিকটে যাইয়া উলটিয়া পরাই বাণের প্রণাম, আর মস্তকের নিকটে যাইয়া উলটিয়া পরাই আশীর্ব্বাদ দান। মহাভারতের সময়েও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অর্জ্জুন বিনে আর কেহ এই কৌশল জানিতেন না। অর্জ্জুন যুদ্ধ জয় করিয়া আবার সমী বৃক্ষে অস্ত্র তুলিয়া রাখিলেন এবং রাজ কুমারের সারথি হইয়া কুমারকে রথী করতঃ গোশালায় প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজপুরে যুদ্ধ বিজয় সংবাদ জানাইয়া দূত প্রেরিত হইল।

ভক্ত—এই রূপই হয় বাবা! নিবৃত্ত ভক্তকে হিংসা করিয়া, হিরণ্য

কশিপু, রাবণাদির বিশ্বজয়ী শক্তিও এমনই ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। হিরণ্যকশিপু একটী বালক প্রহ্লাদকে তাহার বিশ্বত্রাসকারী শক্তি দ্বারা অত্যাচার করিতে যাইয়াও কিছুই করিতে পারিল না! প্রহ্লাদকে অগ্নিতে দগ্ধ করিল না, বিষে নষ্ট করিল না, জলে আর্দ্র করিল না, অস্ত্রে ছেদন করিল না; ভগবৎ কৃপাই তাহাকে সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। বাবা, সেইশক্তিই বিরাটরাজ্যে অর্জ্জুনরূপে অত্য দুর্জ্জয় কৌরব আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিয়া দিলেন। ভক্তিধর্ম্ম চিরকালই এইরূপে ভগবৎ ভক্তের বিপদরাশি দূর করিয়া দেয়। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণ যেমন, অগ্নি, বিষ আদির বিজয়শক্তিকে প্রহ্লাদের গুণ বলিয়া মনে করিত, জীবও ভক্তিকে ধরিতে না পারিয়া, সেই সব শক্তিকে জীবের শক্তি মনে করে! কিন্তু বাবা, সংসারক্ষেত্রে ভীষণ বিপদের আক্রমণে ভীত হইয়া, যে ব্যক্তি হীন দুর্ব্বল হইয়াও এই রাজকুমারের মত, ভক্তিকে সারথি করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহার যুদ্ধ জয়ের জন্য সত্যই আর কোনও ভয় থাকিবে না। সে পালাইতে চাহিলেও এবং যুদ্ধ জয় ইচ্ছা না করিলেও যুদ্ধ জয় তার নিশ্চয়ই হইবে। তাহার বিপক্ষ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদির ন্যায় মহাবীরও সহজেই পরাজিত হইয়া পলাইয়া যাইবে। আবার কৌরব পক্ষেও দর্শন কর, নিবৃত্তিধর্ম্মের বাদী হইয়া, ধর্ম্ম সাধনকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আজ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সমন্বিত দুর্য্যোধন পরাজয়ের অপমান ও লাঞ্ছনা লইয়া ফিরিয়া গেল। বালক প্রহ্লাদকে দ্বেষ করিয়া হিরণ্যকশিপুর ও জানকীর উপর অত্যাচার করিয়া রাবণের, এমন ত্রিলোক বিজয়ী শক্তির বিনাশ হইয়াছিল। ভক্তি চিরকালই পৌরুষত অর্থাৎ দর্প হীন অঙ্গ তাহার বল—ভগবানের মত অসীম, তাই অর্জ্জুনকে নপুংসক ও মহাবীর দেখান হইয়াছে। জীব ধর্ম্ম বলে জয় লাভ করিয়া অনেক সময় নিজের বলেই জয়লাভ করিয়াছে বলিয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠে, কিন্তু নিবৃত্ত ভক্ত

হইলে, ভগবানই তখন তাহাকে রক্ষা করিয়া আত্মসাৎ করেন। এখন সেই লীলা শ্রবণ কর।

লীলা—বিরাট রাজা, সুশর্ম্মাকে জয় করিয়া ফিরিবার পথে সংবাদ পাইলেন যে, ভীষ্ম দ্রোণ সহিত দুর্য্যোধন উত্তর দিক হইতে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। শুনিয়াই চক্ষু স্থির, আর রাজা রক্ষার উপায় কি? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ইহারা এক এক জনেই যে পৃথিবী বিজয় করিতে সক্ষম! এতক্ষণে বুঝি তাহার রাজধানীও কাড়িয়া লইয়াছে। ধর্ম্মরাজ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় কি মহারাজ! আপনার রাজধানী জয় করিতে পারে এমন শক্তি ত্রিলোকেও নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সকলকেই পরাজিত হইয়া ফিরিতে হইবে। ধর্ম্ম পথে চলিলে ভগবান যে স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করেন! আপনি জানেন না, সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব্ব স্বামিগণ আপনার রাজ্যের রক্ষক হইয়া আছেন। কি সাধ্য দুর্য্যোধন আপনার রাজ্য কাড়িয়া লইবে। বোধ হয় এতক্ষণে তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।" ধর্ম্মরাজের উৎসাহে ও সাহসে রাজা রাজধানীতে আসিয়াই সংবাদ পাইলেন, রাজপুত্র উত্তরার নৃত্যশিক্ষক নপুংসক বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া, এক রথে কৌরবগণের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিয়াছে। শুনিয়াই রাজা পুত্রস্নেহে হাহাকার করিয়া উঠিলেন, মন্ত্রী আদির নিন্দা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, "পুত্র কি আর জীবিত আছে? সে ত গিয়াছে, এখন রাজ্য রক্ষার বন্দোবস্ত কর।" ধর্ম্মরাজ ইহাই আশা করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় অর্জ্জুন সে দিক রক্ষায় গমন করিয়াছে! তাহাই হইয়াছে শুনিয়া তাহার অপার আনন্দ হইয়াছিল। তাই আনন্দে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, বৃহন্নলা যখন গিয়াছে, স্বয়ং মৃত্যুও রাজকুমারের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না! আপনি বৃহন্নলাকে জানেন না, সে একা এক রথে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সকলকে একত্রে পরাজয় করিয়া দিতে পারে।" এমন সময়ে দূত আসিয়া সংবাদ দিল, "কৌরব

সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। রাজকুমার বিশ্রাম করিয়া আসিতেছেন; আমায় অগ্রে সংবাদ দিতে প্রেরণ করিলেন।" অর্জ্জুন রাজকুমারকে তাহাদের বিষয় আরও কতকদিন গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া, রাজকুমার কৌশলে যুদ্ধজয়ের সংবাদ দান করিল। রাজা মনে করিল, তাহার পুত্রই আজ একরথে জগতের যত শ্রেষ্ঠবীরকে পরাজয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তাই পুত্রের গৌরবে আনন্দে দিশাহারা হইলেন। আর এদিকে ধর্ম্মরাজাও আজ অর্জ্জুনের বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সকলেরই আনন্দে আজ গোল লাগাইয়া দিল। রাজা শত মুখে পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর ধর্ম্মরাজও অমনি তাহার উপরে কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুত্রের কথা কিছুই বলিতেছে না, একটা নপুংসক সারথির বার বার প্রশংসা, রাজার কাণে ভাল লাগিবে কেন? রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া, নিকটস্থ খেলিবার পাশা দ্বারা ধর্ম্মরাজকে আঘাত করিলেন, ও বলিলেন, "আমার বিজয়ী পুত্রের প্রশংসা মাত্র না করিয়া, বার বার তার সারথি, একটা নপুংসকের প্রশংসা করিতেছ!" পাশার আঘাত ধর্ম্মরাজের মুখে লাগায় রক্তপাত হইল। ধর্ম্মরাজ অমনি হস্ত দ্বারা সেই রক্ত ধারণ করিলেন, ইঙ্গিত বুঝিয়া দ্রৌপদীদেবী অমনি প্রস্তর পাত্রে জল আনিয়া নিকটে ধরিলেন। ধর্ম্মরাজ তাহাদ্বারা রক্ত ধুইয়া ফেলিলেন, রাজসভায় রক্তপাত হইতে দিলেন না। এমন সময় দূত আসিয়া সংবাদ দিল, রাজকুমার ও বৃহন্নলা আসিয়াছেন। রাজা আনন্দে বিজয়ী পুত্রকে শীঘ্র আনয়ন করিতে বলিলেন! কিন্তু ধর্ম্মরাজ দূতকে নিকটে আনিয়া বলিয়া দিলেন, "কেবল কুমারকে সভায় লইয়া আসিও, বৃহন্নলাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিও। বলিও, কঙ্কের আদেশ সে যেন রাজসভায় না আসে।" সেই আদেশ শ্রবণ মাত্র অর্জ্জুন অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন

রাজকুমার সভায় আসিয়া কঙ্কের মুখে আঘাত ও রক্তপাত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। অর্জ্জুন তাহাকে পথে বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আছে, যেই স্থানে বিনাযুদ্ধে ধর্ম্মরাজের রক্তপাত হইবে, সেই দেশকে সে অস্ত্রানলে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। এই দিকে যে তাহার রাজ্যেই সেই অপরাধ ঘটীয়া গিয়াছে! চাহিয়া দেখিল ধর্ম্মরাজ মাটীতে রক্ত পড়িতে দেন নাই। তখন বুঝিল এই জন্যই অর্জ্জুনকে তিনি রাজ সভায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজের অপার দয়া ভাবিয়া আশ্বস্ত হইয়া প্রথমেই তাহার চরণ বন্দনা করিল ও পরে রাজাকে বন্দনা করিয়া বলিল— "পিতঃ, এমন কার্য্য কে করিল? এই ব্রাহ্মণের অঙ্গে কে আঘাত করিল। পিতঃ শীঘ্র ইহাকে প্রসন্ন করুন্! বরং মৃত্যুদেব রুষ্ট হইলেও জীবনের আশা থাকিতে পারে, ইহার ক্রোধে কাহারই জীবনের আশা নাই। ইহার রক্ত যে দেশে পাত হইবে, সে দেশের কীট পোকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী, ভস্ম হইয়া যাইবে। পিতঃ, শীঘ্র ইহাকে প্রসন্ন করুন।" রাজা পুত্রের কথায় বলিল, 'পুত্র! তোমার বিজয় সংবাদে আমি তোমার প্রশংসা করিতে থাকিলে, এই ব্রাহ্মণ যেন অসহিষ্ণু হইয়া, তোমার একটু প্রশংসা মাত্র না করিয়া, বার বার তোমার সেই নপুংসক সারথিটার প্রশংসা করিতে লাগিল। তাই আমি তাহাকে পাশাদ্বারা আঘাত করিয়াছি।" পুত্র বলিল, "কি করিয়াছেন পিতা! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত মহাবীরকে পরাজয় কি আমার মত ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবে! তাঁহাদের ধনুর শব্দ শুনিয়াই যে আমি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাত্র বৃহন্নলার শক্তিতেই এই যুদ্ধ জয়লাভ করিয়াছি। একজন দেব পুত্র আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বৃহন্নলা তার সারথি ছিল। এখন শীঘ্র এই ব্রাহ্মণকে সন্তোষ করুন।" রাজা বলিলেন, "সেই দেবকুমার কে বাবা!" রাজপুত্র বলিল, "শীঘ্রই তিনি নিজে আসিয়া পরিচয় দিবেন, এখন পরিচয় দিলেন না।" পরে

রাজা ও রাজপুত্র জোর হস্তে কঙ্কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ধর্ম্মরাজ উঠিয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন ও মহারাজকে সবিনয়ে বলিলেন "মহারাজ, একস্থানে থাকিতে এমন সামান্য বিরোধ কত হয়, আমি একটুকও ক্রুদ্ধ হই নাই। ক্রুদ্ধ হইলে হস্ত দ্বারা রক্ত ধারণ করিতাম না। মহারাজ আমার রক্ত মৃত্তিকায় পরিলে সত্যই দেশের ভীষণ অমঙ্গল হইত। আপনি এই সামান্য বিষয় জন্য কিছু মনে করিবেন না!" এর পর রাজ্যে বিজয়োৎসব লাগিয়া গেল! অতিক্ষুদ্র বিরাটরাজ্য এইরূপে ছদ্মবেশী পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় দিয়া সৌন্দর্য্যে, সুখ শান্তিতে, যশে বিজয়ে আজ পৃথিবীর সমস্ত রাজাগণকে অতিক্রম করিল! আর পাণ্ডবকে পরিত্যাগ করায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরাজা, দুর্য্যোধন জগতের অজেয় বলদ্বারা বেষ্টিত হইয়াও আজ, এক ক্ষুদ্র রাজার গোধন গ্রহণ করিতে আসিয়া, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া গেল।

তত্ত্বঃ—দেখিলেত বাবা, অজ্ঞজীব এই বিরাট রাজার মতই, ধর্ম্মের বলে, ধন সম্পদ বিজয় আদি লাভ করিয়া, নিজ বলেই সম্পন্ন করিয়াছে বোধে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া উঠে এবং হঠাৎ কোনও অন্যায় করিয়া ধর্ম্মদেবকে আঘাত করিয়া বসে। অজ্ঞ জীবের সেই সামান্য ত্রুটি ও অপরাধ, ধর্ম্মদেব সত্যই এই যুধিষ্টিরের মত ক্ষমা করতঃ শোধন করিয়া লন; সেজন্য তাহার আর শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। এই জন্যই ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব। বিরাট রাজ্যে দেখিলে না! সকলই পাণ্ডবগণ করিয়া লইলেন। বিরাটরাজ নিজে ইচ্ছা করিয়া কোন প্রকার সাধনাই কখনও গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে, ভগবৎকৃপার আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত, জীবের প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইতেই পারে না। তাঁহার কৃপা হইলে তিনিই জীবকে সর্ব্ব প্রকারে

তাঁহার সেবায় উপযুক্ত করিয়া লন। শত শত অবিদ্যা মায়া ও অসুর শক্তিও তখন তাহাকে কিছুতেই বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। তাই ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে হইলেই,এই বিরাট রাজার মত মাত্র শ্রদ্ধা ও করুণার আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ কৃপা প্রার্থনার সাধনই বিশেষ প্রয়োজন। এখন বিরাট রাজ্যের পূর্ণলাভ শ্রবণ কর।

লীলা—এই যুদ্ধের চারি দিন পরেই শুভদিন শুভলগ্ন দেখিয়া পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করিয়া, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে লইয়া বিরাট রাজার সিংহাসনে রাজার মত বসিলেন, নকুল সহদেব চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, ভীমসেন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মস্তকে ছত্র ধরিলেন, অর্জ্জুন জোড় হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিংহাসন-রক্ষক দ্রুত যাইয়া রাজপুরে এই সংবাদ দান করিলে. রাজা ও রাজপুত্রগণ সকলেই সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া এই অদ্ভুতকাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইল। ব্রতপরায়ণ সভাসদ কঙ্ক সৈরিন্ধ্রীকে লইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন! সুপকার বল্লভ ছত্র ধরিয়াছে! অশ্বপাল গোপাল দুইজন চামর ব্যজন করিতেছে! কন্যার নৃত্যগীত শিক্ষক নপুংসক বৃহন্নলা পুরুষ বেশে তাহার সম্মুখে জোড় হস্তে দণ্ডায়মান! এ কি কাণ্ড! রাজাত তাহার রাজ্য করা ফুরাইল ভাবিয়া অস্থির। কেন না গত যুদ্ধে ইহাদের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছেন, ইহাদিগকে যুদ্ধে জয় করা তাহার শক্তির অতীত; তাই অতি দুঃখে কঙ্ককে বলিতে লাগিলেন, "কঙ্ক! এই কি তোমার ব্রত ছিল? আমি তোমাকে এত সম্মান ও ভালবাসা দিয়া, তার প্রতিফল কি এই প্রাপ্ত হইলাম? তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় দিয়া আজ নিজের সিংহাসন হারাইলাম।" রাজা আরও ভৎর্সনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু এমন সময় রাজপুত্র উত্তর আসিয়া বলিল, "পিতঃ; এই সেই দেবকুমার, যার বলে

আমরা সেদিন কৌরব বলকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। এই বৃহন্নলারূপী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনই সেই দেব কুমার! এই জগতে একমাত্র অর্জ্জুন বিনে একরথে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামাকে জয় করে, এমন বীর আর কে আছে! পিতঃ! আমাদের বড় ভাগ্য, পূর্ব্বপুরুষগণের অসম্ভব ধর্ম্মবল ছিল, তাই আমাদের গৃহে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীদেবীর সহিত অজ্ঞাত বাস নির্ব্বাহ করিলেন। পিতঃ, আপনার খেলাসহচর কঙ্কই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, আর যাহার কেশাকর্ষণ করিয়া আমার মাতুল কীচক সবংশে নিহত হইয়াছেন, সেই সৈরিন্ধ্রীই দ্রৌপদী দেবী। আর আপনার মল্লশ্রেষ্ঠ, সুপকার বল্লভই, পৃথিবীর অদ্বিতীয় বলশালী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন। পিতঃ এই গন্ধর্ব্বরাজই আমার মাতুলকে সমস্ত বল সহিত নিহত করিয়াছেন ও তোমাকেও সুশর্ম্মার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। আর এই অশ্বপাল ও গোপাল দুই জনই কনিষ্ঠ পাণ্ডব নকুল ও সহদেব।" রাজা ধর্ম্মরাজের পরিচয় পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিলেন; "পুত্র! সত্যই কি তাই! পৃথিবীসম্রাট পরম ধার্ম্মিক শ্রীকৃষ্ণ সখা পাণ্ডব, আমার পুরে এত দিন অজ্ঞাত বাস করিলেন। আমার রাজ্য ধন্য,পুরী ধন্য, আমাদের কুল ধন্য হইল। ভাণ্ডারের সমস্ত ধন বিলাইয়া দাও, রাজ্যে মহামহোৎসব লাগাইয়া দাও, আমার জন্ম সফল হইয়াছে। কিন্তু পুত্র! এতদিন না চিনিয়া আমরা যে ইহাদের প্রতি দাসের মত ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের উপরে আমি রাজা হইয়াছিলাম! ছিঃ, ছিঃ, এখন যে এই মুখ দেখাইতেও লজ্জা হইতেছে।" এমন সময় ধর্ম্মরাজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, মহারাজ! আমরা যে তোমার পুরে এতদিন, শিশুর মাতৃজঠরে বাসের মত নিরাপদে বাস করিয়াছি, তোমার এই উপকারের কি আর প্রতিদান আছে? আমাকে যেমন সখার অধিকার দান করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে, এখনও

সেই সখা বলিয়াই গ্রহণ কর। তাহার অধিক সম্মান ও গৌরব দেখাইলে, আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত হইব।" রাজা পাণ্ডবের মহত্ব জানিতেন, তাই আর শিষ্টাচার না করিয়া উৎসবে মত্ত হইলেন। মহারাণী পুরমহিলাগণ লইয়া, জয়ধ্বনি করিতে করিতে দ্রৌপদী দেবীকে অন্তঃপুরে নিয়া, উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনাদি করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিলেন। রাজাও পঞ্চপাণ্ডবকে রাজোচিত বেশভূষায় সাজাইয়া সেবকাদি নিয়োগ করিয়া দিলেন। এরপর রাজা অর্জ্জুনের সহিত কন্যা উত্তরার বিবাহ দানের জন্য প্রস্তুত হইলে, অর্জ্জুন শিষ্যা উত্তরা কন্যাতুল্যা বলিয়া, নিজপুত্র অভিমন্যুর সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াইলেন। সেই বিবাহ উৎসবে যাদবগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দ্রুপদ রাজাও পুত্রগণ সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পাণ্ডবের অন্য পত্নী ও পুত্রগণও আসিয়া মহাসমারোহে বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। এই স্থানেই বিরাট পর্ব্বের শেষ হইল। স্বপুরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়া বিরাট রাজা ধর্ম্ম সাধনার চরম লাভ করিলেন।

তত্ত্ব—বৎস! ধর্ম্মরাজকে সিংহাসনে দেখিয়া বিরাট রাজা যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, জীবের এই অবস্থাই নিত্য। জীব যে পূর্ণরূপে অসুরত্বের অধীন হইয়া স্বরূপ ও অধিকার হারাইয়া বসিয়া আছে, তাহার খবরও সে রাখে না। তাহাই বিরাট রাজা পূর্ব্বে কীচকের অধীন হইয়াছিল, তাহার অত্যাচারের প্রতিবিধানেও তার শক্তি ছিল না, তবু তাহাতে তিনি অসুখী বা দুঃখিত ছিলেন না। কিন্তু ধর্ম্ম বিধির অধীন হইতে বলিলেই জীব, নিজের স্বাধীনতা বুঝি গেল বলিয়া, তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিবে: অবিধির অধীন হইয়া বিধি পালন করিব না, এই ভাবটী যেন অবিধির অধীনতা নয়। কেবল বিধির অধীন হইয়া অবিধি ত্যাগই বিধির অধীনতা। তাহাই ধর্ম্মরাজকে সিংহাসনে দেখিয়া ভীত হওয়া। কিন্তু জীব ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে পরে ধর্ম্মকে চিনিতে

পারিলে, সেই যে তাহার যথার্থ প্রভু, স্বরূপদাতা, মহা বান্ধব জানিতে পারিয়া, এই বিরাট রাজা যেমন ধর্ম্মরাজকে চিনিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিল, তেমনি মহানন্দে ধর্ম্মকে গ্রহণ করে, কন্যা উত্তরাকে তাহাদিগকে দান করিয়া দেয়। এই কন্যাটীকে চিনিলে কি বাবা? প্রত্যেক জীবেরই দুইটী কন্যা আছে, একটী উত্তরা অন্যটী দক্ষিণা। এই উত্তরা কন্যা ধর্ম্মকে দান না করিতে পারিলে, কিছুতেই জীবের সাধনযজ্ঞ পূর্ণ হয় না। ধর্ম্মদেবও সত্যই এই পাণ্ডবদের মত নিজে সেই কন্যাকে বিবাহ না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধ করাইয়া দেন। তখন জীবের ঘরে সব পুত্রকন্যা সহিত দ্রুপদরূপ ভাগ্যদেবতা ও শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবান্ আসিয়া দেখা দেন। জীবনের দুইটী কাল বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বা ইহকাল ও পরকাল; ইহাই দক্ষিণকাল ও উত্তরকাল কন্যাদ্বয়। যাহারা পরকালরূপ উত্তরাকে ধর্ম্মদেবের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়, ধর্ম্মদেব সেই কাল-কন্যাকে, সু+ভদ্র অর্থাৎ কল্যাণের পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া দেন। সেই কল্যাণও সহজ কল্যাণ নয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী অর্জ্জুনের পত্নী কল্যাণের অর্থাৎ জীবকে ভক্তি ও ভগবান সম্বন্ধীয় মঙ্গলের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দেন। তাই তখন জীব সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য, বৈরাগ্য, বিনয়, সমাধি, ইত্যাদির অধিকারী হয় ও স্বয়ং ভগবনেকেও লাভ করিয়া জীবন সার্থক করে। এই তত্ত্বই অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ ও সেই বিবাহে, সপুত্র ভাগ্যদেবতা দ্রুপদ রাজা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণ সহিত আগমন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া বিরাট পর্ব্বের শেষ করা হইয়াছে।

শিষ্য—প্রভু! এই পর্ব্বে কয়টী প্রশ্ন রহিয়া গেল। প্রথমে ধর্ম্মরাজ নিজের নাম কঙ্ক ও ধর্ম্মরাজের সভাসদ ছিলাম বলিয়া যে মিথ্যাপরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে কি ধর্ম্মরাজের মিথ্যাকথা বলা হইল না?

গুরু—না বাবা, এই মিথ্যা পরিচয়ে, মিথ্যার অপরাধ স্পর্শে নাই। হিন্দু শাস্ত্র মতে, 'ঈশ্বর মঙ্গলময় সৎ' তিনি মঙ্গলময়, অসতের সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাই জগতে কোন কর্ম্ম অকরণীয় বা অসৎ নয়, করিতে পারিলে অকর্ম্মও সুকর্ম্ম হয়; আর করিতে না পারিলে সুকর্ম্মও অকর্ম্ম হইয়া অসৎ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যেমন প্রাণ নাশক বিষ ব্যবহার করিতে পারিলে মরণোন্মুখ রোগীর জীবন রক্ষা করে, আবার জীবের জীবনোপায় অন্নও ব্যবহার দোষে মরণের কারণ হয়। তাই কোন কার্য্যই শুধু সৎ বা অসৎ নয়। প্রত্যেক কর্ম্মই করিবার ভাব ব্যত্যয়ে সৎ ও অসৎ হয়। অযথার্থ কথা কোন্ কোন্ স্থানে বলিবার প্রয়োজন, তাহা প্রদর্শন জন্যই এই অসত্য কথার কথাও মহৎ ও জ্ঞানবানদের কর্ম্মাদর্শ দ্বারা পুরাণে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; নচেৎ গোপন করিয়া গেলেই পারিতেন। ধর্ম্মরাজ যখন এইরূপ করিয়াছেন, তখন এইরূপ করিলে অপরাধ হয় না নিশ্চয় জানিবে। বাবা, এই কথা যদি মিথ্যা বলা হয়, তবে অজ্ঞাত বাস প্রতিজ্ঞাই যে হইতে পারে না। থাকিব দেখিবে না, ইহার অর্থই যে মিথ্যাময়। এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ, খেলায়, রহস্যছলে, বিপন্ন রক্ষায়, অবোধ বালক ও রমণীর নিকটে মিথ্যা বলিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে মিথ্যায় কাহারও অনিষ্ট নাই, নিজেরও স্বার্থসাধন নাই এবং পরে প্রকাশ করিয়া সত্যকথা বলিয়া যাওয়া যায়, তাহা মিথ্যাকথা নয়। সময়ে যেমন হত্যাকার্য্য করিয়াও ধর্ম্ম এবং জীবন রক্ষা করিতে হয়, তাহাতে অপরাধ হয় না, প্রয়োজনে মিথ্যা কথাও বলা যাইবে না কেন?

শিষ্য—অর্জ্জুনের প্রতি স্বর্গনর্ত্তকী অপ্সরার নপুংসক হইবার অভিসম্পাৎ তত্ত্ব বুঝাইয়া বলুন প্রভু।

গুরু—নিবৃত্ত সাধকের যে কিছুতেই অনিষ্ট হয় না, এবং ভক্তিবলে জীব কত বড় জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, এই উপাখ্যান তাহার জীবন্ত

দৃষ্টান্ত। বনপর্ব্বে অর্জ্জুন মহাদেব আরাধনায় সিদ্ধ হইয়া, তাঁহাদের সব অস্ত্র শক্তিআদি লাভ করিলে, কালকেয় নামক অসুরদিগকে বধ করিবার জন্য দেবরাজ অর্জ্জুনকে স্বর্গে লইয়া যান। তাহারা বরপ্রভাবে দেবতাদের অবধ্য ছিল। সেই অসুরসকলকে বধ করিয়া দিলে দেবরাজ অর্জ্জুনকে নানা প্রকারে সৎকার করিয়া দেব উৎসব দর্শন করান। সেই উৎসবে স্বর্গ নর্ত্তকী অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীও নৃত্য করেন! অর্জ্জুন বার বার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলে, দেবরাজ রাত্রিতে উর্ব্বশীকে তাহার সেবা করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্জ্জুন নিজে মর্ত্ত্যবাসী হইয়া উচ্চলোক স্বর্গবাসিনী তাহাতে পিতা দেবরাজের সেবিকা উর্ব্বশীর সেবা গ্রহণে কুণ্ঠিত হইলেন এবং চন্দ্রবংশের আদিমাতা বলিয়া, কিছুতেই তাহার সেবা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। চন্দ্রতনয় বুধের পুত্র পুরুরবা ও উর্ব্বশী হইতেই এই বংশের বিস্তার হয়। উর্ব্বশী সর্ব্বপ্রকার হাবভাব অনুনয় আদি দ্বারাও অর্জ্জুনের সেই দৃঢ়তা নাশ করিতে না পারিয়া, একটী সামান্য নর তাহাকে উপেক্ষা করিল ভাবিয়া ক্রুদ্ধা হইলেন ও অভিসম্পাৎ করিলেন, "তুমি নপুংসক হইবে।" কিন্তু পরেই অর্জ্জুনের মহত্ব জিতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি দেখিয়া, এবং তাহারই বংশীয় জানিয়া স্নেহে বলিয়া দিলেন, "যদিও তুমি আমারে উপেক্ষা করিয়াছ বলিয়া আমি অপ্সরাসমাজে একটু হতমান হইয়াছি, তবু তোমার মহত্বে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমায় এই বর দিয়া গেলাম, নপুংসকত্ব এক বৎসর ভোগ করিতে হইবে। তাহাও তোমার ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারিবে।" অর্জ্জুন অভিশাপের বলেই নপুংসক হইয়া অজ্ঞাত বাসে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপই বাবা, নিবৃত্ত সাধককে অভিশাপও বরের কাজ করিয়া, পরম মঙ্গল দান করে। আর অর্জ্জুন ভক্তিবলে প্রকৃত মাতৃভাব আরোপ করিতে পারাতেই, স্বর্গ-নর্ত্তকী, তাহাতে অপ্সরা প্রধানা উর্ব্বশীকে দেখিয়া, তাঁহার হাব ভাব কটাক্ষেও

অনায়াসে স্থির থাকিতে পারিয়াছিলেন। সে যে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে কামদেবের মীনচক্র ভেদ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই উর্ব্বশীতেও তাহার কামোদ্রেক হইল না।

শিষ্য—প্রভু! ধর্ম্মরাজের দ্রৌপদীসহ রাজা হওয়া, ভীমসেনের ছত্র-ধরা, কনিষ্ঠগণের চামর ব্যজন, অর্জ্জুনের আদেশ প্রতীক্ষা ও কর্ম্মভার গ্রহণ রূপভাবে বিরাটপুরে প্রকাশমধ্যেও কি কোন প্রকার সার্থকতা আছে।

ঋষি—আছে বৈকি বাবা! ধর্ম্মের স্বরূপটীই এই স্থানে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। ধর্ম্মের ষড়অঙ্গ লইয়া জ্ঞানদেব কিরূপে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হন, এইটী তাহার সত্য স্বরূপ। জ্ঞানের শক্তিই সন্তোষ, তাই তাহাকে বামে সিংহাসনে বসান হইয়াছে। এই দেবীকে বামে না বসাইতে পারিলে কিছুতেই জ্ঞানদেবের প্রতিষ্ঠা হইবে না। এই দুইয়ের সর্ব্বপ্রকার তাপ ও বাধা আবরক শক্তিই যোগসত্তা। তাই ভীমসেন অস্ত্র লইয়া ইহাদের মাথায় ছত্রধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, যেন ইহাদের উপরে কিছুই না পড়িতে পারে, কিছুতেই যেন ইহাদিগকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া না দেয়। বিশ্বদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ দর্শিতা কর্ম্মযোগদ্বয় দ্বারা সেই জ্ঞান সন্তোষের তাপ নাশ করতঃ সেবা করিতে হয়, তাই নকুল ও সহদেব চামর ব্যজন করিতেছেন। তখন জ্ঞানাদির পূর্ণতা লইয়া অর্জ্জুনের মত ভক্তের লীলা প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহাই অর্জ্জুনের আদেশ প্রতীক্ষা। জীব এইরূপ ধর্ম্ম লাভ করিলে তখন ভগবানের পূর্ণকৃপা পাইয়া কৃতার্থ হয়। বাবা, ধর্ম্মরাজের এই রাজরূপটী ধর্ম্মদেবের ষড়ঙ্গ সমন্বিত পূর্ণমূর্ত্তি। এখন উদ্যোগ পর্ব্ব শ্রবণ কর!

উদ্যোগ পর্ব্ব।

পরিচয়।

সত্ত্বমিশ্র রজ বা মোহিনী প্রকৃতির সংবাদ।

শাস্ত্র বিধিমতে সাধনাদি দ্বারা অন্য জীব অতিরিক্ত শুধু মানবশক্তির আধ্যাত্মিক জ্ঞান বীর্য্যাদির জাগরণে অহঙ্কারী হইয়া, যাহারা সেই শক্তি দ্বারা দেবত্বের তৃপ্তি ফেলিয়া আসুরিক দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিপথে ধাবিত হয়, তাহাদের অবস্থা ও লাভালাভই এই পর্ব্বে বর্ণিত হইবে।

১। মোঘআশা—পশুপ্রকৃতি জীব, ইহারা পশু ও রাক্ষসের মত কিছুতেই ধর্ম্মলাভে সক্ষম হয় না। মোঘকর্ম্মা—সাংসারিকজীব, বিরাট রাজার মত শ্রদ্ধা করিয়া ভগবৎভক্তকে আশ্রয় দিয়া এবং তাহাদিগকে কার্য্যভার দান করিয়া অবিদ্যা কীচকের হস্ত হইতে মুক্ত হয়। মোঘজ্ঞানা—মোহিনীপ্রকৃতি-গতজীব, রাবণত্ব হিরণ্যকশিপুত্ব ইত্যাদি লাভ করিয়া দেবত্ব অধিকারী বা অপহারী ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের বিরোধী মহা অসুর হইয়া উঠে। কিছুতেই ভক্তিধর্ম্মে ও দেবত্বে শ্রদ্ধা আনিতে পারে না। (ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে তাড়াইয়া অসুর দুর্য্যোধনের তৃপ্তি করিতে যাইয়া, পূর্ণরূপে পাণ্ডবের বিপক্ষ হইয়া উঠিল, আর তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেই পারিল না।

২। মোহিনীপ্রকৃতি—অমানুষশক্তি, যোগবল দ্বারা বিষয় জগতের বিজয়, ধনসম্পদ, দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তি আদি ভোগ করিলেই,

তাহার বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্মেচ্ছা, দয়া ইত্যাদি সমস্ত, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় অসুর ভাবদ্বারা কলুষিত হইয়া বিকৃত হইয়া যায়। জীব তখন ধার্ম্মিক-দিগকে অগ্রাহ্য করে, ভগবান্‌কে অস্বীকার করে ও আত্মজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের বিপক্ষে দারুণ যুদ্ধ ঘোষণা করে! (ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদির অমানুষ শক্তি বীর্য্যাশ্রয়ে দুর্য্যোধনাদির তৃপ্তি করায়, ভীষ্ম, দ্রোণাদিও অসুরভাবাপন্ন হইয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞাধীন হইয়া পড়িল। ধৃতরাষ্ট্র ঋষিদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন, বিরাটরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও অস্বীকার করিলেন ও আত্মজ্ঞান-বিদুরকে তাড়াইয়া দিয়া পাণ্ডবের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।)

৩। **মোহিনী প্রকৃতির অধ্যাত্ম শক্তি** ভগবানের কি শক্তি ও **দেবপ্রকৃতির আধ্যাত্ম শক্তিই** বা ভগবানের কি শক্তি, ইহার কোন্ পন্থাকে ভগবান্ প্রীতি করেন, কোন্ সাধনায় ভগবান্ লাভ হয়, তাহাই দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ বরণে প্রদর্শিত হইবে। মোহিনী-প্রকৃতি শক্তিকে বরণ করিবে আর দেবপ্রকৃতি ভগবানকে বরণ করিবে। অসুরের চরম ফল তাহারা রজোগুণ মাদ্রীদেবীর ভ্রাতা মদ্ররাজকে কৌশলে আয়ত্ত করিবে, আর সত্ত্বগুণ কুন্তীদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা লাভ করিবে।

৪। **ভগবানের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব কি**—তিনি কাহার নিকট নির্গুণ ও কাহার নিকট সগুণ, কেন তিনি ভক্তের নিকট নির্গুণত্ব রক্ষা করিতে পারেন না, সর্ব্বভূতে সমভাব হইয়াও ভক্তের বেলায় বিষম হইয়া উঠেন কেন, ভক্তের সখা, সারথী, দূত ইত্যাদি হইয়া এবং কখন বা ভীষণ যুদ্ধ করিয়াও ভক্তের শত্রুনাশ করিয়া সেবাদি করেন কেন, তিনি কাহার সেবা গ্রহণ করেন, সকাম সাধনায় ভগবান্ লাভ হয় না কেন, এই সমস্ত তত্ত্ব দুর্য্যোধনের নিকট নিদ্রিত ও অর্জ্জুনের নিক

জাগরিত, অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে বরদান, দুর্য্যোধন সভায় দূত হইয়া যাইয়া তাঁহার উপহার উপেক্ষা করিয়া বিদুরের ক্ষুদ গ্রহণ এবং বিরাট রূপ দর্শনাদির মধ্যে প্রকাশ করা হইবে।

এইরূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল ধ্বংস করিয়া যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন অন্যায় করেন নাই, তাহারা নিজেদের স্বভাব ও কর্ম্মদ্বারা এইরূপ ফলই পাইবার যোগ্য, তাহা এই পর্ব্বে প্রদর্শন করিবেন।

উদ্যোগ পর্ব্ব।

সত্ত্বমিশ্ররজ বা মোহিনী প্রকৃতি সংবাদ।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে শ্রীচৈতন্যদেবস্য ॥

গুরু—বৎস! অসুরপ্রকৃতি তিনপ্রকার বলিয়া গীতায় ব্যখ্যাত হইয়াছে। মোঘআশা—রাক্ষসী, মোঘকর্ম্মা—আসুরী, ও মোঘজ্ঞানা—মোহিনী প্রকৃতি। ইসলাম গ্রন্থে এই তিনকে পশু জীবন, সংসার জীবন, ও নর জীবনের বন্ধন বলা হইয়াছে; এই তিনের উপরে দেবপ্রকৃতি। আশা সম্বন্ধে অজ্ঞ অর্থাৎ স্বদেহেন্দ্রিয়ের উপয়ের আর কোন সুখের আশা করে না, এই পশু প্রকৃতিই মোঘআশা—রাক্ষসীপ্রকৃতি—পশুজীবন। মহাভারতে বক-আদি রাক্ষসগণ। স্বদেহেন্দ্রিয়ের উপরেও স্বপরিবার, স্বদেশ, স্বজাতি প্রভৃতির তৃপ্তি লইয়া যে জ্ঞানের গণ্ডিকরা—অন্যপরিবার, অন্যদেশ, অন্যজাতি ধ্বংস করিয়াও স্বপরিবার, নিজদেশ, নিজজাতিকে সুখী করিবার মতি জন্মে, তাহাই মোঘকর্ম্ম, আসুরী প্রকৃতি—সংসার জীবন। মহাভারতে বিরাটাদি ক্ষুদ্র রাজগণ। আর বেদাদি অধ্যয়ন ও ধর্ম্মসাধনাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বীর্য্য জাগাইয়াও যে ভগবানের আরাধনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, সেই সব শক্তিদ্বারা দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি আদির তৃপ্তি করিতে চেষ্টাকরে, ধর্ম্মসাধন ত্যাগ করে, ভগবানে ভক্তি ও নির্ভরতা ত্যাগ করে,

তাহাই মোহিনী প্রকৃতি বা নরজীবন। ইহাতে জীবকে নরই থাকিতে বলে, দেবতা হইতে দিতে চায় না। মহাভারতে জরাসন্ধ ও দুর্য্যোধনাদি দ্বারা সেই প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

বাবা! রাবণ, হিরণ্যকশিপু আদি অসুররাজগণ বেদবিহিত তপস্যাদি ধর্ম্মসাধন করতঃ, দেবতাদি দর্শন ও অষ্টসিদ্ধি আদি সর্ব্বপ্রকার অমানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বীর্য্য লাভ করিয়াও সেই সিদ্ধশক্তি আদিদ্বারা অসুরত্বের তৃপ্তি, দেহেন্দ্রিয় প্রবৃত্তির সেবা আরম্ভ করিলেন; ধর্ম্মসাধন ও আলোচনা ত্যাগ করিলেন। তাই কতকদিন পরে পূর্ণ অসুরত্বের আয়ত্ত হইয়া ধর্ম্মদ্বেষী, দেবদ্বেষী, ও ভগবৎ দ্বেষী পর্য্যন্ত হইয়া আত্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দিলেন এবং ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের উপর পীড়ন আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ তাহাদের সকলপ্রকার সিদ্ধশক্তিআদি হরণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তাহারা নষ্ট হইল তবুও আর দেবত্ব ধর্ম্মসাধনকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদ্বারা কৌরবকুলকে জগতে অপ্রতিদ্বন্দী সুখের, শক্তির সম্মানের অধিকারী দেখিয়া, এখন পাণ্ডবদিগকে ত্যাগ করতঃ, অসুরত্ব দুর্য্যোধনের তৃপ্তিকরিতে যাইয়াও ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক দ্বেষী অসুর হইয়া উঠিবে। এখন ঋষিদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবে—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভগবত্তা—বিরাটরূপ দেখাইয়া সন্ধি করিতে বলিলেও তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবে, পরে আত্মজ্ঞান বিদুরকে কটুবাক্যে তাড়াইয়া দিয়া, স্ব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতঃ পাণ্ডবকে নাশ করিতে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে; কিছুতেই আর ধর্ম্মপথ গ্রহণে সমর্থ হইবে না। তখন ভগবান্ রাবণাদির মত তাহাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সেই নির্গুণ নিরপেক্ষ নিষ্ক্রিয় ভগবান্, কেন ধর্ম্মের পক্ষ হইয়া অধার্ম্মিককে বধ করিয়াও তাঁহার ভক্তগণকে রক্ষা করিতে বাধ্য হন, উদ্যোগপর্ব্বে সেই রহস্যই এখন লীলার মধ্যে শ্রবণ কর।

লীলা—অভিমন্যুর বিবাহান্তে শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রুপদাদি একত্র হইয়া, বর্ত্তমানে পাণ্ডবদের কি কর্ত্তব্য তাহা নির্ণয় করিলেন। মাত্র পঞ্চপাণ্ডব রাজ্যে ফিরিয়া গেলে সেই পাষণ্ডগণ তাহাদের প্রতি আবার যদি কোন অধর্ম্ম অত্যাচার করিয়া বসে, তাই ধার্ত্তরাষ্ট্রদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিবার জন্য, দ্রুপদ রাজার বৃদ্ধ পুরোহিতকই পাণ্ডবের দূত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট• প্রেরণ করা স্থির হইল। তিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডব সপরিবারে ইন্দ্রপস্থে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে বলিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি প্রার্থনা করিবে ও সেই পক্ষে যুক্তি আদি দেখাইবে। তাহাতে না হইলে পাণ্ডব যে হীনবীর্য্য নয়, গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে ও গোগৃহ-যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছে, সেইসব বলিবে। পরে পাণ্ডব যে অসহায় নয়, তাহাদের আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদ আদি সকলেই যে পাণ্ডবের প্রতি অত্যাচারের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার প্রতিশোধের সুযোগই অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাও বলিবে। আরও বলিবে, এইবারও যদি পাণ্ডবদিগকে ন্যায্য অধিকার না দিয়া বঞ্চনা দ্বারা অধর্ম্মাচার করে, তবে তাহাদিগের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ ধৃতরাষ্ট্রই করিয়া দিবেন, সেজন্য তিনিই দায়ী হইবেন। স্ববলে শ্রীকৃষ্ণ, স্ববলে দ্রুপদ, মদ্ররাজ, চেদীপতি মগধপতিআদি মিলিত হইলে, পাণ্ডববল কেমন আকার ধারণ করিবে ধৃতরাষ্ট্র যেন একটু বিচার করিয়া দেখেন, বলিয়া ভয় প্রদর্শনও করিতে বলিয়া দিলেন। দ্রুপদ-পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্র সভায় আসিয়া পাণ্ডবের প্রার্থনা জানাইতেই দুর্য্যোধন উচ্চৈঃস্বরে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল, "পাণ্ডবকে কিছুতেই রাজ্যাধিকার দেওয়া হইবে না। এই কৌরবরাজ্যে তাহাদের কোন প্রকার ন্যায্য অধিকারই নাই। আমি বালক ছিলাম, তাই পিতা যখন তাহাদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন, তাহাতে বাধা দিতে পারি নাই। অদ্য আর আমি বালক নই! পিতা অন্যায়পূর্ব্বক আমার অধিকার অন্যকে

দান করিতেছেন দেখিলে, আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। পাণ্ডবের এ রাজ্যে কিসের অধিকার? রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনই পাইবে।” দ্রুপদপুরোহিত বলিলেন, “ধৃতরাষ্ট্রতো রাজা নন! এ রাজ্য যে ভারতসম্রাট্ পাণ্ডুর রাজ্য, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রই যে রাজা হইয়াছেন; ধৃতরাষ্ট্র যে সম্রাট্ পাণ্ডুর প্রতিনিধিরাজা ছিলেন মাত্র।” দুর্য্যোধন অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, “পাণ্ডু স্বার্থপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া জ্যেষ্ঠের অধিকার হরণ করিয়াছিল। নচেৎ জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কেন রাজা হইবে? ব্রাহ্মণেরা চক্রান্ত করিয়া একটী কল্পিত শাস্ত্রবচন দেখাইয়াছিল। আমি সেই সব শাস্ত্র মানি না। এই রাজ্য আমার। পাণ্ডবদিগের এ রাজ্যে কোনই অধিকার নাই।” দুর্য্যোধনের এই স্বাধীন ব্যবহার ও উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ অভিভাবকগণ ও ধৃতরাষ্ট্র স্তম্ভিত হইলেন, কি যে বলিবেন স্থির করিতেই পারিলেন না। তখন দূত শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদআদির সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণের ভয় দেখাইলেন, পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ আদির বলবীর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন বলিল “সেই ভাল! তাহাই হউক। তাহাদিগকে বলিবেন কুরুরাজ্য হয় পাণ্ডবের, না হয় ধার্ত্তরাষ্ট্রের—একজনেরই হইবে, দুই পক্ষের স্থান তাহাতে আর নাই। যদি পাণ্ডব কুরুরাজ্যে অধিকার চায়, ধার্ত্তরাষ্ট্র কুলকে সমূলে ধ্বংস না করিয়া তাহা পাইবে না। আমি বিনাযুদ্ধে একটী সূচ্যগ্র-ভূমিও তাহাদিগকে দিব না।” রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাষণ্ড পুত্রের তেজ ও বিপক্ষতা দেখিয়া স্তম্ভিত ও রাজ্যচ্যুতির ভয়ে ভীত হইলেন, এই নির্লজ্জরাজা দীনভাবে দূতকে বলিলেন—“আপনি কুরুবংশের গৌরব, জগৎপূজ্য পাণ্ডদিগকে এই অকর্ম্মণ্য, বৃদ্ধ, অন্ধ জেষ্ঠতাতের স্নেহাশীর্ব্বাদ দান করিয়া বলিবেন—আমি যেই পুত্রগণের মোহে অভিভূত হইয়া, একদিন তাহাদের প্রতিও পক্ষপাত করিয়াছিলাম,

সেই পুত্রই এখন আমায় আর গ্রাহ্য করে না; নিরুপায় বৃদ্ধ এখন পুত্র-শাসনে অক্ষম। তাই সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও অত্যাচারিত, দুঃখপ্রাপ্ত, প্রিয় ভ্রাতষ্পুত্রগণের দুঃখ দূর করিতে, এমন কি, তাহাদের ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া দিতেও আমি অশক্ত। পাণ্ডব পরমধার্ম্মিক, মহাবীর্য্যবান্, আমার হতভাগা পুত্রগণ কোনরূপেই তাহাদের ক্রোধের যোগ্য নয়। তাই শিশুকালহইতে, কত অত্যাচার সহিয়া সেই ভ্রাতৃগণকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে ও গোগৃহ-যুদ্ধে হাতে পাইয়াও জীবন রক্ষা করিয়া দিয়াছে। আজও যদি ক্ষমা করিয়া রক্ষা করিতে পারে, তবে যেন তাহাই করে। নচেৎ পাষণ্ডকুল ধ্বংস করিয়া, জগতের আবর্জ্জনা অশান্তি দূর করুক। তাহাতে আমার আর বাধা বা নিষেধ নাই।" দূত ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণাদিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তত্ত্ব—বৎস্য! অদ্য দুর্য্যোধন সত্য অসুর-স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। অসুর কখনই দেবত্বের সহকর্ম্মি হয় না। অধিকার লইয়া এই দেবাসুর বিরোধ চিরকালই চলিবে। অসুর কুল ধ্বংস না করিতে পারিলে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা ও ধার্ম্মিকের বিশ্রাম সুখ অসম্ভব। অসুর যখন বর্দ্ধিত হইয়া এই রাবণত্ব লাভ করতঃ নিবৃত্তিধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখনই ভগবান্ "পবিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্" হইয়া প্রকাশিত হন, এক অসুর ধ্বংস করিয়া সাধু রক্ষা করতঃ ধর্ম্ম স্থাপন করেন। তাহাই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলের সংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবেন।

লীলা—ধার্ত্তরাষ্ট্রদের উত্তর শুনিয়া পাণ্ডবপক্ষের সকলেই যুদ্ধ করতঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলদেব বলিয়া উঠিলেন, "আমি ত এই

ক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের তত অধিক দোষ দেখিতেছি না! স্বার্থসাধনে, অভীষ্টলাভ-প্রতিযোগিতায় এমন চতুরতা চেষ্টাদি কি প্রশংসনীয় নয়? কপটপাশার কপটতা দ্বারা কেমন সুন্দর ভাবে পাণ্ডবকে বোকা বানাইয়া স্বার্থ করিয়া লইয়াছে! কেমন বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে! পাণ্ডবই এমন প্রতিযোগী, কুটীল অসুরকে অযথা বিশ্বাস করিয়া, অসাবধানে পাশাখেলা স্বীকার করিয়া, বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ করিয়াছে! তবে অত্যাচার—পাণ্ডব অত্যাচার সহিল কেন? গায়ে কি বল ছিল না? দুর্ব্বল হইলে অত্যাচার সহিতেই হয়। তবে যদি পাণ্ডব ক্ষমা করিয়া থাকে, তাহাদের ত্যাগমহত্ব দেখাইয়া থাকে, পাণ্ডব উত্তমরূপে তাহা দেখাইয়াছে। বনবাসে অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডব অসম্ভব দেবত্ব মহত্ব দেখাইয়াছে। বুদ্ধিবলে ধার্ত্তরাষ্ট্র বিজয় লাভ করিয়া সুখ ভোগ করিয়াছে, আর পাণ্ডব বুদ্ধিদোষে পরাজয় ও দুঃখ ভোগ করিয়াছে। ইহাতে অন্যের ক্রুদ্ধ হইবার কি কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ! উভয় পক্ষই আমাদের আত্মীয়, তাই আমার ইচ্ছা যাদবগণ কোন পক্ষেই অস্ত্র ধারণ না করে। আর এই ক্ষত্রিয়ধ্বংসকর দারুণ যুদ্ধ যাহাতে না হয় তুমি তাহারই চেষ্টাকর"। শ্রীকৃষ্ণ দাদার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিলেন, "বেশ তাহাই হইবে। আমাদের বংশ রাজা উগ্রসেনের অধিকারের কেহই কোন পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে না; অন্য যাদবগণ যাহা ইচ্ছা করিবে। আমিও কোন পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিব না। কিন্তু আমি অস্ত্র ধারণ করিব না জানিয়াও, যদি তাহারা আমার নিকট অন্য কিছু সাহায্য প্রার্থী হয়, আমিতো ফিরাইয় দিতে পারিব না। তবে তাহাতে ও আমি পক্ষপাত করিব না, প্রার্থী হইলে উভয় পক্ষকেই সাহায্য করিব।" ইহার পর পাণ্ডবকে ধৃতরাষ্ট্র রাজাধিকার না দিলে, বল-পূর্ব্বকই সে অধিকার গ্রহণ করা উচিত নির্ণয় করিয়া, পাণ্ডবপক্ষে

রাজা দ্রুপদ ও বিরাটকে যুদ্ধায়োজন ও আত্মীয়গণকে সংবাদ দানের ভার দিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেশে চলিয়া গেলেন। রাজা দ্রুপদ পাণ্ডব আত্মীয় ও বাধ্য রাজগণের নিকট পাণ্ডবের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া, সাহায্য জন্য স্বসৈন্যে আহ্বান করিয়া দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ইচ্ছা থাকিলেও পুত্রের বিরুদ্ধাচারে রাজ্য দিতে অক্ষম? ইচ্ছা করিলে পাণ্ডব যুদ্ধ করিয়া অধিকার গ্রহণ করিতে পারে বলায়, পাণ্ডবের যুদ্ধজন্য ধৃতরাষ্ট্র আদেশলাভ হইল; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশও হওয়ায় যুদ্ধ করিতে পাণ্ডবের আর কোনও বাধাই রহিল না। বিশেষ ভীম অর্জ্জুনাদি কৌরবের অধর্ম্মাচারে অত্যন্ত উত্যক্ত বলিয়া, প্রতিশোধের জন্য ইচ্ছুক হইয়া উঠিয়াছিল।

ভক্ত—বাবা, বলদেবের দুর্য্যোধনের প্রশংসাকরা ও শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করার মধ্যেও বেশ একটু রহস্য আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত মাধুর্য্যময় ভগবৎসত্তা, আর বলদেব গুণসমন্বিত ঐশ্বর্য্যময় ভগবৎসত্তা। জগতের সৃজন ও পালন কর্ত্তা এই গুণময় দেবতা। তিনি প্রত্যেক গুণের ক্রিয়া, কৌশল, লীলা দেখিয়াই সমান আনন্দিত হন ও প্রশংসা করেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় মধ্যে যাহারা উত্তমরূপে পাগল বা দস্যুর অভিনয় করিতে পারে, তাহাকে কি দর্শকগণ প্রশংসা করেন না? তাই বলদেব, দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুরতাময় কুটীল অসুর লীলাকৌশল দেখিয়াও যেমন আনন্দিত হইয়াছেন, আবার পাণ্ডবের অপূর্ব্ব ত্যাগ, ক্ষমা ইত্যাদি দেবত্ব মহত্ব দেখিয়াও তেমনই তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি কাহারও পক্ষে যোগ দিয়া এই লীলা খেলার এখনই শেষ করিতে প্রস্তুত নন। তাই অদ্য শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ দেখিয়া যখন বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন অসুরের অসুরত্বে ক্রুদ্ধ হইয়া এই লীলার শেষ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—তাঁহার সৃষ্টি বিকর্ষণ ইচ্ছার শেষ

হইয়া, যেন আকর্ষণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তখনই শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিতে বলিলেন, আমার ইচ্ছা তুমি অস্ত্র ধরিও না অর্থাৎ এখনই সৃষ্টিলীলার সংহরণ করিও না, আরও কতদিন দেবত্ব অসুরের লীলা হউক আমি দেখি। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন। এখন পরের লীলায় দেখাইবেন, আমি উপেক্ষা করিলে কি হইবে, অসুর তাহার অসুর স্বভাবে আপনিই ধ্বংসের পথে নামিয়া যায়, ভগবান্ ইচ্ছা করিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। এখন সেইসব লীলা শ্রবণ কর।

লীলা—গুপ্তচর মুখে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের কথা দুর্য্যোধনও শ্রবণ করিল। আরও শুনিল এই যুদ্ধবিমুখ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তগত করিতে অর্জ্জুন যাত্রা করিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে আগেই হস্তগত করিবার জন্য দুর্য্যোধন দ্রুতগামী রথে দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবকে সাহায্য না করিতে পারে তাহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। যাইয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত হইয়া আছেন, তাই দুর্য্যোধন তাঁহার জাগরণের অপেক্ষা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের দিকে স্থাপিত, তাঁহার স্বর্ণ-সিংহাসনেই যাইয়া বসিয়া রহিল। কতকক্ষণ পরে অর্জ্জুনও যাইয়া উপস্থিত হইল ও শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিত দেখিয়া, ধীরে ধীরে পদযুগল কোড়ে লইয়া চরণ সেবায় ব্রতী হইল। দুর্য্যোধন কৌরব রাজকুমার, তাতে অসীমবীর্য্যশালী অর্জ্জুনের এমন দাসের মত শ্রীকৃষ্ণসেবা দেখিয়া, বড়ই হীনতা ও অপমান বলিয়া বোধ করিল। কতকক্ষণ চরণ চাপিতেই শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইয়া, প্রাণের সখা অর্জ্জুনকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দে জড়াইয়া ধরিলেন ও সকলের কুশল সম্ভাষণ করিয়া, হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধে সাহায্যপ্রার্থী জানাইতেই, শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া দুর্য্যোধনকে সিংহাসনে দেখিতে পাইয়া, সহাস্যে তাহাকে রাজোচিত

অভ্যর্থনা করতঃ, কুশল সম্ভাষন ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্য্যোধনও যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনায় আগমন বলিয়া, সে যে অর্জ্জুনের অনেক পূর্ব্বে আসিয়া বসিয়া আছে, তাহা জানাইল। এইজন্য সে দৌবারিক আদি প্রমাণ দিতেও প্রস্তুত হইল। ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার কথা ত আমি অবিশ্বাস করি নাই! আপনি পূর্ব্বেই আসিতে পারেন, আমি কিন্তু জাগিয়া অর্জ্জুনকেই প্রথমে দেখিয়াছি। এখন উভয় দিক রক্ষা করা যাউক। আমি উভয় পক্ষকেই সাহায্য করিব। একদিকে আমার অজেয় এক অক্ষৌহিনী নারায়ণী সৈন্য। যে সৈন্যগণকে আমি সৌভরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, অসুরসৈন্য নাশের জন্য যোগমায়া দ্বারা সৃজন করিয়াছিলাম, তাহারা নর ও অসুরের অবধ্য, প্রত্যেকে আমার ন্যায় বীর্য্য ও অস্ত্রধারী সেই সৈন্যগণ; আর অপর দিকে যুদ্ধবিমুখ অস্ত্রহীন আমি। তোমরা দুই জনে এই দুটি গ্রহণ কর। এখন কে প্রথম যাচ্ঞা করিবে, তাহা নির্ণয় করা চাই। দানকালে নিয়ম আছে, কনিষ্ঠের প্রার্থনা প্রথম শুনিবে, তাই এ ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ অর্জ্জুনই প্রথমে প্রার্থনা কর।" অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকেই প্রার্থনা করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কি মত?" দুর্য্যোধন আনন্দের সহিত বলিল—"আমি নারায়ণী সৈন্যই প্রার্থনা করিতেছি। তাহা পাইলেই যথেষ্ট উপকৃত ও আনন্দিত হইব।" শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নারায়ণী সৈন্য দিয়া বিদায় করিলেন। দুর্য্যোধন নারায়নী সৈন্য ও তাহার বন্ধু কৃতবর্ম্মা নামে এক যদুবংশীয় ক্ষুদ্র রাজাকে সৈন্য সহিত দলে লইয়া মহানন্দে রাজ্যে ফিরিয়া গেল।

এদিকে দুর্য্যোধনকে বিদায় দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অর্জ্জুন! এই যুদ্ধের সময়ে অজের যুদ্ধ শক্তিরই ত তোমার প্রয়োজন ছিল। এই দুর্জ্জয় নারায়নী সৈন্য গ্রহণ করিলে, মুহূর্ত্তমধ্যে তোমার যুদ্ধ বিজয় সাধিত

হইত। তুমি তাহা গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধবিমুখ, নিরস্ত্র আমাকে কোন প্রয়োজনে গ্রহণ করিলে? দেখ ত, কত আনন্দে দুর্য্যোধন নারায়ণী সৈন্য গ্রহণ করিল!" অতি বিনীতভাবে অর্জ্জুন বলিল, "যুদ্ধশক্তি তোমার কৃপায় যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। তোমাকে অস্ত্র ধরাইয়া বা তোমার যুদ্ধশক্তি দ্বারা শত্রু বধের মতি যেন পাণ্ডবের কখনও না হয়। যুদ্ধে বিজয়ীই হই আর পরাজিতই হই, সখা! তোমায় যেন নিকটে দেখিতে পায়, পাণ্ডব এই মাত্র তোমার কাছে প্রার্থনা করে। তুমি আমাদের পক্ষে আছ, এই জ্ঞান লইয়া পাণ্ডব মরিতেও প্রস্তুত, তুমি আমাদের পক্ষে নাই. এই জ্ঞান লইয়া বাঁচিয়া থাকিতেও তাহারা চাহে না।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "পাণ্ডবের এই গুণেইত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সকল ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সখা হইয়াছে। আচ্ছা, অর্জ্জুন, আমি ত অস্ত্র ধারণ করিব না, এই কালে তোমাদিগকে কি দান করিয়া সহায়তা করিতে বল?" অর্জ্জুন বলিল, "সখা, এই সময় আমার এই প্রার্থনা, খাণ্ডব দাহনের মত এই যুদ্ধেও তুমি আমার রথচালক সারথী হও! আর চিরকাল যেমন সুখে দুঃখে সর্ব্বদা পাণ্ডবকে পরামর্শ দান করিয়া আসিয়াছ, এই শঙ্কট কালেও সেইরূপ পরামর্শ দান করিয়া পথ প্রদর্শন কর।" শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইয়া অর্জ্জুনসঙ্গে ধর্ম্মরাজের নিকট গমন করিলেন।

ভক্ত—বাবা! এই শ্রীকৃষ্ণ-বরণ অধ্যায়ের দুর্য্যোধনের নিকট নিদ্রিত ও অর্জ্জুনের নিকট জাগরণ হইতে সাহায্য দান পর্য্যন্ত, সমস্ত অংশই গভীর তত্ত্বসমূহ সরল করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে বলদেবকে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার ইচ্ছায় কোন পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিব না বটে, কিন্তু ইহা জানিয়াও যদি কোন পক্ষ আমার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া যায়, আমি তো ফিরাইয়া দিতে পারিব না। প্রার্থী হইলে আমি যুদ্ধ

বিনা অন্য সাহায্য উভয় পক্ষকেই দান করিব।" এই কথাটুকু অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভগবান্ যদিও নিগু‍ণ ও নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি রাজ্য হইতে দূরে বসিয়া আছেন, তবু যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব আর কাহারও কাছে প্রার্থী না হইয়া, সত্যই তাহার কাছে হাত পাতিয়া বসে, তবে তাহাকে কি সেই দাতার শিরোমণী ভগবান্ কখনও কিছু না দিয়া ফিরাইয়া দিতে পারেন? সকাম, অকাম, মোক্ষকাম, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী—যে কেহ, যে কোন ভাব লইয়া তাহার কাছে হাত পাতিলেই, তিনি তাহাকে কিছু না কিছু কখনও ফিরাইয়া দেন না! সাগরের তীরে যাইয়া জলে না নামলেও, সাগর শীতল বাতাস দান করিয়া তার শরীরের জ্বালা জুড়াইয়া দিবে।

রত্নাকর সাগর যেমন জল, নুন, শুক্তি হইতে মহামূল্য মুক্তা ও রত্ন পর্য্যন্ত লইয়া পড়িয়া আছেন। কি মানুষ, কি পশু, কি পাপী, কি পুণ্যবান্, কি শুচি, কি অশুচি যে ইচ্ছা যাইয়া, যার যার শক্তি ও জ্ঞানানুরূপ যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেছে; সাগর কাহাকেও নিষেধও করেন না, ফিরাইয়াও দেন না। তিনি নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ যেন নিদ্রিত। ভগবান্ ও জীবদিগের সম্মুখে কর্ম্মফলরূপ রত্নাকর স্থাপন করিয়া নিজে নিগু‍ণ, নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ ভাবে লুকাইয়া আছেন। জীবসকল কর্ম্ম চেষ্টাদ্বারা সেই সাগর হইতে জ্ঞান ও শক্তি অনুরূপ ফল তুলিয়া ভোগ করিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও কিছু দান করেন না। তাই কর্ম্মপন্থীদিগের কর্ম্মই সুখ দুঃখ দাতা বিধাতা। তাহাদের নিকট ভগবান নিগু‍ণ নিষ্ক্রিয়, যেন নিদ্রা-মগ্ন। এই তত্ত্বই, বাবা, দুর্য্যোধনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রিত হইয়া থাকা দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

কর্ম্মী জীব আত্মচেষ্টায় কর্ম্ম দ্বারা ফল লাভ করিতে করিতে ভগবানের কর্ত্তৃত্বে সন্দিগ্ধ হইয়া, ক্রমে নিজেই কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তা, এই অহঙ্কার

সম্পন্ন হইয়া উঠে; যেন নিজেই ভগবান্ হইয়া বসে। এই তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থী হইয়াও দুর্য্যোধন দীনতাহীন হইয়া, তাঁহার মস্তকের দিকে তাঁহারই সিংহাসনে যাইয়া বসিয়া ছিল। আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু, এই ভাবটিকেই ইসলাম সাধক, ঈশ্বরের অংশী হওয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই নাকি কর্ম্মাভিমানী জীব ধন+ঈশ=ধনেশ, জন+ঈশ=জনেশ, ভূপ+ঈশ=ভূপেশ ইত্যাদি নাম গ্রহণ করে। এই জন্যই কর্ম্মী জীব, ভক্তের দীনতা, ভগবৎ দাসত্বকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, নিবৃত্তি ও ভক্তি মার্গকে হীনতা মনে করে। এই তত্ত্বই অর্জ্জুনের আড়ম্বরহীন অহঙ্কারহীন ভাব ও শ্রীকৃষ্ণ চরণসেবাকে দেখিয়া, মহাপরাক্রমী কুরু কুমারের পক্ষে অশোভন ও হীনতা জ্ঞাপক বলিয়া দুর্য্যোধন বোধ করিয়াছিল।

গুণময়কর্ম্মী অহঙ্কারসহিত শত শত কর্ম্মসাধনাদ্বারা ডাকিয়াও ভগবানকে কখনও গুণময় করিয়া জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু খেলা ফেলিয়া সন্তান মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে, মা যেমন হাতের কাজ ফেলিয়াও আসিয়া ছেলেকে কোলে করেন, তেমন ভগবৎভক্ত ভগবানের নিকট আসিয়া প্রার্থী হইলেই, তিনি তাঁহার নিগুর্ণ নিরপেক্ষতা আর রক্ষা করিতে পারেন না। এই তত্ত্বই দুর্য্যোধনের নিকট না জাগিয়া অর্জ্জুনের নিকট জাগ্রত হওয়া। সকাম ভক্ত ও নিষ্কাম ভগবৎভক্তের সঙ্গে ভগবৎ কৃপার অধিকারী হয়, এই তত্ত্বই অর্জ্জুনের সঙ্গে দুর্য্যোধনেরও নারায়ণী সৈন্য লাভ! নচেৎ শ্রীকৃষ্ণ জাগিতেনই না। ভগবান্ যে ভক্তের নিকট নিরপেক্ষত্ব রক্ষা করিতে পারেন না, গীতায় তাহাই বলিয়াছেন। সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ সর্ব্বভূতই আমার কাছে সমান আমার কাছে কেহই দ্বেষ্যও নাই প্রিয়ও নাই, তবু আমাকে যে ভক্তিপথে ভজনা করে, আমি তার সে আমার। এই বাক্যের যথার্থতা দেখাইতেই অদ্য শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ

হইয়াও মন্ত্রী, সারথী, দূত আদি হইয়া পাণ্ডবের সেবাভার গ্রহণ করিলেন।

বৎস, কর্ম্মদ্বারা কখনও ভগবানের কৃপার অধিকারী হইতে পারে না। ইসলাম সাধক বলিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ যাহাকে এই জগতে আত্মচেষ্টার উপায় ও সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে ত ইহকালে দূর করিয়া দিয়াছেনই, পরকালেও দূরে স্থান দেন (তজকর আয়োলিয়া)। এই কথা অতি সত্য, বাবা! কর্ম্মদক্ষ পুত্রকে পিতা মাতা নিশ্চিন্তমনে দূর হইতে দূরান্তরে কর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ও যশ লাভের জন্য পাঠাইয়া দেন। কর্ম্মীকেও ভগবান্ কর্ম্মভার দিয়া সেইরূপ দূরে প্রেরণ করেন,পরকালেও কর্ম্মফলে কেহ স্বর্গে, কেহ নরকে পড়িয়া থাকে ভগবানের কাছে যাইতে পারে না। আর পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, শিশুস্বভাব, শুধু মাতা পিতার স্নেহ ও সঙ্গ প্রার্থী পুত্রকে মাতা পিতা কখনও দূরে প্রেরণ করেন না, সর্ব্বদা কোলে কোলে চক্ষে চক্ষে রাখেন। সেই কর্ম্মজ্ঞানহীন বালক মাতা পিতার কোলে স্থান পায়, কত আদর ও চুমা খায়, মাতাপিতাই তাহার সকল দিকের অভাব ও অসুবিধা দূর করিয়া দেন। এই তত্ত্বই ভক্তের জন্য ভগবানের সগুণ হইয়া তাহাদের সেবা করা। মাতাপিতা কর্ম্মী পুত্রকে সম্মান ও প্রশংসা করেন, আর স্নেহের পুত্রকে কোলে তুলিয়া লন। এই তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে সম্মান করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করা। কর্ম্মী পুত্রকে পিতামাতা প্রশংসা করিয়া আরও নূতন কর্ম্মশক্তি ও অধিকার দিয়া দূরে পাঠাইয়া দেন,স্নেহের পুত্রকে নিজকেই দান করিয়া দেন। তাহাই শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে নারায়ণী সৈন্য দিয়া অর্জ্জুনকে নিজ দেহ দান করিলেন। কর্ম্মী নূতন কর্ম্মশক্তি ও অধিকার, প্রশংসাদি পাইয়া নিজকে কৃতার্থ বোধ করতঃ, অবজ্ঞায় করুণভাবে মাতৃ-ক্রোড়স্থ ভাইয়ের দিকে চাহিতে চাহিতে গৌরব ভরে চলিয়া যায়, ক্রোড়াস্থ ভাই তাহাদের কোলে থাকিয়া, তাহাদের কত দান কতরূপে ভোগ করিতেছে, সে তাহার খবর ও

প্রাপ্ত হয় না। দুর্যোধনও তাই আজ অজেয় নারায়ণী সৈন্যদল লাভ করিয়া, জীবন যুদ্ধে সে নিশ্চয় পাণ্ডব দিগকে পরাজয় করিয়াছে, সেই ভগবানের নিকট অধিক কৃপা লাভ করিয়াছে বলিয়া মহানন্দে চলিয়া গেল। অর্জ্জুন কি লাভ করিল তাহার খোজ ও সে পাইল না, অর্জ্জুনকে নিতান্ত অজ্ঞ ও হীন বলিয়া মনে করিল। কিন্তু প্রতিযোগীতার যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইবে, কে জ্ঞানী ও কে অজ্ঞ, কাহার প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; অস্ত্র দান গ্রহণ কালে কে যথার্থ রূপে জিতিয়া গিয়াছে।

শিষ্য—প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে না বলিয়া অর্জ্জুনকে পূর্ব্ব বর চাহিতে বলিলেন কেন?

গুরু—বৎস্য! আত্মচেষ্টান্বিত কর্ম্মী কর্ম্মদ্বারাই ফলের চেষ্টা করে, তাহারাত ভগবানের কাছে প্রার্থী নয়! তাই দুর্য্যোধনকে চাহিতে দেন নাই। কৃপাপ্রার্থী ইষ্টলাভ জন্য দীন ভাবে, কত যত্নে পরকে তোষণ করিয়া ইষ্টলাভের চেষ্টা করে। দুর্য্যোধনের মত রাজার অহঙ্কার লইয়া, সিংহাসনে বসিয়া, গর্ব্বভরে "আমায় কৃপা কর" বলা কি সত্যই কৃপা প্রার্থনা হয়? তাই তাহাদের কর্ম্মফল ভগবান দেন না, তাহাদের কর্ম্মই তাহাদের ফলদান করে। এইজন্যই গীতায় বলিয়াছেন, যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান ভূতগণাংশ্চান্যে জজন্তে তামসাজনাঃ॥ ১৭—৪। গুণেভ্যশ্চপরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি॥ ১৪—১৯। তমোগুণে প্রেতত্বের সাধিনা, রজোগুণে যক্ষরক্ষের ও সত্ত্বগুণে দেবত্বের আরাধনা হয়, গুণের উপরে, কামনার পারে যাইতে পারিলে প্রকৃত ভগবানের নিকটে উপস্থিত হয়। তখন ভগবৎ ভক্তিলাভে সক্ষম হয়—গীঃ ১৪—২৫। গুণের সমতার অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইলে আমাকে ভক্তি পথে সেবা করিতে পারে। তাই অর্জ্জুন গুণ রাজ্যের ঐশ্বর্য্য না চাহিয়া মাত্র ভগবানকেই প্রার্থনা করিল। বাবা, অর্জ্জুনকে না বলিয়া দুর্য্যোধনকে চাহিতে বলিলেও সে কৃষ্ণকে না

চাহিয়া সৈন্যই প্রার্থনা করিত। অর্জ্জুনকে চাহিতে বলার দ্বারা ভক্তের স্বভাব—সে যে ভগবান বিনে ভগবানের মত অক্ষৌহিণী শক্তিও প্রার্থনা করে না, বিজয় বা ত্রিলোকের রাজত্বও প্রার্থনা করে না, তাহাই দেখাইলেন। ভক্তের কোন্ গুণে ভগবান তাঁহার জন্য গুণময় হইয়া তাঁহার সেবা ও রক্ষা না করিয়া পারেন না, তাহাও প্রদর্শন করিলেন।

শিষ্য—প্রভো! ভগবানকে চাওয়া কি কামনা নয়?

গুরু। বৎস! শিশুর মাকে চাওয়া যেমন কামনা নয়, তাহা তাহার স্বভাব, ভক্তের ভগবান্ চাওয়াও তেমন ভক্তের স্বভাব। বাবা, যে চাওয়ার প্রাপ্তিতে চাহিবার কামনা কেবল বর্দ্ধিত হয়, তাহারই নাম কামনা বা কাম, আর যাহা চাহিয়া পাইলে চাহিবার কামনা শেষ হইয়া যায়, তাহাই নিষ্কাম বা প্রেম। রত্নাকর সাগরের রত্নের সন্ধান না পাইয়া সাধারণ জীবগণ যেমন, তাহার জল, নুন্ মৎস্য, শুক্তি আদি গ্রহণ করিয়াই যথেষ্ট পাইয়াছে মনে করে! কর্ম্মসাগরের মহারত্নই এই ভগবান, ইহার সন্ধান প্রাপ্ত না হইয়া অনেকেই ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, রাজ্য, সম্পদআদি লাভ করিয়াই কৃতার্থ বোধ করে। কেবল পাণ্ডবের মত নিবৃত্তি সাধকই সর্ব্বজগতের মূল্য হইতেও অধিক, এই মহারত্নের সন্ধান পাইয়া তাহাকেই গ্রহণ করে ও বিষয় রাজ্যের সকল জ্বালা, অশান্তি ও অভাব হইতে মুক্ত হয়।

শিষ্য—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সারথী ও মন্ত্রী হইতে বলিল কেন?

গুরু—পাণ্ডব যে এখনও প্রবৃত্তি-রাজ্য শেষ করিয়া নিবৃত্তি-রাজ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনও তাহারা নিবৃত্তি গামী, তাই প্রবৃত্তি অসুরগণকে ধ্বংস করিতে উদ্যত! সেইজন্য এখনও তাহারা চাওয়ার অতীত হয় নাই। ভক্তি-পথী ভগবানের কাছে কি চায়? তাহারা বলে, সুখ, দুঃখ, বিপদ, সবল, দুর্ব্বলতা, তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়া দিবে, আমরা আনন্দে বহন করিতে

প্রস্তুত বটে, তবু ঐ প্রার্থনা, তোমার অভীপ্সিত পথ—যে পথে চলিলে তোমার তুষ্টি হয়, আমায় সেই পথে চলিবার শক্তি দিও, তেমন বুদ্ধি যোগাইয়া দেও; শঙ্কট কালেও যেন, সেই পথ ও সেই জ্ঞান না হারাই তাহা করিয়া দিও। এই টুকুই সারথী ও মন্ত্রিত্বের জন্য প্রার্থনা। বাবা, জীবের পূর্ণজ্ঞান হইলে, ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ আসিয়া এমন প্রার্থনার বুদ্ধি জন্মে। তাই খাণ্ডবদাহনে জ্ঞানাগ্নিদেবই এই একমাত্র অভ্রান্ত অপরাজেয় সারথী চিনাইয়া দিয়াছিলেন। আরও বাবা, সেই নিগুর্ণ ভগবান্ যে, তাঁহার ভক্তের এই কর্ম্মভার সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়াই আছেন। এই জন্যই গীতায় বলিয়াছেন, "বুদ্ধিযোগ দদাম্যহম", "যোগক্ষেম বহাম্যহম." "মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" আমি ভক্তকে বুদ্ধিযোগ দান করি। যোগ্যক্ষম বহন করি, পাপতাপ ধোয়াইয়া শুচি করিয়া দেই। পাণ্ডবের জীবনে এই সকলের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিবে।

শিষ্য—প্রভো, তাঁহার প্রিয় পাণ্ডবকে পীড়ন করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ এমন পাষণ্ড দুর্য্যোধনকে দুর্জ্জয় নারায়ণী সৈন্য দান করিলেন কেন!

গুরু—অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্য্যোধনকে এমন যুদ্ধশক্তি দিয়া সাহায্য করিলেন, তবে কি দুর্য্যোধনের বিজয়ই শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করেন! কিন্তু দেবতার দেবত্বশক্তি ও অসুরের আসুরিক-শক্তি, সকলই কি সেই একই ভগবানের দান করা শক্তি নয়! অসুরের দুর্জ্জয়শক্তি কি সে ভগবান্ হইতেই লাভ করে নাই? যেমন বৃক্ষাদির ছায়াকে আশ্রয় করিয়া, অন্ধকার আলোর বিপক্ষতা করতঃ জীবের-পথআদি অন্ধকার করে। অসুরত্বও দুর্জ্জয় বরশক্তি আদি আশ্রয়ে দেবত্বের বিপক্ষে দাড়াইয়া ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়। নচেৎ আলোর নিকট যেমন অন্ধকার আসিতেই পারে না, ধর্ম্মের নিকটেও অধর্ম্ম দাড়াইতেই পারিত না। দেবকে আলোড়ন করিয়া জীবলীলা

প্রকাশের জন্য, ভগবানই নারায়ণী-সৈন্যের ন্যায় দুর্জ্জয়শক্তি দিয়া অসুরকে দেবত্বের অবরোধক করিয়া দেন। আবার যে দিন অসুর তাহার শক্তির অপব্যবহার আরম্ভ করে, মুহূর্ত্ত মধ্যে বরাদির কোন ছিদ্র ধরিয়া সর্ব্বশক্তি হরণ করতঃ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বর, দ্রোণের অজেয়ত্ব, কর্ণের কবচকুণ্ডল অজয়ে শক্তি না দিয়া দিলে, ইহারা পাণ্ডবের বিপক্ষে দাড়াইতেই যে পারিত না। এই তত্ত্বই দুর্য্যোধনকে নারায়ণী সৈন্যদান। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নে উত্তর করিয়াছিলেন যে, "অসুরকুল সংহার জন্য এই নারায়ণীসৈন্য সৃজন করিয়াছিলাম। অসুর সংহার হইয়া গিয়াছে, এখন ইহাদিগকে রক্ষা করা ত পৃথিবীর ভার বর্দ্ধন মাত্র! তাই ইহাদের ধ্বংসের জন্য দুর্য্যোধনের হস্তে দান করিলাম। ইহার যে অধার্ম্মিক অসুরের অবধ্য-শক্তি, তাই তোমার হস্তে ধ্বংস হইতে তোমার বিপক্ষে প্রেরণ করিলাম। এই জন্যই ইস্লাম সাধক বলিয়াছেন "দুঃখ ও বিপদের দর্প নাশ করিতে ইচ্ছা করিলেই, ভগবান তাহাদিগকে ভগবৎ ভক্তের বিপক্ষে প্রেরণ করেন"। ইহাদ্বারা অর্জ্জুন বুঝিল, তাহাদেরই জয় হইবে, ধৃতরাষ্ট্রদলের যত দুর্জ্জয়শক্তি সকলেরই ধ্বংসকাল উপস্থিত হইয়াছে। জীবের শক্তি, বীর্য্য কিছুই তাহার নয়, শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় তাহার সংহরণ ও বিকাশ হয় মাত্র। এখন সকাম কর্ম্মযোগিগণ ভগবানের কোন্ শক্তির আরাধনা করে, কেন তাহারা ভগবান্ পূর্ণ আরাধনায় সমর্থ হয় না, পরলীলায় আরও স্পষ্ট করিয়া দর্শন কর।

লীলা—দুর্য্যোধন গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের মন্ত্রীত্ব ও অর্জ্জুনের সারথিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তাহার চৈতন্য হইল যে, শ্রীকৃষ্ণকে নিরস্ত্র গ্রহণ করাই তাহার উচিৎ ছিল। এখন কি করা যায়! অর্জ্জুন একেই দুর্জ্জয়, তাতে দুর্জ্জয় রথ, ধনু, তূণ সম্বলিত, তার উপর শ্রীকৃষ্ণকে সারথী পাইল, এখন তাহাকে কেমনে যুদ্ধে জয় করা

যাইবে! তাহারা এইরূপ মন্ত্রী ও সারথীর সন্ধান করিয়া দেখিল, মাত্র পাণ্ডব মাতুল মাদ্রীদেবীর ভ্রাতা মদ্ররাজকে হস্তগত করিতে পারিলে, কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। তাহাদের নিকট অনেকগুণে মদ্ররাজকেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেও অধিক শক্তিশালী বলিয়া বোধ হইল! তাই তাহাকে হস্তগত করিতে দুর্য্যোধন বিশেষ যত্নপর হইল। তাহারা সংবাদ পাইল চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মদ্ররাজ পাণ্ডবের সহায়তার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি তাহাদের পক্ষে যোগ দিলে, পাণ্ডবের সৈন্যবল, তাহার বল হইতে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। তাই মদ্ররাজকে হস্তগত করিবার জন্য কপট কৌশল জাল বিস্তার করিল। ধার্ম্মিক সত্যবাদী রাজাকে, পাণ্ডবদের মত অসাবধান কালে প্রতিজ্ঞায় ঠেকাইয়া, প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়া ফেলিল। এই সৈন্যবল পাইলে পাণ্ডব সৈন্য ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য হইতে চারি অক্ষৌহিণী অধিক হইত। পাণ্ডবের একাদশ ও ধৃতরাষ্ট্রের সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য হইত।

মদ্ররাজের সৈন্য পাণ্ডবগণের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইলে, দুর্য্যোধন গন্তব্য পথের মধ্যে, অপূর্ব্ব বস্ত্রাবাস তোরণাদি নির্ম্মাণ করিয়া মাতুলের আদর অভ্যর্থনা ও অসম্ভব রাজভোগে সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। মাতুলকে যেন পাণ্ডবগণই সেবা করিতেছে, তাহার এই ভ্রম জন্মাইতে পরামর্শ দিয়া, দাস দাসী বহু নিযুক্ত করিয়া দিল। মাতুল জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই যেন, "ভাগিনেয় কৌরব কুমারগণ মাতুলের সেবা করিতেছেন" এই বলিয়া উত্তর করে বলিয়া দিল। আর মাতুল ও তার সৈন্যগণ যে যাহা চায়, তাহাই দিয়া সেবা করিতে পরামর্শ ও আয়োজন করিয়া দিল। মাতুল কর্ম্মচারিগণের ব্যবহারে, তাহাদের আদর অভ্যর্থনা ও সেবাদিতে যথার্থই প্রীত হইলেন। আরও পাণ্ডবই তাঁহার সেবা করিতেছে ভাবিয়া আরও তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমায় ভাগিনেয়গণকে জানাও, আমি তাহাদের

প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি! এখন তাহারা আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাই তাহাদিগকে দান করিব। আমার দেহ, গৃহ, সৈন্য, সম্পদ সকলই তাহাদিগের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তাহাদের জন্য অদেয় এখন আমার আর কিছুই নাই।" তিনি যে পাণ্ডবদের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহার এই কথা বলিতে একটুকুও সঙ্কোচ হইল না। সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা এই কথা বলিবামাত্র, বস্ত্রাবাসের নিভৃত কক্ষ হইতে দুর্য্যোধন বাহির হইয়া আসিয়া, মাতুলকে প্রণাম করিল, ও বিনীতভাবে বলিতে লাগিল—"মাতুল, আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী সেবক, ভাগিনেয় কৌরব-কুমার আপনাকে প্রণাম করিতেছে। আমি পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে কাতর হইয়া, আপনাকে বিনা জগতে আর আশ্রয় দেখিলাম না। তাই আপনার অনুগ্রহ লাভ করিতে এইস্থানে আপনার কিছু সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ইচ্ছা জন্ম ভরিয়া আমায় আপনার সেবা ভার দান করুন। আর সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ মাতুল, এই বিপন্ন ভাগিনেয়কে আশ্রয় দান করিয়া দারুণ কৃষ্ণার্জ্জুন হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন, এখন এই আমার প্রার্থনা।" মদ্ররাজ পাণ্ডবের বদলে দুর্য্যোধনকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পরে এইটী দুর্য্যোধনের কৌশল বুঝিতে পারিয়া, মনে মনে বিশেষ দুঃখিতও হইলেন ও দুর্য্যোধনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে দুর্য্যোধন স্তুতিবাক্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ও তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিতে থাকিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া, এইটী বিধাতারই ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করতঃ ধীরে বলিলেন, "যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, ও তোমার সেবায় যথার্থই তুষ্ট হইয়াছি, তখন তোমার পক্ষ হইয়াই, নিজের প্রিয় ভাগিনেয়দের বিপক্ষেও যুদ্ধ করিব! যাও, আমার সৈন্যগণ লইয়া গমন কর, আমি আমার জন্মদুঃখী ভাগিনেয়গণকে একটু দেখিয়া আসি, এবং আমি যে তাহাদের বিপক্ষে

থাকিয়া যুদ্ধ করিব, সেই কথাও বলিয়া আসি।" দুর্য্যোধনকে বিদায় দিয়া রাজা অতি দুঃখিত মনে পাণ্ডবের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ধর্ম্মরাজের নিকটে মাতুল তাঁহার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া, তিনি যে এই সময়ও পাণ্ডবের কোন প্রকারে সহায়তা করিতে পারিলেন না,—পাণ্ডবের উপর অত্যাচারকারীকে একটুকু শাস্তিও দিয়া শক্তির সার্থকতা করিতে পারিলেন না, সেইজন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "ধর্ম্মরাজ, এই সময় আমার নিকট হইতে তোমার একটু কিছু সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে, নচেৎ আমার দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকিবে না।" ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "মাতুল! আপনি আমার যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। দুর্য্যোধন নিশ্চয় আপনাকে কর্ণের সারথী করাইয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করাইবে। এই জন্যই নিশ্চয় সে আপনাকে গ্রহণ করিয়াছে। আপনি সেইকালে কর্ণের তেজ সংহার করিয়া, কর্ণবধের সহায়তা করিতে পারেন।" মাতুল বলিলেন, "আমায় সারথী করিলে তাহার তেজ এমনই কিছু হ্রাস হইয়া পারিবে। কেন না, আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভারী, আমার ভারে রথের গতি হ্রাস হইবে। আর আমিতো তাহার অধীন হইয়া থাকিব না। সে যেরূপ দাম্ভিক নিশ্চয় তাহার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ ও বাকবিরোধ হইবে, তাই ক্রোধে তাহার তেজক্ষয় ঘটিবে। যাক, যদি আমার অধর্ম্মও হয়, তবু দুর্য্যোধন কপট ব্যবহারে আমার আয়ত্ত করিয়া যেরূপ মনকষ্ট দিয়াছে, সে কিছুতেই পূর্ণকাম হইতে পারিবে না। আমার পূর্ণ বলের সহায়তা পাইতে পারেনা। আমা হইতেই তাহার কর্ণ পরাজয়ের উপায় হইবে। এই বলিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ মাতুল পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট চলিয়া গেলেন।

ভক্ত—বৎস, এই মদ্ররাজকে আয়ত্তকরণ লীলাটি বুঝিলে কি? প্রবৃত্তি নির্ণয়ে বলিয়াছি, মাতা-মাদ্রী প্রবৃত্তিপরা রজোগুণ, আর মাতা-কুন্তী নিবৃত্তিপরা সত্বগুণ। অসুরের অধিকার এই মাদ্রী মায়ের রাজত্ব পর্য্যন্ত, কুন্তীমায়ের অধিকারকে তাহারা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। তাই মদ্ররাজাকে কত চেষ্টা ও দীনতা দেখাইয়া তবে তুষ্ট করিল। আর শ্রীকৃষ্ণের নিকট সিংহাসনে বসিয়া, অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিন্দা করিয়াছিল। প্রবৃত্তি-রাজ্যের ফলদাতা ভগবান্ মাদ্রীভ্রাতা মদ্ররাজ; তাহার অনন্ত কর্ম্ম-শক্তিই অনন্ত সৈন্যশ্রেণী। শাস্ত্রমতে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলেই, এই দেবতা অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম কর্ত্তাকে ফল দিতে বাধ্য হন। এই তত্ত্বই দুর্য্যোধনের কপট সেবায় তুষ্ট হইয়াও মদ্ররাজের বরদান করা। ভগবানের এই ঐশ্বর্য্যসত্ত্বা তাঁহার সর্ব্বশক্তি দিয়া নিবৃত্ত ভগবৎ ভক্তকে সেবা করিতেই সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন, কিন্তু নিবৃত্ত ভক্ত তাহাকে কখনও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না; তিনি সর্ব্বদা সকাম ভক্তের সাহায্যকারী বর ও শক্তি-দাতা। তাই মাতুল পাণ্ডব পক্ষে স্থান না পাইয়া দুর্য্যোধন পক্ষ হইলেন। তবে যে ধর্ম্মরাজ কর্ণ বিজয়ের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর।

নিবৃত্তভক্ত সাধন শক্তিকে সর্ব্বদা ব্যবহার না করিলেও, অন্যের সাধন শক্তির আক্রমণ রোধে, সেই শক্তির সহায়তায় আত্মরক্ষা করেন। তাই দুর্য্যোধন কর্ণ-ঈর্ষ্যাকে সাধনশক্তি-মদ্ররাজের সহায়তায় অজেয় করিয়া পাণ্ডব ধ্বংসের চেষ্টা করিলে, পাণ্ডব সাধন-শক্তির সহায়তায় তাহার নিরোধ প্রার্থনা করিলেন। কোনও সময়ে অসুরদের বুদ্ধি অহঙ্কারাদি দুষ্ট হইয়া তাহাদের অমোঘ বর আদি শক্তি নষ্ট করিয়া দেয় বা সময়ে শক্তির বিস্মৃতি ঘটিয়া যায়, তাহাই ভগবান কর্ত্তৃক অসুরত্বের তেজ হরণ। ভগবানের বিপক্ষতায়ই দানদর্প রক্ষা করিতে যাইয়া, কর্ণ কবচ কুণ্ডল হারাইবে

ও অস্ত্র বিস্মৃত হইয়া প্রাণ হারাইবে। তাহাই মদ্ররাজ কর্ত্তৃক তেজ হরণে কর্ণের পরাজয়। মদ্ররাজ হইতে একটী উপকার প্রার্থনাই পূর্ব্বে ভীমসেনের এক পুত্র গ্রহণপণে হিরম্বা রাক্ষসীকে বিবাহ করা। বৎস, ভগবানের এই ঐশ্বর্য্যসত্তা জীবের অসুরত্ব প্রবৃত্তির বর্দ্ধক ও নিবৃত্তি ভগবৎ ভক্তির মহা বাধক শৈল্য স্বরূপ। তাই বুঝি এই রাজার নাম শৈল্য রাখা হইয়াছে। ইনি ও ইহার সকল শক্তিই অসুরত্বের বন্ধু, তাই দেবত্ব-রাজ্যে তাহার স্থান হয় নাই। এই জন্যই শৈল্য পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

বাবা! এই মদ্ররাজ ঐশ্বর্য্যসত্তাই জীবকে রাবণত্ব দান করিয়া তোলেন। রাবণ দশমাথা বিংশতি হস্ত এবং লক্ষ পুত্র, লক্ষ নাতি ও অগণিত সৈন্য গড়িয়া, ধর্ম্ম ও ভগবানের বিপক্ষে দেবত্ব অধিকার হরণ করতঃ, জগতে অসুর আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। এই ঐশ্বর্য্য সাধনায়ই এক জীবের বুদ্ধি আদিকে অনন্ত শক্তি ও অনন্ত কর্ম্ম-সত্তায় বিভক্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ করিয়া তোলে। তখন জীব সেই অনন্ত-প্রবৃত্তির তৃপ্তির চেষ্টায় রাবণত্ব লইয়া খাটীয়া মরে। শক্তি গর্ব্বের অহঙ্কারে ধর্ম্ম ও ভগবানের বিপক্ষতায় মত্ত হইয়া, সৃষ্টি রাজ্যের মহাউৎপাত হইয়া পরে। সেই কালে ভগবান্ আপনিই তাহাকে ধ্বংস করিয়া সৃষ্টিশৃঙ্খলাকে পুনঃ স্থাপন করেন। অদ্য এই মদ্ররাজ্যের সৈন্য সাহায্যেও দুর্য্যোধন তাহাই হইল। তাহার একাদশ ইন্দ্রিয় হইতে, একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সৃজন হইল। তাহার মন, কামনা, ক্রোধ ও দয়াবৃত্তি স্বরূপ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ আদি অসুরত্ব দ্বারা দুষ্ট হইয়া পাণ্ডব বিপক্ষ মহাঅসুর হইয়া উঠিল। সকাম গুণময় জীবের কেন ভগবৎ সাধনা হয় না, কেন তাহারা ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভের যোগ্য হয় না, এখন পর লীলায় আরও স্পষ্ট করিয়া শ্রবণ কর।

লীলা—উভয় পক্ষই যুদ্ধের আয়োজনে ব্রতী হইলে, ধর্ম্মরাজ ভ্রাতা ও দ্রুপদকে না জানাইয়াই বিশ্বাসী একজন দূতকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন! "তাহারা রাজ্য চায় না! পঞ্চ পাণ্ডবকে স্বাধীন ভাবে বাসের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থের পঞ্চখানা গ্রাম মাত্র দান করিয়া, এই দারুণ জীব ধ্বংসকর যুদ্ধ নিবৃত্ত হউক!" দুর্য্যোধন সেইবারও নিজেই কর্ত্তা হইয়া, তাহাতেও অস্বীকার করিল, আরও জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরমধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজকে বিড়াল-তপস্বী আদি বলিয়া, না না গালাগালী বলিতে দূত পাঠাইয়া দিল। সে মনে করিল, পাণ্ডব পক্ষ তাহার আয়োজন দেখিয়া ভীত হইয়াছে, তাই এমন হীন সন্ধি প্রার্থনা করিতেছে। পাণ্ডব সভায় সকলে এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজের মহত্বে বিস্মিত হইল ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদের হীনতায় আরও ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিতে, নিজেই ধৃতরাষ্ট্র সভায় গমনে ইচ্ছা করিলেন। যুবকদল অসম্মত হইলেও, ধর্ম্মরাজ ও দ্রুপদাদির সম্মতিতে সাত্যকিকে মাত্র সঙ্গে লইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র সভায় যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বেই দূতদ্বারা সংবাদ দেওয়ায়,ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা ও বিবিধ প্রকারে সম্মানাদি দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিল। তাহারা, মদ্ররাজের মত ইহাকে উপহার ও সেবায় সন্তুষ্ট করিবার জন্য, নানা বহুমূল্য উপহার, দাস দাসী আদি আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধরিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহার কিছুই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কৌরবকুমার, একজনে আর একজনের দান গ্রহণ করে কেন? অভাবগ্রস্ত হইলে গ্রহণ করে! আমি তো অভাবগ্রস্থ নই যে সেজন্য তোমার দ্রব্য গ্রহণ করিব! আর গ্রহণ করে প্রীতিতে! ভালবাসা থাকিলে প্রিয় ব্যক্তির দ্রব্য গ্রহণ করে। তুমিতো আমায় প্রীতি কর না! সারাজীবনেও তুমি আমার কোনও বাক্য রক্ষা কর নাই, বা যাহারা আমার প্রিয় তাহাদের

প্রতিও প্রিয় ব্যবহার কর নাই। তবে আমি কেন তোমার দ্রব্য গ্রহণ করিব?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের দত্ত কোনও দ্রব্যই গ্রহণ না করিয়া, ভীষ্ম দ্রোণাদির আদর উপেক্ষা করতঃ, বিশ্রাম জন্য মহাত্মা বিদুরের আলয়ে আপনিই যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

তত্ত্ব—দেখিতে পাইলেত! দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে মদ্ররাজের মত ভুলাইতে পারিল কি! সত্যই বাবা, সেই অন্তর্য্যামী ভগবান্‌কে কপটতা দ্বারা কখনও কেহ ভুলাইতে পারে নাই। ঐশ্বর্য্য ফলদাতা ভগবান্, যেমন বেদোক্ত ধর্ম্ম সাধনা করিলেই, বেদোক্ত ফলদানে বাধ্য, পূর্ণ ভগবান তেমন বিধিপালন দ্রব্য ও মন্ত্রাদি সাধনারই বাধ্য নন; তিনি কর্ম্মকর্ত্তার ভাবটী গ্রহণ করেন। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে ঋষিগণ বলিয়াছেন, "দেবতাঃ মন্ত্রমিচ্ছন্তি, ভাবমিচ্ছাত কেশবঃ॥" ভগবান্ শ্রদ্ধাদত্ত সামান্য ফলমূলও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন, অশ্রদ্ধাদত্ত রাজভোগও কখন গ্রহণ করেন না। এইজন্য গীতায় বলিয়াছেন—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" আর "অশ্রদ্ধয়হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।"

বৎস, শ্রীকৃষ্ণ অদ্য জগতকে দেখাইলেন, জীব, আমি ধন বা দ্রব্যাদির কাঙ্গাল নই, যে তোমাদের দ্রব্যাদির আয়োজন দেখিয়াই ভুলিয়া তোমায় কৃপা করিব। আমার কৃপা পাইতে চাহিলে আমার সঙ্গে প্রীতি সম্বন্ধ কর। আমার প্রিয় কর্ম্মাচরণ কর বা আমার বাক্য রক্ষা—শাস্ত্রাদি বিধি পালন কর, অথবা আমার প্রিয় ভক্তগণকে প্রীত কর, তবেই তোমার সামান্য দ্রব্যও যত্নে গ্রহণ করিব। অদ্য ধৃতরাষ্ট্র সভায়, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক, কর্ণ, শৈল্য ইত্যাদিকে উপেক্ষা করিয়া, না নিতে চাহিলেও দাসী গর্ভস্থ, জারজ—অবিবাহিত প্রসূত সন্তান, দরিদ্র, ভিক্ষাবৃত্তিধারী বিদুরের কুটীরে যাওয়া দ্বারা, জগতকে দেখাইলেন—ভীষ্মের ন্যায় পিতার জন্য

চিরব্রহ্মচর্য্য ও রাজ্যত্যাগেও ভগবৎ কৃপার অধিকারী হয় না, দ্রোণ ও কৃপের ন্যায় একাধারে ব্রহ্মত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পন্ন হইলেও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারে না, মদ্ররাজের মত প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে নিজ ভাগিনেয়ের বিপক্ষে যুদ্ধে ব্রতী হইলেও তাঁহার তোষণ হয় না, কর্ণের মত অতিথীকে পুত্র-মাংস ভোজন করাইয়াও ভগবানকে তোষণ করিতে পারে না, যদি তাহার প্রতি ভক্তি ও সত্ত্বগুণ নির্বৃত্তিপথ গ্রহণ না করে।

শিষ্য! প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ যে কুন্তী পিশিমাতাকে দেখিতেই, আর কোথায়ও না যাইয়া, বিদুরের কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

গুরু—তাই-ই ত বাবা, এই কুন্তী পিশিমাতারূপ সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ না থাকিলে, জীব যত কেন ধর্ম্মকর্ম্ম যজ্ঞাদি না করুক, কিছুতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না। পাণ্ডব বনে গমন করিতে উদ্যত হইলে, তখন এই মাতাকে আশ্রয় দিবার লোক, মাত্র বিদুর ভিন্ন সভায় আর কেহই মিলিল না, তাইত মাতা তাঁহার কুটীরই আশ্রয় করিয়াছিলেন। এইজন্যই অদ্য শ্রীকৃষ্ণও আপনি যাইয়া বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন, ও বিদুর না দিতে চাহিলেও তাঁহার ভীক্ষালব্ধ খুদকণা কাড়িয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই মাতাকে আশ্রয় দানটী বুঝিলে কি বাবা? নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করা। অসুরত্বের ভোগ, বিলাস, সেবাদি গ্রহণ না করাই, এই মাতাকে আশ্রয় দান করা। ভীষ্ম, দ্রোণাদি সকলেই ধার্ম্মিক হইয়াও দুর্য্যোধন-দত্ত ভোগ, বিলাস, প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাইই তাহারা সত্ত্বগুণ ভ্রষ্ট হইয়া, দুর্য্যোধনের অন্যায়েরও প্রতিবাদ করিতে অশক্ত হইলেন এবং তাহার পক্ষ হইয়া ধর্ম্মের বিপক্ষে বিপক্ষতাও করিয়াছিলেন। বিদুর রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী, ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা হইয়াও রাজবৃত্তি ভোগ ও দুর্য্যোধন প্রতিগ্রাহী ছিলেন না, সাত্ত্বিক তাপসব্রত গ্রহণ করিয়া, বিষয়ে অনাশক্ত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম কর্ণাদিকে পরিত্যাগ করিয়া, মাত্র বিদুরের

গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ভগবৎ গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে কেমন ভক্ত তাঁহার অতীব প্রিয়, তাহা বলিয়া, ত্রয়োদশ হইতে বিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত যেই সব লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, মহাত্মা বিদুরই মাত্র তাহার জীবন্ত পূর্ণ দৃষ্টান্ত। যথা সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, মিত্রতা ও করুণাযুক্ত, অথচ কাহারও প্রতিই মমতাযুক্ত নয়, নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে সমভাব, সর্ব্বদা ক্ষমাকারী অর্থাৎ কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে রাখে না, সর্ব্বাবস্থায় তৃপ্ত তুষ্ট, দৃঢ় ও সংযতচিত্ত অথচ ভগবানে অর্পিত মনবুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহার চিন্তায় ও তাঁহার প্রীতি চেষ্টার চিন্তা বুদ্ধিকে নিযুক্ত করিয়াছে, এমন যে ভগবৎ ভক্ত যোগী সেই আমার প্রিয় ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণ প্রত্যেকটী মাত্র বিদুরের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন সকাম-সাধক ও ভোগী সাধকদের সাধনার ফল, ইহার পরের লীলায় শ্রবণ কর।

লীলা—শ্রীকৃষ্ণ রাজসভায় আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে যেন ভীত ও চমকিত করিবার জন্যই দুর্য্যোধন তাহার নিমন্ত্রিত রাজগণে পরিবৃত হইয়া, সাজিয়া আসিয়া দর্পভরে সভায় বসিল। সভায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দারুণ কষ্ট ও দীনতা সহিয়া প্রতিজ্ঞা-মুক্ত পাণ্ডবগণকে রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণও প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিলে বড়ই অন্যায় ও কলঙ্কের কর্ম্ম হইবে। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমার নিতান্ত অনুরোধ, জ্যেষ্ঠতাতের নিতান্ত বাধ্য ও দুর্য্যোধনের মতই তাঁহার প্রতিপাল্য, পুত্র সম পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন হউন। তাঁহার স্নেহকোলে, দুর্য্যোধনাদির মত পাণ্ডবগণকেও স্থান দান করুন। নচেৎ যেইরূপ যুদ্ধায়োজন হইয়াছে, উভয় পক্ষেই যেইরূপ মহাস্ত্রবেত্তা মহারথগণ উপস্থিত, ইহাতে পৃথিবীর ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চয়ই নির্ম্মূল হইয়া যাইবে! দেবপুত্র পাণ্ডবগণের বীর্য্যত আপনি জানেন? তাহাদিগকে স্নেহাধিকার দিয়া আপনার করিয়া লউন, জগতে সর্ব্বদিকে কুরুকুল মঙ্গল ও বিজয় লাভ করিবে; কুরুকুলের

যশোকীর্ত্তিতে জগত পরিব্যাপ্ত হইবে। ইহাদিগকে শত্রু করিয়া, তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিলে, মানব ত দূরের কথা সর্ব্বদেবতাও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। গোগৃহের যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন্! একমাত্র অর্জ্জুন এক রথে অজেয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বথামা ও কর্ণাদি সহিত দুর্য্যোধনকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরাজয় করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছিল। মহারাজ! জগতের শান্তির জন্য, কুরুকুলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এই দারুণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণ করুন্।” উপস্থিত ঋষিগণও ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ থামাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নচেৎ ভীমার্জ্জুনের বীর্য্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রদের যে নিশ্চয় মরিতে হইবে, তাহাও বলিলেন। মহারাণী গান্ধারীদেবীও অন্ধ পিতার অবাধ্যতা জন্য দুর্য্যোধনকে তীব্র ভাষায় ভৎসনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, “ওরে নির্লজ্জ, প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবের প্রতি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কি তোর একটুকুও লজ্জা হইতেছে না। এই সভায় সর্ব্বসমক্ষে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলি, পাণ্ডব প্রতিজ্ঞা মুক্ত হইতে পারিলে নিশ্চয় রাজ্য ফিরাইয়া দিব। আবার কেমন করিয়া বলিতেছিস রাজ্য দিব না। আর তুই রাজ্য না দিবার কর্ত্তা কে? তোর পিতাই বর্ত্তমানে রাজা, যাহা করিবার তিনিই করিবেন। রাজা ও পিতার অবাধ্যতা করিতে কি তোর মনে একটুকুও সঙ্কোচ আসিতেছে না। এমন মহান্ কৌরবকুলকে কলঙ্কিত করিবার জন্যই কি তোমার মত মহা অসুরের জন্ম হইয়াছে। মহারাজ কি করিতেছেন? দুর্বৃত্ত অবাধ্য পুত্রকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করুন্। ওরে কুলাঙ্গার, তোর এই রাজ্যে কিসের অধিকার? সম্রাট পাণ্ডুর সাম্রাজ্যের যথার্থ অধিকারী ত পাণ্ডবগণ। তাহারা অনুগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠতাতকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিয়াছে মাত্র, তিনিও যে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অধীনরাজা। ধার্ম্মিক পাণ্ডব তবু জ্যেষ্ঠতাতের অজ্ঞাবহ, আর পুত্র হইয়া তুই এমন অবাধ্য

লইয়া উন্নত মস্তকে রাজসভায় বসিয়া আছিস। তোর কি একটুকুও লজ্জা বা সঙ্কোচ আসিতেছে না। মহাবীর পিতামহ আজ কি করিতেছেন? একদিন এই বংশ ধ্বংস হইতে বসিলে, মাতা সত্যবতী তাহাকেই এই রাজ্য ও বংশ রক্ষার ভার অর্পণ করেন। তিনি সেইকালে ব্যাসদেব দ্বারা বংশ রক্ষা করতঃ, অস্ত্র ধরিয়া রাজ্য রক্ষা ভার গ্রহণ করেন। সেইদিন হইতে এই রাজ্য যে তাঁর! সেই বংশ আবার ধ্বংস হইতে বসিয়াছে দেখিয়া, তিনি যে এখনও নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। কুরুকুলের জ্বলন্তঅঙ্গার, পাষণ্ড পুত্রকে তাহার সহায় ও মন্ত্রীগণ সহিত বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করুন্। ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়া, জগতকে ও কুরুকুলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন্।" মহাত্মা বিদুরও দেবীর যুক্তির সমর্থন করিয়া দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ও ইহাদিগকে নিগ্রহ করিয়াও পাণ্ডবগণকে গ্রহণ করা উচিৎ বলিয়া বলিতে লাগিলেন। সেইকালে দুঃশাসন উঠিয়া দাদাকে বলিলেন, "শুনিলে ত দাদা, ইহারা আমায়, তোমায় মাতুল ও কর্ণকে বন্দী করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবেন স্থির করিয়াছেন। এখন তোমার যাহা কর্ত্তব্য কর।" অমনি দুর্য্যোধন ক্রোধভরে কাহাকেও কিছু না বলিয়াই, সভা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুবল রাজগণও সভা পরিত্যাগ করিয়া গেল।

দুর্য্যোধন সদলে সভা পরিত্যাগ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখিলেত শ্রীকৃষ্ণ! এই রাজ্যে আমার আর অধিকার নাই। দুর্বৃত্ত পুত্র আমায় অগ্রাহ্য করিয়া পাণ্ডব বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এই যুদ্ধে আমার একটুও সহানুভূতি নাই।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, এমনই একজন স্বেচ্ছাচারী যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! সে বলদর্পে বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া, নিজে রাজা হইয়া বসিয়াছিল। নিবৃত্তি ভক্তিপথী বলিয়া, ধার্ম্মিক জ্ঞাতিগণকে পীড়ন, তাহাদের

অধিকার হরণ ও তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেই ব্রতী হইয়াছিল। আমি ভাগিনেয় হইয়াও সেই দুর্ব্বৃত্তকে বধ করিয়া যদুকুলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছি। মহারাজ! আপনিও অদ্য এই একজনকে পরিত্যাগ করিয়া জগৎ ও কুরুকুলকে রক্ষা করুন্। আপনার পুত্রের জন্য ভীত হইবার কোনও কারণই নাই, আপনি দুর্ব্বল নন! ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য আপনারই আজ্ঞাবাহী, তাহারা এখনও দুর্য্যোধনের অধীন নয়! তাহার উপরেও সাহায্য প্রার্থী হইলে আমি আছি! আদেশ করিলেই পাণ্ডবও আপনার সাহায্যে আসিবে। আপনি দৃঢ়তা ধরিয়া আদেশ করুন্। দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিকে তাহাদের বল সহিত নির্য্যাতন করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করি।" শাস্ত্রে আছে, "ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্বার্থে কুলত্যজেৎ। গ্রাম জনপদস্বার্থে আত্মার্থে পৃথিবী ত্যজেৎ॥"

ধৃতরাষ্ট্র তখন বলিয়া উঠিল, "শ্রীকৃষ্ণ, এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী! এই যুদ্ধ না ঘটীয়া গেলে জগতের আর শান্তি নাই। এই যুদ্ধ, শুধু ধার্ত্তরাষ্ট্র পাণ্ডবের যুদ্ধ নয়, অধর্ম্ম ও ধর্ম্মের যুদ্ধ। যত অধার্ম্মিক পাষণ্ডগণ পাণ্ডবের যশকীর্ত্তিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া, আমার এই পাষণ্ড পুত্রকে আশ্রয় করিয়াছে, ইহারা পাণ্ডব বিজয়ের চেষ্টা করিবেই। নচেৎ দুর্য্যোধন সভা হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, সে ই যাইত! নিমন্ত্রিত রাজগণ উঠিয়া গেলেন কেন? যুদ্ধই হউক, আমি স্বচক্ষে ইহাদের ধ্বংস দেখিয়া যাই; ইহারাও মরিয়া শান্তিলাভ করুক॥" এইরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিলেন না, যুদ্ধ হওয়াই নিশ্চয় হইল।

ভক্ত—বাবা, দুর্য্যোধনের অবাধ্যতা ও ধৃতরাষ্ট্রের নিজকে তাহাদের বিরুদ্ধাচারে অশক্তবোধ করা, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নানাপ্রকার সাহস দান করিলেও, ধৃতরাষ্ট দুর্য্যোধনের বিপক্ষতা না করিয়া তাহার অভিমতে মত দান ইত্যাদির মধ্যে, বড়ই সুন্দর রূপে জীবের অসুর

আয়ত্ত হওয়ার তত্ত্ব দেখান হইয়াছে। একটুক মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

বৎস! জীব ধর্ম্মসাধনকে নির্ব্বাসন দিয়া, কেবল অসুরসাধন—ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, কতকদিন পর তাহাকে ধর্ম্মসাধন গ্রহণে উদ্যত দেখিয়া, তাহার পুত্র স্বরূপ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিগুলি সত্যই এই দুর্য্যোধনাদির মত তাহার বিদ্রোহী হইয়া, বিরুদ্ধচার আরম্ভ করিয়া দেয়। প্রথমে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়া কান্নাকাটা করে, পরে বিদ্রোহী ভাব পর্য্যন্ত দেখাইতে থাকে। তখন জীব সত্যই এই ধৃতরাষ্ট্রের মত, ধর্ম্মসাধন গ্রহণে ও প্রবৃত্তিবর্গের বিরুদ্ধাচার করিতে নিজকে অক্ষম বোধ করিতে থাকে। কিন্তু সে তখনও সত্যই দেহেন্দ্রিয় শাসনে অক্ষম ও ধর্ম্মসাধন গ্রহণে অশক্ত নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে অভয় ও উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি সাহস ধরুন! বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এখনও আপনার দুর্ব্বিনীত পুত্রগণকে শাসন করিতে সাহায্য করিবেন, তাহার উপর আমার সাহায্য চাহিলে, আমিও সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি, ডাকিলে পঞ্চপাণ্ডবও আপনার সহায়তা করিতে থাকিবে। এখনও এই অসুরের দলকে নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মসাধন পাণ্ডবগণকে অধিকার দিতে আপনার শক্তি আছে। এই উৎসাহদান বুঝিলে কি? বাবা, জীব সেই বিপদকালে আত্মজ্ঞান বিদুর; মনভীষ্ম, সৎকামনা দ্রোণ, ও দয়া কৃপাচার্য্য দ্বারা সেই ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিবর্গের বিরুদ্ধাচারে লাগিলে, তাহাদিগকে নিগ্রহ করিতে পারে! তাহার উপর স্বয়ং ভগবান্ ও তাহাকে এইকালে সহায়তা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়াই আছেন। আরও ধর্ম্মসাধন রূপ পাণ্ডবের সহায়তা গ্রহণ করিলে, তাহারাই জীবের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচার নষ্ট করিয়া দেয়, তাহাই বলিয়া দিলেন। কিন্তু তবু জীব এই ধৃতরাষ্ট্রের মত সেই সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, অসুরত্বের অধীনতা লইয়া দেবত্বের বিপক্ষেই

যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসে, এইটা জীবত্বের অন্ধতার নিত্য স্বভাব। এখন অসুরের ভগবান্ সাধনার স্বরূপ শ্রবণ কর।

লীলা—শ্রীকৃষ্ণ সভা হইতে বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ করিতেই, দুর্যোধনসখা যদুবীর কৃতবর্ম্মা বেগে প্রবেশ করিয়া সাত্যকিকে বলিলেন, "সাত্যকি, শীঘ্র অস্ত্রধারণ করিয়া প্রস্তত হও, আমি আমার সৈন্যগণ লইয়া আসিতেছি। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিতে পরামর্শ করিয়া স্ববলে আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, দুর্যোধন বুঝি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইল।" কৃষ্ণ শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কৃতবর্ম্মাকে সৈন্য আনয়নে নিষেধ করিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। এমন সময় দলবদ্ধ ভাবে দুর্য্যোধনের দল শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পুত্রগণের কীর্ত্তি দর্শন করুন, তাহারা আমায় আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। আপনি একটু আদেশ করুন, দেখি কে কাহাকে আক্রমণ করে! তাহারা আমায় আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, এখন আপনার আদেশ বিনাও আমি ইহাদিগকে বধ করিলে, কেহই আমার দোষ দিতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবের দূত হইয়া আসিয়া ইহাদিগকে বধ করিয়া গেলে, হয়তো কেহ মনে করিবে, পাণ্ডবের স্বার্থ রক্ষার্থে অল্প দোষেই আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া ফেলিয়াছি, তাই ক্ষমা করিলাম। ইহারা নিজেদের অপরাধেই সকল প্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন ও তাঁহার একটী ঈশ্বর বিভূতির বিকাশ করিয়া, সভার মধ্যে মহাজ্যোতির্ম্ময় সহস্রশীর্ষ সহস্রপাদ বিরাটরূপের প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সেই অনন্ত মস্তক, অনন্ত হস্ত, অনন্ত পদ তেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্র ও রাজাগণ

তৎক্ষণাৎ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, মহর্ষিগণ ও ভীষ্মাদি নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বিদুরের আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

তত্ত্ব—বৎস! ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনের চেষ্টা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপ ধারণ করিয়া, তাহাদিগকে নিরস্ত করার মধ্যে অতি মধুর তত্ত্ব নিহিত আছে। অসুরপ্রকৃতি সকাম-সাধকগণ সত্যই বলপূর্ব্বক ভগবানকে বন্ধন করিয়া, নিজেদের ইষ্টলাভ করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের বন্ধন-রজ্জুটা চিনিলে কি? দীনতা ও ভক্তিবিহীন হইয়া, ইষ্টলাভের জন্য বেদবিহিত সকাম যজ্ঞ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানই ভগবানের বন্ধন-রজ্জু প্রস্তুত করা। সেই সকাম-সাধনায় তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা ভগবান্‌কে আয়ত্ত করিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহার অমতেও ফলগ্রহণই বলপূর্ব্বক বন্ধনের চেষ্টা। অন্ধ দুর্য্যোধনের দল সেই সকাম-সাধন কর্ম্মদ্বারাই বন্দী করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের পক্ষ করতঃ পাণ্ডব পরাজয় ফলগ্রহণ করিবে ভাবিয়াছিল। চোর ও দস্যুরাও এইজন্য মঙ্গলচণ্ডিকা কালীকাদির আরাধনা করে। ভগবতী তাহাদিগকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন ভাবিয়া, তাহারা চুরি ও দস্যুতায় ব্রতী হয়। ধার্ত্তরাষ্ট্রও সেইরূপ পাণ্ডব-হিংসায় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ব্রতী হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরূপ ধারণ করিয়া দেখাইলেন, সকাম সাধনার ফল মিথ্যা নয়। বলপূর্ব্বক ভগবানের বন্ধনরজ্জু সদৃশ বৈদিক-সাধন তাহারই যে মুখের বাণী। কিন্তু সকাম সাধনায় সেই অনন্তশক্তি ভগবানের এক এক শক্তি আয়ত্ত হয় মাত্র; তাহাতে পূর্ণ ভগবান্ আয়ত্ত হন না। অনন্ত মস্তক, অনন্ত হস্ত, অনন্ত পদ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখাইলেন, "হে, অসুরগণ, তোমরা আর আমার কত শক্তি কত পদ বান্ধিয়া রাখিবে, আমি যে অনন্ত পাদ, তোমাদিগকে এক এক পাদ, এক এক শক্তি দান করিয়াও যে আমার অনন্ত পদ, অনন্ত শক্তি থাকিয়া যাইবে, আমি তাহা দ্বারা আমার

ভক্তকে রক্ষা করিব। পাণ্ডবের মত দীনতা ও ভক্তি বিনে, তোমরা সকাম সাধনায় কিছুতেই আমায় আয়ত্ত করিতে পারিবে না।" বৎস, এই জন্যই ভগবান গীতায়, বেদের ত্রিগুণময় সকামসাধনার বার বার নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে দাদা বলদেবের ইচ্ছায় অসুর কুলকে আরও কতদিন রক্ষা করিতে নানা প্রকারে চেষ্টা করিলেন, বিরাট মূর্ত্তিরূপে অমানুষ সত্তা দেখাইয়াও ভয় দেখাইলেন। জীব ধর্ম্মের দিকে একেবারে বিপক্ষ হইলে, ভগবান এইরূপে অমানুষ সত্তা দেখাইয়া সত্যই তাহাদিগকে সাবধান করেন। এখন তাহার ফল শ্রবণ কর।

লীলা—রাত্রিতে ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দুর্য্যোধনকে আনাইয়া আবার বুঝাইলেন। দুর্য্যোধন অন্ধকে বুঝাইল, "শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাহার জন্য আর ভয় কি? আমারপক্ষে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব, অমর তুল্য অস্ত্রগুরু দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা তার উপর অজেয় মহাবীর কর্ণ আছেন। ইহাদের উপরেও মদ্ররাজ, ভগদত্ত, কম্বোজ রাজা ও নারায়ণী সৈন্যও আছে। ইহাদিগকে কি করিয়া পাণ্ডব জয় করিবে।" ভীষ্মাদির অজেয়ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিবে না ভাবিয়া, বৃদ্ধ যুদ্ধ জন্যই মন স্থির করিল। পরদিন সভায় মহাত্মা বিদুর বৃদ্ধরাজকে নানারূপে ভয় দেখাইয়া, তাঁহার পুত্রগণের কুকীর্ত্তিসকল বর্ণনা করিয়া, তাহাদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সন্ধি করিতে বলিতেছে, ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালি আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, "বিদুর, তোমাকে আমি ভাল বলিয়াই জানিতাম! এতদিনে বুঝিলাম, তুমি আমার মহাশত্রু! আমার মন্ত্রী হইয়া তুমি আমায় প্রিয়কথা একদিনও বল নাই! কেবল শত্রুপক্ষের গুণগান ও আমার প্রিয়পুত্রদিগের দোষ প্রদর্শনই করিয়া আসিতেছ। কতদিন আর সহ্য হয়? তুমি আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাও, তোমার মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা করি না!

আমি যুদ্ধই করিব।" বিদুর তৎক্ষণাৎ সেইরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, যেন কুলক্ষয় দর্শন করিতে না হয় এই জন্য তীর্থযাত্রা করিলেন। পূর্ণ মমতাহীন বিদুর তাঁহার প্রাণসম প্রিয় শিষ্য, চিরদুঃখী পাণ্ডবের দিকেও ফিরিয়া চাহিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রাহ্য ও বিদুরকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণাই স্থির করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধই নিশ্চয় করিলে, ভীষ্মদেব উঠিয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধন, এতদিন যদিও তোমার বিরুদ্ধাচার করিয়াছি, যাহাতে যুদ্ধ না হয় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমি তোমাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব। আমি রাজ্য বিভাগকালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাদের রক্ষা ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্য তোমাদের দত্ত রাজবৃত্তিও এতদিন ভোগ করিয়াছি। সেই বিত্তপুষ্ট দেহদ্বারা তোমাদের সেবাই করিব, এই বিপদকালে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহি না। কিন্তু একটা কথা, সেইকালে যে আরও একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম! পাণ্ডবও সহায় চাহিলে যথাসাধ্য সাহায্য করিব বলিয়াছিলাম। তাই এই যুদ্ধকালেও অস্ত্রগ্রহণ বিনে তাহারা যাহাই সাহায্য চাহিবে, আমি তাহাদিগকে তাহাও দান করিব; আমার এই কার্য্যে কিন্তু বাধা দিতে পারিবে না। যদি বাধা দেও আমি কোন পক্ষেই থাকিব না।" দুর্য্যোধন পাণ্ডব সাহায্যে বাধা দিবে না বলিল। তখন ভীষ্মদেব আবার বলিলেন "আমি এই বৃথা অহঙ্কারী সূত পুত্রের সাহচর্য্যে যুদ্ধ করিব না। হয় সে প্রথমে যুদ্ধ করুক, নচেৎ আমিই পূর্ব্বে যুদ্ধ করিব।" কর্ণ দুর্য্যোধনের মঙ্গল চিন্তা করিয়া নিজেই বলিয়া উঠিলেন এই বৃদ্ধ জীবিত থাকিতে "আমি অস্ত্রধারণ করিব না। বৃদ্ধ পাণ্ডব হস্তে নিহত হইলে, আমি একাই পাণ্ডবগণকে বধ করিব।" এই বলিয়া কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধন ভীষ্মদেবকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিল। তখন দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে বলিলেন,

"আমরাও তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিব বটে, কিন্তু রাজ্য বিভাগ কালে পাণ্ডবকে সাহায্য করিব বলিয়া আমরাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। যদি তাহাতে বাধা না দেও তবে যুদ্ধে যোগদান করি। দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সেই স্বাধীনতা দিয়াই গ্রহণ করিলেন। তখন যুদ্ধ ঘোষণা করতঃ সকলে অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই সংবাদ দান করিলেন ও মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বিদায় দান করিলেন। কর্ণ তাঁহার রথে উঠিয়া আগাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ কতকদিন হয় কর্ণ নিজের জন্ম বৃত্তান্ত জানিয়াছিলেন। কুন্তীদেবী ও সূর্য্যদেব তাহাকে দেখা দিয়া জন্ম-রহস্য বলিয়াছিলেন। তাই এখন পাণ্ডবের প্রতি আর ঈর্ষ্যা ছিল না ও শ্রীকৃষ্ণকেও আপনজন বলিয়া জানিয় ছিলেন। এখন ভ্রাতাদের মহত্বে তিনি মহা আনন্দিত, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও তার মহাপ্রীতি জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডব সহ মিলিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন। সেই কালে কর্ণ উত্তর করেন, "শ্রীকৃষ্ণ, আমি যে পাণ্ডব এই কথা যুধিষ্ঠির তোমার মুখে শুনিবা মাত্র বিশ্বাস করিবে ও আমাকে জ্যেষ্ঠাধিকার দান করিবে নিশ্চয় জানি। কিন্তু দুর্য্যোধনের দল বিশ্বাস করিবে কি? তাহারা বলিবে, পাণ্ডব কর্ণের ভয়ে তাহাকে দাদা বলিয়াছে, অথবা বলিবে ভয়ে আমি পাণ্ডবকে ভাই বলিতেছি। তাই এইকথা জগতে প্রকাশ না হওয়াই উচিৎ। আরও বড় আশা করিয়া এই যুদ্ধের জন্যই, দুর্য্যোধন আমায় রাজ্য ভোগাদি দিয়া স্বর্ব্বস্বপণে সেবা করিয়াছে, এই দেহ এখন তাহার। পাণ্ডব আমায় রাজ্য দিলে, আমি দুর্য্যোধনকেই তাহা দান করিয়া দিব। কিন্তু ধর্ম্ম রাজই রাজা হইবার যথার্থ উপযুক্ত, ভীমার্জ্জুনই প্রকৃতরূপে জয় লাভের উপযুক্ত পাত্র। আমি জন্ম ভরিয়া এমন দেবস্বভাব, অবিরোধী ভাইদের প্রতি যেরূপ অন্যায় করিয়াছি, আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবু আমার এই দেহ দানে তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত হউক।" শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে

অনুতপ্ত ও মৃত্যুজন্য দৃঢ়চিত্ত দেখিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া দিলেন, "তবে এখন, ক্রুরতা ছাড়িয়া কুন্তী-পুত্রের মত গৌরবের মৃত্যু বরণের চেষ্টা কর।" কর্ণও তাহাই স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া গৃহে আসিলেন। এই স্থানেই উদ্যোগ পর্ব্বের লীলার শেষ হইল।

ভক্ত—দেখিলে বাবা, ধৃতরাষ্ট্র যেমনি অসুর দুর্য্যোধনের আশা ভরষায় মুগ্ধ হইয়া, আত্মজ্ঞান বিদুরের বাক্যকে বিষবৎ অপ্রিয় বোধ করিল, তাঁহার পরামর্শ আর শুনিবে না বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়াই দিল, বিরাটরূপ দেখিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার করিল, তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিল না, অমনি ভীষ্ম দ্রোণাদিও দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া পাণ্ডব বিপক্ষে অস্ত্র ধরিয়া দাড়াইল। সত্যই বাবা, জীব আত্মজ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া ভগবানকে অস্বীকার করতঃ, অসুরত্ব গ্রহণ করিলেই তাহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও দয়া ইত্যাদি সমস্তই বিকৃত হইয়া দেবত্বের বাধক মহা অসুর হইয়া উঠিবে। অসুরগণ যে দুর্য্যোধনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল, "আমরা ভীষ্মাদির শরীরে প্রবেশ করিব।" সত্যই আত্মজ্ঞানকে ত্যাগ ও ভগবানকে অস্বীকার করিলে, অবিদ্যা সমস্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করিয়া, প্রকৃত ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি-পথের বাদী করিয়া তোলে; অন্তও তাহাই হইল, ভীষ্ম দ্রোণাদিরও মোহ জন্মিল। জানিয়া শুনিয়া অধর্ম্মকারী, অত্যাচারী দুর্য্যোধনের সহায়তা করিয়া, ন্যায্য অধিকারী ধার্ম্মিক অত্যাচার প্রাপ্তের বিপক্ষে যুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিল। প্রকৃত ধার্ম্মিক কখনই তাহা করিতেন না, "আত্মার্থে পৃথিবী ত্যজেৎ।" আত্মার পাবিত্রতা জন্য পৃথিবীর সমস্ত ত্যাগেও অপরাধ হয় না। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে সতীকেও অধার্ম্মিক পতিত পতি ত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাদেবী, দণ্ডীরাজকে আশ্রয় না দেওয়ায় অর্জ্জুনকে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছিলেন। ভীষ্মাদির ধৃতরাষ্ট্র ত্যাগে কি অপরাধ হইত। যথা—

"সন্তুষ্টা লোলুপা দক্ষা দর্ম্মজ্ঞা প্রিয় সত্যবাক। অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিতং স্বামিনং ত্যজেৎ॥" শ্রীমদ্ভাগবত। ভীষ্মাদির জ্ঞান আবরণ তত্ত্বই ভীষ্মাদিতে অসুরত্ব আবির্ভাব। বাবা, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় দেহদান, মধুকৈটভ হইতে বলাসুর, গয়াসুর ইত্যাদি অসুরগণই করিয়াছেন, তাই এই দানকে বামনদেব বলির দান গ্রহণ কালে, সম্মুখেই অসুরধর্ম্ম বলিয়াছিলেন। তাহাদের মত ভীষ্ম দ্রোণ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে নিজেদের মৃত্যুছিদ্র বলিয়া প্রাণ দান করিবেন, কর্ণও নিজের বিজয়-সম্বল কবচ কুণ্ডল দান করিয়া নিহত হইবেন। অধর্ম্ম পথের সাহায্য জন্য ধর্ম্মের বিপক্ষতায় দাঁড়াইলে অসুরের এই ফলই লাভ করিতে হয়।

অসুর সঙ্গ ও ভোগে মনের বিকার হওয়াই ভীষ্মের পাণ্ডব বিপক্ষতা গ্রহণ। মন এতদিন তাহার সঙ্কল্প রক্ষার প্রথম স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া, অদ্য হইতে বিকল্প রক্ষার দ্বিতীয় স্বরূপ প্রদর্শন আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মদেবের দুইটী নাম ছিল, একটী দেবব্রত, অন্যটী ভীষ্মদেব। এতদিন তাঁহার দেবব্রত —মুক্তি-সহায় রূপ দর্শন করিয়াছ, অদ্য হইতে তাঁহার ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়ানক মুক্তি-বাধক স্বরূপ দর্শন করিবে। মন বিকল্প পথে ধাবিত হইলেই, জীবের একাদশ ইন্দ্রিয় হইতে একাদশ অক্ষৌহিণী পৃথক পৃথক কর্ম্মসত্তার বিকাশ হইয়া, জীবকে অনন্ত কর্ম্মশক্তি দান করে। সেই চঞ্চল বিকল্প-সত্বার আশ্রয়ে মন নিবৃত্তি-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারে ব্রতী হইলে, তাহাকে বিজয় করা, এই ভীষ্ম বধের মতই সঙ্কট হইয়া উঠে। এইরূপ কাম বিকার হইয়া, দ্রোণাচার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, কেবল নানা লোভে নানাপ্রকার বুদ্ধির বিকাশ আরম্ভ করে। অহঙ্কার কর্ণত্ব লাভ করে, কেবল ঈর্ষার তৃপ্তিতেই বুদ্ধি ও মন চালিত করে। কর্ম্মচেষ্টা অশ্বত্থমাত্ব লাভ করে, ক্রোধে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়। জ্ঞান শকুনিত্ব লাভ করে, কেবল দারুণ কুটীল কৌশল উদ্ভাবন করে। দয়া মমত্ব যুক্ত হইয়া, স্বর্গের দ্বারস্বরূপ দয়া নরকের সেতু হইয়া উঠে।

জীবনের লক্ষ্য শৈল্যত্ব প্রাপ্ত হয়, অনিমাদি ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধাই শক্তি লাভই জীবনের সার্থকতা মনে করে। এখন যুদ্ধ অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে অসুরের এই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির শক্তি, বীর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া, ইহাদের পরাজয় উপায় প্রদর্শন করা হইবে। প্রথমে মনের বিজয়ই ভীষ্মপর্ব্বে শ্রবণ কর।

যুদ্ধ-পর্ব্ব।

পরিচয়।

প্রবৃত্তি বিজয় সংবাদ

ভীষ্মপর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অনুশাসন-পর্ব্বের শেষ ভীষ্মদেবের নির্ব্বাণ লাভ হইলে, পাণ্ডবগণ অসুরত্বের আক্রমণের অতীত হইতে পারিয়াছিলেন। তাই ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্ব, শৈল্যপর্ব্ব, সৌপ্তিকপর্ব্ব, অনুশোচনা-পর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন-পর্ব্ব এই অষ্ট পর্ব্বই যুদ্ধ-পর্ব্ব। পর্ব্বগুলি দ্বারা যুদ্ধের এক একটী বিশেষ স্তরকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে মাত্র। সহজে বোধগম্য হইবার জন্ত ইহাদের পরিচয় এক স্থানেই দান করিলাম।

মনই বিষয়াশক্তির মূল সত্তা—তাই এই সংকল্প বিকল্পাত্মক মনরূপ ভীষ্মদেবের জন্মমাত্রই, শান্ত-ভগবান রাজাশান্তনু নিবৃত্তি ভাবচ্যুত হইয়া ঐশ্বর্য্য প্রবৃত্তি গত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভীষ্মদেবই কুরুবংশকে রক্ষা করিয়া বর্দ্ধিত করতঃ, পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। তাই ইহার নির্ব্বাণ অর্থাৎ মনের নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইলেই, সর্ব্ব বিষয়াসক্তির শেষ হইয়া পাণ্ডব গুণমায়ার অতীত হইবেন। এই মনকে নির্ব্বাণে নেওয়ার কৌশলই এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্ট-পর্ব্বে প্রদর্শিত হইবে। মনকে প্রথম সবিকল্প সমাধিতে ফেলাইয়া, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি

যুক্ততা হইতে পৃথক করিয়া দিতে হয় ; তাহাই ভীষ্মদেবের শরশয্যা। পরে সবিকল্প সমাধির বিকল্পের আশ্রয় সত্তাগুলিকে ক্রমে নষ্ট করিতে পারিলে, মন ক্রমে শান্ত হইয়া, নিবৃত্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করে। মনের বিকল্পের আশ্রয় কতকগুলিকে নষ্ট করিতে হয়, কতককে নিদ্রিত করিতে হয়, আবার কতককে মার্জ্জনা করিয়া লইতে হয়। তাই এক যুদ্ধপর্ব্বের মধ্যে ও বধ, সৌপ্তিক, অনুশোচনা, শান্তি আদি পৃথক পৃথক নামিয় পর্ব্বের পরে ভীষ্মদেবের নির্ব্বাণ হইল। অসুরত্বের মূল আশ্রয় সত্তাগুলির স্বরূপ, শক্তি, বীর্য্যাদি ও আক্রমণ পদ্ধতির খেলা, এই যুদ্ধ-পর্ব্বগুলির মধ্যে জীবন্ত ভাবে দর্শন করিবে।

ভীষ্ম-পর্ব্ব—মনের গুণাতীত ও গুণময় দুই অবস্থা, তাহা ভীষ্মদেব দুই নামের পরিচয় জানিবে। গুণাতীত মন প্রথম জীবনের লীলাকারী ভীষ্ম, তাঁহার প্রথম নাম দেবব্রতের মধুর স্বরূপ, আর গুণময় মন এই দুর্য্যোধন দলভুক্ত শেষ জীবনের ভীষ্মদেব, এইটী তাহার দ্বিতীয় নাম ভীষ্মদেবের ভীষণ স্বরূপ। মন যখন কামক্রোধ ঈর্ষ্যাদির বশীভুত না হইয়া, নিজের সর্ব্ব বিকল্প-জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা অসুরত্ব স্থাপনে ব্রতী হয়, তখন তাহার আক্রমণ রোধ, এই ভীষ্ম জয়ের মতই অসম্ভব ব্যাপার। ভগবৎভক্তি ও অভ্যাস দ্বারা তাহাকে কোনরূপে অসুরত্বের বেষ্টন হইতে পৃথক করিয়া, চঞ্চলতা ও সন্দেহের নাশ করতঃ সমাধির সম্মুখে লইয়া যাইতে পারিলেই, মনের যুদ্ধশক্তি অর্থাৎ কর্ম্মকরী-শক্তির হ্রাস হইয়া যায়, তাহাই মনের সবিকল্প-সমাধি লাভ। তখন জীব ধর্ম্ম করিব না দৃঢ়তা হইতে, ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে সম্মত হয় মাত্র। ইহাই অর্জ্জুন ভীষ্মরক্ষক দুঃশাসন আদি তাড়াইয়া রথের অশ্ব ও তাহার বর্ম্মাদি ছেদন করিয়া দিলে, ভীষ্মদেব একা শিখণ্ডির সম্মুখে পড়িয়া অস্ত্র ত্যাগ করতঃ শরশয্যা গ্রহণ করিলেন।

বিকল্পের আশ্রয়—মনের সবিকল্প-সমাধি হইলেই জীবের

অবস্থা নিরাপদ নয়। এই অবস্থায়ও মনের বিষয় বিকল্পের অর্থাৎ কল্পনার শেষ হয় না। তাই এই বিকল্পের আশ্রয় নষ্ট করিবার প্রয়োজন। বিকল্পের আশ্রয় কাম, ক্রোধ ও আমিত্ব জ্ঞান। ইহারাই দ্রোণ, অশ্বত্থমা ও দুর্য্যোধন। গীতার "কাম এষ ক্রোধ এষ" এই দুর্জ্জয় সত্তাই মনকে বিষয়ের দিকে টানতে থাকে। কামেরও তিনটী স্বরূপ, তমোগুণে বিষয় কাম, ধন সম্পদ লোভ। রজোগুণে ঈর্ষ্যা কাম প্রতিযোগিতা লোভ, এবং সত্ত্বগুণে সিদ্ধাই কাম অষ্টসিদ্ধি লোভ। এই তিন কামই, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও মদ্ররাজ শৈল্য দ্বারা জীবন্ত প্রদর্শিত হইবে। বিষয়-কাম-আরবিত মনই দ্রোণাচার্য্য, ঈর্ষ্যাবরিত মন কর্ণ ও সিদ্ধাই আবরিত মন মদ্ররাজ। এই তিন কামকেই নষ্ট করিতে হইবে, পরে ক্রোধ ও অহঙ্কারকে ঘুম পাড়াইয়া, দয়া ও কর্ম্মাভিমানের অনুশোচনাকে মার্জ্জনা করিতে পারিলে, মনের বিকল্পের শান্তি অবস্থা লাভ হয়। তখন সৎসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গে মনকে রাখিলে বিকল্পের নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তাহাই শান্তি-পর্ব্বের পরে ভীষ্মদেবের নির্ব্বাণ লাভ।

দ্রোণ-পর্ব্ব—বিষয় কাম আরবিত মনের বিজয়, এই দ্রোণ বধের মতই ভীষণ ব্যাপার। তাহার দারুণ চক্রব্যূহের অগ্রপশ্চাৎ কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। যুদ্ধ করিয়া ভেদ করিতে যাইয়া, ধর্ম্মরাজ, ভীমাদির মত ব্যক্তিও সেই ব্যূহের প্রবেশ নির্গম পথের সন্ধান পায় না। অর্জ্জুন-পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ ভাগিনেয় অভিমন্যুর মত মহাবীরও সেই ব্যূহ ভেদ করিতে যাইয়া, বর্ম্ম অস্ত্রাদি হীন হইয়া নিরাশ্রয় ভাবে নিহত হয়। এই দুর্জ্জয় রিপুকে যুদ্ধ করিয়া বিজয় অসম্ভব। শোকাদি অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে মন অভিভূত হইলে, মনের উপর কামের অধিকার লোপ পায়, যেন কাম অস্ত্র ছাড়িয়া একটু যুদ্ধ বিমুখ হয়। এই কালে হঠাৎ বৈরাগ্যাদি গ্রহণ করিয়া বসিলে, কামের নাশ হয়। দৃঢ়তার সহিত একেবারে নাশ করা চাই। এই তত্ত্বই গীতার "নৈষ্ঠিকিং শান্তি মাপ্নোতি।" নিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া বাজারের মিঠাই

ছাড়িয়া দিলে, মিঠাই দেখিয়া আর লোভ হয় না। এই বিষয়ই মিথ্যা পুত্রশোকের সংবাদে অভিভূত গুরুকে, হঠাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধন করা।

কর্ণ পর্ব্ব—আধ্যাত্মিক সিদ্ধাই-শক্তির আশ্রয়ে জীব যখন ঈর্ষ্যার তৃপ্তি ও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয়, তখন সেই যুদ্ধ শৈল্যসারথী কর্ণকে বিজয় করার মতই দুষ্কর ব্যাপার হয়। কেবল ভক্তিবলে ভগবানের কৃপায় জীব সেই বিপদে উদ্ধার লাভ করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ-সারথী অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে কর্ণকে বধ করিলেন।

শৈল্য-পর্ব্ব—এই যোগ-শক্তি-কামনা মুক্তি-রাজ্যের দারুণ শৈল্য স্বরূপ। কেবল জ্ঞানিগণ যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম যোগের সাহায্যে, এই কামনাকে বধ করিতে সক্ষম হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের আদেশে চারি ভ্রাতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজ মদ্রপতিকে বধ করিলেন।

ক্রোধের স্বরূপ—ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ গীঃ ২য় ৬২ শ্লোঃ। বিষয়ের ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা হইতে মনে বিষয়ের সঙ্গ জন্য কামের জন্ম হয়, সেই কাম হইতে ক্রোধের জন্ম হয়। বিষয় সুখের আস্বাদ মনে জল্পনা করিতেই তাহা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা লোভের জন্ম হয়, তাহারই নাম কাম। আর আকাঙ্ক্ষা হইতে যে প্রাপ্তি জন্য দৃঢ় ইচ্ছা জন্মে, যেই বৃত্তি "এইটী আমার চাইই" বলিয়া ছেলের মত আবদার আরম্ভ করে, সেইটাই ক্রোধবৃত্তি। এই কাম ও ক্রোধ অহঙ্কার তত্ত্বকে আবরণ করিতে পারিলেই, অহঙ্কার তত্ত্ব আমিত্ব অবস্থা লাভ করতঃ "আমি লাভ করিবই" বলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কাম ও ক্রোধ আমিত্ব অহঙ্কারের আশ্রয় না পাইলে, দাড়াইতে পারে না; আবার এই কাম ক্রোধের আশ্রয় না পাইলেও জীবের অহঙ্কারতত্ত্ব আমিত্বে পরিণত হয় না। তাই কাম ক্রোধ নাশে আমিত্বের নাশ হয়।

আবার আমিত্ব নাশ করিতে পারিলেও কাম ক্রোধের শেষ হইয়া যায়। ক্রোধের আবরণে আমিত্ব গ্রহণই জীবের মোহ, এই আমিত্বের মোহেই জীবের স্বস্বরূপ স্মৃতির নাশ হয়। তখন জীবের ব্রহ্ম বুদ্ধির নাশ হইয়া, নষ্ট জ্ঞান জীবত্ব লইয়া জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই গীতায় বলিয়াছেন।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ গীঃ ২য় ৬৩ শ্লোঃ।

কাম ক্রোধ আবরিত জীবঅহঙ্কার মনের বিকল্প আশ্রয় করিলেই ক্রমে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ও স্বজনাদি প্রত্যেককে পৃথক পৃথক অহঙ্কার দান করিয়া, এক আমিকে দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মতই অসংখ্য করিয়া তোলে। তখন সে প্রকৃত আমিকে হারাইয়া, দেহ আমি কি ইন্দ্রিয় আমি, না প্রবৃত্তিই আমি, না পুত্র, কন্যা আমি, না আত্মা আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে সক্ষম হয় না। তাই প্রতি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ও স্বজনের তৃপ্তিকে নিজ তৃপ্তি ভাবিয়া, ভীষণ অসুর হইয়া অশান্ত ও অশ্রান্ত ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; তাহার কর্ম্মের আর বিরাম হয় না। এই কর্ম্মদৃঢ়তা ক্রোধ আবার তিন প্রকারে জন্মে। তিন প্রকারের ক্রোধযুক্ত হইয়া জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। একটী কর্ম্ম-শক্তির অভিমানের ফলে, দ্বিতীয় প্রতিফল দানার্থে ক্রোধে, তৃতীয় দয়ায়—পর দুঃখাদি দর্শনে কৃপাযুক্ত হইয়া। এই ক্রোধের তিন সত্তাই দুর্য্যোধনের যুদ্ধাব শেষ বীরত্রয়—কৃতকর্ম্মা, অশ্বত্থমা ও কৃপাচার্য্য। কর্ম্মাভিমান,—কৃতবর্ম্মা, প্রতিহিংসা—অশ্বথামা ও করুণাই—কৃপাচার্য্য। কামনার শেষ হইলে অহঙ্কারের বহু আমিত্বের শেষ হইয়া, এক আমিত্ব ও তিন ক্রোধ-সত্তার প্রকাশ হইয়া পরে, তাহাই ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষে কৃতবর্ম্মাদি সহিত দুর্য্যোধন এই চারিজনের মাত্র যুদ্ধশেষে জীবিত থাকা।

অহঙ্কার তত্ত্বের একেবারে নাশ হইলে যে, কর্ত্তা আমির সঙ্গে দাস আমিরও শেষ হইয়া যায়, এবং ক্রোধের দৃঢ়তা চলিয়া গেলে যে দাস্য

কর্ম্মেও দৃঢ়তা নাশ হয়, তাই দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থমাদিকে বধ করা হয় নাই; ইহাদিগের দর্প ইত্যাদি তমঃ ও রজঃ ভাবের নাশ করিয়া নিস্তেজ করিয়া যেন সুপ্ত করিয়া রাখিতে হয়। তাহাই সৌপ্তিকপর্ব্বে এই অহঙ্কার তত্ত্বের ও ক্রোধের মার্জ্জনা বর্ণিত হইবে।

সৌপ্তিক-পর্ব্ব—দ্বৈপায়নহ্রদে লুকাইত দুর্য্যোধনকে পৌরুষ বাক্য বলিয়া বাহির করিয়া, ভীমের দ্বারা পদ ভাঙ্গিয়া মূর্চ্ছিত করার মত, অন্যের পৌরুষ বাক্যে যাহাতে আমিত্ব ক্রোধযুক্ত হইয়া আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহাই করিতে হইবে। অন্যায়পূর্ব্বক পা ভাঙ্গিয়া দিলেও যখন ক্রোধ না জন্মিবে, শত্রু মস্তকে পদাঘাত করিলেও যখন দর্পাহঙ্কার সাড়া না দিবে, তখন জানিবে দর্প অহঙ্কারের আমিত্ব ঘুমাইয়াছে। তাহাই দুর্য্যোধনকে অবিধি-আঘাতে পদ ভাঙ্গিয়া, ভীমসেন মস্তকে পদাঘাত করতঃ মুর্চ্ছিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন।

এই মুর্চ্ছা অর্থাৎ পদাঘাতেও শব্দ না করা, দায়ে ঠেকিয়া অর্থাৎ উপায় আর নাই বলিয়াও হইতে পারে। তাহাকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারিলে, মমতা ও কর্ম্মাভিমান যোগে, দারুণ প্রতি-হিংসায় ক্রোধযুক্ত হইয়া অহঙ্কার আবার জাগিয়া উঠে। তখন জীব না করিতে পারে এমন কর্ম্মই থাকে না। মহাজ্ঞানীও অতি হীনকর্ম্ম করিয়া বসে। তাহাই ঋষিপুত্র, পরমজ্ঞানী, মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, কৃপাচার্য্যের মমতা ও কৃতবর্ম্মার কর্ম্মাভিমানে উত্তেজিত হইয়া, প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। ক্রোধাধীন মমতাযুক্ত দয়া ও কর্ম্মাভিমান, কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাও তাহার সাহায্যে ব্রতী হইলেন। পরে চোরের মত শিবিরে প্রবেশ করিয়া, দস্যুর মত নরহত্যা, শিশুহত্যা করিয়া বসিলেন। মহাশত্রু প্রতিহিংসার পাত্র পাণ্ডব না মরিয়া, নিদ্রিত শিশুহত্যা দেখিয়া

দয়া—কৃপাচার্য্য দারুণ দুঃখিত হইলেন, কর্ম্মাভিমান—কৃতবর্ম্মাও বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। অমনি তাঁহারা প্রতিহিংসা অশ্বত্থমাকে নিন্দা করিয়া পরিত্যাগ করিলেন ও অতি দুঃখের সহিত যাইয়া দুর্যোধনকে এই হীন শোচনীয় সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দুর্য্যোধনও অন্ত লজ্জায় ও দুঃখে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অন্ত সত্যই সে করুণায় আকুল হইয়া, শক্রজ্ঞান ভুলিয়া, পাণ্ডবের পুত্রশোকে নিজের পুত্রশোকের মত ব্যথা পাইয়া কান্দিয়া উঠিলেন। "হায়,! নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ এই কি করিলে, কুরুবংশে বাতি দিতেও একজনকে রাখিলে না।" এই বলিয়া দুর্য্যোধনের যে মুর্চ্ছা হইল সে মুর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। অনুশোচনার জন্ম হইলেই পাপের শেষ হয়, অহঙ্কার তত্ত্বের দর্প, প্রতিহিংসাও মমত্বের গণ্ডীর শেষ হয়। তখন প্রভু আমিত্বের শক্তিহীনতা—নিদ্রাবস্থার আগমন হয়। অনুশোচনার ও প্রকার ভেদ আছে তাহাই অনুশোচনাপর্ব্বে বর্ণিত হইবে।

অনুশোচনা-পর্ব্ব—যুদ্ধাবসানে নিহতগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মাতা,পত্নী, সন্তানাদির শোকাবহ রোদনাদিতে এবং তাহাদের দুঃখযুক্ত অনুযোগ,নিন্দা ইত্যাদিতে ধর্ম্মরাজের মনেও দারুণ অনুশোচনার বিকল্প উদয় হইয়াছিল। গান্ধারী তামস-অনুশোচনায় পাণ্ডবধ্বংসের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণকেই অভিশাপ দান করিয়া বসিলেন। ধর্ম্মরাজ সাত্ত্বিক-অনুশোচনায় সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়া শান্তি পথে লইয়া গেলেন, তাহাই শান্তি-পর্ব্ব।

শান্তি ও অনুশাসন-পর্ব্ব—গীতায় বলিয়াছেন, বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি॥ (২য় ৭১ শ্লোঃ)। সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে চ্যুত হইয়া, যখন জীব নিস্পৃহ মমত্বহীন অর্থাৎ আমার সংজ্ঞাহীন ও নিরহঙ্কার অর্থাৎ দর্পাভিমান হীন হয়, তখনই শান্ত অবস্থায় উত্থিত হয়। এই

শান্ত অবস্থায় মনের বিষয়স্বাদের নাশ পায় বটে, কিন্তু তখনও মনে ব্রহ্ম আস্বাদের জন্ম হয় না, এই অবস্থা জীবের তটস্থ অবস্থা। তখন সে বদ্ধজীবও নয়, মুক্তজীবও নয়। এই কালে বিষয়ীর সঙ্গ ও বিষয় আলাপনে থাকিলে মন আবার বিষয়ে নামিয়া আসে, এবং মুক্তদের সঙ্গ ও মুক্তরাজ্যের আলোচনায় মন মুক্তরাজ্যে উঠিয়া যায়। সৎসঙ্গাদিতে মনে নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের স্বভাবতঃ স্ফুরণ হইয়া, অভ্রান্ত অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞান ও ভক্তির জন্ম হয়। তাই শান্তিপর্ব্বে ঋষিগণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে ব্রহ্ম আলাপন করিতে করিতে, মনরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবগণকে বেদগুহ্য ব্রহ্ম সংবাদ দান করিলেন। প্রথমে মোক্ষধর্ম্ম ব্রহ্মরাজ্য সংবাদ বলিয়া, পরে কিরূপ অনুশাসন মতে চলিলে জীব সংসারে নিরাপদে কর্ম্ম করিতে করিতে, অবিদ্যার বিষয়-রাজ্যের পারে গমন করিতে পারে, তাহা বলিয়া, ব্রহ্মে লীন অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করিলেন; তখনই মনের বিকল্পের শেষ হইল। এই তত্ত্বই শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বের পরে ভীষ্মদেবের নির্ব্বাণ। ব্রহ্মরাজ্যের মোক্ষ্যধর্ম্মের বর্ণনাই **শান্তি-পর্ব্ব** এবং অবিদ্যা নাশের বিধিধর্ম্ম বর্ণনাই **অনুশাসন-পর্ব্ব**। মনের বিকল্পের নাশ হইলেই কর্ম্মরাজ্যের একেবারে শেষ হয় না। তখন মনের ব্রহ্মবিমুখী বিকল্পসত্তায় শেষ হইয়া, ব্রহ্মাভিমুখী সঙ্কল্পসত্তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়—জীবত্বের জন্য কর্ম্ম যাইয়া ব্রহ্মতৃপ্তি জন্য কর্ম্ম আরব্ধ হয়, তাহাই ভীষ্মদেবের নির্ব্বাণের পরে **অশ্বমেধপর্ব্বে** দর্শন করিবে। অশ্বমেধপর্ব্বে কর্ম্মশক্তিরূপ অশ্বের বলিদান হইলে, **আশ্রমিক ও মৌষলপর্ব্বে** সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া ব্রহ্মের মায়াশক্তি জীবকে পরিত্যাগ করিবেন। তখন **মহাপ্রস্থান-পর্ব্বে** জীবের কর্ম্ম শেষ হইয়া, **স্বর্গারোহণ পর্ব্বে** মুক্তিলাভ বর্ণনা করিয়া মহাভারত লীলা শেষ হইবে।

ভীষ্ম-পর্ব্ব।

মন বিজয় সংবাদ।

ভগবদ্গীতা অধ্যায়।

কুমনাঃ সুমনস্তং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণ মাত্রেণ তং চৈতন্য প্রভুং ভজে॥

লীলা—ভীষ্মদেব ধার্ত্তরাষ্ট্রের প্রধান রক্ষক ও চালক হইয়া, পাণ্ডবদের গতিরোধ জন্য, কুরুক্ষেত্রের প্রসস্তক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, পাণ্ডবপক্ষও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা পরিচালিত ও দ্রৌপদ বল দ্বারা রক্ষিত হইয়া, যুদ্ধের জন্য তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধারম্ভের পুর্ব্বে অর্জ্জুন উভয় পক্ষের সৈন্যবল দর্শন করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ সহিত রথে উঠিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন; উভয় পক্ষেই বিশেষ বিশেষ আত্মীয়গণ পরস্পরকে বধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, জীব যাহাদিগকে লইয়া সংসার রচনা করিয়া সুখের কল্পনা করে, সেই সমস্ত আত্মীয়কেই তাহাদের নিহত করিতে হইবে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজবংশই, তাহাদের সমস্ত সৈন্যবল সহিত, "মৃত্যু না হয় জয়" এই পণ করিয়া, উভয় পক্ষে যুদ্ধ জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন। প্রায় সকলেই

ব্রহ্মাস্ত্র বেত্তা মহারথ, কেহই প্রাণ থাকিতে যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। তাই কিছুতেই উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ ধ্বংস বিনা, এই যুদ্ধের শেষ হওয়া অসম্ভব। বুঝিলেন, এই কালযুদ্ধ সংঘটিত হইলে, পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজগণ সহিত ক্ষত্রিয় কুলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর ইহাদিগকে হারাইয়া তাহাদের আত্মীয়, মাতা, পত্নী ও সন্তানগণ নিরাশ্রয় হইয়া, দারুণ শোক ও বিষাদের সাগরে নিমগ্ন হইবে। পৃথিবীব্যাপি এই বিষাদ ও শোকের কথা মনে করিয়া অর্জ্জুন করুণায় গলিয়া গেলেন। দুঃখে তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডিবধনু পড়িয়া গেল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, শোকে বিবশ ও অশ্রুপ্লাবিত হইয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! এই যুদ্ধ জয় করিয়া আমাদের কি ফল লাভ হইবে? জীব যে জন্য সংসারী হইয়া বাস করে, যাহাদিগকে লইয়া সুখের আশায় সংসার বন্ধন করে, এই যুদ্ধাগ্নিতে যে তাঁহাদের সমস্তকেই আপন হস্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে! গুরুবর্গ, জ্ঞাতিবর্গ, কুটুম্বগণ, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, বন্ধু ও শ্যালকগণকে বধ করিয়া, কি লইয়া আমরা আবার সুখের কল্পনা করিব? হে হৃষিকেশ! এই যুদ্ধে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান লইয়া ধ্বংস হইয়া গেলে, পৃথিবীর কি সর্ব্বদিকে অমঙ্গল হইবে না? আহা! এই দারুণ ধ্বংসযজ্ঞে কত মাতা যে পুত্র হারা হইবে, পত্নী স্বামী হারা হইবে, কত বালক পিতা হারা হইবে! সমস্ত পৃথিবীই যে শোক ও বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে; দারুণ ক্রন্দনের রোলে যে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত হইবে। জ্ঞান ও শাসনের অভাবে যত অধর্ম্ম ও অজ্ঞতায় দেশ আচ্ছন্ন হইবে। হে পাণ্ডবের প্রভো! এই কোটী কোটী ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস না করিয়া, শুধু পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংসে জগতের এমন কি ক্ষতি হইবে? ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অজ্ঞতার মোহে যদিও এই সব অনর্থের বিষয় ভাবিতেও পারিতেছে না, আমরা বুঝিয়াও কি করিয়া এই যুদ্ধে ব্রতী হইব। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমায় বধ

করুক, আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।” এই বলিয়া অর্জ্জুন অবসন্ন হইয়া পরিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একান্ত ভক্ত অর্জ্জুনকে ভগবৎসত্তায় কৃপা করতঃ, সৃষ্টি-রাজ্যের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব উপদেশ করিলেন এবং সর্ব্বতত্ত্বাত্মক বিরাটরূপ, ঐশ্বর্য্য তত্ত্বাত্মক দেবরূপ ও মাধুর্য্য তত্ত্বাত্মক নররূপ, এই ত্রিবিধ রূপই দর্শন করাইলেন। ভগবৎকৃপায় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের জাগরণে অর্জ্জুনের বিকল্পের মূল সন্দেহের নাশ হইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন সত্যই ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া, সর্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন ও নিবৃত্ত ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্টপথে যুদ্ধে ব্রতী হইলেন।

তত্ত্ব—বৎস! সহস্র বর্ষ অধ্যয়ন ও সহস্র ঋষির নিকট উপদেশ শ্রবণেও জীবের অবিদ্যার সন্দেহের গ্রন্থি চ্ছেদন হইবে না, যতদিন পর্যান্ত ভগবান কৃপা করিয়া সাধককে তাঁহার বিভূতি দর্শন সহিত, তত্ত্বের স্ফুরণ না করিয়া দিবেন। অন্তর্য্যামী গুরুরূপী ভগবান্ যখন স্বয়ং সমস্ত রহস্য সহিত নিজের স্বরূপ দর্শন করাইবেন, তখনই জীবের নিঃসন্দেহ অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানের বিকাশ হইবে। তখন জীব ভগবৎকৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিকল্পের আক্রমণের অতীত হইয়া যাইবে। সেই ভগবৎ কৃপাভাজন সাধকের আর যুদ্ধ করিয়া মন ও কামনা ইত্যাদির বিজয়ের প্রয়োজনই হয় না। এই তত্ত্বই অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদ্গীতা উপদেশে জ্ঞানদান দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দেব-প্রকৃতির গুণমায়া-প্রবৃত্তির বিকল্প জয় “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।” গীঃ ১৮ অঃ শ্লোঃ ৬৬। ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্ববিচার পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমার শরণ লও, আমিই তোমায় সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করতঃ শুচি করিয়া লইব, [illegible]ন এই পন্থা। দেবপ্রকৃতি, একান্ত-ভক্ত এই পথেই প্রবৃত্তি বিজয় করিতে পারেন। এখন জ্ঞানী যোগী আদির প্রবৃত্তি-রাজ্যের প্রত্যেককে একে একে বিজয় করিয়া মুক্তি লাভের উপায়, ভগবদ্গীতায় স্বমুখে যেরূপ উপদেশ

করিয়াছেন তাহা বুঝাইতে, যুদ্ধলীলাদ্বারা প্রদর্শন করিবেন। ভীষ্মপর্ব্ব হইতে শান্তি পর্ব্বের মধ্যে, বলপূর্ব্বক মনের বিকল্প-প্রবৃত্তি বিজয় বা অসুরত্ব ধ্বংস ক্রমে বর্ণিত হইবে।

মনরূপী ভীষ্মদেব তাহার বিকল্পসত্তা দ্বারা দুর্য্যোধনের রক্ষক ও কর্ম্মসেনাপতি হইয়া, অন্ত নির্বৃত্তির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। আবার তাঁহারই সঙ্কল্পসত্তা পাণ্ডবকে রক্ষা করিয়াও বিকল্পের বিপক্ষে দারুণ যুদ্ধ করিবেন। এই তত্ত্বটুকুই বাবা ভীষ্মদেবের উভয় পক্ষে সহায়তা করণ। এই সৃষ্টি রাজ্যই বিকল্পসত্তার রাজ্য। রজোগুণাত্মক সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তিই বিকল্প হইতে জন্মে, তাই ক্রিয়াশক্তি লইয়া ভীষ্মদেব দুর্য্যোধন রক্ষক হইলেন। আর সঙ্কল্প কেবল জ্ঞানের কার্য্য, মনের ক্রিয়া, তাই জ্ঞানোপদেশ-সত্ত্বা লইয়া ভীষ্মদেব পাণ্ডবের সাহায্য করিলেন। সঙ্কল্পসত্ত্বা দ্বারা বিকল্পকে নাশ করার উপায় প্রদর্শনই এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। অন্ত মমতা ও করুণারছলে বিকল্পসত্ত্বাই অর্জ্জুনকে দারুণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাই অর্জ্জুনের বিষাদ মোহে অবসন্ন হওয়া। অর্জ্জুন পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য সহিত উত্তম গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তার পরে ত্যাগ ও ধর্ম্মসাধন সহিত ধর্ম্মরাজ ও বহু ঋষির নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, আবার ভগবানের একান্ত শরণ লইয়া, ভক্তিবলে ভগবানের বিশেষ কৃপার অধিকারী হইয়াছিলেন, সেইজন্যই স্বয়ং ভগবান ভগবৎসত্ত্বার বিকাশে, উপদেশ ও রূপ দেখাইয়া তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করিলেন; অর্জ্জুনের বিকল্প নষ্ট করিয়া দিলেন। তাই গীতায় এমন ব্যক্তি বিনা গীতা জ্ঞান উপদেশ করিতে নিশেধ করিয়াছেন।

বৎস, স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক গীত ভগবৎভক্তি-ধর্ম্মের জীবন্ত দৃষ্টান্তই সমস্ত মহাভারতে প্রদর্শিত হইয়াছে জানিবে। আর্য্যঋষিগণের ও বেদ বেদান্তাদির সমস্ত জ্ঞানরাশিই জীবের মঙ্গল জন্য, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

এই গীতার মধ্যে স্বত্ররূপে গ্রন্থন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই গীতায় উক্ত হয় নাই এমন তত্ত্ব, এমন ধর্ম্মসাধন জগতেই সৃষ্ট হয় নাই। এই গীতার জীবন্ত ও বিস্তৃত পরিভাষাই মহাভারত লীলা, তাহাতে জীবন্ত জীবনের মধ্যে শ্লোকগুলির যথার্থতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতা অধ্যায়ের আরও একটু রহস্য শ্রবণ কর। গীতায় ভগবান্ একস্থানে বলিয়াছেন জ্ঞানীদিগকে আমার নিকট যাইবার বুদ্ধি দেই, দেখিবে ধর্ম্মরাজকে সর্ব্ব সময় যথোপযুক্ত বুদ্ধি যোগাইয়া দিয়াছেন। অন্যত্র বলিয়াছেন, যুক্তদের যোগক্ষেম বহন করেন, দেখিবে যোগী ভীমসেনকে, শ্রীকৃষ্ণ নিজে যাইয়া বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিবেন। অন্যত্র বলিয়াছেন একান্ত শরণাগতের পাপ তাপ ধোয়াইয়া শুচি করিয়া লন, তাহাই স্বয়ং কৃপা করিয়া তত্ত্ব উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনের অবসাদ দূর করিয়া লইলেন। মোট কথায় যুদ্ধারম্ভের প্রথমেই তিনি ভগবৎ সত্ত্বা লইয়া, উভয় সৈন্যের মধ্যে দাড়াইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করতঃ, বিশ্বাসী ভক্ত পাণ্ডবদের তেজ বর্দ্ধন ও অবিশ্বাসী অভক্ত ধৃতরাষ্ট্রদের তেজকে হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শঙ্খনাদের এক ক্রিয়াই অর্জ্জুনের গীতাশ্রবণ, দ্বিতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রদের হৃদয় বিদারণ হওয়া। এখন তৃতীয়ে যুধিষ্ঠিরের কি লাভ হইল তাহা শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজকে ভগবান্ এমন বুদ্ধি যোগাইয়া দিলেন যে, তাহাতে অজেয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ বিজয়ও পাণ্ডবের সহজ সাধ্য হইয়া গেল। ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষীয় রাজগণ ও সাধারণ সৈন্যগণ পর্য্যন্ত, পাণ্ডবের মহত্ত্বে তাহাদের প্রতি বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া, দুর্য্যোধনের প্রতি বিরক্ত হইল; নিজেরা অধর্ম্ম দলভুক্ত বলিয়া লজ্জিতও হইল। ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষের এক মহারথ, দুর্য্যোধনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুযুৎসু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিলেন। এখন সেই লীলা শ্রবণ কর!

লীলা—ধর্ম্মরাজ হঠাৎ যুদ্ধসাজ ফেলিয়া, সামান্য বেশে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুবর্গকে প্রণাম করতঃ, স্বাধিকার

রক্ষায় যুদ্ধ জন্য আদেশ প্রার্থনা করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণাদি সকলেই পাণ্ডবের এই শীলতায় বিশেষ আনন্দিত হইয়া, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। "তুমি আসিবে জানি! না আসিলে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিতাম! যখন আসিয়াছ, আমাদের একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। আমরা রাজ্য বিভাগ কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া রক্ষাভার লইয়া বিত্তভোগী হইয়াছিলাম, তাই অন্য অধর্ম্ম জানিয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষে অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু তোমাদিগকেও সর্ব্বদা প্রাণপণে সাহায্য করিব বলিয়া, বলিয়া দিয়াছিলাম। এই বিত্তপুষ্ট দেহত কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য, এখন এই যুদ্ধে তোমাদিগকেও আমরা অন্য প্রকারে কি সাহায্য করিতে পারি বল? আমাদের নিকট হইতে কোনওপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর!" ধর্ম্মরাজ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমায় আপনারা যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। আপনারা সকলেই অজেয় মহারথ! আমি আপনাদিগকে কি কৌশলে বিজয় করিতে পারিব, আমার সেই যুদ্ধ পরামর্শ দান করিতে পারেন।" ভীষ্মাদি আনন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া দিবেন, এমন কি তাহাদের মৃত্যুর ছিদ্রও বলিবেন স্বীকার করিয়া, ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই শ্রীকৃষ্ণ-সারথী অর্জ্জুনের সহায়তায় তুমিই নিশ্চয় জয়লাভ করিবে। যেইদিকে ধর্ম্ম সেইদিকেই শ্রীকৃষ্ণ ও সেইদিকেই বিজয়, তাহাদের পরাজয় হইতেই পারে না। আমরা এই যুদ্ধে দেহ দান করিয়া, অন্নের ভোগ গ্রহণের ঋণ মুক্ত হইব।" কৃপাচার্য্য বলিলেন "আমি অমর, তাই আমার মৃত্যু ছিদ্র বলিতে পারিব না। তবে প্রতি রজনিতে তোমাদের বিজয়জন্য একশত অষ্টটী শিবপূজা করিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।" তারপরে ধর্ম্মরাজ গুরুবর্গের বন্দনা করিয়া যুদ্ধের আদেশ গ্রহণ করতঃ, তাহাদিগকে

যুদ্ধ জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে সর্ব্ব ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষ মধ্যে দাড়াইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "পাণ্ডব পাশা খেলার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিয়া, প্রতিজ্ঞাত স্ব-অধিকার প্রার্থনা করিলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবকে অধিকার দিতে অস্বীকার করিলেন। তাই পাণ্ডব স্ব-অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। আমি আজ ধর্ম্মের নামে সমস্তের কাছে, আমার এই ধর্ম্ম চেষ্টার আদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। কেহ ধর্ম্ম রক্ষার্থে আমার পক্ষে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলে, আমার সঙ্গে আসুন, পাণ্ডব সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, প্রাণপণে রক্ষা করিবে। অধর্ম্মের নিশ্চয় পরাজয় ও পতন হইবে! ধর্ম্মপথে নিশ্চয় ধর্ম্ম ও ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" ধর্ম্মরাজের এই আমন্ত্রণে, দুর্য্যোধনের বৈমাত্রের ভ্রাতা যুযুৎসু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া,অধর্ম্মাচারী ভ্রাতাকে ত্যাগ করতঃ পাণ্ডব পক্ষে যোগ দান করিলেন। পরে ধর্ম্মরাজ অশ্বত্থমা, ভগদত্তাদি রাজগণকে অভ্যর্থনা করতঃ, যুদ্ধের আদেশ লইয়া, নিজ সৈন্য মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। সমস্ত রাজা ও সৈন্যগণ পাণ্ডবের মহত্ব, বিনয় ও সদাচার দেখিয়া মোহিত হইল। তাহারা যে দুর্য্যোধনপক্ষে যোগ দিয়া অধর্ম্মের প্রশ্রয় দান করিয়েছে, বুঝিয়া লজ্জিতও হইল। পাণ্ডবের প্রতি বৈরভাব যাইয়া শ্রদ্ধা জন্মিল ও দুর্য্যোধনের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল। এইরূপে ধার্ত্তরাষ্ট্রদের তেজ নাশ ও যুযুৎসু চলিয়া যাওয়ায় বল নাশ হইয়া গেল, এবং পাণ্ডবের উৎসাহ তেজ ও বলের বর্দ্ধন হইল। এইবার যুদ্ধ অধ্যায় শ্রবণ কর।

ভীষ্মের শরশয্যা বা মনের সবিকল্প সমাধি।

যুদ্ধ লীলা—ভীষ্মদেব দীর্ঘ্যব্যূহ করতঃ, দ্রোণ কৃপাদিকে পৃথক পৃথক সৈন্য বল বিভাগ করিয়া দিয়া, প্রত্যেকের দ্বারা পাণ্ডবের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দারুণ আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। আর নিজে দুঃশাসন আদি

উনশত ধার্ত্তরাষ্ট্র বীর ও প্রচুর সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হইয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্র বল রক্ষা করতঃ, পাণ্ডব সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভীষণ আক্রমণ অন্যের প্রতিরোধ করাত দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ-সারথী অর্জ্জুনেরও প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অর্জ্জুনের একটুকু অনবধানতার মধ্যে ভীষ্মদেব তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত, পাণ্ডবের দশ সহস্র রথী ও প্রচুর সৈন্যবল ধ্বংস করিয়া যুদ্ধ জয় করিতে লাগিলেন; তাঁহার দারুণ যুদ্ধে পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। একদিন অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণই ক্রোধে রথচক্র লইয়া ভীষ্মবধে ধাবিত হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন সঙ্গা পাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ ভীষ্মদেবের নিকট ভীষ্ম পরাজয় মন্ত্রণা জানিতে চাহিলে, ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা মত নিজের পরাজয় ছিদ্র বলিয়া দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে, অর্জ্জুন দ্রুপদ পুত্র উত্তমৌজা ও যুধামন্যুর সহায়তায় দারুণ ভাবে যুদ্ধ করতঃ, ভীষ্মদেবের পৃষ্ঠবল ও পার্শ রক্ষক সভ্রাতা দুঃশাসনের দলকে ছিন্নভিন্ন করতঃ দূরে তাড়াইয়া, এক ভীষ্মদেবকে নিজ সৈন্য-বল দ্বারা বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী তাহার সম্মুখে আসিয়া দারুণ ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এই টুকই ভীষ্মদেবের পরাজয় ছিদ্র। ভীষ্মদেব নিজেই ইহা বলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি কখনও শিখণ্ডির সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবেন না, অথচ তাহার নিকট হইতে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়নও করিবেন না। ভীষ্মদেব শিখণ্ডিকে উপেক্ষা করতঃ তাহার সম্মুখে থাকিয়াই, অন্য পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যের আক্রমণ রোধ ও বাণাদি কর্ত্তন করিলে বা শিখণ্ডির বাণ চ্ছেদন হইয়া যায়, তাই আত্মরক্ষা ও বাণ প্রতিরোধ ত্যাগ করিলেন। তখন অর্জ্জুন তাহার সারথী ও অশ্ব বধ করিয়া রথকে নিশ্চল করতঃ, ধনু ও বর্ম্ম চ্ছেদন করিয়া দিলেন ও যেই অস্ত্র গ্রহণ করেন তাহাই চ্ছেদন করিয়া দিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্মদেব যুদ্ধ ত্যাগ করতঃ মৃত্যু অপেক্ষায়

দণ্ডায়মান হইয়া, পাণ্ডব পক্ষের অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডি ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে আহত ও কাতর হইয়া,দশমদিনে সূর্য্যাস্তের সময় ভীষ্মদেব রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। তাহার শরীরে এত শর বিদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার অঙ্গের কোন অংশই আর মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না, তিনি বাণের উপরেই শয়ন করিয়া রহিলেন, তাই ভীষ্মদেবের এই পতনকে ভীষ্মদেবের শরশয্যা গ্রহণ বলা হয়। সেইকালে দক্ষিণায়ন ছিল, হিন্দুশাস্ত্রে দক্ষিণায়নে দেহত্যাগে পুনঃ জন্ম লইতে হয় বলা থাকায়, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব সেই অসংখ্য বাণছিন্ন দেহেও উত্তরায়ণের আগমন জন্য প্রাণকে ধারণ করিয়া রাখিলেন।* এইরূপে দশদিন দারুণ যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মদেব শরশয্যা লাভ করিলে,যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় ভীষ্ম-পর্ব্বের শেষ হইল।

তত্ত্ব—এই ভীষ্ম জয়ের মধ্যে মনের বিজয় অতি সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে। ভীষ্মদেব তাহার পরাজয় ছিদ্রে বলিয়াছিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা আছে আমি শিখণ্ডির সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। আর আমার মৃত্যুর জন্যই তাহার জন্ম। এই ছিদ্র অবলম্বনে কৌশলে আমায় বধ কর। আমি সৈন্য বেষ্টিত ও অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে, যুদ্ধে আমায় কখনও কেহ বধ করিতে পারিবে না!" বাবা, মনের এইটী সত্য স্বভাব। সে শিখণ্ডিত্বের নিকটবর্ত্তী হইলেই তার সঙ্গে যুদ্ধে অশক্ত হয়। তখন তাঁহার অস্ত্র বর্ম্মাদিও কাড়িয়া লওয়া যায় ও আক্রমণও রোধ করা যায় এবং তখন দেবভাবের অস্ত্রাঘাতে তাহাকে হতচেতন করিয়াও ফেলান যায়।

টীকা—গীতা—৮ অঃ ২৪,২৫ শ্লোঃ "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্ম বিদো জনাঃ॥ ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ উত্তরায়ণে গমনে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মে যায়, আর দক্ষিণায়ণে গমনে যোগী ফিরিয়া আসে॥

কিন্তু সেইস্থানে লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। সে কি সহজে যাইতে চায়, না অসুরের দল সে সুযোগ হইতে দেয়। দুর্জ্জয় অসুর সত্তাগুলি মনকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিবে, মনও আসুরীক অস্ত্র শস্ত্র রথ ও বর্ম্মে সজ্জিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিবে, সেইকালে কাহার সাধ্য তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে টিকিয়া থাকে ; ততক্ষণ মন অজেয়। এখন কাহারা অসুর দুঃশাসনের দলকে তাড়াইয়া মনকে একা করিয়া, শিখণ্ডির নিকট লইয়া যাইতে পারে ? শিখণ্ডিই বা কে! তাঁহার নিকট যাইলে মন কেন যুদ্ধে অশক্ত হইয়া উঠে, অথচ পলাইতেও পারে না, সেচ্ছায় শরশয্যা গ্রহণ করে, সেই রহস্য ক্রমে শ্রবণ কর।

শরশয্যা রহস্য—মন হইতেই যে বিষয় সংসারের জন্ম বাবা! নিবৃত্তি ব্রহ্মেরও এই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের জাগরণ হইলেই, প্রবৃত্তিগত হইয়া লীলারত হন এবং ক্রমে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অনন্ত সৃষ্টি গড়িয়া, তাহার অনন্ত বিকল্প শক্তির খেলা দর্শন করেন। তাই মহাভারতেও ভীষ্মদেবের জন্মমাত্রেই রাজা শান্তনুর শান্তত্ব নষ্ট হইয়া গেল। ভীষ্মদেবই বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান ও রক্ষা করিয়া, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র দ্বারা সেই কুলকে বর্দ্ধিত করিলেন। মনের নির্বিকল্প সমাধি হইলেই যেমন জীবের কর্ম্মরাজ্য শেষ হইয়া যায়, দেখিবে ভীষ্মদেবের নির্ব্বান লাভ হইলেই পাণ্ডব বিকল্প-অসুরের আক্রমণ হইতে নিস্তার লাভ করিবেন। প্রধানতঃ মনের দুইটী স্বরূপ, একটী গুণাতীত অন্যটী গুণময়, তাহাই ভীষ্মদেবের দেবব্রত ও ভীষ্মদেব এই দুই নামের সার্থকতা। প্রথম জীবনের ভীষ্মদেবেই গুণাতীত দেবব্রতের স্বরূপ, আর শেষজীবনের দুর্যোধন পক্ষের ভীষ্মদেবই গুণময় ভীষ্মদেব। মন যখন চঞ্চলতার রথে উঠিয়া, গুণের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতা অবাধ্যতা অধৈর্য্যতা ইত্যাদি অসুর বল দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, বিকল্পের ধনু

হইতে, সন্দেহ কুযুক্তি আদি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে দেবত্বের বিরুদ্ধাচার আরম্ভ করে, তখন মানবের কি সাধ্য তাহার পরাক্রম সহ্য করে। এইজন্য ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "হে কৃষ্ণ, মন যে অতি চঞ্চল প্রমাথি-উন্মত্তবৎ উচ্ছৃঙ্খল ও দৃঢ়বল অর্থাৎ দুর্জ্জয়, তাহাকে নিগ্রহ যে বায়ু নিগ্রহের মত কঠিন। গীঃ ৬—৩৪ শ্লোঃ। আবার ভগবান বলিয়াছিলেন, "মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল বটে, অসংযত চিত্তগণের বশ করা অসম্ভব হইলেও, সংযত চিত্তগণ উপায় দ্বারা তাহাকে বশ করিতে পারেন। গীঃ ৬—৩৫।৩৭ শ্লোক। সেই উপায় মহাভারত মধ্য এখন প্রত্যক্ষে দর্শন কর।

প্রথমে মনকে উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা ইত্যাদি অসুর বল হইতে মুক্ত করিয়া, ধর্ম্মভাব গণ দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। এই টুকুই দুঃশাসনের দল তাড়াইয়া ভীষ্মকে পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে নেওয়া। পরে মনকে সমাধির নিকটবর্ত্তী করিয়া দিতে হইবে, তাহাই শিখণ্ডির নিকটে লইয়া যাওয়া। সেইখানে নিয়া তাহার চঞ্চলতার নাশ করিতে হইবে, তাহাই রথের সারথিও অশ্ব বধ করা। এর পর মনে বিকল্প ও সন্দেহাদি আসিতে না দেওয়াই ভীষ্মদেবের ধনু ও অস্ত্র সমূহ বার বার ছেদন করিয়া দেওয়া। এর পরে গুণের আচ্ছাদন বর্ম্ম ছেদন করিয়া দিতে পারিলে, মনে ধর্ম্মভাবের অস্ত্র সমূহ বিদ্ধ হইবে অর্থাৎ তখন ধর্ম্ম সাধনার আঘাতে মনের আসুরিক জ্ঞান ও শক্তির নাশ হইবে। এই তত্ত্বই ভীষ্মদেবের বর্ম্ম নষ্ট হইলে পাণ্ডব পক্ষের অসংখ্য বাণে আহত হইয়া, ভীষ্মদেবের শর শয্যায় পতন। তখনও মনের বিকল্প আলোড়নের শেষ হয় না, গুণের ক্ষোভ, বিষয় আস্বাদন থাকিয়া যায়, তাই ভীষ্মদেব মরিলেন না ও অসুর যুদ্ধেরও শেষ হইল না। আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডি দ্বারা মনের এই সবিকল্প সমাধি পর্য্যন্তই লাভ হয়। পরে সেই মহান শিখণ্ডি শিখীপুচ্ছধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হাতে

পড়িলেই, মনের বিকল্পের গুণক্ষোভ একেবারেই শেষ হইয়া যায়; মন নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করে। এখন মনকে গুণ চঞ্চলতা ও অসুর সঙ্গ চ্যুত করিতে পারে কোন শক্তি তাহার বিষয় শ্রবণ কর।

ভক্তি অর্থাৎ তীব্র ভালবাসাই মাত্র মনের বিকল্পের চঞ্চলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার নাশ করিয়া দিতে পারে। এক জনকে ভাল বাসিয়া ফেলিলেই, মন তাহার প্রতি সমাধি মগ্নের মত বদ্ধ হইয়া পরে। অন্য চেষ্টা, অন্য কল্পনা, আদি সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতা চঞ্চলতার নাশ পায়। গুণ বোধ—সুন্দর কুৎসিৎ বোধ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া কুৎসিতকে সুন্দর দেখে, প্রিয়ের জন্য খাটীয়া ও সর্ব্বস্ব দিয়াও সুখী হয়। তাই অর্জ্জুনই মাত্র ভীষ্মকে প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছেন। ভক্তির সামান্য অভাবে মনে অসুরত্বের বিজয় হয়, তাই অর্জ্জুনের সামান্য অনবধানতায়, ভীষ্ম পাণ্ডব পক্ষের অসংখ্য সৈন্য বধ করিয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন। ভক্তির সহিত অভ্যাস ও ত্যাগটী চাই, (অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে। গীতা) তাহাই বুঝি দ্রুপদ পুত্র উত্তমৌজা ও যুধামন্যুর সাহায্য। এই ভক্তি মনকে দুই জন শিখণ্ডির নিকটই লইয়া যাইয়া থাকে। বিষয়রাজ্যে দ্রুপদ-পুত্রের আয়ত্ত করিয়া সংযতমনা কারে, আর আধ্যাত্ম-রাজ্যে ভগবানে মিলাইয়া দেন। এখন শিখণ্ডির পরিচয় তাহার জন্মাদির মধ্যে শ্রবণ কর।

অম্বা—ভীষ্মদেব কাশী-রাজের তিন কন্যাকে বল পূর্ব্বক বিচিত্র বীর্য্যের জন্য লইয়া আসেন। জ্যেষ্ঠা অন্যকে মনে মনে বরণ করিয়াছে বলায়, তাহাকে সেই মনোনীত স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়! কিন্তু সেই স্বামী স্বয়ম্বর সভায় ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া, অন্যজিত কন্যাকে গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। তখন সেই কন্যা আবার বিচিত্র বীর্য্যের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও অন্যে মনদত্ত কন্যাকে বিবাহে স্বীকৃত হইলেন না। তখন কন্যা ভীষ্ম তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া, ভীষ্মকেই

বিবাহ করিতে বলিলেন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞার জন্য বিবাহে অস্বীকার করিলেন। কন্যা তপোবনে যাইয়া ঋষিদের নিকট অভিযোগ করিলে, ভীষ্ম-গুরু পরশুরাম শিষ্যকে আনিয়া এই কন্যা গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞার জন্য অক্ষমতা জানাইলে, গুরু অবাধ্য শিষ্যকে যুদ্ধ করিয়া বাধ্য করিতে যাইয়া, ভীষ্ম পরাজয়ে অশক্ত হইলেন। তখন কন্যা ভীষ্ম বিজয় উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। এই কন্যাই দ্রুপদের ঘরে নপুংষক হইয়া জন্মিয়া, পরে গন্ধর্ব্বের বরে পুরুষত্ব লাভ করিয়া মহাবীর হন, এবং পূর্ব্ব তপস্যার গুণে শিখণ্ডি ভীষ্মকে পরাজয় করেন।

ভক্ত—কাশিরাজ মহাদেবের সত্যই তিন কন্যা? তাঁহার ত্রিশূলেও তিন ফলা, মুখেও ত্রিনয়ন, ললাটেও ত্রিপুণ্ড্র! এই ত্রিতত্ব তিন গুণ নয়! কেননা, তিনি যে গুণময় হইয়াও আবার গুণাতীত। এই তিন তত্ত্ব, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও সমাধি, এই তিন অবস্থা জ্ঞাপক। প্রবৃত্তি হইতে তমোগুণ, নিবৃত্তি হইতে সত্বগুণ, আর উভয় মিলিয়া রজোগুণের জন্ম হয়, এবং গুণ সাম্যে ক্ষোভ রহিত ত্রিগুণ সমতা অবস্থাই সমাধি অবস্থা। এই সমাধির আর এক নাম শান্ত অবস্থা, তাই মহাদেবের এক নাম শান্ত। এই গুণাতীত সমাধি অবস্থাই কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সমাধি অবস্থা না বিষয়ের ভোগ্যা, না ভগবানের ভোগ্যা। তাই শিখণ্ডিকে কি মনোনীত স্বামী, কি বিচিত্র বীর্য্য, কি ভীষ্মদেব কেহই বিবাহ করিলেন না। এই সমাধি একটী প্রকৃতি, তাই প্রথমে রমণী ছিলেন। সমাধি অবস্থা ক্রিয়াকর অহঙ্কার পৌরুষ হীন বলিয়াই তাহাকে নপুংষকও বলা হয়। কিন্তু এই সমাধির সম্মুখে ধীরভাবে অবস্থিত হইলে, দুর্জ্জয় মনের সর্ব্ব প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বর্গ যুক্ততার ক্রিয়াশক্তি নাশ না হইয়া উপায় নাই, তাই ইহাকে মহারথ বীরও বলা হইয়াছে। এই সমাধি বিনা মন বিজয়ের প্রতিযোদ্ধা বীর আর নাই? সত্যই মনের মৃত্যু স্বরূপ করিয়াই এই সমাধি সত্তার জন্ম হইয়াছে। জীবের

আধ্যাত্মিক-রাজ্যে ইনিই প্রধান বান্ধব বা শ্রেষ্ঠ সম্পদ শক্তি। এখন ভীষ্মদেব নিহত না হইয়া, শর শয্যায় পড়িয়াও কেন প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন তাহাই শ্রবণ কর।

মনের বিকল্পের নির্ব্বানই জীবের অসুরত্বের আক্রমণ অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভ। মনের সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি কি সহজেই হয়। সমাধির অনেক স্তর ভেদ করিয়া মন নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উথিত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগ শাস্ত্রে ষষ্ঠ সমাধিতে নির্ব্বিকল্প অবস্থা লাভ হয় বর্ণিত হইয়াছে। এইটী মনের মাত্র প্রথম সমাধি বলিয়াই, ভীষ্মদেবকে শর শয্যায় জীবিত রাখা হইয়াছে। যেই দিন মনের বিকল্পের মূলগুলি জীবের হৃদয় হইতে নির্মূল হইয়া যাইবে, সেইদিন এই ভীষ্মদেবের মৃত্যু হইবে। মনের বিকল্পের মূলই কাম ও ক্রোধ আচ্ছাদিত অহঙ্কার তত্ত্বের সহিত তাহার যুক্ততা। মনই সৃষ্টির মূল মহত্তত্ব। ইহার সাত্ত্বিক অহঙ্কারে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণের জন্ম, রাজস অহঙ্কারে মানস ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও প্রবৃত্তির বা বুদ্ধির জন্ম, এবং তামস অহঙ্কারে ভুতাত্মক দেহ ইন্দ্রিয়ের জন্ম। এই ভীষ্ম পর্ব্বের শরশয্যা দ্বার মনের সেই তামস অহঙ্কার দেহ ও ইন্দ্রিয়াত্মক যোগ মাত্র নষ্ট হইল। ধর্ম্ম জন্য দেহ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আরম্ভ হইল; ইহার নামই সবিকল্প সমাধি। এর পর বুদ্ধিগত মনের নাশ করিয়া সর্ব্ব অহঙ্কারের নাশ করিতে পারিলে মনের বিকল্পের শেষ হইবে। এখন মনের বিকল্পের মূল, গুণময় কাম ও ক্রোধের নাশ ক্রমে শ্রবণ কর।

দ্রোণ, কর্ণ ও শৈল্য-পর্ব্ব

দ্রোণ বধ বা বিষয় কামনার বিকল্পের নাশ।

কৃপাসুধা সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদাভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥

লীলা—ভীষ্মদেবের পতন হইলে, দুর্য্যোধন দুঃখিত হইয়াও দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দ্রোণাচার্য্য সমস্ত সৈন্যকে একত্র সমাবেশ করিয়া, একসত্তার দারুণ ভাবে পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের জন্য কিছুতেই পাণ্ডবদিকে আটীয়া উঠিলেন না। পাণ্ডবগণ অর্জ্জুন সাহায্যে ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষের বহু বীর ও সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন গুরুদ্বারা ধর্ম্মরাজকে বন্দী করিয়া, আবার পাশা খেলাইয়া বনে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে, গুরু নারায়ণী সৈন্যগণ দ্বারা একটী পৃথক ব্যূহ করিয়া, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করাইলেন। আর অপর সমস্তসৈন্য দ্বারা দারুণ চক্রব্যূহ রচনা করিয়া ধর্ম্মরাজকে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের এই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে যাইয়া, অর্জ্জুন-পুত্র মহারথ অভিমন্যু দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাদি সপ্ত মহারথীর একত্র আক্রমণে, অস্ত্র শস্ত্র রথাদি হীন হইয়া অকালে প্রাণ দান করিলেন।

শিশু পুত্রকে সপ্ত মহারথী একত্র হইয়া বধ করায়, অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও পরদিন দারুণ যুদ্ধ করিয়া জয়দ্রথাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রদের অনেক মহারথীকেই সংহার করিলেন। ভীমসেন ও দুঃশাসনাদি উনশত ভ্রাতাকে বধ করিলেন। এই পর্ব্বেই অভিমন্যু ও ভীমপুত্র ঘটোৎকোচের হস্তে দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সমস্ত সন্তানগণই নিহত হইয়া গেল। পাণ্ডব-পক্ষেও অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিরাট ইত্যাদি বহু মহারথ ও দ্রৌপদীর সন্তান বিনা অন্য পাণ্ডব সন্তানগণ নিহত হইয়াছিল। গুরু দ্রোণাচার্য্য এইরূপে পঞ্চদিন দারুণ ভাবে যুদ্ধ করিয়া পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে নিহত হইলেন।

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মত ধর্ম্মরাজ গুরুর নিকট দ্রোণ বিজয়ের মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও ভীষ্মের ন্যায় নিজের পরাজয় ছিদ্র বলিয়া দিলেন। বলিলেন,"আমি অস্ত্র হস্তে যুদ্ধে উন্মুখ হইয়া থাকিলে আমায় কেহই পরাজয় বা নিহত করিতে পারিবে না। কোনও বিশেষ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে আমি মোহিত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে, সেইকালে আমায় বধ করিতে পারে। আমার নিধন জন্য যজ্ঞ হইতে জাত দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে দেখিলে, আমি একটু সংত্রস্ত হইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করি; সেইকালেই দুঃসংবাদে মোহিত হইতে পারি। তখন সে ই মাত্র আমায় বধ করিতে পারিবে; আমার অন্য সময়ে বা অন্যের বধ করা অসম্ভব।" পরদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বধে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া, তাঁহার রথের সঙ্গে নিজের রথ ঠেকাইয়া গুরুর গতিরোধ করতঃ, খর্গ চর্ম্ম লইয়া দারুণ ভাবে আক্রমণ করিলে, গুরুও বিশেষ ভাবে তাহার আক্রমণ রোধ করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায়, ভীমসেন অশ্বথমা নামে একটী বৃহৎ যুদ্ধ-হস্তীকে স্বহস্তে বধ করতঃ, গুরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "আমি অশ্বথমাকে বধ করিয়া আসিলাম।" দ্রোণাচার্য্য তাহা শ্রবণ করিয়া, মনে ভাবিলেন, আমার একমাত্র প্রিয়, সংসারের বন্ধন পুত্র

অশ্বত্থামাই কি নিহত হইল? না আমাকে শোকে অভিভূত করিতে এই কথা বলিল। ধর্ম্মরাজকে নিকটে দেখিয়া গুরু যুদ্ধ করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সত্যই কি অশ্বত্থামা হত হইয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই ছিলেন, তিনি ধর্ম্মরাজকে ইঙ্গিতে বলিলেন, "বল, অশ্বত্থামা হত।" ধর্ম্মরাজ দেখিলেন, গুরুদেবের প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাঁহার পুত্র অশ্বত্থমা হত কি না? তাই অশ্বত্থামা হত বলিলেই, তিনি পুত্রের মৃত্যু বোধ করিবেন, এবং তাহার উক্তি মিথ্যা তুল্য হইবে। তাই 'অশ্বত্থামা হত কিন্তু গজ' এই কথা বলিলেন। অশ্বত্থামা হত এইটুকু শুনিয়াই গুরুর শোক ও মোহের উদয় হইল, গজ শব্দ আর শুনিলেন না! আর শ্রীকৃষ্ণও জোড়ে শঙ্খ বাদন করায়, 'কিন্তু গজ' এই কথা সকলের কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিল না। দারুণ পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, গুরু প্রথমে দারুণ ক্রোধে দৈব ও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবের সাধারণ সৈন্যগণকেই বধ করিতে লাগিলেন। পরে শোকে হস্ত হইতে ধনু খসিয়া পড়িল, কান্দিতে কান্দিতে রথে বসিয়া পড়িলেন ও শ্বাস রোধ করিয়া যোগ পথে দেহত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেইকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন একলম্ফে রথে উঠিয়া, খর্গাঘাতে দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পঞ্চদিন দারুণ যুদ্ধের পর, ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবপক্ষের অধিকাংশ মহাবীর ও সৈন্যবল নিঃশেষ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের পতন হইল।

ভক্ত্র—বৎস, ভীষ্মদেব যে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া শরশয্যা লইয়াও প্রাণত্যাগ করিলেন না, তাহার কারণই, এই দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার বাঁচিয়া থাকা। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, মনের বিকল্পের নাশ ও অসুর কর্ম্মস্পৃহার নাশ হইতেই পারে না। এই তিন সত্তার নাশ হইলেই, মন নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবে। কামই মনের বিকল্পের আশ্রয়, আর ক্রোধ ও অহঙ্কারই

কর্ম্মের আশ্রয়। স্বাদ পাইয়াই হউক, আর শুনিয়াই হউক, সুখের আস্বাদেই লোভের জন্ম হয়। লোভ হইলেই লোভের বিষয়টী বারবার মনে জাগিতে থাকে, সুখ-স্বাদের জল্পনা আরম্ভ হয়। জল্পনা হইতে আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়, আকাঙ্ক্ষার নামই কামনা। কামনা হইতে প্রাপ্তির জন্য দৃঢ় ইচ্ছার জন্ম হয়, 'ইহা চাইই' এই ইচ্ছার নামই ক্রোধ। এই ক্রোধ, অহঙ্কার অর্থাৎ আমিত্বের সহিত যোগ হইলেই, জীব আকাঙ্ক্ষার দ্রব্য লাভ জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার থাকিতে জীবের বিকল্প ও কর্ম্মের শেষ হয় না। তাহাই ভীষ্মদেবের শরশয্যা হইলেও অহঙ্কার দুর্য্যোধন, কাম-গুরু ও ক্রোধ-অশ্বথামা লইয়া, পাণ্ডবদের বিপক্ষে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

মন যতক্ষণ কামক্রোধাদি কোন শক্তির দ্বারা আবরিত না হয়, ততক্ষণ জীবের সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিবর্গ যার যার পূর্ণ জ্ঞান লইয়া, যার যার স্থানে থাকিয়া, অসুরত্ব রক্ষণে যত্নবান হয়. তাহাই ভীষ্মদেবের দীর্ঘ্যব্যূহ করিয়া যুদ্ধ করা। আর লোভাদিতে অভিভূত হইলেই জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিবর্গ সঙ্কীর্ণ, একলক্ষ সাধনে একত্রিত হইয়া সমবেত ভাবে কর্ম্মে অগ্রসর হয়, তাহাই দ্রোণাচার্য্যের সঙ্কীর্ণ ব্যূহ গড়িয়া যুদ্ধ করা। মন যতক্ষণ কোন প্রকার মোহশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকে, ততক্ষণ জীব কোন প্রবৃত্তিকেই নষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। তাই যতদিন ভীষ্মদেব সেনাপতি ছিলেন, ততদিন পাণ্ডবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদের কোনই বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে শরশয্যায় ফেলিবার পরই ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষের বল ধ্বংস আরম্ভ হইল। কামনারাজ্য দুই প্রকার, অধিভূত ও আধ্যাত্ম কামনা। তাহাই দ্রোণাচার্য্যের দুই সৈন্যব্যূহ। অধিভূতটী সপ্তমহারথী ও জয়দ্রথ সহিত দারুণ চক্রব্যূহ—বিষয় কামনার মোহ। আর আধ্যাত্মটী শ্রীকৃষ্ণদত্ত নারায়ণী-সৈন্য সহিত মদ্ররাজের সংসপ্তকব্যূহ—যোগশক্তি,

অষ্টসিদ্ধি আদি কামনার মোহ। বিষয়কামনা বিজয় হইলেই অসুরত্বের অধিভূত শক্তিগুলির নাশ হইয়া যায়, তাহাই দ্রোণ-পর্ব্বে, উনশত ধার্ত্তরাষ্ট্র সহিত জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল্য, ভগদত্তাদি মহারথগণ, দুর্য্যোধনাদির পুত্রগণ ও অধিকাংশ সৈন্যবল নিহত হইয়া যাওয়া। পাণ্ডব পক্ষেও এই সব সত্তা নাশের জন্য যাহারা আসিয়াছিলেন, তাহারা কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ, নিহত হইয়া চলিয়া গেলেন। যেমন ঘটোৎকচের যোগ-শক্তি দুর্য্যোধনের রাক্ষসসৈন্য ও কর্ণের একাঘ্নি বাণ নাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। অভিমন্যুর ভক্তি-শক্তি চক্রব্যূহ ধ্বংস করিয়া দিয়া গেলেন, ইত্যাদি। দ্রোণ বধের পর কামের দ্বিতীয় ব্যূহ, আধ্যাত্মকামের আক্রমণ বর্ণিত হইবে। আধ্যাত্ম ফলদাতা মদ্ররাজ, প্রথমে সারথী হইয়া, পরে স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া জীবকে অসুর-কর্ম্মরত করিতে চেষ্টা করিবেন। এখন বিষয় কামনার দারুণ **চক্রব্যূহ রহস্য** শ্রবণ কর।

চক্রব্যূহের দ্বার রক্ষক ছিলেন, দুর্য্যোধনের দুঃশলা ভগ্নিপতি জয়দ্রথ, আর ভিতরে সপ্তরথী ছিলেন, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বথামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধন ও শকুনি। বাবা! এই অষ্টবলকেই বিষয় কামনার মূলসত্তা জানিবে। দুঃশলা অর্থ কুমন্ত্রণা, তাহার পতিই বিষয় চক্রব্যূহের প্রধানদ্বার রক্ষক; ধর্ম্ম সাধককে দ্বার নির্ণয় করিতেই দেয়না। আর, দ্রোণ—লোভ, কর্ণ—ঈর্ষ্যা, অশ্বথামা—ক্রোধ, কৃপ—মমতা, কৃতবর্ম্মা—কর্ম্মাভিমান, দুর্য্যোধন—দর্প, শকুনি—কুটিলতা, এই সপ্তসত্তাই, এই চক্রের মূল ভিত্তি। বিষয়-কামের চক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়া এই ব্যূহভেদ করিতে মাত্র ভক্তই পারে। আর জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী ভিতরে না যাইয়া বাহিরে থাকিয়াই সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্যূহকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন। তাই মাত্র অর্জ্জুনই এই ব্যূহ ভেদে সক্ষম ছিলেন, অন্য পাণ্ডবগণ বাহিরে থাকিয়া চক্রের সৈন্যবল ধ্বংস করিয়া ফেলেন। তাই গুরু পরে আর চক্রব্যূহ গড়িতে পারেন নাই।

কামের দুই স্বরূপের মত এই স্থানে ভক্তিরও দুইটী স্বরূপই দেখান হইয়াছে। একটী অর্জ্জুন, দ্বিতীয় তাহার পুত্র অভিমন্যু। একটী পূর্ণতা প্রাপ্ত সিদ্ধ অবস্থার ভক্তি, অন্যটী শিশু-ভক্তি—সাধক অবস্থায় ভক্তির বল দেখান হইয়াছে। শিশু অবস্থার সাধন-ভক্তিও এই চক্রব্যূহের দুর্ম্মন্ত্রণার দ্বার ভেদ করিয়া যাইতে পারে। এই সপ্ত মহারথীর পৃথক পৃথক আক্রমণ রোধ করিয়া পরাজয় করিতেও পারে। কিন্তু সপ্তরথী একত্র হইয়া আক্রমণ করিলে, তাহার রথ, অশ্ব, বর্ম্ম, ধনু নষ্ট করিয়া, তাহাকে নষ্ট করিয়াও ফেলিতে পারে। লোভ, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, মমতা, কর্ম্মাভিমান, দর্প ও কুটীলতা এই কয়টীতে শিশুভক্তি অর্থাৎ সাধনভক্তি নষ্ট করিয়া দিতে পারে, এই যুদ্ধে তাহাই দেখান হইল।

এই পর্ব্বে ভীমের হস্তে দুঃশাসন আদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, অর্জ্জুনের হস্তে জয়দ্রথ, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবাদি, অভিমন্যুর হস্তে ধার্ত্তরাষ্ট্রের সন্তানগণ এবং ঘটোৎকচের হস্তে কর্ণের অব্যর্থ একাঘ্নি বজ্রের নাশ হইলে, দ্রোণাচার্য্যের পতন হয়। সত্যই বাধা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা, অসহিষ্ণুতা. দুর্ম্মদতা দুঃশাসন-বৃত্তিগুলি নষ্ট না হইলে, দুর্ম্মন্ত্রণাদি জয়দ্রথের দলও বিনষ্ট না হইলে, অবাধ্যতাদির সন্তান রূপ, ধনমদ, জ্ঞানমদ, বিদ্যামদাদি কুমারগণ ধ্বংস না হইলে এবং ঈর্ষ্যার হিংসা রূপ দারুণ অস্ত্র ও হৃত না হইলে কিছুতেই বিষয় কামনার শেষ করা যায় না। ইহাদের অবাধ্যতাদির দল সংযমের হস্তে নিহত হয়, তাই ভীমের হস্তে দুঃশাসন আদি ঊনশত ভ্রাতার মৃত্যু। দুর্ম্মন্ত্রণাদি ভক্তি জন্মিলে নষ্ট হয়, তাই অর্জ্জুন হস্তে জয়দ্রথাদির মৃত্যু। ধনমদ তনুমদ আদি অহঙ্কার হইতে জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহঙ্কারগুলি, ভক্তি ও যোগ সাধনা দ্বারা নষ্ট হয়, তাই দুর্য্যোধনাদির সন্তানগণ অর্জ্জুন-পুত্র ও ভীম-পুত্র হস্তে নিহত হইল। পরে ঈর্ষ্যার তমো আবরণ—বধ করিয়া বড় হইবার ইচ্ছারূপ হিংসা-ভাব, ভীমপুত্ররূপ যোগশক্তির হস্তেই নষ্ট হয়।

তাহাই ঘটোৎকচের দ্বারা অস্ত্র নাশ। কর্ণ এই অস্ত্র হারাইয়া হিংসার ভাব ত্যাগ করিয়া কর্ণ-পর্ব্বে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইবার কাম-বিজয় শ্রবণ কর।

কাম-বিজয়—কামকে অস্ত্রধারী যুদ্ধ উন্মুখ, অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায়, সম্মুখ যুদ্ধে কখনও কেহই বধ করিতে পারিবে না। এই জন্যই গীতায় অর্জ্জুনকে কাম ক্রোধের স্বরূপ জানাইতে বলিয়াছেন। রজোগুণ সমুদ্ভব এই কাম ও ক্রোধ মহাশন—বহু আহারেও যাহার তৃপ্তি হয় না ও মহাপাপ—কেবল পাপ পথেই যাহার মতি এমন মহাশত্রু। ইহারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে অধিষ্ঠান করিয়া ধূমের অগ্নি আবরণ, ধূলির দর্পণ আবরণ, গর্ভকে অপরা চর্ম্মে আবরণ করার মত, কামরূপ দুষ্পূরণতা দ্বারা জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে, ইহারা জ্ঞানিদের নিত্য বৈরী। (গীঃ—৩ অঃ ৩৭ হইতে ৪০ শ্লোক।) সেই কাম জয়ের দৃষ্টান্ত আজ লীলাদ্বারা দেখাইলেন। সমাধির ও সন্তোষের ভ্রাতা বোধ হয় বৈরাগ্য রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য কামের সম্মুখে ধরিয়া দিবে। সত্যই বৈরাগ্যকে দেখিলে কাম সন্ত্রস্ত হইয়া, ভীত ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করে, এই তত্ত্বই ধৃষ্টদ্যুম্ন দর্শনে গুরুর সন্ত্রস্ত হওয়া। ইহার পূর্ব্বে দুঃশাসন জয়দ্রথাদি বধ না হইলে, কামনা বৈরাগ্যের নিকটে স্থির হইয়া দাঁড়াইবেই না। বৈরাগ্যের হস্তে কামের রথের গতি রোধ হইলে, সেইকালে অপ্রিয় দুঃখ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, কাম অভিভূত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া বসে। এই তত্ত্বই ধৃষ্টদ্যুম্ন রথের গতি রোধ করিয়া দারুণ যুদ্ধে ব্রতী হইলে, অশ্বত্থামা বধ শুনিয়া গুরুর মোহ হওয়া। সত্যই বিপদ ও শোকের সংবাদে জীবের কামের আকাঙ্ক্ষা লোপ হইয়া, বৈরাগ্য জাগিয়া উঠে। সেইকালে কামকে হঠাৎ বৈরাগ্য দ্বারা বধ করাই কাম জয়ের উপায়। এইটুকুই ধৃষ্টদ্যুম্নের হঠাৎ গুরুবধ করা। দুঃখাদির সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ন্যাসাদি লইয়া বসিলে, কাম নষ্ট হয়। যদি পূর্ব্বে দুঃশাসন আদি

নিহত হয় আর কাম জাগেই না, নচেৎ বৈরাগ্যই নষ্ট হয় কাম আবার জাগিয়া উঠে। গুরু বধের সময় অর্জ্জুন ও সাত্যকি গুরুকে রক্ষার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন ও বধ করার ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে সাত্যকির যুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু ধর্ম্মরাজ বা শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বলেন নাই। কারণ, কামকে একেবারেই বধ করিতে হয়, কিছু কামনা থাকিলেই বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু কামকে নষ্ট করিতে অর্জ্জুন ও সাত্যকির মত ব্যক্তির ও মোহ জন্মে। এখন দ্রোণাচার্য্যের দ্বিতীয়-ব্যূহ বিজয় শ্রবণ কর, তাহাই কর্ণ-পর্ব্ব ও শল্য-পর্ব্ব। এই দুই জনের পতন না হইলে কামের শেষ হয় না, জীবও আসুরিক কর্ম্ম-স্পৃহার আক্রমণের অতিত হয় না।

শিষ্য—গুরুদেব! দ্রোণাচার্য্যকে এইরূপ মিথ্যা কথার আবরণ দ্বারা বধ করায় কি পাণ্ডবদের অধর্ম্ম হইল না? ধর্ম্মরাজের কি গুরুদেবের নিকট মিথ্যা কথা বলা হইল না?

গুরু—বাবা, যুদ্ধকালে এইরূপ কপট ব্যবহার দ্বারা, শত্রুকে অভিভূত করিয়া পরাজয় করাকে কুট যুদ্ধ বলে, তাহা অশস্ত্র যুদ্ধ নয়। গুরুই শিক্ষাকালে এই সব বিষয়ের কৌশল শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। রথচালক যেমন পথের আমোদ দৃশ্যাদি কোন দিকে না চাহিয়া রথ চালাইতে শিখে, যোদ্ধাও যুদ্ধ কালে, শত্রুর দত্ত শোক মোহকর কোন সংবাদে বিশ্বাস না করিয়া যুদ্ধ করিতে শিক্ষা লাভ করে। এই জন্য, ঋষিগণ যুদ্ধের জন্য, পুত্র কন্যা বিবাহ জন্য, ক্রীড়ার জন্য ও রমণী ও বালকের নিকট মিথ্যা বলিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন (রমণী ও বালক কথা বুঝিতে ও গোপন রাখিতে অক্ষম)। এই জন্যই রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরামের নিকট মায়াসীতা বধ করে ও শৌভরাজ শ্রীকৃষ্ণের নিকট মায়া-বাসুদেব দেবকী বধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ হংসের মৃত্যু সংবাদ দিয়া ডিম্বককে বধ করেন। তাই এই কথা বলাতে ধর্ম্মরাজের অধর্ম্ম হয় নাই। আরও গুরুর পরামর্শ মতেই এইটী

করা হইয়াছিল, এই গুরুবাক্য রক্ষা করাতেও তাহাদের অধর্ম্ম হয় না। পাণ্ডব বুদ্ধি করিয়া, সঙ্কটযুদ্ধের সময় এমন কুটীলতা চালাইয়াছিল যে, গুরুরও মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি যে বলিয়াছিলাম তাহারইবা করিয়াছে, সেই সন্দেহও মনে আসিল না।

শিষ্য—এইরূপ কল্পিত মৃত্যুসংবাদ দিয়া পাণ্ডব পিতাকে বধ করিয়াছে শুনিয়া, অশ্বত্থামা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে ধ্বংস করিবার জন্য, নারায়ণ-অস্ত্র নামে একটী অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইদিন কৌশলে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন। তাহার মধ্যে কোন্ তত্ত্ব বলা হইয়াছে প্রভো ?

নারায়ণ-অস্ত্র মোক্ষণ বা ক্রোধাক্রমণ রোধ।

নারায়ণ-অস্ত্র রোধ তত্ত্ব—এই মহাস্ত্র ত্যাগ ও নিরোধ দ্বারা, ক্রোধের স্বরূপ ও তাহার আক্রমণ রোধ করার কৌশল প্রদর্শন হইয়াছে। ক্রোধ কামের মত সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি লইয়া, কৌশল প্রকাশ করতঃ কর্ম্ম করিতে অশক্ত। ক্রোধ হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নির মত শত্রুকে ভস্ম করিতে ধাবিত হয়। তাহাই অশ্বত্থামার যুদ্ধাদির চেষ্টা না করিয়া হঠাৎ নারায়ণ-অস্ত্র ত্যাগ করতঃ সসৈন্য পাণ্ডব ধ্বংসের চেষ্টা করা। একজন মহাবীর ও অস্ত্রবিদ হইয়াও তাই তিনি সৈন্য চালনা ভার গ্রহণ করেন নাই। এই মহাস্ত্রের বিফলীকরণ দ্বারা ক্রোধের মহাক্রমণ রোধের কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

অশ্বত্থামা নারায়ণ-অস্ত্র ত্যাগের কালে বলিয়াছিলেন,"হে আমার ব্রহ্মাস্ত্র ! সশস্ত্র যুদ্ধোন্মুখ পাণ্ডব পক্ষের সকলকে সংহার কর।" ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রজ্বলিত ও দারুণ সংহারাগ্নির মত আসিতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অমনি পাণ্ডবপক্ষের সকল বীরগণকেই অস্ত্রত্যাগ করতঃ যুদ্ধ বিমুখ হইতে

বলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধোন্মুখ সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দী না পাইয়া ফিরিয়া গেল। কেবল ফিরিয়া যাওয়া নয়? বৃথা ত্যাগ দোষ ধরিয়া অশ্বত্থামাকেও ত্যাগ করিয়া গেলেন। বৎস, মহাশক্তি ধর তাপস শক্তির ক্রোধ এই নারায়ণ-অস্ত্রের মতই সর্ব্ব সংহারক। ক্রোধের সম্মুখে প্রতিযোদ্ধা হইয়া সশস্ত্র দাড়াইলে, কাহারই রক্ষা নাই। অস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়াই ইহার আক্রমণ রোধ করিয়া বাঁচিতে হয়। ক্রোধে জ্ঞানহীন হইয়া জীব তাহার পূর্ণ বীর্য্য লইয়া ধ্বংসের চেষ্টা করে, সেই কালে কখনও প্রতিযোদ্ধা হইয়া সম্মুখে দাড়াইতে নাই। সেইকালে বিমুখ হইয়া সরিয়া গেলেই, ক্রোধীর ক্রোধের আঘাতও ফিরিয়া যায় এবং ক্রোধ আপনিই সেই ক্রোধীকে পরিত্যাগ করে। ইহাই প্রতিযোদ্ধা না দেখিয়া অস্ত্রের ফিরিয়া যাওয়া ও অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করা।

শিষ্য—ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অস্ত্রত্যাগ ও যুদ্ধোন্মুখতা পরিত্যাগে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি যোদ্ধা-ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ অবিমুখতা-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, গদা লইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের বিপক্ষতায় ব্রতী হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহায়তায় বল পূর্ব্বক অস্ত্র কাড়িয়া তাহাকে যুদ্ধ বিমুখ করতঃ রক্ষা করেন। তাহা দ্বারা কি দেখাইলেন প্রভো?

গুরু—আর কি বাবা! ধর্ম্মপথের মহিমা প্রদর্শন করিলেন? ধর্ম্মের জন্য যাহারা এইরূপ প্রাণের মমতাও ত্যাগ করিয়া, অধর্ম্মের প্রবৃত্তির আক্রমণ রোধ করিতে দণ্ডায়মান হয়। ভগবান স্বয়ং নিশ্চয় তাহাকে এইরূপে অমোঘ মহাস্ত্র হইতেও রক্ষা করেন। এইবারও উপায় দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। ভীষ্মদেবের বৈষ্ণবাস্ত্র, ভগদত্তের অমোঘ-শক্তি আদি অনেক মহাস্ত্র, অমানুষ শক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াও পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শেষ হইলে, মদ্ররাজ নিধনের পরে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রথ হইতে আগে নামাইয়া পরে

নিজে নামিবা মাত্র রথখানা ভস্ম হইয়া গেলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "ভীষ্মাদির ব্রহ্মাস্ত্রে রথ কবেই ভস্ম হইয়া গিয়াছিল, আমার অধিষ্ঠানে ও প্রয়োজন জন্য, আমার ইচ্ছায়ই এতদিন অস্তিত্বশালী হইয়াছিল। অদ্য যুদ্ধ শেষ হওয়াতে, আমার রথত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাই রথ ভস্ম হইয়া গেল।" ভগবান এমনই অমানুষ ভগবৎসত্তা দ্বারাও তাঁহার ভক্তগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-সাধনা ও ভগবৎ-কৃপার বলেই, অপরাহ্নে মেঘের সূর্য্যাচ্ছাদনকে সন্ধ্যা হইল ভাবিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আনন্দে সাবধানতা হীন হইলে, অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিয়া ফেলেন। গুরু দ্রোণ 'ইতি গজ' শুনিতেই পাইলেন না। আর কর্ণ দেবরাজকে অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল দান করিয়া, এক শক্র নাশ জন্য যে বজ্রকে প্রাপ্ত হন। যেই বজ্রকে অর্জ্জুনের বধের জন্য তিনি রোজ পূজা করিতেন। প্রতিদিন যুদ্ধে গমনকালে দুর্য্যোধনাদি ও সেই কথা মনে করাইয়া দিতেন, তবু পাণ্ডবদের পুণ্যবলে, ভগবানের কৃপায়ই যুদ্ধকালে সেই কথা আর কর্ণের মনেও উদয় হইত না। পরে প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া ঘটোৎকচকে এই বজ্রদ্বারা বধ করিয়া তিনি বজ্রহীন হইলেন। এই জন্যই ভগবান্ গীতায় বার বার বলিয়াছেন "কৌন্তেয় প্রতি জানিহ্ নমে ভক্ত প্রণশ্যতি।" এখন কর্ণবধ মধ্যে রাজস কামনা ঈর্ষ্যা বিকল্পের বিজয় শ্রবণ কর।

কর্ণবধ বা ঈর্ষ্যা কামনার নাশ।

লীলা—দ্রোণাচার্য্যের পতনের পরে অধিকাংশ সৈন্য, সাহায্যকারী রাজা ও ভ্রাতাগণ হারা হইয়াও দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতি করিয়া, পাণ্ডবগণকে বীর্য্যদ্বারা পরাজিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। মহাবীর কর্ণও আজ দুঃশাসন আদি হীন হইয়া, অন্য পাণ্ডবদের প্রতি হিংসা ত্যাগ করতঃ মাত্র অর্জ্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে পরাজিত করিতে যত্নবান

হইলেন। অর্জ্জুনের একে ত অগ্নিদেবদত্ত দৈবরথ তাহাতে সারথী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই দুর্য্যোধন তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথে মদ্ররাজ শৈল্যকে কর্ণের সারথী করিয়া, অর্জ্জুনের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অধর্ম্মাচারী, ধার্ম্মিক-দ্বেষীর বাসনা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। কর্ণের অসুরত্ব আশ্রয়ের ফলে, পূর্ব্ব অপরাধের বৃক্ষ সকলে অদ্য ফল প্রসব করিতে লাগিল। গুরু পরশুরাম যে মনে দুঃখ পাইয়া বলিয়াছিলেন, "কপটতা করিয়া গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিলে, সেই বিদ্যা প্রয়োজনকালে স্ফুর্ত্তি পায় না।" তাই অদ্য বারবার তাহার অস্ত্র বিস্মৃতি ঘটিতে লাগিল। গুরু আরও বলিয়াছিলেন—"অস্ত্র গুরুর প্রাণে ব্যথা দিলে, সে যার সঙ্গে স্পর্দ্ধা করে তার হস্তে পরাজিত হইয়া মনে ব্যথা পায়।" অদ্য সেই ব্যথা প্রাপ্তির সময়ও উপস্থিত হইল। চিরকালের ঈর্ষ্যার পাত্র অর্জ্জুনের নিকট তাই পরায় ঘটাল। গুরুদত্ত বর "কোন ক্ষত্রিয়বীরই তোমায় পরাজিত করিতে পারিবে না।" অর্জ্জুন দেব-পুত্র বলিয়া সেই বরের শক্তিও লোপ পাইল। হোম ধেনু বধের ফল, "আপদকালে গোরূপা পৃথিবী তাহার রথচক্র গ্রাস করিবে।" সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে অদ্য পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করিলেন। পূর্ব্বেই দেবরাজ কর্ত্তৃক সূর্য্য-দেবদত্ত অজেয় কবচ কুণ্ডলও হৃত হইয়াছিল। ইন্দ্রদেবদত্ত বজ্রও ঘটোৎকচ বধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আবার বার বার চিত্ত বিভ্রম জন্য সারথী মদ্ররাজের সঙ্গেও বিরোধ হইতে লাগিল। এই সব কারণে তেজোহীন হইয়া, দ্বিতীয় দিন সূর্য্যাস্তের সময় অর্জ্জুনের হস্তে মহাবীর কর্ণের পতন হইল। কর্ণ এক ভীষণ বাণাঘাতে অর্জ্জুনকে অজ্ঞান করিয়া, রথচক্রকে মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিতে রথ হইতে নামিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনরায় রথে না উঠিতে উঠিতেই, দৈব-অস্ত্রে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দুইদিন দারুণ যুদ্ধ করিয়া মহারথ কর্ণের পতন

হইল। মহাভারতে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ-সারথী অর্জ্জুনের সহিত মদ্ররাজ-সারথী কর্ণের যেরূপ দারুণ দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন ভীষণ যুদ্ধ নাকি আর কখনও হয় নাই।

তত্ত্ব—বৎস, কামনা তিন গুণ আশ্রয়ে তিন রূপ ধারণ করে। তমোগুণে বিষয় কামনা, রজোগুণে প্রতিযোগিতা ঈর্ষ্যা-কামনা, সত্বগুণাশ্রয়ে যোগৈশ্বর্য্য অনিমা লঘিমাদির কামনা, ইহারাই তিন জন, দ্রোণ, কর্ণ ও মদ্ররাজ। গুরু দ্রোণ বিষয় কামনার স্বরূপ, তাই তাহা দ্বারা ধর্ম্মরাজকে ধরিয় রাজ্যলাভের চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই কামনার পতন হইলেই, দুঃশাসন জয়দ্রথাদির মত তমোভাবের ও হিংসার শেষ হইয়া যায়। তখন ইচ্ছা হয় মহত্ব বীর্য্যাদি দ্বারা শত্রুপক্ষকে ও অন্য সকল মহৎ বীর্য্যবানদিগকে অতিক্রম করি, এই ঈর্ষ্যা-কামের স্বরূপই মহাবীর কর্ণ। দুঃশাসনাদির ধ্বংস হওয়ায় কর্ণের হিংসা অর্থাৎ যে কোন প্রকারে হনন করিয়া নিজকে বড় করিব ভাবটা এখন আর নাই। তাই অদ্য কর্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে ধর্ম্মপথে দ্বৈরথ-যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। অদ্য দুর্য্যোধন সর্ব্বপ্রকারে তমোভাব বর্জ্জন করিয়া, রজোগুণের ঈর্ষ্যায় আধ্যাত্মশক্তির সাহায্য লইয়া পাণ্ডবগণকে বিজয়ের চেষ্টায় ব্রতী হওয়াই, মদ্ররাজকে সারথী করিয়া কর্ণ দ্বারা যুদ্ধে ব্রতী হওয়া। অদ্য অসুরত্ব বেদোক্ত ফলদাতা ভগবানের ঐশ্বর্য্য-সত্তাকে সারথী করিয়া, তাহার ঈর্ষ্যাকে রথী করতঃ যুদ্ধে অগ্রসর হইল। আর দেবত্ব তাহার ভক্তিকে রথী করিয়া, নির্বৃত্ত-ভগবানকে সারথী করতঃ তাহার প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইল। তাই এই কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধের মত দারুণ যুদ্ধ আর কখনও হয় নাই। এই পর্ব্বে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যসত্তার মহা যুদ্ধ হইয়াছিল।

বৎস, ভক্তি ও ঈর্ষ্যা চির প্রতিদ্বন্দ্বী, ইহাদের যুদ্ধ নিত্যই হইতেছে। ভালবাসা ও দ্বেষ, বিশ্বাস ও সন্দেহ, মীমাংসা ও জিজ্ঞাসার যুদ্ধ শেষ

হইলে ত জীবত্বেরই শেষ হইয়া যায়। ভক্তি, বিশ্বাস, মীমাংসার সারথী স্বয়ং সত্ত্ব গুণময় নিবৃত্তি ভগবান্। আর ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার সারথী রজোগুণাশ্রয়ী প্রবৃত্ত-ঐশ্বর্য্যময় ভগবান, এইটী ও নিত্য। যেমন প্রবৃত্তরাজ্যের জাগ্রত জীবন, নিবৃত্তিরাজ্যের নিদ্রা ও মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবেই, তেমন মাধুর্য্যের কোলে সর্ব্বঐশ্বর্য্যের পতন ঘটাবেই। দুর্জ্জয় অসুর সেনাপতির নিষ্ঠুর তেজবীর্য্য পত্নী প্রণয় ও পুত্রস্নেহের কোলে পড়িয়া নিবিয়া যায়। সেই সেনাপতি তখন সাধীনতা অস্ত্র শস্ত্র পাণ্ডিত্য ফেলিয়া তাহাদের ভালবাসায় ডুবিয়া যাইবেই। তাই যত সব অসম্ভব অক্ষয়ত্বের মূল বর্ম্ম ও ব্রহ্মাস্ত্রাদি ধ্বংস হইয়াও অর্জ্জুনের শরে কর্ণের পতন হইল। অর্জ্জুনের মত নিষ্কাম ভক্তিবিনা ঈর্ষ্যাকে ধ্বংস করিবার আর উপায় নাই। এখন সত্ত্বগুণাশ্রয়ী যোগৈশ্বর্য্য কামনার স্বরূপ মদ্ররাজের বিষয় শ্রবণ কর।

ধনী হইয়া জগতের দুঃখ দরিদ্রতা নাশের চেষ্টা করিব ভাবযুক্ত এই বিশ্বপ্রীতি মাখা অর্জ্জুনের মুক্তিকারক বিস্তাররাজ্যের কামের নামই প্রেম। এই কাম হইতে ভগবানের কৃপার অধিকার জন্মে ও বিশ্বপ্রেম ভগবান্ ভক্তিতে পরিণত হয়। এই জগত হয় প্রেম—ভালবাসার হইবে, নচেৎ ঈর্ষ্যা প্রতিদ্বন্দীতার অধীন হইবে। তাই এই প্রেম ও ঈর্ষ্যার চির বৈরতাই অর্জ্জুনের প্রতি কর্ণের চির প্রতিদ্বন্দীতার ভাব। এই প্রেমের হস্তবিনা, ঈর্ষ্যা জ্ঞান্ যোগ কর্ম্ম কাহারও হস্তেই নিধন হয় না, তাহাই অর্জ্জুন বিনা কর্ণ বধের অন্য পাত্র না থাকা। এইরূপে বৈরাগ্যের হস্তে বিষয় কামনা ও ভক্তির হস্তে ঈর্ষ্যার ধ্বংস হওয়ায়, মনের তামস ও রাজস অহঙ্কার জাত বুদ্ধির শেষ হইয়া গেল। এখন শৈল্যপর্ব্বে সাত্ত্বিক অহঙ্কার জাত কর্ম্মশক্তির বিকল্প নাশ শ্রবণ কর।

শৈল্যবধ বা মনের সাত্ত্বিক বিকল্প নাশ।

লীলা—হতাবশেষ সৈন্য ও বীরগণকে একত্র করিয়া মদ্ররাজকে সেনাপতি করতঃ, দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে ধ্বংস করিবার জন্য শেষ চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা, দুর্য্যোধন, শকুনি আদি মহারথ এবং শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত নারায়ণী-সৈন্য ও মদ্রসৈন্য লইয়া, মদ্ররাজ এমন দারুণ ব্যূহ করিয়া পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন যে, সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি বিজয়ী পাণ্ডবদেরও সেই বেগ ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ধর্ম্মরাজ চারি পাণ্ডব দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, শিখণ্ডি, ধৃষ্টদ্যুম্নাদি ও দ্রৌপদীর পুত্রগণকে অনুবল করতঃ, এক-সত্তায় আক্রমণ করিলে, মদ্ররাজের ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মদ্ররাজ দুইপ্রহর ভীষণযুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজের হস্তে নিহত হইলেন। নারায়ণী-সৈন্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে ও যবন ও মদ্র সৈন্যাদি অন্য পাণ্ডবদের হস্তে নিহত হইল। মদ্ররাজের পতনের পরে কুট যোধী মায়াবী শকুনি মামাও সহদেবের হস্তে নিহত হইলেন। মাত্র দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাই ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষে জীবিত রহিলেন, তাঁহারাও যুদ্ধবেগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন।

তত্ত্ব—এই সাত্ত্বিক কামনার, দেবশক্তিই যোগৈশ্বর্য্য, এই শক্তিই কর্ম্ম-কার্য্যের মূলসত্তা। কর্ম্মশক্তি যাহার নাই তাহার কর্ম্মস্পৃহাই হয় না। শক্তির কণ্ডুয়ন মিটাইতেই জীবকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই শক্তির কণ্ডুয়নই তিন গুণাশ্রয়ে তিন কামনার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসে। শক্তির রজোপ্রকাশ হইতেই প্রতিযোগিতা ঈর্ষ্যার জন্ম। শক্তির তমোপ্রকাশেই বিষয় প্রভুত্ব ও অত্যাচার স্পৃহার জন্ম। সত্ত্ব আশ্রয়ে অনিমা লঘিমাদি প্রকাশ ইচ্ছার জন্ম হয়। তাই কর্ম্মশক্তির সংযম বা কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলেই গুণ মায়ার অতীত হওয়া যায়। এইজন্যই দেবপ্রকৃতি নিবৃত্তি-পথী পাণ্ডব অনন্ত যোগৈশ্বর্য্য

যুক্ত কর্ম্মশক্তি থাকিতেও দীনহীন নিগুর্ণ নিস্পৃহের মত চলিয়াছেন। এই জন্যই ইহারা মদ্ররাজকেও বধ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রবৃত্তির রাজ্যের অতীত হইতে পারিলেন। আর অসুর-প্রকৃতি-গত প্রবৃত্তি-পথী দুর্য্যোধন এই মাতুলকে আশ্রয় করিয়া, তমঃ রজঃ সত্ত্বগুণে মিলাইয়া অতি দুর্জ্জয় একাদশ অক্ষৌহিণী কর্ম্ম-প্রবৃত্তি সৃজন করতঃ, নিবৃত্তি দেবত্বের বিপক্ষে যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিল। অসুরের কর্ম্মশক্তি গুণাবরণে এইরূপই অসংখ্যাকারে বর্দ্ধিত হইয়া, তাহাকে প্রবৃত্তি পথে টানিতে থাকে। তাই অদ্য মদ্ররাজের মৃত্যুতে তাহার সর্ব্ব কর্ম্ম সত্তার শেষ হইয়া গেল। এই পর্ব্বে যাহারা জিবিত ছিলেন, ইহারা প্রত্যেকেই অতি দুর্জ্জয়সত্ত্বা, জীবের মুক্তির মহাবাধক শেষ-আবরণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ছিলেন, "অদ্য যেরূপ যুদ্ধ হইবে এমন যুদ্ধ আর কুরুক্ষেত্রে হয় নাই। আর সকলকে এক এক পাণ্ডব বধ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু মদ্ররাজকে পঞ্চ পাণ্ডব একত্র হইলে বধ করিতে পারিবে। তবু ধর্ম্মরাজ বিনা অন্য কেহই মদ্ররাজকে নষ্ট করিতে পারিবেন না।" বাস্তবিকই একসত্ত্বায় এত মহারথের এমন জীবন নিরেপেক্ষ দারুণ যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রে আর হয় নাই। আর এই ভূক্তি মুক্তিকাম ভগবানের শেষ মায়ার জয়, যোগ ভক্তি ও কর্ম্মযোগ আচরণে জ্ঞান লাভকারী বিনা, কেহই করিতে পারেন না; অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ ভক্তি ও কর্ম্ম একত্র সমাবেশ না হইলে, কেহই বলপূর্ব্বক এই শৈল্য জয় করিতে পারিবেন না। আর জ্ঞানের অস্ত্র বিনাও ইহার নাশ হয় না। তাই ভ্রাতা বেষ্টিত ধর্ম্মরাজ শৈল্যকে বধ করিলেন। এই সাত্ত্বিক কামরাজ্যের বিজয় হইলে, কুটীলতার পতন হয়, তাহাই এই শৈল্য বধের পরে স্বংল শকুনি মামার পতন! এই কুটীলতাকে বিজয়, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বিশ্বদর্শিতা, কাহার দ্বারাই হয় না। মাত্র ভবিষ্যৎ দর্শিতা দ্বারাই তাহার পরাজয় সম্ভবে, তাই সহদেবের হস্তে মামার পতন হইল। এই কুটীলতা সন্দেহের কুট অর্থ প্রকাশের হস্ত সত্ত্বগুণে পৌছিলেও ছাড়ান যায় না।

এই কুটবুদ্ধি ও জ্ঞানই সত্ত্বগুণকে অন্য গুণে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। তাই সর্ব্বপ্রকার স্বার্থবোধ কামনার-রাজ্য পার না হইলে, এই কুটজ্ঞানের আলোড়ণ শেষ হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অহঙ্কার তত্ত্বই ত্রিবিধ বিকার পাইয়া, মনের ত্রিগুণাত্মক বিকল্পের জন্মদান করে। এখন ত্রিবিধ বিকল্পের নাশের পরে অহঙ্কার তত্ত্বের শোধন বর্ণিত হইবে। অহঙ্কার তত্ত্ব গুণের দিকে নামিয়া আসে কেন, তাহার সেই গতিদাতা পদ কিরূপে নষ্ট হয়, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের মধ্যে শ্রবণ কর।

সৌপ্তিক ও অনুশোচনা-পর্ব্ব।

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ বা অহঙ্কারের বিকল্প নাশ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং স্বপ্রেম নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরঃ যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

লীলা—শল্য ও শকুনি সমস্ত সৈন্য সহিত নিহত হইলে, অশত্থামা কৃপাচার্য্যাদিকেও দেখিতে না পাইয়া, একা দুর্য্যোধন অতি মনোদুঃখে যুদ্ধস্থল নিকটবর্ত্তী দ্বৈপায়ণ হ্রদের জলে প্রবেশ করতঃ জলস্তম্ভ বিদ্যা সহায়তায় লুকায়িত হইলেন। পাণ্ডবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্র শিবির সমূহ অধিকার করিয়া, কোথায়ও দুর্য্যোধনের দর্শন পাইলেন না। পরে কয়জন ব্যাধের মুখে দুর্য্যোধনের জলপ্রবেশ কথা শ্রবণ করিলেন। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে উপেক্ষা করিতেই চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাকে বধ না করিয়া রক্ষা করিলে আবার বিপদে পড়িতে হইবে; তাহাকে হ্রদ হইতে তুলিয়া একেবারে নষ্ট কর। হ্রদের তীরে যাইয়া দুর্য্যোধনকে অসম্মানকর পৌরুষ বাক্য বলিতে থাক, দেখিবে সে আপনিই উঠিয়া আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" হ্রদের তীরে যাইয়া ধর্ম্মরাজ পৌরুষ বাক্য বলিতেই, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ও পাণ্ডবগণকে

নানাপ্রকারে ভৎর্সনা করিতে করিতে দুর্য্যোধন উঠিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি পলায়ন করি নাই, একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম মাত্র। এস যুদ্ধ করি! হয় দ্বৈরথ-যুদ্ধ কর, নচেৎ তোমরা সকলেই আমায় আক্রমণ কর! আমি একাই সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তবু তোমাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিব না।" পঞ্চ পাণ্ডবের যে কোন পাণ্ডবকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে পরাজিত করিলেই, দুর্য্যোধনের যুদ্ধ জয় হইবে, ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে যাহাকে ইচ্ছা যুদ্ধে আহ্বান করিতে বলিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তার চিরপ্রতিদ্বন্দী ভীমকেই গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন রাজসভায় প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া, দ্রৌপদীকে ইঙ্গিতকরা তাহার পাপ উরু গদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধন দারুণ আঘাতে ভূমিতে পতিত হইলে, ভীমসেন আবার প্রতিজ্ঞা মতে তাহার মস্তকে পদাঘাত করতঃ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধন, এখন দেখ পাণ্ডব কেমন হীনবীর্য্য ষণ্ডতিল, দ্রৌপদী কাহাদের পত্নী হইবার উপযুক্ত।" দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতেই ধর্ম্মরাজ হাহাকার করিয়া ভীমকে বাধা দান করিলেন। দুর্য্যোধন অসম্মানে ও আঘাতে রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধনকে মৃত মনে করিয়া ও এই দিকে সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া, পাণ্ডবগণ শিবিরে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে শৈল্য বধের দিন সন্ধ্যার সময়ে দুর্য্যোধনের পতন হইল।

ভক্ত—বৎস, এই অহঙ্কার-তত্ত্বের বিকল্পনাশের অধ্যায় অতি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিও! অহঙ্কারের নিম্নগামী-পদ ভগ্ন করিয়া না দিতে পারিলে, তাহার দর্পেভরা উন্নত মস্তক পদাঘাতে নত করিয়া না দিতে পারিলে, সত্যই জীবের নিরাপদ অবস্থা লাভ হয় না; আমিত্বের বিকল্পও শেষ হয় না। এক আমিত্বই

মনের বিকল্প-সত্ত্বায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের আশ্রয়ে, অধিদৈব, আধ্যাত্ম ও অধিভূত প্রবৃত্তিরূপে অসংখ্য আমিত্ব-অহঙ্কারের সৃজন করিয়া, ভ্রমময় বিষয়রাজ্যে জীবকে ঘুরাইতে থাকে। তখন জীব আমি যে কে তাহা নির্ণয় করিতেই সক্ষম হয় না। তখন অধিদৈব আত্মাই আমি, না আধ্যাত্মজ্ঞানময় প্রবৃত্তিবর্গ ই আমি, না অধিভূত দেহেন্দ্রিয়ই আমি, তাহাই স্থির করিতে পারেনা। জীব প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিকেই আমি ভাবিয়া, তাহাদের তৃপ্তিরজন্য কায়মনোবাক্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া খাটিয়া খাটিয়া শ্রান্ত হয়। গুণ-কামনা-রাজ্যের শেষ হইলে বহু আমিত্বের নাশ হইয়া, প্রকৃত আমিত্ব বাহির হইয়া পরে। কিন্তু বহির্মুখী-কর্ম্মকারী-জীব তখন তাহাকে দেখিতেই পায় না এবং খোজ করাও প্রয়োজন বোধ করে না; মনে করে আমিত্বের নাশ হইয়া গিয়াছে। এই তত্ত্বই শৈল্য বধের পর সমস্ত সৈন্যবল নাশ পাইলে দুর্য্যোধনের পলায়ন ও পাণ্ডব তাহাকে উপেক্ষা করিতে চাওয়া; কিন্তু তাহাকে এই কালে উপেক্ষা করিলে, সে আবার গুণ প্রসব করিয়া, রক্তবীজের মত বহু হইয়া উঠিবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষা করিতে নিষেধ করিলেন ও বাহির করিবার কৌশল বলিয়া দিলেন। ভীমসেনের সহিত দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণই নিজ উরুতে আঘাত করতঃ ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া, বধের উপায়ও বলিয়া দেন। নচেৎ ধর্ম্মপথী ভীমসেন দ্বৈরথ-যুদ্ধকালে গদাঘাতের নিষিদ্ধ-স্থানে আঘাত করিতেন কি না সন্দেহ। অহঙ্কারকে যে এমন অন্যায় আঘাতেই পদ ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। অন্যায় আঘাতে পাতিত করিয়া, শত্রু মস্তকে পদাঘাত করিলেও যখন অহঙ্কার শক্তির বড়াই লইয়া, দর্পে কর্ম্ম চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হইবে, জানিবে তখনই অহঙ্কার-সত্ত্বার নিম্নগতি রোধ হইয়াছে; তাহার পদ ভগ্ন হইয়াছে। ন্যায়ের আঘাত, অপরাধের ন্যায্য-শাস্তিকে সহজেই সহ্য করা যায়। কিন্তু

অন্যায়ের আঘাত, বিনা দোষে শাস্তি পাইয়া ক্রোধ বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাই যে অন্যায় আঘাতও সহ্য করিতে পারে, তাহারই অহঙ্কার কতক জয় হইয়াছে জানিবে। এইজন্যই অবিধি আঘাতে দুর্য্যোধনকে পরাজয় করা হয়। তবে এই উরুভঙ্গে প্রকৃত পক্ষে ভীমের অন্যায় আঘাত হয় নাই। কেননা, সে পূর্ব্বেই উরুতে আঘাত করিবে বলিয়া, বলিয়া রাখিয়াছিল। যুদ্ধকালে তোমার ঐ স্থানে আঘাত করিব বলিয়া, সেইস্থানে আঘাত করিলে, আঘাতকারীর অপরাধ হয় না। এখন ধার্ত্তরাষ্ট্রদের পক্ষে দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা মাত্র জীবিত রহিলেন কেন, সেই বিষয় শ্রবণ কর।

অহঙ্কার-তত্ত্বের কর্ম্ম জন্য দৃঢ়তা জন্মিবার মূলই তিনটী, কর্ম্মাভিমান, প্রতিহিংসা ও কৃপা। হয় কর্ম্মাভিমানে—কর্ম্ম যে করিতে পারে তাহা দেখাইতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, নচেৎ কোন কারণে ক্রোধাদিতে অভিভূত হইয়া প্রতিহিংসা জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, না হয় কৃপাযুক্ত হইয়া মমতায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই তিন সত্তাই দুর্য্যোধনের শেষ-অনুবল কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য। কর্ম্মাভিমান—কৃতবর্ম্মা, প্রতিহিংসা—অশ্বত্থামা ও করুণাই—কৃপাচার্য্য। কর্ম্মাভিমান বিজয়—দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, প্রতিহিংসা বিজয়—অশ্বত্থামার মস্তকমণি হরণ,আর দয়ার বিজয়—অনুশোচনা-পর্ব্বে বর্ণিত হইবে। কর্ম্মদৃঢ়তা-রূপ ক্রোধের তিন অবস্থাই ইহারা তিনজন। পরমব্রহ্মও এই তিনসত্ত্বায় সৃষ্টি-জগতে তিনপ্রকার সৃষ্টির বিকাশ করিয়া থাকেন। কর্ম্মশক্তি দেখিতে দেব ঋষি নর আদি জীব সৃজন। ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশপ্ত দেব দানব সৃজন, আর কৃপাযুক্তে জগতের ও জীবের দুঃখ নাশ এবং মঙ্গলের জন্য—অবতার আদি হইয়া ব্রহ্মসত্ত্বার স্বয়ং প্রকাশ হয়। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে কর্ম্ম-দর্পের গতিনাশ শ্রবণ করিলে, এখন অশ্বত্থামার বিজয়ে প্রতিহিংসার গতি-বিজয় শ্রবণ কর।

অশ্বত্থামার মস্তকমণি হরণ বা ক্রোধ-বিকল্পের নাশ

খা—মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধনকে মৃত মনে করিয়া পাণ্ডবগণ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ক্রমে ক্রমে দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধন তাহার প্রত্যেক সাহায্যকারীকেই, নানাভোগ ও ভালবাসা দিয়া প্রাণপণে সবা করিতেন, তাহার সেই সেবাতে প্রত্যেকেই তাহাকে যথার্থই ভালবাসিতেন। তাই ভালবাসার দুর্য্যোধনকে তাহারা জীবিত থাকিতেও, পাণ্ডব নিরাশ্রয়ের মত বধ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া, ইহাদের প্রত্যেকের মনেই অত্যন্ত পরিতাপ জন্মিল। আর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ও অসংখ্য রাজা, শত ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতষ্পুত্র সেবিত, মহামানী ও অতুল-ঐশ্বর্য্যপতি দুর্য্যোধনকে আজ সামান্য দীনহীন অনাথের মত, একা ধুলি শয্যায় গড়াইতে দেখিয়া, তাঁহারা শোকে দুঃখে ও ক্রোধে একেবারে আকুল হইয়া উঠিলেন। দুর্য্যোধনের তখনও মৃত্যু হয় নাই, তাই মূর্চ্ছাভঙ্গে সে যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া উঠিল; তখন অশ্বত্থামা, পিতৃঘাতী ও প্রিয়বন্ধু দুর্য্যোধন-ঘাতী পাণ্ডবদিগকে প্রতিহিংসা দানের জন্য ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া, প্রতিজ্ঞা করতঃ বলিলেন, "দুর্য্যোধন! বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা যুদ্ধ বেগে বিমূঢ় হইয়া তোমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। তাই তোমাকে নির্দ্দয় পাণ্ডবগণ অনাথের মত, এমন অন্যায় সমরে আহত করিয়াছে। তাহারা এমনই অন্যায় ব্যবহারে, আমার পিতাকেও নিহত করিয়াছে! কে বলে পাণ্ডব ধার্ম্মিক! কুরুরাজ, তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ, তোমার পক্ষে এখনও আমরা তিনজন মহারথ জীবিত আছি। আমায় তুমি এখনই যুদ্ধ ভার দান কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই মহা অধর্ম্মকারী পঞ্চপাণ্ডবকে আগামী

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিহত করিব। যদি না পারি,আমার যেন সৎগতি রোধ হয়।” কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মাও এইকার্য্যে স্বীকৃত হইলে, সেই দারুণ আহত অবস্থায়ই দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে গঙ্গাজল দ্বারা অভিষেক করিয়া, সেনাপতি পদে বরণ করতঃ পাণ্ডব নিধনে আদেশ দান করিলেন। অশ্বত্থামার এই প্রতিজ্ঞার কথা শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের পতনের পরেই তিনি যুযুৎসুকে লইয়া, হস্তিনায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ জানিয়া যুযুৎসুকে তথায় রাখিয়া, তিনি পাণ্ডবশিবিরে চলিয়া আসিলেন এবং পাণ্ডব ও সাত্যকিকে লইয়া অন্যত্র জাগিয়া রহিলেন; আর শিবির রক্ষার জন্য স্বয়ং মহাকাল মহাদেবকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এইদিকে অশ্বত্থামা, গভীর রাত্রিতে চোরের মত শিবিরে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিত পাণ্ডবগণকে নিদ্রার মধ্যেই,দস্যুর মত হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। সে শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলে, মহাদেবের জন্য প্রবেশে অক্ষম হইয়া, পরে মহাদেবের পূজা করতঃ যজ্ঞকুণ্ডে নিজ দেহ আহুতি দান করিলেন।তখন মহাদেব তুষ্ট হইলেন এবং সৈন্যগণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে ও অশ্বত্থামাকেই সেই মৃত্যুর নিমিত্তভাগী বুঝিয়া. অশ্বত্থামাও তাঁহাকে আরাধনায় তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, নিজের ধ্বংসকারী খর্গ অশ্বত্থামাকে দান করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই খর্গ লইয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে দ্বাররক্ষক করতঃ, অশ্বত্থমা মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায়ই শিবিরের সমস্ত সৈন্য সহিত শিখণ্ডি আদি দ্রুপদের পুত্র ও দ্রৌপদীর বালক পুত্রগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পাণ্ডবদিগকে খুজিয়া পাইলেন না। অদ্য মহাকাল-দণ্ড খর্গের আঘাতে সেই ভীষ্ম-দ্রোণ-বিজয়ী মহারথগণ, আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র না করিয়া, নিদ্রার মধ্যেই মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইদিকে পাণ্ডব বধ না করিয়া, তাঁহাদের নির্দোষ বালক পুত্রগণকে নিদ্রার মধ্যে বধ করায়, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া,

অশ্বত্থমাকে ভৎর্সনা করিতে করিতে তাহার নিষ্ঠুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের মুখে, পাণ্ডব না মারিয়া তাহাদের শিশু পুত্রগণকে বধ করিয়াছে শুনিয়া, দুর্য্যোধনও আজ দারুণ শোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, একি করিলে! একেবারে কুরুবংশই নির্ম্মূল করিলে? হায়, হায়, বংশে বাতি দিতেও আর কেহ রহিল না। এই নির্দ্দোষ বালক তোমার কি অপকার করিয়াছিল। আমারই ভুল হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ রক্ষিত পাণ্ডব, যাহাদিগকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণই কিছু করিতে পারিলেন না, তুমি আর তাহাদের কি করিবে? মাঝ থেকে কুরুবংশ নির্ম্মূল করিলাম।" হঠাৎ এই আত্মগ্লানিতে দুর্য্যোধন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এই মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। তখন অশ্বত্থামা প্রাণ ভয়ে নিবির বনের দিকে পলায়ন করিলেন, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

তত্ত্ব—প্রতিহিংসার অহঙ্কারের স্বরূপ দেখিলেত বাবা? এই প্রতিহিংসার ক্রোধের উদয়ে জীব না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। এই বৃত্তি অশ্বত্থামা,কৃপাচার্য্যের মত মহাজ্ঞানী ঋষিকে পর্য্যন্ত, দস্যু পিশাচের অধিক পাষণ্ড করিয়া নাচাইতে পারে। এই তত্ত্বই অশ্বথামা কৃপাচার্য্যাদির দস্যুর মত নিদ্রিত হত্যাদ্বারা দেখান হইল। বহু বৎসরের কঠোর যত্নে প্রাপ্ত আধ্যাত্ম সম্পদ, মন-বিজয়ী, কাম-বিজয়ী সমাধি, বৈরাগ্যাদি বলকে, এবং জ্ঞান,যোগ আদি পঞ্চ প্রকারের সাধনার ফলকে, এই ক্রোধ মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তি বধের মত নষ্ট করিয়া বসিতে পারে। অনেক সিদ্ধযোগী এই অহঙ্কারের ঘাটে যাইয়া, এই ক্রোধের হস্তে পড়িয়া নিজের সর্ব্বসিদ্ধি বলিদান করিয়া বসেন। এই তত্ত্বই অশ্বথামার হস্তে নিদ্রিত দ্রুপদপুত্র ও পাণ্ডবপুত্রগণের নিহত হওয়া। এই দারুণ প্রতিহিংসার ক্রোধ দুই প্রকারে জন্মে। কর্ম্মাভিমানে আঘাত পরিলে, 'আমি থাকিতে এমন কর্ম্ম হইল' এই ভাব হইতে, আর মমতা হইতে। কৃপা, ক্রোধও অহঙ্কার এই তিনটীর যোগ

হইলেই, মানব প্রতিহিংসার জন্য হিতাহিত জ্ঞান বিস্মৃত হয়, তাহাই অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য একত্র হইয়া এই দস্যুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসাভাবে হীন নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া বসিলে, হীনতা জন্য কর্ম্মাভিমান-বৃত্তি লজ্জিত হইয়া পরে ও নিষ্ঠুরতায় দয়াবৃত্তি ও দুঃখিত হইয়া দারুণ আত্মগ্লানির সৃজন করে। তখন প্রতিহিংসা-বৃত্তির বিকল্পের শেষ হইয়া অনুশোচনার জন্ম হয়। এই তত্ত্বই অশ্বত্থামার হীনকার্য্যে বিরক্ত হইয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। জীবের কুকর্ম্ম জন্য আত্মগ্লানি জন্মিয়া যখন, শত্রুর পুত্রশোকে নিজের পুত্রশোকের তুল্য যাতনা হয়, তখনই জীবের দর্পের ও প্রতিহিংসার-আমিত্বের পতন হয়। এই তত্ত্বই পাণ্ডবপুত্রগণের নিধন সংবাদে, দুঃখে হাহাকার করিতে করিতে দুর্য্যোধনের শেষ মূর্চ্ছিত হওয়া ও অশ্বত্থমার পলায়ন করা। এই দর্প ও প্রতিহিংসার বিকল্পের নাশের পরেও অনুশোচনার বিকল্প থাকিয়া যায়। ইহার আলোড়ণও সহজ নয়,তাহার বিষয় পর পর্ব্বে বর্ণিত হইবে। এখন অশ্বত্থামা-কৃত এই শোকাবহ দারুণ কর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডবদের প্রতি কেন ঘটিল, এই লীলাদ্বারা কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, সেই বিষয় শ্রবণ কর।

লীলা—এদিকে প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির দারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডব স্তম্ভিত হইয়া গেল। দ্রৌপদী দেবী ভ্রাতা ও পুত্রশোকে ব্যকুলা হইয়া ভীমসেনকে বলিলেন, "ওগো, সেই নিদ্রিত বালকঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী বীরপুরুষকে আনিয়া,আমায় একটু দেখাও! আমি জিজ্ঞাসা করিব, কেমন করিয়া সে এই কর্ম্ম করিতে পারিল।" ভীমসেন তৎক্ষণাৎ দারুণ ক্রোধ ভরে অশ্বত্থমাকে ধরিয়া আনিতে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অমনি অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজকে কহিলেন "এই কর্ম্মত ভীমসেনের সাধ্যায়ত্ত নয়! অশ্বত্থামার নিকট এখনও দারুণ ব্রহ্মঅস্ত্র ব্রহ্মশির বিদ্যমান; সে প্রাণ ভয়ে নিশ্চয় সেই অস্ত্র চালনা করিবে। ব্রহ্মশির-অস্ত্র বিনা তাহার প্রতিরোধত আর কিছুতেই

হইবে না, আপনারা দুইজন শীঘ্র আমার রথে আরোহণ করুন, আমাদেরও তথায় যাইতে হইবে। তখনই ধর্ম্মরাজ ও অর্জ্জুনকে লইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ভীমের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। সেই পরম যোগীদের অশ্বত্থামার অবস্থান জানিতে কছুমাত্র কষ্ট হইল না। অশ্বত্থামা ভীমাদিকে আসিতে দেখিয়া, সত্যই তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মশির অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সেই বাণকে পৃথিবী নিষ্পাণ্ডব করিতে আদেশ দিতেই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "শীঘ্র তুমিও ব্রহ্মশির পরিত্যাগ কর!" অর্জ্জুন অমনি রথ হইতে নামিয়া, আচমনাদি করতঃ, প্রথমেই গুরুপুত্রের কোন অনিষ্ট না হয়, তাহার জন্য স্বস্তি বাচন করিলেন ও পরে পঞ্চ পাণ্ডবেরও কিছু না হইয়া, ঐ ব্রহ্মশির অস্ত্রকে মাত্র নিরোধ করিবার জন্য, ব্রহ্মশির অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। দুই ব্রহ্মাস্ত্রই ব্রহ্মজ্যোতি লইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, দেবগণ তাপিত হইয়া উঠিলেন, ত্রিজগত ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। অমনি নারদ, ব্যাস আদি ঋষিগণ আসিয়া দুই বাণের মধ্যে দাড়াইয়া, অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামাকে বাণ সম্বরণ করিয়া লইতে বলিলেন। জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মবলী, ক্ষমাশীল অর্জ্জুন বাণকে সম্বরণ করিলেন, কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়, ক্রোধী অশ্বত্থামা তাহাতে সক্ষম হইলেন না। সত্যই ক্ষমা না করিয়া সম্বরণ করিলে, এই বাণে তাঁহারই মৃত্যু হইবে জানিয়া, বাণকে পাণ্ডবের শেষ বংশধর, উত্তরার গর্ভস্থ-শিশুকে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। ঋষিপুত্র মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধের প্রভাবে শেষে ভ্রূণ হত্যাকারী মহাপাপী হইলেন। ব্রহ্মশির-অস্ত্র উত্তরাদেবীর গর্ভস্থ অভিমন্যুর পুত্রকে বধ করিয়া অন্তর্হিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ও ঋষিগণের যোগ শক্তিতে শিশু পুনর্জীবন লাভ করিল। এইদিকে নিদ্রিত হত্যা ও ভ্রূণহত্যা পাপে অশ্বত্থমার ব্রাহ্মণপ্রভা নষ্ট হইয়া গেল, ব্রহ্মাস্ত্রহীন হইয়া ক্ষত্রবীর্য্যেরও নাশ হইয়া গেল। তারপর ঋষিগণও তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া অন্তর্হিত হইলে, ভীমসেন সামান্য অপরাধীর মত রজ্জুদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিয়া দ্রৌপদীর নিকট অর্পণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এমন নিষ্ঠুর ও অধর্ম্মচারীকে প্রাণদণ্ড করিতে বলিলেও, পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী দেবী,ব্রাহ্মণ ও গুরু-পুত্র বলিয়া,প্রাণদণ্ডে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু রাজা অপরাধীকে দণ্ড না দিলে, সেই অপরাধের অংশী হইতে হয় বলিয়া, প্রাণদণ্ড তুল্য শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। অশ্বত্থামাও, কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মত মস্তকে একটী মণি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মণি প্রভাবে সাধারণ নর হইতে তিনি অতি সুশ্রী ও তেজস্বী ছিলেন। পাণ্ডবগণ তাহার সেই মণি কর্ত্তন করিয়া, তাহার শিরে ক্ষত ও শ্রীনাশ করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। হীন তেজ ও পাপ ভার লইয়া, অশ্বত্থামা তপস্যার জন্য মহেন্দ্র-পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। পরে দারুণ কঠোর সাধনায় তিনি ঋষিত্ব লাভ করিয়া, সপ্তর্ষির এক ঋষি হইয়াছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস, মণিকর্ত্তনে অশ্বত্থামার শিরে যে ক্ষত হইয়াছিল, মহাপাপ জন্য সেই ক্ষতে তিনি এখনও ভোগিতেছেন। পাণ্ডবগণ গুরুপুত্রের যন্ত্রণা লাঘব জন্য, প্রতিদিন তৈল মর্দ্দনের পূর্ব্বে অশ্বত্থামার নাম লইয়া তিনবার তৈল দান করিতেন। আজও হিন্দুগণ তৈল মর্দ্দনের পূর্ব্বে সেই তৈল দান করিয়া, অশ্বত্থামার মহাপাপ ও ক্রোধের ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া থাকেন।

ভক্ত—আমিত্ব-অহঙ্কারহীন ক্রোধ-বিজয়ীর পূর্ণস্বরূপ দেখিলে কি? শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আজ, পাণ্ডবের আমিত্ব-দুর্য্যোধন সত্যই নাশ হইয়াছে কি না, তাহারই পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দুর্য্যোধন উরুভগ্ন হইয়া পতিত ও মস্তকে পদাঘাত পাইয়া শব্দ না করায়, পাণ্ডব তাহাকে মৃত মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেই অহঙ্কার মরে না। শক্তিহীন ব্যক্তি প্রবলের অত্যাচার এমনই নিরবে সহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের ভিতরে পূর্ণ আমিত্ব-অহঙ্কার ও প্রতিহিংসার চেষ্টা থাকিয়া যায়। সুখ দুঃখ সমস্তই প্রভু ভগবানের দান বলিয়া যতক্ষণ গ্রহণ করিতে না পারিবে,

ততক্ষণ আমিত্বের নিম্নগতি-প্রবৃত্তির নাশ পাইবে না। তাহাই মৃতপ্রায় দুর্যোধন অশ্বত্থামার প্রতিহিংসাভাব আশ্রয়ে, আবার যে কোন ভাবে বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডব, এমন শোচনীয় ভাবে শ্যালক ও পুত্রগণের নিধনেও শোকে, প্রতিহিংসার জন্য ক্রোধে জ্ঞানহারা হইল না। নিদ্রিত বন্ধু ও পুত্রঘাতী, আবার তাহাদিগকে বধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, এমন আততায়ী শত্রুর জন্যও, নিজেদের রক্ষার পূর্ব্বে মঙ্গল কামনা করিলেন! এইরূপ ক্ষমাশীল ধার্ম্মিক, আমি ও আমার এই জ্ঞান থাকিতে কখনও হইতে পারে না! পাণ্ডবের আমিত্ব সত্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে যে জীবের সম্বন্ধ নাই, ভগবানের ইচ্ছায় স্বভাব হইতেই হইতেছে, তাহারা যথার্থরূপেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই কর্ম্ম অশ্বত্থামা করে নাই, ভগবানের ইচ্ছায়ই সংঘটিত হইয়াছে, এই শোক দুঃখও সেই ভগবানের দান বুঝিতে পারাই, পাণ্ডব এমন দুঃখ ও ক্রোধের আলোড়নে ধীরতা রক্ষা করিতে ও এমন ক্ষমা করিতে পারিলেন। তাই আজ ব্রহ্মাস্ত্রও পাণ্ডবকে দগ্ধ না করিয়া ফিরিয়া গেল, ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধীভূত গর্ভস্থ ভ্রূণ জীবনলাভ করিয়া প্রসূত হইল। ক্রোধজয়ীকে অন্যের ক্রোধে কখনও নষ্ট করিতে পারে না। এইজন্য ঋষিগণকে হিংস্র পশুতেও হিংসা করে না। অক্রোধ বালক প্রহ্লাদকে নাশ করিতে চেষ্টা করিলে, তাই পিতার ক্রোধদত্ত অগ্নি দগ্ধ করিল না, বিষ প্রাণ নাশ করিল না, অস্ত্র কর্ত্তন করিল না, শীলা পেষণ করিল না। বৎস, এই ক্রোধ হইতে বড় শত্রু জীবের আর নাই। পূর্ব্বকালে শিশুকাল হইতে এই ক্রোধ বিজয় শিক্ষা দান করা হইত। গুরুগণ সর্ব্বদা শাসন তাড়না ও হীনকর্ম্মে নিয়োগ দ্বারা শিষ্যগণের ক্রোধ নাশ করিয়া, বিদ্যা শিক্ষাদান করিতেন। শিষ্য শব্দের অর্থই শাসন নমনীয় ব্যক্তি। তাই ঋষিগণ পিতার কর্ত্তব্য

নির্দ্দেশে বলিয়াছেন, পুত্রকে পঞ্চবর্ষ লালন করিয়া দশবর্ষ তাড়না করিবে। "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ॥" শিশুকাল হইতে অধীনতা, নির্য্যাতন, আঘাত, অসম্মান সহন না শিখিলে, জীবের ক্রোধ কখনও আয়ত্ত হয় না, ক্রোধ উহাকে দুর্য্যোধনের মত অসুরত্বের পথে চালনা করে; তাহারা কিছুতেই জীবনে সংযম ও দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না।

শিষ্য—প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে শিবির রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াও শিখণ্ডি আদিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার রক্ষক মহাদেবই অশ্বত্থামাকে নিজের খর্গ দিয়া, তাহাদিগকে ধ্বংস করাইলেন। ভীষ্মদ্রোণ-বিজয়া বীর-পুরুষগণ নিদ্রার মধ্যে নিহত হইলেন, এই সবের মধ্যে কি তত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলুন।

গুরু—এই তত্ত্ব বুঝিয়াইত পাণ্ডবের আমিত্ব শেষ হইয়াছিল। বাবা! যেই উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে রক্ষক করিয়াছিলেন ও শিখণ্ডিআদিকে এমন ভাবে নিহত করাইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল, পাণ্ডব তাহা বুঝিয়াছিল। বৎস, অদ্ভুতবীর্য্য দেবশ্রেষ্ঠ কালরূপী মহাদেব সর্ব্বদাই এই বিশ্বরূপ জীবশিবিরের রক্ষক হইয়া আছেন। ইহার অনুকুলতা বিনা তৃণগাছা নষ্ট করিবারও কাহারো শক্তি নাই। তিনিই রক্ষক আবার ধ্বংসের কর্ত্তাও তিনিই। তিনি যখন ধ্বংস ইচ্ছায় খর্গ চালনা করেন, তখন জীবের ধ্বংসের আর কালাকাল সময় অসময় কিছুই থাকে না। মহাবীরই হউক, বৃদ্ধই হউক, বালকই হউক, নিদ্রিতের মত বিনা চেষ্টায় নিহত হয়। তাহার সেই ইচ্ছার উদয়রূপ খর্গাঘাতে দুর্ব্বলও সবলকে নিহত করে। এই তত্ত্বই মহাদেব রক্ষক হইয়াও শিখণ্ডি আদির ধ্বংসকাল উপস্থিত ও অশ্বত্থামাই তাহাদের বধ নিমিত্ত জানিয়া, নিজের ধ্বংসকারী খর্গ দান করিলেন এবং

অশ্বত্থামা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই খর্গদ্বারা অজেয় বীর ও বালকগণকে নিদ্রার মধ্যে নিহত করিলেন।

মহাদেবের অস্ত্র দান রহস্য—বাবা! বৃহৎ ব্যাপার ও অভিনয় সম্পন্ন করিতে হইলেই, কোন্ দিন কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, কে প্রবেশ করিয়া কি অভিনয় আদি করিবে, তাহার একটী নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করি। পরে সেই নিয়মাবলী মতে কর্ম্ম সম্পাদন কর্ত্তা নিযুক্ত করি। এই বিশ্ব-অভিনয়ের সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা রূপ কার্য্যভার যাহার উপর, তাহারই নাম মহাকাল দেবতা। ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার দীপ্যমান ক্রিয়াশীল সত্তাগুলির মধ্যে, এই সত্তাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে মহাদেব বলে। এই মহাদেবই পুরুষসত্তায় সময়ের আদেশ কর্ত্তা. আর প্রকৃতিসত্তায় সেইকালে অভিনেতাগণকে সেইরূপ সাজে, তেমন কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও শক্তি দিয়া প্রেরণ করিবার-শক্তি, যোগমায়া দেবী! এই তত্ত্বই বাবা, নিষ্ক্রীয় মহাকালের বুকে দাড়াইয়া মহাকালী নৃত্য করিতে করিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালনা করিতেছেন। ইনই বর হস্তে—বর দিয়া জগৎ সৃজন করিয়া অভয় হস্তে—কতদিন পালন করিতে থাকেন, পরে ধ্বংসের খর্গে—সংহার করিয়া আবার অন্য হস্তে বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার তিননেত্রে, ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব ও জীবত্ব বা অধিদৈব, আধ্যাত্ম ও অধিভূত জ্ঞানের বা তত্ত্বের বিকাশ হইতেছে। এই দেবতা ও দেবী অভিন্ন একসত্ত্বায় অবস্থিত। এই ইচ্ছা ও কাল-শক্তি বিশ্বে কর্ম্মাভিনয় জন্য, ঠিক সময় মতে, দিন রাত্রি, ষড়ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য ও প্রকৃতি লইয়া, নির্দ্দয় নিষ্ঠূরের মত অনপেক্ষ ভাবে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। জীবদেহে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করিয়া,ইহারাই ভিন্ন আকার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম-স্বভাব দানে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মলীলা করাইতেছেন। জীবের ইচ্ছার দিকে, তৃপ্তির দিকে ফিরিয়াও

চাহিতেছেন না। ইহাদেরই আদেশ ও শক্তিতে আলো আঁধারে ডুবিয়া যাইতেছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হইতেছে। আবার আঁধার আলোর তেজে পালাইতেছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। কখন দস্যুর করে পথিক, কখন পথিকের করে দস্যু মারিতেছে। বালকের হস্তেও কখন মহাবীরের নিধন হইতেছে। এই সবই নির্দ্দিষ্ট কালের লিখা যথাযথ বিকাশ হইতেছে, তাহাতে জীবের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। এই জন্যই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎকরিষ্য স্ববশোঽপিতৎ॥ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীঃ ১৮ অঃ ৬০।৬১ শ্লোঃ; হে কৌন্তেয়! করিতে ইচ্ছা নাই সেই কর্ম্মও, স্বভাবের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া অবসভাবে (অনিচ্ছায়ও) জীব করিয়া বসিতেছে। তাই বুঝিবে অর্জ্জুন, এই স্বভাবরূপী ঈশ্বর (লোক প্রভু) সর্ব্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া, যেন যন্ত্রারূঢ় হইয়া সর্ব্বভূতকে মায়ায় (কর্ম্মরাজ্যে লীলা করাইয়া) ভ্রমণ করাইতেছেন।

শিখণ্ডিআদি ও দ্রৌপদী-পুত্রের মৃত্যু রহস্য —

বৎস। কণ্টক তুলিবার জন্য কণ্টকের প্রয়োজন, কিন্তু কণ্টক উঠিয়া গেলে উভয় কণ্টককেই পরিত্যাগ করিয়া থাকি। সেইরূপ অজ্ঞতা নাশের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, অজ্ঞতা নষ্ট হইলে সেই অজ্ঞান বা জ্ঞানের (বাদ তর্কাদির) আর প্রয়োজন কি? ব্রহ্মস্বরূপ জীবের অবিদ্যা ব্যাধি নাশের জন্য, বিদ্যা রাজ্যের জ্ঞানালোচনা, সমাধি, বৈরাজ্ঞাদি ঔষধের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞতা নাশ হইয়া গেলে ঔষধ সেবনের আর কি প্রয়োজন? তাই ভগবান অসুরত্বের বিজয়ের জন্য, পাণ্ডবপক্ষে যত প্রকার বল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, অসুরত্ব বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রয়োজন নাশ, পাইল বলিয়া, তাহাদিগকেও বিসর্জ্জন করিলেন। অধিভূত নাশকগুলি অধিভূত বিঘ্ন নাশ করিয়া চলিয়া

গিয়াছে, আধ্যাত্মনাশক অধ্যাত্মবিঘ্ন নাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অন্ত পাণ্ডবের শেষ আমিত্ব-অহঙ্কারের নাশের পরে, এই সমাধি বৈরাগ্যাদি অধিদৈব-বল দ্রুপদ-পুত্র ও পঞ্চ-পাণ্ডবের পঞ্চ-সাধন জনিত শক্তি—দ্রৌপদী-পুত্রের আর প্রয়োজন রহিল না। আজ যুদ্ধান্তে পঞ্চপাণ্ডব ও যদু-বংশীয় সাত্যকি মাত্র জীবিত রহিলেন, সাত্যকি বোধ হয় সত্যনিষ্ঠা। ধার্ত্তরাষ্ট্র হইয়াও যুযুৎসু ধর্ম্মপক্ষ গ্রহণ করায় জীবিত রহিলেন এবং অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা পলাইয়া জীবন বাঁচাইলেন। এখন দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইতে অশ্বত্থামা ইত্যাদির পলায়ন পর্য্যন্ত অধ্যায় গুলিকে সৌপ্তিকপর্ব্ব বলা হইল কেন, সে রহস্য শ্রবণ কর।

সৌপ্তিক-পর্ব্ব তত্ত্ব—এই বৃত্তিগুলিকে সুপ্ত অর্থাৎ ঘুম লওয়ান হয় বলিয়া, এই পর্ব্বের নাম সৌপ্তিক-পর্ব্ব করা হইয়াছে। অহঙ্কারের গুণ-কর্ম্মপথে গমনকারী প্রভু-আমিত্বের নাশ করিয়া, জীবের নিজস্বরূপ দাস-আমিত্বের জাগরণ চাই। তাহাই দুর্য্যোধনকে উরু ভাঙ্গিয়া ঘুমলওয়ান হইয়াছে, দুর্য্যোধনকে বধ করা হয় নাই। ক্রোধের কর্ম্মজন্য দৃঢ়তা একেবারে নাশ হইয়া গেলে, দাসের সেবা কর্ম্মও যে নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই ক্রোধের দর্পাদি মস্তক-মণি কর্ত্তন করিয়া ঘুম লওয়াইয়াছে। এইরূপ, কর্ম্মাভিমান ও দয়াকেও আমিত্ব এবং ক্রোধের সঙ্গচ্যুত করিয়া ঘুম লওয়াইতে হয়। সমাধি, বৈরাগ্য, ধর্ম্মসাধন শক্তিগুলি, আমিত্ব হীন হইলে স্বভাবতঃই ঘুমাইয়া পড়ে। অবিদ্যানাশে জীবের নিত্য স্বরূপ ব্রহ্মত্বের জাগরণে, স্বভাবতঃ ধর্ম্মে সমাধি বিষয়ে বৈরাগ্যাদির জাগরণ হয়, চেষ্টা-পর সমাধি আদি আর থাকে না। তাই শিখণ্ডি আদিও সৌপ্তিক পর্ব্বে ঘুমের মধ্যে একেবারে ঘুমাইলেন। এইরূপে সৌপ্তিক-পর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তা আমিত্বের নাশ পাইলেও, কৃপা জন্য অনুশোচনার আমিত্বের নাশ পায় না। ইহারও নাশ না হইলে মনের বিকল্পের শেষ হয় না। তাহাই **অনুশোচনা-পর্ব্বে** অনুশোচনা-নাশে শ্রবণ কর।

অনুশোচনা-পর্ব্বে আত্মগ্লানির বিকল্প নাশ।

লীলা—যুদ্ধের উত্তেজনার পরে এইবার শোকের অবসাদের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। সর্ব্ব পৃথিবীর শোকরাশি আজ একস্থানে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মানবের মাতা, পত্নী, পুত্রগণের শোকের কণ্ঠ একেবারে কান্দিয়া উঠিল. এই দারুণ শোকের আলোড়ণে কে স্থির থাকিতে পারে। গন্ধারীদেবী, জীবিতে যাহাদিগকে চক্ষু খুলিয়া দেখেন নাই, আজ শোকে উন্মাদিনী হইয়া, তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে দৌড়িয়া আসিলেন। তাহাকে মা বোল বলিবার শত কণ্ঠের মধ্যে, আজ সারাদিবার যে একটী কণ্ঠও নাই, সহস্র পৌত্রের আনন্দ ভরা বীনা-কণ্ঠ আজ যে সবই নিরব হইয়া গিয়াছে, মায়ের প্রাণে আর কত সয়। যদিও জানিতেন এই যুদ্ধের এই পরিনাম, অধার্ম্মিকের ইহাই প্রাপ্য ফল। যুদ্ধ বিদায়-কালে দুর্য্যোধনকেও বলিয়া দিয়াছিলেন, বাবা 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।' তবু আজ শোকে দুঃখে আত্মহারা হইয়া, তাহার রুদ্ধচক্ষের ক্রোধ দৃষ্টিদ্বারা দুঃখদাতা পাণ্ডবগণকে ভস্ম করিতেই উদ্যত হইলেন। ক্রোধের সহিত চক্ষু-বন্ধন মোচনে ব্রতী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনাদির অধর্ম্মাচারের কথা ও তাহাতে পিতামাতার অন্যায় সমর্থনেই যে এই বিষময় ফল হইয়াছে, তাহা বলিয়া মাতাকে ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলে, মাতা লজ্জিত হইয়া পাণ্ডবের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই সামান্য ক্রোধ দৃষ্টিতেই ধর্ম্মরাজের পদের নখ মরিয়া কুনখ হইয়া গেল। মাতা শোকে দুঃখে তখন শ্রীকৃষ্ণকেই বৃথা অনুযোগ আরম্ভ করিলেন। তুমি কেন আমার অল্পদোষী একটী পুত্রকেও জীবিত রাখিলে না। আমার দিকে না রাখিয়াছিলে, পাণ্ডবকুলেও কাউকে রাখিলে না কেন? তুমি এই সবের ধ্বংস ইচ্ছা করিয়াই নিজে অস্ত্রধারণ কর নাই, তোমার বংশকেও অস্ত্র ধরিতে দেও নাই। তাহা হইলে যে পাণ্ডব কুলও

ধ্বংশ হইত না? আহা, অভিমন্যু আদির মত এমন সব স্বর্গ-কুসুম এমন অকালে ঝড়িয়া গেল, আর তুমি দাড়াইয়া দেখিলে? তুমি কেন অস্ত্র ধরিয়া দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনিকে মাত্র বধ করিয়া এই পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলে না? আমি তোমাকেই অভিসম্পাত দান করিব। অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পরে তোমার যদুবংশ, এমনই তোমার চক্ষের সম্মুখে, আত্মকলহে ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই অভিসম্পাতের পরে মায়ের ক্রোধ কিছু শান্ত হইল; পরে কান্দিতে কান্দিতে পুত্রগণের অন্ত্যেষ্টি দর্শন করিলেন। কুরুক্ষেত্র ব্যাপিয়া অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল, অনেক বিধবা সতী স্বামীর সহিত চিতানলে ভস্মীভূতা হইলেন। পরে চিতা নির্ব্বাপিত করিয়া কান্দিতে কান্দিতে মৃতদের তর্পণ করতঃ সকলে রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। এই তর্পণের সময় ধর্ম্মরাজ মায়ের নিকট জানিলেন, মহাবীর দাতাকর্ণ তাঁহারই জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কুন্তী-মায়ের গর্ভের সূর্য্যদেবদত্ত পুত্র। এই কথা পূর্ব্বে জানিলে কি এই কাল যুদ্ধ আর সংঘটিত হয়? এমনই শোক বিষাদে ধর্ম্মরাজ অভিভূত হইয়াছিলেন, এখন এই সংবাদে আরও বিশেষ কাতর হইয়া পরিলেন।

ধর্ম্মরাজ বহু পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞান্তে ব্যাসদেবের মুখে এই ধ্বংস ও শোকের আভাষ পাইয়াই, দুঃখে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই শোক দুঃখের ভয়ে দারুণ অবিচার অত্যাচার সহিয়াও, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের কালে দুর্য্যোধন আদিকে ক্ষমা করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। অদ্য সেই শোক দুঃখ চক্ষে দেখিয়া তাঁহার কি ধৈর্য্য রক্ষা হইতে পারে? গান্ধারী মায়ের দুঃখভরা অনুযোগ, বিধবা ভগ্নি, পুত্রবধু, ভ্রাতৃবধু আদির বিষাদভরা বিলাপ, নানাভোগ প্রতিপালিত স্নেহ-সেবিত রাজগণ ও রাজকুমারগণের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন বিরূপ ও শৃগাল, শকুনি ভক্ষিত দেহাবশেষ দর্শনে, তাহাদের শোকাতুরা মাতা, পত্নী সন্তানাদির ক্রন্দনে, ধর্ম্মরাজের

অন্ত হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। "হায়, এ কি করিলাম! এত জনকে দুঃখ দিলাম? সামান্য প্রতিহিংসা সাধন ও রাজ্যলোভে কি ব্রাহ্মণবধ গুরুবধ, জ্ঞাতিবধ, ভ্রাতৃবধ, পুত্রবধ ও বন্ধুবধ ইত্যাদি জগতের যত মহাপাপ সবই করিয়া বসিলাম। তবে আমাতে আর মহাপাপীতে প্রভেদ কি?" ধর্ম্মরাজ এই অনুশোচনায় বিহ্বল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তত্ত্ব—বৎস, সামান্য নারীগণের ক্রন্দন বলিয়া এই অধ্যায়কে উপেক্ষা করিও না। এই নারিত্বরূপ অনুশোচনার আক্রমণ না আসা পর্য্যন্ত, জীবের পাপকর্ম্মে নিবৃত্তিই আসিবে না। এই জন্যই এক সাধক বলিয়াছেন, "এমন পাপও ভাল যাতে অনুশোচনা আনয়ন করে। এমন পুণ্যও ভাল নয় যাহাতে অভিমান আনয়ন করে।" এই অনুশোচনা, অসুরত্ব ত্যাগের নিদর্শন; তাই দুর্য্যোধনের এই অনুশোচনা আসা মাত্র মৃত্যু হইয়াছিল। অনুশোচনায় কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজও এই অনুশোচনার পরই শান্তির অধিকারী হইবেন। এই জন্যই মহাভারত হেন ধর্ম্মগ্রন্থে, শুধু শোক দ্বারা একটী পর্ব্ব গ্রন্থন করিয়াছেন। দৈবপ্রকৃতির অনুশোচনা ও অসুর প্রকৃতির অনুশোচনা পাশাপাশি অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। গান্ধারীদেবী নিজে পাপের প্রশ্রয় দিয়া, পাণ্ডবের প্রতি অত্যাচার, অবিচার করিয়া, অদ্য তাহার প্রতিফল পাইয়াছে জানিয়াও, ক্রোধে পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিতে চাহিতেছেন। পুত্রগণের কৃত কর্ম্মের এই ফল তিনি জানিতেন, মুখেও বলিয়াছেন, তবু ধর্ম্মের নিন্দা, ভগবানের নিন্দা, পরে ভগবানকে গালি ও অভিসম্পাৎ করিলেন, এই সমস্তই আসুর অনুশোচনার নিদর্শন। আর ধর্ম্মরাজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অক্ষম হওয়া, কৃত কর্ম্মে নিজকে পাপী ও অপরাধী ভাবা, ভগবৎ কৃপার অযোগ্য বোধে ব্যাকুল হইয়া

বিষয় ত্যাগে প্রস্তুত হওয়া, দৈব প্রকৃতির অনুশোচনা। এখন অনুশোচনার মূল কারণ, কৃপার স্বরূপ শ্রবণ কর।

আমিত্ব আবরিত কৃপা হইতেই, মমত্ব অর্থাৎ 'আমার' জ্ঞানের জন্ম হয়। এই মমতা হইতেই জীব পৃথিবীর কতকজনকে লইয়া আমিত্বের সংসার পাতাইয়া, আর সকলকে পরসংজ্ঞা দান করিয়া লয়। তখন সেই আপনজন-গুলির তৃপ্তির জন্য অপরজনদিগকে পীড়া দিতে, এমন কি বধ পর্য্যন্ত করিতেও দুঃখিত হয় না। এই আমার-জ্ঞানে আবরিত হইয়াই রাজর্ষি ভরত মৃগশিশুকে কৃপা করিয়া মুক্তিরাজ্য হইতে পতিত হন ও পশু জন্ম লাভ করেন। এই মমত্ব কৃপার আক্রমণে জীবত দূরের কথা, দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত নিজের তোষণকারী ভক্ত অসুরকে, দেবতার অজেয় বর আদি দান করতঃ, পাতালের অসুরকে স্বর্গের অধিপতি করিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টি-শৃঙ্খলা নষ্টকারী অসুরের রক্ষা ভার গ্রহণ করিয়া, ভগবানের বিপক্ষে অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। ভগবান তখন সৃষ্টির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, তাহাদের বাক্যাদি রক্ষা করিয়াই, নূতন অবতারাদি রূপে আবির্ভূত হইয়া, স্বয়ং সেই সব অসুরকে নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই মমত্ব কৃপার আক্রমণেই ধর্ম্মরাজ আজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই রমণীবৃত্তি—কর্ম্ম করিয়া পরে অনুশোচনা ও আত্মীয়-স্বজনের শোক-অনুযোগের আক্রমণ বড়ই সাজ্বাতিক। বাবা! এই দারুণ আক্রমণে কত শক্তি-সম্পন্ন মুক্তি-পন্থীর বহুবর্ষের কঠোর সাধনালভ্য সাধন-শক্তি মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়। অন্য যেমন গান্ধারী দেবী শোক দুঃখে নিজ পুত্রদের ক্রটী না দেখিয়া, ধর্ম্মের নিন্দা ও ভগবানকে অভিসম্পাৎ আরম্ভ করিয়াছিল, অসুর জীব সত্যই তখন ধর্ম্ম ও ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে। এখন গান্ধারী শাপ ধর্ম্মরাজের কুনথ হইবার রহস্য শ্রবণ কর।

গান্ধারীদেবী স্বামীর অতিরিক্ত-সুখকে ভোগ করিবেনা বলিয়া নিজের দৃষ্টি শক্তিকে চিরকালের জন্য রোধ করেন। তাহার এই কঠোর সাধনায় তাহার অব্যর্থ দৃষ্টি লাভ হয়। তাই একদিন গান্ধারীদেবী দৃষ্টি খুলিয়া অমৃতময় স্নেহদৃষ্টিদ্বারা দুর্য্যোধনের সর্ব্বঅঙ্গ বজ্রতুল্য করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কেবল শকুনি ও কর্ণের মন্ত্রণায় লজ্জা পরাতে উরুমাত্র সেই দৃষ্টিতে বঞ্চিত থাকে। অন্য আবার অগ্নিময় ক্রোধ দৃষ্টি দ্বারা পাণ্ডবকে ভস্ম করিতে চক্ষুর আবরণ খুলিতেছিলেন, আর কেহ হইলে ইহাতেই ভস্ম হইয়া যাইত, কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া পাণ্ডব বাঁচিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবের এমন শক্তি ছিল, যে এই দৃষ্টিকে ব্যর্থ করিতে পারিতেন, কিন্তু ধার্ম্মিক অন্যের ধর্ম্ম-সাধনার ফল নষ্ট করেন না, আংশিকভাবেও তাহা রক্ষা করিয়া শাস্ত্রবাক্য ও ধর্ম্মসাধনার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। তাই ধর্ম্মরাজ পদনখে দৃষ্টির দগ্ধকারী-শক্তির ক্রিয়া রক্ষা করিলেন। এইজন্যই শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদের আভিচারিক ভগন্দর-রোগও কতদিন ভোগ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানও তাই ব্রহ্মাদির বাক্য রক্ষা করিতে, নিজে অবতার হইয়া অসুরগণকে বধ করিয়াছেন; তাহাদের বরশক্তিকে নষ্ট করেন নাই। এখন কৃপাই কি করিয়া অসুরত্বের মূল সেই তত্ত্ব শ্রবণ কর।

রাজা শান্তনু বনমধ্যে কৃপ ও কৃপী নিরাশ্রয় শিশুদ্বয়কে কুড়াইয়া পাইয়া, আশ্রয় দান পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করেন। তার পরেই ভীষ্মকে নষ্ট করিতে চলিলে গঙ্গাদেবীকে বাধা দান করিলেন। রাজা পাণ্ডুর সময়েও মাত্র কৃপাচার্য্যই তাঁহার সখা ও কর্ম্মসেনাপতি ছিলেন, অর্থাৎ তখন মাত্র দয়া বিনা অন্য কর্ম্ম ছিল না। তিনিও এই দয়ায় অভিভূত হইয়াই অন্ধ জ্যেষ্ঠকে রাজ্য জন্য দুঃখিত ভাবিয়া, তাঁহাকে রাজ-প্রতিনিধি করিয়া বনে গমন করেন। এই দয়া হইতেই ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রের প্রতি অতি কৃপায় পাণ্ডবদ্বেষী হইয়া, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত

সংঘটিত করিলেন। তাই বলিতেছি বাবা! এই বিষয়-রাজ্যের মূলই এই কৃপাচার্য্য। ইহার মার্জ্জনায়ই জীবের মুক্তি, আর ইহার আবরণেই জীবের মমত্ব-বন্ধনে বন্ধ হইয়া নানা কর্ম্মফাঁস গলায় পরে। কামক্রোধ ঈর্ষ্যাদির হস্তে পড়িয়া, জীব এই কৃপাচার্য্যকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কাম ও ঈর্ষ্যাদির মূল আশ্রয় এই মমত্ব-আবরিত কৃপা। সেই সবের আক্রমণ নাশ হইলেই, এই গুরুর আক্রমণ, অনুশোচনা লইয়া আসিয়া জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। বাবা! এই অনুশোচনাই জীবের যথার্থ গুরু! অনুশোচনা না আসা পর্য্যন্ত কখনও পাপাসক্তি রূপ অসুরত্বের শেষ হয় না। অনুশোচনা জন্মিলেই পাপের নিবৃত্তি হইল। অনুশোচনা দুই প্রকার, একটী ভয়ে, একটা লজ্জায়। একটী পাপের শাস্তির ভয়ে অনুশোচনা, অন্যটী অতৃপ্তিকর কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া লজ্জায় অনুশোচনা। এই অনুশোচনা-বিকল্প মনে উপস্থিত হইলেই মনের বিষয়-বিকল্পের শেষ হইয়া গেল, তাহাই ধর্ম্মরাজের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া। এইবার মন কোন অবস্থায় উপস্থিত হইলে, তাহার সমস্ত বিকল্পের শেষ হইয়া যায় তাহা শান্তি-পর্ব্বে শ্রবণ কর।

শান্তি ও অনুশাসন-পর্ব্ব।

ভীষ্মদেবের নির্ব্বাচন বা মনের নির্ব্বিকল্প সমাধি সংবাদ।

নৌমিতং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্ক শাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভুমান মাচরৎ।

লীলা—মৃতদেহগুলির সৎকার ও তাহাদের তর্পণান্তে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মাতা ও পত্নীগণ সহিত, ত্রয়োদশবর্ষের পরে পাণ্ডবগণ আবার ধৃতরাষ্ট্রপুরীতে প্রবেশ করিলেন। পাশাখেলার দারুণ অপমান নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত হইয়া বনে গমন কালে, দুঃখে ও ক্রোধে যাহাদের ধ্বংসই কামনা করিতে করিতে পুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাহাদের নির্য্যাতন ও ধ্বংস দেখিলে তাহারা কতই আনন্দ লাভ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, অদ্য ত্রয়োদশ বর্ষ পরে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়াও কিন্তু পাণ্ডবগণ তেমন সুখী হইতে পারিলেন না। আজ যেন তাঁহারা অমঙ্গল বিসর্জ্জন করিতে যাইয়া মঙ্গলকেও সেই সঙ্গে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের সব দিকই যেন শূন্য, জগত যেন বিষাদে আবরিত।

তত্ত্ব—বহু দিনের বিহারের, অভ্যাসের বিষয়-রাজ্যের বিষয়জ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া, ব্রহ্ম-রাজ্যের নিকট যাইয়া পৌছিলে এই অবস্থাই হয়। যেমন ঊষা ও সন্ধ্যায় সূর্য্যও নাই চন্দ্রও নাই, কেবল অন্ধকারই দর্শন করি। ঊষার পরে দিবা আসিলে সূর্য্য-কিরণে আন্ধার নাশ পায়, সন্ধ্যার পরেও

চন্দ্র উঠিয়া আবার আলো দান করে, এই অবস্থাটীও এইরূপ জানিবে। বিষয় রজনীর শেষে এই উষার অন্ধকারের পরে আবার ব্রহ্মসূর্য্য উঠিলেই, এই বিষাদ অন্ধকারের নাশ হইয়া আনন্দের আলো জ্বলিয়া উঠিবে। এখনও যে পাণ্ডবের ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি তাহাদের পূর্ব্বঅভ্যস্থ সুখের কারণই অনুসন্ধান করিতেছে, তাই পিতৃসম ভীষ্মাদিরস্নেহ, ভ্রাতা, পুত্রাদির প্রীতি সেবা না পাইয়া, সবদিক শূন্য দেখিতেছে; কি ধরিবে, কি করিবে তাহার অবলম্বনই পাইতেছে না। নিরানন্দ ও আনন্দ, অমঙ্গল ও মঙ্গল বিষয়-রাজ্যের এই দুই জ্ঞান বোধকেও নষ্ট করিলেই যে বিষয়-রাজ্যের শেষ হইল। তাই আজ পাণ্ডব দেখিল, তাঁহারা নিরানন্দের সহিত যেন আনন্দকেও এই যুদ্ধে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, অমঙ্গলের সঙ্গে যেন মঙ্গলও তাহাদের অন্তর্হিত হইয়াছে। সত্যই বিষয়-রাজ্যের এই দুই জ্ঞানই তাহাদের শেষ হইয়াছে। তাইত আজ মন কর্ম্মরাজ্য শেষ করিয়া, সেই শান্তিরাজ্যের শান্ত-সমাধিতে উন্নত হইল, তাহাই বর্ত্তমান শান্তিপর্ব্ব।

বৎস, শান্তি শব্দের অর্থ কিছু প্রাপ্তি নয়! যখন সুখও নাই দুঃখও নাই সেই অবস্থার নামই শান্তি অবস্থা। (সম্‌+ক্তি) তরঙ্গহীন জলের মত যখন মনে বিষয়ের তরঙ্গও নাই, ব্রহ্মের তরঙ্গও নাই সেই অবস্থাকেই শান্ত অবস্থা বলে। এই জন্যই বিষয়-নিবৃত্ত সাধুগণের নাম শান্ত। এই অবস্থা, বিষয় শেষ হইয়া ভগবৎরাজ্য আরম্ভ হইবার মধ্য অবস্থা। তখন মনে বিকল্পও নাই, সঙ্কল্পও নাই, বিষয়ও নাই ব্রহ্মও নাই। এই অবস্থাকে (বদ্ধও নয় মুক্তও নয়) তটস্থ অবস্থা বলে। এই কালে বিষয়ের সঙ্গ ও বিষয়তত্ত্ব আলোচনায় মন আবার বিষয়-রাজ্যেই ধাবিত হইয়া পরে, আর ব্রহ্মজ্ঞানী-সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনায় ব্রহ্মরাজ্যে চলিয়া যায়। এই শান্ত অবস্থাই নির্ব্বিকল্প-সমাধি অর্থাৎ প্রবৃত্তি লয়ের পরে মাত্র আত্মার অবশেষ অবস্থা। এই অবস্থা হইতেই জীবের স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই অবস্থার নামই জীবত্ব নাশে ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভ। গীতায় এই অবস্থাকেই "ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা নশোচতি নকাঙ্ক্ষতি। সম সর্ব্বেষুতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মদ্ভক্তিই অভ্রান্ত ব্রহ্মজ্ঞানের জাগরণ, সেই জ্ঞান জন্মিলে আর বিষয়-জ্ঞান স্ফুর্ত্তি হইতে পারে না। এখন কি করিয়া এই শান্ত-সমাধি হইতে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম হয় তাহাই শ্রবণ কর।

লীলা—দারুণ অনুশোচনাগ্রস্ত ও শোকাতুর পাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া, এখন কুরুকুলের অবশেষ পরমধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগকে অবলম্বন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে জীবন যাপন করিতে বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মন কিছুতেই সেই প্রিয়-পুত্রঘাতী পাণ্ডবের প্রতি প্রসন্ন হইলনা। বিশেষ শত পুত্রঘাতী ভীমকে ক্ষমা করিতে তাহার মন কিছুতেই প্রস্তুত হইলনা। তিনি অন্য পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়া ভীমকে নিহত করিতেই মনস্থ করিলেন। তিনি অতি বলবান ও মল্লযোদ্ধা ছিলেন। মনে করিলেন ক্ষমা করিবার ছলনায় ভীমকে আলিঙ্গন করিতে ধরিয়া, তাহাকে বাহুপেষণে বধ করিয়া ফেলিবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "এখন ক্ষমা না করিয়া আমি কি লইয়া বাচিয়া থাকিব! আর ইহাতে পাণ্ডবের দোষই বা কি? আমার পাষণ্ড পুত্রগণইত এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। যাও পাণ্ডব-গণকে লইয়া আস, আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করি?" শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই, ভীমসেন বলিয়া দুর্য্যোধনের গড়া লৌহ ভীমকে তাহার নিকটে ধরিয়া দিলেন। একেত রাজা অন্ধ, তাতে ক্রোধে শোকে আত্মহারা, তাই সেই মূর্ত্তিকেই ভীম ভাবিয়া দারুণ ভাবে আক্রমন করিলেন ও মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া দারুণ বাহু পেষনে, সেই লৌহ-ভীম—দুর্য্যোধনের শত শত গদাঘাতেও যাহা ভগ্ন হয় নাই, তাহাকেই ভগ্ন

করিয়া ফেলিলেন। লৌহ-মূর্ত্তির পেষণে নিজেও মাটীতে পড়িয়া রুধির বমন করিতে লাগিলেন। ক্রোধবেগ শান্ত হইলে, আবার ভীমের জন্য অনুশোচনায় রোদন আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাকে শান্তনা দিয়া বলিলেন, "ভীমসেন কুশলেই আছেন। এইরূপ ঘটীবার সম্ভাবনা মনে করিয়া, আমি লৌহভীম দিয়া আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছি।" ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির শত শত প্রশংসা করিলেন ও পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন।

ইহার পরে মৃতদের শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল, কিন্তু ধর্ম্মরাজ অনুশোচনা ও শোকে কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অশক্ত হইয়া পরিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব ও ভ্রাতাগণকে বলিলেন, "এত শোক ও দুঃখের স্মৃতিমাখা, গুরু, ব্রাহ্মণ, ভ্রাতা ও পুত্রাদির রক্তধৌত রাজসিংহাসনে বসিতে আমি অশক্ত, আমি বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বনে যাইয়া তপস্যা করিতে ইচ্ছা করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের নিকট লইয়া গেলেন। সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও ঋষিগণ বেষ্টিত ভীষ্মদেবের নিকট, কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিতে থাকিলে, ভীষ্মদেব বেদ বেদান্তের গুহ্যতত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মরাজকে উপদেশ দান আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মদেবের অপূর্ব্ব উপদেশে, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মরাজের সমস্ত সন্দেহের নাশ হইয়া পূর্ণজ্ঞানের উদয় হইল। ধর্ম্মরাজ পূর্ণরূপে বিষয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া, আনন্দময় ব্রহ্মরাজ্যে উত্থিত হইলেন। তখন উত্তরায়ণের আগমন হইল এবং ভীষ্মদেব দেহত্যাগ ইচ্ছায়, শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দাড়া করাইলেন। তাঁহার রূপে নয়ন, গুণে মনসংযোগ করিয়া বাক্যদ্বারা স্তুতি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে লয় হইয়া গেলেন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র বিতারিত মহাত্মা-বিদুর আবার কুরুরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ পিতৃ প্রতিম বিদুর ও কৃপাচার্য্যকে লইয়া আবার কর্ম্ম-রাজ্যে নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ

ভীষ্মদেবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া, সম্রাটপদ গ্রহণ করতঃ ধর্ম্মপথে প্রজাপালনে ব্রতী হইলেন। এইরূপে ভীষ্মদেবের নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অশুরত্বের আলোড়ণ শেষ হইয়া গেল।

ধর্ম্মরাজ বুঝিলেন, তপস্যা নামে পৃথক কর্ম্ম নাই, কর্ম্মে অনাসক্ত, ফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিলেই তপস্যা করা হয়। এই ভাব বর্জ্জিত যোগাদি সাধনাও তপস্যা নয়, আর এই ভাব যুক্ত সংসার কর্ম্মও তপস্যা। তপস্যার জন্য বনে যাওয়ার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, কেননা বনে বাস করিয়াও দস্যু, পশু ও রাক্ষসগণ পাপাচরণ করিয়া থাকে। এই সৃষ্টিরাজ্যই কর্ম্মক্ষেত্র, ইচ্ছা না করিলেও শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা জাগরণাদি কর্ম্ম, স্বভাবেই করিতে হইবে; অকর্ম্মা হইয়া ক্ষণকালও অতীত করিবার শক্তি নাই। "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" তাই "সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ কর্ম্ম ফলে আসক্তি হীনতাই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ। গীতা ১৮শ ১১শ্লোঃ বলিয়াছেন, "নহি দেহভৃতাশক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্য ভিধীয়তে॥" দেহাভিমানী জীব নিঃশেষ রূপে কর্ম্মত্যাগে কিছুতেই সক্ষম হয় না। যে কর্ম্মফলাশক্তি ত্যাগ করে সেই ত্যাগী পদ বাচ্য। পাণ্ডব ত্রিগুণময়-রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া অদ্য সর্ব্বপ্রকারে গুণাতীত ভক্তিরাজ্যে উত্থিত হইলেন। গীতায় গুণাতীতের কর্ম্ম নির্দ্দেশে যে বলিয়াছেন, আমায় যে অব্যভিচারী ভক্তিপথে সেবা করিতেছে, জানিবে সে গুণের সমতার অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইয়া গিয়াছে, পাণ্ডব সেই অবস্থায় উত্থিত হইলেন। যথা—মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ গীঃ ১৪শ ২৬ শ্লোঃ॥ তখন এই অবস্থাস্থিত জীবের কর্ম্ম অশ্বমেধ-পর্ব্বে শ্রবণ করিবে।

ভক্ত—বৎস, অদ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল নিহত হইলেও যেমন ধৃতরাষ্ট্র

পাণ্ডবগণকে, পূর্ণস্নেহে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, এই সময়ও ভীমসেনকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন, সত্যই এই জীবাত্মা জীবত্বের উপর আর কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেনা, বিষয়-রাজ্যের উপরে তাহার আস্বাদনের অধিকারই নাই। সে শেষদিন পর্য্যন্ত জীবকে স্ব-যোনী অর্থাৎ স্বজাতীয়-স্বভাব জাগরণের চেষ্টাই করিয়া থাকে: সর্ব্বদাই ব্রহ্মযোগরূপ ভীমসেনকে বধের জন্য তাহার চেষ্টা থাকে, তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের ভীমবধ চেষ্টা দ্বারা বর্ণিত হইল। এখন ধর্ম্মরাজের অনুশোচনার বিকল্পনাশ তত্ত্ব শ্রবণকর।

ধর্ম্মরাজ ব্যাস আদি বহু মহর্ষির নিকট উপদেশ লাভ ও বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং আত্মজ্ঞান জাগরণের জন্য বহু তপস্যা ও যোগাদি করিয়াছিলেন। তাহাকে নূতনতত্ত্ব শ্রবণ করাইতে পারেন এমন লোক বোধ হয় জগতেই ছিল না। তবু আবার শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের নিকট নিয়া উপদেশ শ্রবণ করাইলে, ধর্ম্মরাজের প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, এই টুকুর রহস্য প্রথমে শ্রবণ কর। বৎস, যতই কেন উপদেশ শ্রবণ, বেদাদি অধ্যয়ন ও সাধন ভজন না কর, সেই সব উপদেশ আত্মাতে যথার্থ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত, অবিদ্যার সন্দেহ কিছুতেই নষ্ট হইবে না; তাহাই অন্তর্য্যামী গুরুর জাগরণ। অদ্য কাম ক্রোধাদি সমস্ত প্রবৃত্তি ও দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া আত্মায় যুক্ত হওয়াই, মন শান্ত-অবস্থা লাভ করিয়াছে। এই অবস্থায় মন হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব সমূহের স্ফুরণ হওয়াই, আবার ভীষ্মদেবের মুখে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ। অদ্য মনরূপী অন্তর্য্যামী-গুরু ধর্ম্মরাজের সমস্ত সন্দেহের নাশ করিয়া দিলেন। এইজন্যই বুঝি গীতায় বিভূতি যোগে বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়াণং মনশ্চাস্মি।" ভক্তগণের নিকট পরমব্রহ্ম ভগবানরূপে জ্ঞান দান করেন, আর জ্ঞানীদের নিকটে তিনিই মন হইতে

আত্মজ্ঞানরূপে জাগ্রত হইয়া উঠেন। তাই অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞান দান করিয়া, ধর্ম্মরাজকে ভীষ্মদেব দ্বারা জ্ঞানদান করিলেন। এই অন্তর্য্যামী গুরুরূপী-আত্মা হইতে আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি প্রকাশ বিনা, শাস্ত্রাধ্যয়ন বা তপস্যা কিছুতেই অভ্রান্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তাই এই ধর্ম্মরাজের সন্দেহ নাশমাত্র ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক তাড়িত আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বিদুর আবার ফিরিয়া আসিলেন। রাজাপাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যদান করিয়া বনে যাইবার সময়, তাহাকে যেই মন্ত্রী, কর্ম্ম সেনাপতি ও রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কথামতে চলিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য আবার সেই মন্ত্রী আত্মজ্ঞানরূপ বিদুর, কর্ম্ম সেনাপতি দয়ারূপ কৃপাচার্য্য ও রক্ষক ভীষ্মরূপ নিবৃত্তমন কুরুরাজ্যের কর্ত্তা হইলেন। তাই আবার সেই পাণ্ডুর রাজত্বের মত রাজ্য অসুরত্ব শূন্য হইয়া মধুর লীলার আবাস হইল। এখন উপদেশ দিতে দিতে ভীষ্মদেবের নির্ব্বাণ রহস্য শ্রবণ কর।

শান্ত-অবস্থায় মনকে ব্রহ্মজ্ঞানী ও ভক্ত-সঙ্গে, সর্ব্বদা ভগবৎ-প্রসঙ্গে রাখিতে পারিলেই, মন বিষয়-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ব্রহ্ম-রাজ্যে উঠিতে উঠিতে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান না থাকায়, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্পের পূর্ণরূপে নাশ পায়, ইহাই মনের ব্রহ্মে লয় হওয়া বা ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মভক্তি লাভকরা। এই জন্যই আজ ধর্ম্মরাজের শান্ত-অবস্থা প্রাপ্ত মনকে, ব্রহ্ম-রাজ্যের ঋষিগণ দ্বারা বেষ্টন করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা পূর্ণরূপে বিষয়-রাজ্য হইতে তুলিয়া লইলেন। দৃষ্টি ব্রহ্মের রূপে, চিত্ত ব্রহ্মের তত্ত্বে ও বাণী ব্রহ্মগুণগানে ডুবিয়া গেল, বিষয়জ্ঞান ও গুণাবরণের নাশ হইল। এতদিনে পূর্ণরূপে গীত-ধর্ম্মের অধিকারী হওয়ায়, পাণ্ডব গৃহী হইয়াও আজ সন্ন্যাসী হইল, কর্ম্মী হইয়াও কর্ম্মহীন হইল, সম্রাটের সম্পদ গ্রহণ করিয়াও সর্ব্বত্যাগী হইল, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নর বধ করিয়াও অহিংসক হইল, রাজভোগী

হইয়া ঋষি হইল, বিষয় সংস্রবে থাকিয়া ব্রহ্মপদ লাভের অধিকার পাইল। এখন গীতা-ধর্ম্মের পূর্ণ-আদর্শ পাণ্ডবের জীবন্মুক্তলীলা **অশ্বমেধ-পর্ব্বে** দর্শন করিবে।

ধর্ম্মসাধন দুই প্রকার, একটী জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সহায়তায় প্রবৃত্তি মার্জ্জনার জন্য, শাস্ত্রানুশাসনে চলা। দ্বিতীয় ও বিশ্বাসীর আত্ম ভক্তিলোক নিজ-ভগবানে সহিত সমর্পণ করা। ভগবানে আত্মসমর্পণরূপ মোক্ষধর্ম্মের উপদেশই **শান্তিপর্ব্ব**, আর প্রবৃত্তিমার্জ্জনারূপ গৌণ-ধর্ম্মের উপদেশই **অনুশাসন পর্ব্ব**। আজকাল এই দুই পর্ব্বের পার্থক্য প্রায় নষ্ট হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, তাই এই দুই পর্ব্বের শ্লোকসংখ্যা গ্রন্থের লিখার সঙ্গে মিলেনা।

যুদ্ধপর্ব্ব সমাপ্তম্।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

পরিচয়।

গুণাতীত কর্ম্ম-সংবাদ।

সত্ত্বগুণময় ও গুণাতীত কর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শন জন্যই বুঝি এই অশ্বমেধ-পর্ব্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আদি-পর্ব্বে পাণ্ডবের জন্মের পর হইতে জতুগৃহ দাহ পর্য্যন্ত তামস-রাজ্য ও সভাপর্ব্ব হইতে অনুশাসনপর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজসরাজ্য, এইবার অশ্বমেধ-পর্ব্বে সাত্ত্বিক ও গুণাতীত-রাজ্যের কর্ম্ম প্রদর্শন করা হইবে।

সত্ত্বগুণীয় লীলা—পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্বরোধকারী পরমধার্ম্মিক, ভগবৎভক্ত রাজা শিবি, নীলধ্বজ, প্রবীর, সুধন্বা, বভ্রুবাহন ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিকামী অনুশাসনধর্ম্মা সত্ত্বগুণাশ্রয়ীর মধুর লীলা দেখাইয়াছেন। অনুশাসন পর্ব্বের দৃষ্টান্ত।

গুণাতীত লীলা—ঐ সব লীলাকে বিজয় করিয়া পাণ্ডবের গুণাতীত শান্তিধর্ম্মা লীলার মহিমা প্রকাশ করা হইয়াছে। শান্তি-পর্ব্বের দৃষ্টান্ত। নানারূপ মধুর সাত্ত্বিক ভাবও পাণ্ডবের কর্ম্মশক্তিরূপ অশ্বকে ধরিয়া রাখিয়া যজ্ঞ হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না। এই সকল আবরণ হইতেও কর্ম্মশক্তিরূপ অশ্বকে বাহির করিয়া নিয়া পাণ্ডব তাহাকে বধ করতঃ

জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ভগবান উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পন্ন করিল। ভগবৎ-ভক্তি ও সেবা বিনা অন্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ত্রিলোক সম্রাট, কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়, তিনবার দিগবিজয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজা যুধিষ্ঠির, ভগবৎভক্ত মেথরের পদে নত হইতে কুণ্ঠিত হইল না; সেই ভক্তের সেবা ও সম্মানকে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিলেন। তাই সত্যই পাণ্ডবের কর্ম্মশক্তিরূপ অশ্ব ভস্ম হইয়া যজ্ঞ পূর্ণ হইল, অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া গেল।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

গুণাতীত কর্ম্মসংবাদ।

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুষ্করং ভবেৎ।
বিস্মৃতিঞ্চ স্মৃতি যাতি শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে॥

লীলা—পাণ্ডব আবার রাজ্য-শাসন কর্ম্মে ব্রতী হইয়া, অনুশাসন-পর্ব্বের ভীষ্মদেবের উপদেশ মতে, কর্ম্ম আচরণে চেষ্টিত হইলেন। তাই প্রথমেই নিজেরাও যে যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ, গুরুবধ, ব্রাহ্মণবধ আদি করিয়াছেন তাহার দোষ নাশের জন্য, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। রাজা যদি শাস্ত্রবিধি রক্ষা না করেন, প্রজা তাহা পালন করিবে কেন? মহাভারতে একটী অশ্বমেধের কথাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু পুরাণান্তরে ও শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটী অশ্বমেধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনামতে এই পর্ব্বের সমস্ত শ্লোক পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ঐ দুই বারের কথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঋষিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ জন্য সুলক্ষণ অশ্বকে পূজা করিয়া, অর্জ্জুনকে সৈন্যবল সহ অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করতঃ অশ্বকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ জন্য ছাড়িয়া দিলেন। এই অশ্ব ঘুরিতে ঘুরিতে যেই দিন নিজেই পুনঃ এই রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবে, সেই দিন তাহাকে বলি দিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিতে হইবে। ধর্ম্মরাজ অশ্বের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় দ্রৌপদীদেবী সহ সস্ত্রীক ব্রত ধারণ করিলেন। ভীমসেন কনিষ্ঠদ্বয়কে লইয়া রাজ্য রক্ষা ও দাদার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন কর্ণপুত্র বৃষকেতু ও ঘটোৎকচ-পুত্র মেঘবর্ণকে অনুবল করিয়া, অশ্বের গতি-বিঘ্ন নাশ করিতে চলিলেন।

পাণ্ডবের মিত্ররাজাগণ, কেহই অশ্বের গতিরোধ করিলেন না। কিন্তু রাজা শিবি, নীলধ্বজ, হংসধ্বজাদি কতিপয় ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় রাজা, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মরক্ষার জন্য অশ্বের গতিরোধ করিয়া, অর্জ্জুনের সহিত দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই সব যুদ্ধে অর্জ্জুনের সেই অজেয় ভীষ্মদ্রোণ-জয়া শক্তিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণকে সারথী করিয়াও তাঁহার মন্ত্রণামতে চলিয়া সেই সব রাজগণকে বিজয় করিতে সক্ষম হন। এইরূপে কোথায়ও নিজের বলে, কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় যুদ্ধ জয় করিয়া, অর্জ্জুন অশ্বকে মুক্ত করিয়া চলিতে চলিতে, অশ্ব আবার হস্তিনায় প্রবেশ করিল। তখন মহর্ষিগণ দ্বারা বেদবিহিত পূজাদি করিয়া, সেই অশ্বকে বলিদান করতঃ মাংসদ্বারা ভগবানের তৃপ্তি উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। ফলে সন্দিগ্ধ হইয়া, ক্রমে তৃতীয় বারের যজ্ঞান্তে ভগবানের যথার্থই প্রাপ্তিলাভ হইয়াছে ও তাহারাও

কর্ম্মাপরাধ মুক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া, ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন ও প্রজাপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

তত্ত্ব—পুরাণাদিতে শ্রবণ করা যায়, দেবরাজ ইন্দ্রদেব বৃত্তাসুরকে যুদ্ধে বধ করিয়াও, ব্রহ্মহত্যা পাতক নাশের জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন। চন্দ্র ও স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা পাপ মোচন করিয়াছেন। এখন এই কর্ম্ম জন্য পাপদোষ বা কর্ম্ম-বন্ধন নাশক যজ্ঞ-রহস্য শ্রবণ কর। দেবগণ অশরীরী, ভূতাত্মক জড়দেহ তাহাদের নাই। তাহাদের কৃত অশ্বমেধ-যজ্ঞ যে এই জীব-অশ্ব দ্বারা যজ্ঞ মাত্র নয়, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পার। জীবরাজ্যে ক্ষত্রিয় রাজগণ অশ্রু পশু-অশ্ব দ্বারাই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাই তাহারা বহুবার যজ্ঞ করিয়াও দেবতাদের মত পাপহীন হইতে পারেন নাই। তাহারা আরও অশ্বহত্যা ও দিগ-বিজয়ের নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-পরিচালিত পাণ্ডব দেবতাদের মতই প্রকৃত অশরীরী অশ্বকেও পশু-অশ্বের সহিত ভস্ম করিয়া, এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতঃ পাপশূন্য হইয়াছিলেন। পাণ্ডবের এই অশ্ব ভস্ম না হইলে, যে তাহারা শুদ্ধলোকে যাইবার উপযুক্তই হইতেন না, কর্ম্মবন্ধনের ফাঁসও ছিন্ন হইত না। এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ, কর্ম্ম শক্তিকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করা।

পূর্ব্বে বিরাট-পর্ব্বে, জীবকে কর্ম্মরাজ্যে সুখে দ্রুত-বিচরণ করায়, এমন কর্ম্মশক্তিগুলিকেই জীবের অশ্বসম্পদ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শক্তিগুলি ভারবাহী পশুরমতই জীবের জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হয়। এই শক্তিকে ইচ্ছামতে চড়িতে ছাড়িয়া দিয়া, ভগবংভক্তিকে তাহার রক্ষক নিযুক্ত করিবে। তখন তামস, রাজস, সাত্ত্বিক প্রকৃতির বহু বহু পৃথকসত্তা সেই কর্ম্মশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, তাহাদের ইচ্ছামত কর্ম্ম করাইতে চেষ্টা করিবে, কিছুতেই এই অশ্বকে কোথাও বদ্ধ হইতে দিতে নাই। কর্ম্মশক্তি যেন কোন

গুণাবন্বিত না হইয়া কর্ম্ম করিয়া যায়, সেইরূপে চালাইতে হইবে। হয়ত সাত্বিক-রাজ্যের কোনও সুন্দরসত্তা, তাহার অপূর্ব্ব কর্ম্ম-সৌন্দর্য্যে ভক্তিকে অভিভূত করিয়া অশ্ব আটকাইয়া ফেলিবে, হয়ত তখন জীব-শক্তিতে অশ্বের উদ্ধার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। ভয় কি? নিজের দর্প ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণ লইও, তিনি নিজে আসিয়া অশ্ব মুক্ত করিয়া দিবেন, এই জয় বিজয়ের অহঙ্কারের বা সুখ দুঃখের দাঁগ যেন হৃদয়ে না লাগে। এইরূপে কর্ম্ম-শক্তিকে ত্রিলোক ঘুড়াইয়া আনিয়া ভগবান উদ্দেশে বলিদান করিবে; অশ্বকে জ্ঞানাগ্নিতে একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। তখন কর্ম্মশক্তি দ্বারা-কৃত শুভাশুভ কর্ম্মফলে জীবের আর বন্ধনের ভয় থাকিবে না। দেবরাজের মত ব্রহ্মবধ ও চন্দ্রের মত অগম্যাগমনেও তখন কর্ম্মজন্য পাপ আর থাকিবে না। পাণ্ডবের অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ করণ দ্বারাই এখন এই অশ্বমেধ-যজ্ঞ রহস্য শ্রবণ কর।

লীলা—পাণ্ডবের প্রথমকার যজ্ঞ শেষ হইলে, অর্দ্ধস্বর্ণবর্ণ একটী নকুল আসিয়া যজ্ঞকুণ্ডে গড়াগড়ি দিয়া বলিল, "ধর্ম্মরাজ! এক ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত এক অঞ্জলী শক্তু (ছাতু) দান করিয়া ভগবানকে যেরূপ তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, তোমার যজ্ঞ যে তাহার তুল্যও হয় নাই! সেই শুক্তু অবশেষে গড়ি দিয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গ স্বর্ণ হইয়াছিল। এই যজ্ঞে গড়ি দিয়া এক গাছালোমও যে স্বর্ণ হইল না।" ভক্তিদত্ত এক অঞ্জলী শক্তুদানে ভগবান যেমন তুষ্ট হইয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজের পৃথিবী লুণ্ঠিত অর্থ দানাদি, শ্রেষ্ট ঋষিগণ দ্বারা বহু দিন ব্যাপী বেদাদি অধ্যয়ন ও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান দ্বারাও ভগবানের তেমন তুষ্টি হয় নাই; এই কথা শুনিয়াও কিন্তু এইবার ধর্ম্মরাজের চৈতন্য হইল না, মনে করিলেন যজ্ঞে কোনও ত্রুটী হইয়াছে, তাই আবার যজ্ঞায়োজন করিলেন। দ্বিতীয় বারও তেমন ত্রুটী বোধ করিয়া, তৃতীয় বার বহু সাবধানতা লইয়া যজ্ঞারম্ভ

করিলেন। এইবার যজ্ঞ পূর্ণ হইলে, কি লক্ষণ প্রকাশিত হইবে, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জানিয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "তাহা হইলে যজ্ঞান্তে যজ্ঞ নিকট রক্ষিত, আমার পাঞ্চজন্যশঙ্খ আপনিই বাজিয়া উঠিবে।" তৃতীয় বার যজ্ঞের শেষ-আহুতিতেও যখন শঙ্খ বাজিয়া উঠিল না, ধর্ম্মরাজ বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আপনার যজ্ঞে কোনও অনুষ্ঠানেরই ক্রটী হয় নাই, তবে কি না, যজ্ঞের একটী প্রধান অঙ্গই বাকী রহিয়া গিয়াছে, তাই শঙ্খ বাজিতেছে না। আমার নিষ্কিঞ্চণ একান্ত-ভক্তের পূজা হয় নাই।" যত্রয়াজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত পারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিষৎ কোট্যাদ্বিষ্ণু-ভক্ত্যা বিশিষ্যতে॥ বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে। একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পমরং পদং॥ (গারুড়ে) সহস্র যজ্ঞকারী হইতে সর্ব্ববেদান্ত পারগশ্রেষ্ঠ। কোটী বেদান্তবিদ হইতে বিষ্ণুতে ভক্তিযুক্ত শ্রেষ্ঠ, তেমন বৈষ্ণব সহস্র হইতেও একান্ত-ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই একান্ত-ভক্তি ভাবযুক্ত পুরুষ পরম-পদ লাভ করেন।" ধর্ম্মরাজ বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তেমন লোক আমি কোথায় পাইব বলিয়া দেও, তাহাকে পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি; আমাদের যজ্ঞও পূর্ণ হউক।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তেমন ভক্ত নিকটেই একজন আছেন বটে, কিন্তু সে যে জাতিতে অতিহীন, ঝাড়ুদার (ভূইমালী) মেথর শ্রেণীর অতি মূর্খ ও দরিদ্র লোক। আপনি পৃথিবীর সম্রাট, তাতে সর্ব্বপৃথিবী বিজয় করিয়া তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞকারী চন্দ্রবংশীয় মহামানী ক্ষত্রিয় রাজা, আপনি কি করিয়া তাহার পূজা করিবেন মহারাজ?" ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "একি বলিতেছ শ্রীকৃষ্ণ? যে তোমাতে একান্ত-ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেও আবার হীন! তাঁর আবার জাতি বুদ্ধি! জগতে উচ্চ-বংশে জন্ম, ধর্ম্মসাধন ও মহৎকর্ম্মের প্রয়োজনই যে তোমায় প্রতি

একান্তভক্তি লাভের জন্য! তাহাই যাঁহার লাভ হইয়াছে, সে কি আর জীব আছে? সে যে এই দেহেই দেবতা হইয়া গিয়াছে। আমার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচারে পূজা, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের যজ্ঞাহুতি ও বেদস্তুতিতেও ভগবানের যত তৃপ্তি না হয়, যাঁর পূজায় ভগবানের সেই প্রীতি ও তৃপ্তি হইবে, তাঁহাকেও আমি হীন, দরিদ্র, মূর্খ বলিয়া পূজা করিতে বিরত হইব? ভগবানের না নিজের মুখের বাণী, 'নমেপ্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথাহ্যহং॥' অভক্ত চতুর্ব্বেদী হইতেও ভক্ত স্বপচ চণ্ডাল আমার প্রিয়। তাঁকেই দান করিবে, তাঁহাকে গ্রহণ করিবে ও তাঁহাকেই আমার মত পূজা করিবে। শীঘ্র বল, সেই ভাগ্যবান একান্ত-ভক্ত কোন মহাপুরুষ?" শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ঝারুদার রুইদাসকে দেখাইয়া দিলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ ভ্রাতাদিগকে লইয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ভক্ত ভুইমালী মহাত্রস্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, ধর্ম্মরাজ তাহাকে আদরে তুলিয়া বসাইলেন ও তাঁহাকে সসম্মানে রাজপুরীতে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সেই ভক্ত বলিল, "মহারাজ আমাকে ক্ষমা করিবেন! আমার প্রতি গুরুর আদেশ আছে, যে কোটী কোটী তীর্থ ও শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছে, তুমি তাঁহার বাটীতে মাত্র ভোজন করিবে। আপনি যদি তাহা করিয়া থাকেন বলুন, তবে ভোজন করিতে পারি?" ধর্ম্মরাজ নিরুত্তর হইয়া ভ্রাতাগণ সহ বিরস বদনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দ্রৌপদীদেবী সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন! "ধর্ম্মরাজ" আপনি ঠকিয়া আসিয়াছেন। আমি এই ভক্তকে আনিতে পারিব, আমায় লইয়া চলুন।" আবার পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীদেবীর সহিত সেই ভক্তের নিকট উপস্থিত হইলেন ও দ্রৌপদীদেবী ভক্তবরকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রণাম করতঃ জোড় হস্তে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভক্তও তাঁহার

বাধার কথা জ্ঞাপন করিলেন। অমনি দ্রৌপদীদেবী বলিলেন, "আমি কোটী কোটী তীর্থ ও শত শত অশ্বমেধ করিয়াছি, আপনি আমার গৃহে ভোজন করিতে পারেন।" ধর্ম্মরাজ এই বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দ্রৌপদী, তুমি কোটী কোটী তীর্থ ও শত শত অশ্বমেধ কখন করিলে?" দ্রৌপদীদেবী বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে, ভগবৎভক্ত দর্শনে কেহ রিক্তপদে গমন করিলে, তাঁহাকে রিক্তপদে প্রদক্ষিণ করিলে, প্রতি পদক্ষেপে কোটী কোটী তীর্থ ও শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হয়। আমি এই ভক্তকে রিক্তপদে দেখিতে আসিয়াছি প্রদক্ষিণ করিয়াছি, তাই সেই তীর্থ ও অশ্বমেধ করা হইয়াছে।" ধর্ম্মরাজেরও সেই শাস্ত্র বচন মনে হইল। তখন পঞ্চপাণ্ডব আনন্দে ভক্তবরকে সত্যই বিষ্ণুর মত সম্বর্দ্ধনা করিয়া গৃহে লইয়া চলিলেন। ভীমসেন কোলে লইলেন, অর্জ্জুন ছত্র ধরিলেন, নকুল সহদেব চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ তাহার অগ্রে অগ্রে পথ ঝাট দিয়া চলিলেন, দ্রৌপদী লাজবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল, নারীগণ জয়কার দিয়া ভক্তকে দেবতা ও পরম বান্ধবের মত রাজপুরে নিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। অমনি পাঞ্চজন্য-শঙ্খ আপনিই মঙ্গলরবে বাজিয়া উঠিল, পাণ্ডবের অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রয়োজন শেষ হইল। পাণ্ডব কর্ম্মজন্য পাপ-বন্ধন মুক্ত হইয়া ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিল। এই তত্ত্বই প্রথম-যজ্ঞে নকুল ইঙ্গিত করিয়াছিল, সেইকালে পাণ্ডব তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এই ভক্তসেবার কথা এইরূপ ভাবে জৈমিনী ভারতে বর্ণিত আছে, কিন্তু ভক্তমালে একটু অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হয়ত কল্পভেদে লীলার কোনও অংশ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু মূলতঃ পাণ্ডব ভক্তের সম্মান ও পূজা করিয়াই অশ্বমেধ-যজ্ঞের পূর্ণফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর মত বিরোধ নাই।

তত্ত্ব—এই লীলাদ্বারা অশ্বমেধের প্রতিপাদ্য সাধন বুঝিলে কি? মানবের কর্ম্মশক্তির সার্থকতা, যখন নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন না হইয়া, ভগবানের সেবা, প্রীতি লাভের মধ্যে পর্য্যবসিত হইবে। ভগবানের প্রীতি হইবে এই কথা শুনিয়াই যখন, এই পাণ্ডবদের মত জাত্যভিমান, পদগৌরবাদি সর্ব্বাভিমান পদদলিত করিয়াও, ভগবৎভক্ত হীনকুলজাত, দীন, দরিদ্র, মূর্খ হীনবেশ কুৎসিৎকেও দেবতার মত পূজা ও বান্ধবের মত আদর যত্ন সম্মানাদি করিতে পারিবে, যখন ভগবানের তৃপ্তিজন্য ত্রিজগতের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অশ্বমেধের চেষ্টায়ও ভীত নয়, আবার দীনহীন কুৎসিত মূর্খকে পূজা করিতেও কুণ্ঠিত নয়, ভগবৎ তৃপ্তি ধরিয়া যখন কর্ম্মের মহত্ব ও হীনতার নির্ব্বাচন আসিবে, কর্ম্মশক্তি দ্বারা ভগবান তোষণেই নিজের জীবনের লক্ষ্য ও কর্ম্মশক্তির সার্থকতা নিশ্চয় হইবে, তখনই অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হইবে। তখন কর্ম্মশক্তিরূপ অশ্ব বধ হইয়া তাহার মাংসও যজ্ঞাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যাইবে; কর্ম্ম জন্য পাপপুণ্য, সুখ, দুঃখ বোধও নষ্ট হইবে। তখনই জীব একান্ত বিকল্পহীন ভক্তি লাভ করিবে। তখনই ত্রিলোকের সম্রাট্ পদ, উচ্চবংশে জন্ম হইতেও ভগবদ্ভক্তপদকে মহৎ মনে করিবে। জগতের সমস্ত ধনসম্পদের কৃত বিরাট মহাযজ্ঞ হইতেও তখন ভগবদ্ভক্তি ও পূজাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিবে। আমিত্বহীন গুণাতীত পাণ্ডব অন্য সত্যই ঐ অবস্থায় উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা এইরূপ লীলা করিয়া, অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনবার পৃথিবী বিজয়, অসম্ভব ধনরত্ন বিতরণ, সহস্র সহস্র ঋষিদ্বারা বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ করাইয়াও তাহারা কর্ম্মাভিমানী হইলেন না। তাই এই যজ্ঞের পর হইতেই অতি-দ্রুত তাহাদের কর্ম্মরাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল ও পাণ্ডব মহাপ্রস্থানের অধিকার লাভ করিলেন। এইরূপ গুণাতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া পাণ্ডব ত্রয়োদশবর্ষ নানা মধুর-লীলা করিয়াছিলেন।

শিষ্য—প্রভু! অশ্বমেধ-পর্ব্বে রাজাশিবি, নীলধ্বজ, হংসধ্বজ, সুধন্বা, সুরথ প্রবীর আদি রাজা ও রাজপুত্রগণ মহাবীর ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ইহারা যুদ্ধে সেই অজেয়-বীর অর্জ্জুনকে পর্য্যন্ত পরাজিত করেন। অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে কুট-যুদ্ধে এই সমস্তকে পরাজিত ও বধ করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিয়া কি প্রতিপাদন করিলেন প্রভো! আমাদের চক্ষে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেন পাণ্ডবের প্রতি পক্ষপাত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

গুরু—সাধারণ জ্ঞানে তাহা ত হইবেই বাবা! এই রাজাগণ পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন, তাই ইহাদের প্রত্যেকেরই মহৎ ও মধুর জীবন, প্রত্যেকেই অতি ধার্ম্মিক, সদাচারী, কৃপালু সত্য-পথী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু জীবের যে এই সত্ত্বগুণেরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই সত্ত্ব-গুণের লীলাও যে কর্ম্মবন্ধন, স্বর্গাদি দান করে। তাই গুণাতীত-পাণ্ডব দ্বারা ইহাদিগকে নষ্ট করা হইয়াছে। কেহই জীবত্ব-শক্তি দ্বারা সত্ত্বগুণের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না! ভগবদ্ভক্তিতে, ভগবানের কৃপাসহায়তায় এই সত্ত্বগুণের মোহও নষ্ট করিতে পারা যায়, তাই অর্জ্জুনও ইহাদের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ সহায়তায় অশ্ব উদ্ধার করিলেন। সত্ত্বগুণের মোহ হইতেও কর্ম্মশক্তিকে উদ্ধার করিয়া নিয়া, পরে ভগবৎ তৃপ্তিজন্য তাহাকে বলি দিতে পারিলে ভগবান লাভ হয়।

বৎস, গীতায় যে ভগবান বলিয়াছেন, 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ,' এইধর্ম্ম আশ্রয়ই সত্ত্বগুণীয় ধর্ম্ম, আর 'সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' এইধর্ম্ম আশ্রয়ই গুণাতীত ধর্ম্ম। তাই শিবি ও সুধন্বাদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম রক্ষা জন্য, প্রাণের মত প্রিয় পরমধার্ম্মিক ও শ্রীকৃষ্ণদাস পাণ্ডবের সঙ্গেও যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন। "কি জানি, স্বধর্ম্ম ত্যাগে বা শ্রীকৃষ্ণ রুষ্ট হন! যুদ্ধে না হয় মরিব, তবুত তাহার কৃপার যোগ্য থাকিয়া তাঁহার দাসের হাতে মরিব। স্বধর্ম্ম রক্ষা না করিয়া তাহার কৃপা ও

দর্শনের অযোগ্য হইয়া বাচিয়া কি ফল!” এই ভাব লইয়া তাহারা পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে বধ করিয়া সত্ত্বগুণীয় সাধনার প্রাপ্য ফল—পরকালে স্বর্গাদি দান করিয়াছিলেন। এই ফল দান না করিলে কি তাঁহার উচিত কর্ম্ম হইত! বৎস, যাদবগণ কি ধার্ম্মিক ছিলেন না! তাঁহারাত অশ্ব ধরিলেন না! কেন ধরিলেন না? তাহাদেরই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, তাহাদেরই শ্রীকৃষ্ণের দাস যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছে, তাঁহারা তাহাতে বাধা দিবেন কেন? কিন্তু এই রাজাগণ সেই ভাব আনিতে পারেন নাই, কেননা তাহারা সত্ত্বগুণময়, স্বধর্ম্মের উপরে তাহারা বুঝেন না। পাণ্ডব যে গুণাতীত হইয়া তাহারও উর্দ্ধে উঠিয়া ছিলেন, বৈষ্ণব সেবায় তাহার প্রমান দেখিয়াছেন। পাণ্ডব সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়া ছিলেন বলিয়া, তাহারা সত্ত্বগুণীয় রাজাদিগকেও বিজয় করিয়াছিলেন।

বৎস, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে পাণ্ডব যেমন আত্মীয় স্বজন সমস্তকে নিহত দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, আবার কি লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব! অনেক মানবও মনে করে যে, রজঃ ও তমঃগুণীয় প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট হইলে জীব কি লইয়া কর্ম্ম করিবে; ইহারা গেলে যে জীবের কর্ম্ম লীলাই শেষ হইয়া যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রকুল ধ্বংস করিয়া, কর্ম্মসৌন্দর্য্যই বুঝি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, অর্জ্জুনও যুদ্ধারম্ভে বিষাদকালে যাহার আশঙ্কার কথাই বলিয়া ছিলেন, সেই সন্দেহ নাশ জন্য অশ্বমেধ-পর্ব্বে তমঃ ও রজোহীন শুধু সাত্ত্বিক কর্ম্মলীলার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অসুরকুল ধ্বংস করিয়া কেমন দেব-লীলা স্থাপন করিয়াছিলেন, তমো ও রজো গুণহীন শুধু সত্ত্বগুণীয় ও গুণাতীত-জীব কেমন মধুর লীলা করিতে পারেন, তাহাই এই অশ্বমেধ-পর্ব্বের লীলাগুলি দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের পুত্র হইয়াও মণিপুর রাজের দত্তক-পুত্র ছিলেন, তাই মণিপুর রাজের সম্মান

রক্ষার্থে পিতা অর্জ্জুনের সঙ্গেই তিনি যুদ্ধ করেন; প্রবীর মাতৃভক্তির জন্য মায়ের আদেশে যুদ্ধ করেন; সুধন্বা প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে তপ্তৈতেলে পড়েন; রাজা শিবী কপোত জন্য গাত্র মাংস দান করেন! এইরূপ কত মধুর লীলাই না সত্ত্বগুণীরা করিয়া থাকেন। কিন্তু এইসব কর্ম্ম-অহঙ্কারও নষ্ট করিতে হইবে, এই সব সাধনায়ও ভগবানকে লাভ করা যায় না। সব ছারিয়া, একমাত্র ভগবানের শরণ লইয়া তাঁহার সেবা কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলে, কর্ম্ম-রাজ্যের শেষ হইবে। এখন আশ্রমিক-পর্ব্বে ও মৌসল-পর্ব্বে মায়ার তিরোধান লীলা শ্রবণ কর।

অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত

আশ্রমিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব।

পরিচয়।

কর্ম্মমায়া সংহরণ ও মুক্তি-সংবাদ।

জীব একান্ত অর্থাৎ দ্বৈতহীন ভক্তিলাভ করিলেই যোগমায়া দেবী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যা মায়ার সংহরণ করেন।

প্রথমে অবিদ্যা-মায়া সংহরণ—একান্ত-ভক্তি জন্মিলেই জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের নাশ পায়, স্থূলদেহের জীবাত্মা, সূক্ষ্মদেহের জ্ঞানময় পুরুষও নষ্ট হইয়া, মাত্র কারণ দেহের পরমাত্মা অবশেষ থাকেন, গুণত্রয়ও চলিয়া যায়। এই তত্ত্বই অশ্বমেধ-যজ্ঞান্তে, সত্যবতী দেবী, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর সহিত বধূগণকে লইয়া বনে চলিয়া যাওয়া এবং তথায় যজ্ঞাগ্নিতে সকলের দেহত্যাগ করা। এইরূপে আশ্রমিক-পর্ব্বে যোগমায়া মায়ের অবিদ্যা-মায়া কুরুরাজ্যের মায়ার শেষ হইবে।

দ্বিতীয়ে বিদ্যামায়া সংহরণ—মায়ের বিদ্যামায়াই যদুরাজ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তখন জীবের সেই কর্ম্মও শেষ হইয়া যায়। তাহাই **মৌষল-পর্ব্বে** ব্রহ্মশাপছলে আত্মকলহে যদু-বংশের অন্তর্দ্ধান।

তৃতীয়ে ব্রহ্মের আহ্বান—বংশীনাদে গোপিনীগণের আত্মবিস্মরণের ন্যায়, তখন সর্ব্বমোহন ব্রহ্মের-আহ্বান আগমন করে ও জীবের সকল কর্ম্ম-ফাঁস আপনিই খসিয়া যায়, আর বিষয়-কর্ম্মের শক্তিই থাকে না! তাহাই **মহাপ্রস্থান-পর্ব্বে** শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পাণ্ডব রাজ্য ছাড়িয়া স্বর্গ উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

চতুর্থে মুক্তি-রাজ্যারোহণ—জগতে কাহারা মুক্তির অধিকারী, কোন সাধনার কোন ক্রটী স্বাভাবিক, কোন সাধনায় কোন ক্রটীর জন্য এইজন্মে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না, কাহারা এই দেহেই দেবত্ব লাভে সক্ষম, কেমন জ্ঞানে মুক্তির অধিকারী হয়, মুক্তি কত প্রকার, এইসব তত্ত্ব **স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে** পাণ্ডবের লীলার মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতে জীবত্ব হইতে দেবত্বলাভ পর্য্যন্তই বর্ণিত হইয়াছে, ভগবান লাভতত্ত্ব মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ ভাগবতের বর্ণিত বিষয়। জীবের সৃষ্টিরাজ্য হইতে পূর্ণ ব্রহ্মরাজ্যে গমন তাহাতেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

আশ্রমিক ও মৌষল-পর্ব্ব।

সৃষ্টিমায়া সংহরণ-সংবাদ।

কৃপাসুধা সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদাভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥

আশ্রমিক-পর্ব্ব লীলা—অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইয়া গেলে, ধৃতরাষ্ট্র আর সংসারে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বানপ্রস্থ গ্রহণে প্রস্তুত হইলে, তাঁহার মাতাগণও বধূগণও তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। তখন মাতা সত্যবতী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও তাহাদের মাতাগণ এবং কুন্তী, গান্ধারী আদি বধূগণ সহিত রাজপুরী ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। কতদিন পরে সংবাদ আসিল যে, যজ্ঞাগ্নিতে তাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, মাত্র বিদুর অবশেষ আছেন। এই সংবাদ পাইয়া পাণ্ডবগণ দ্রুত বনে উপস্থিত হইলে, মহাত্মা বিদুরও ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবগণ সকলের অন্ত্যেষ্টি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

তত্ত্ব—শিশুগণ যখন আর কিছুতেই খেলিতে স্বীকৃত না হইয়া, কেবল মায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন শিশুর ক্রীড়াদায়িনী-দাসীও ক্রীড়াত্যাগ করিয়া শিশুকে মায়ের নিকটই সমর্পণ করতঃ নিজে বিশ্রাম গ্রহণ করে। সেইরূপ অন্ত পাণ্ডবগণ জগতের সর্ব্বকর্ম্ম-কৃতিত্ব হইতেও ভগবৎ ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করিয়া, ভগবানে একান্তভক্তি লাভ করিলে, জীবকে ভগবান ভুলাইয়া কর্ম্মরতকারিণীসত্তা যোগমায়া-সত্যবতী,

অমনি তাঁহার সৃষ্টিমায়ার সংহরণ করতঃ, পাণ্ডবকে ভগবানে মিলাইয়া দিতে উদ্যতা হইলেন। তিনি পরমাত্মাকে আবরণ জন্য প্রথমই যে আবরণ দিয়াছিলেন, সেই তিন দেহকোষ, কারণদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূল-দেহের ভেদ নষ্ট করিয়া দিলেন, তাহাই পাণ্ডু, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র জননীর অন্তর্হিত হওয়া! পরে সৃষ্টিরাজ্যের কর্ম্মমায়ার মূল-সত্তা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের ভেদ নাশ হওয়াই, মাতা কুন্তী আদির তিরোধান। তখন এক আত্মারই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থাজন্য ত্রিবিধ অহঙ্কার জীবাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মার ভেদের নাশই, প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের নাশ, পরে বিদুরের নাশ হইয়া মাত্র পাণ্ডুসত্তা ধর্ম্মরাজের অবশেষ থাকা; জীবাত্মা আত্মায় ও আত্মা পরমাত্মায় লয় হইল। এই অবস্থা লাভ হইলে, সৃষ্টিরাজ্যের অবিদ্যা ও বিদ্যা অসুর ও দেবপ্রকৃতি উভয় মায়ারই নাশ হইয়া যায়। তাই যোগমায়া দেবীর অবিদ্যামায়া ধার্ত্তরাষ্ট্র কুলের মত, আবার বিদ্যামায়া যাদব-কুল ও অন্তর্হিত হইয়াগেল। তাহাই মৌষল-পর্ব্বে শ্রবণ কর।

মৌষল-পর্ব্ব লীলা—আশ্রমিক-পর্ব্বের দুর্ঘটনার সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মরাজ যদুরাজ্য হইতেও তেমনই দারুণ সংবাদ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের তিরোভাবরূপ দারুণ সংবাদ লইয়া অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং যদুবংশের শেষাবশেষ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ-পুত্র শিশু বজ্রাঙ্গ ও তাঁহার মাতা উষাদেবীকে ধর্ম্মরাজের করে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মশাপ মোচন উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে লইয়া প্রবাষতীর্থে সন্ত্যয়ণ জন্য গমন করিলে, যাদব কুমারগণ মদিরাপানে মত্ত হইয়া দারুণ আত্মকলহ আরম্ভ করেন। পরে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া সকলেই নিহত হইলেন। এই দারুণ সংবাদে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রোপদীদেবী বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেন তাহাদের প্রাণ-শক্তিই চলিয়াগেল।

গান্ধারী দেবী শত পুত্রশোকে ব্যাকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাৎ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "আপনি কেন অভিসম্পাৎ দিয়া নিজের তপস্যা নষ্ট করিতেছেন। আমার বংশের মৃত্যু আমি কি নির্দ্দেশ করিয়া রাখি নাই? ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে মৃত্যু হইতে শ্রেষ্ঠ ও শ্লাঘার মৃত্যু আর নাই! তবে আমা হইতে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়া কি যাদবগণ, সেই মৃত্যু হইতে বঞ্চিত হইবে? তাহাদিগকে যুদ্ধে বধ করিবার শক্তিও তাঁহারা বিনা ত এ জগতে আর কাহারও নাই! তাই তাহাদের হস্তেই তাহাদের মরিতে হইবে? ইহা যে পূর্ব্বেই স্থির হইয়া আছে?" অদ্য শ্রীকৃষ্ণের সেই ইচ্ছায়ই যাদবগণ প্রভাসতীর্থে যাইয়া অসংযত হইয়া মদিরাপান করতঃ জ্ঞান হারাইলেন ও পরস্পর কলহে মত্ত হইলেন। পরে অপর যাদবগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সন্তানগণ নিহত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকেই তাহারা আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। পরে বলদেব যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া সেইদেহেই অন্তর্হিত হইলেন। অর্থাৎ অন্য যাদবগণ, শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সন্তানে, সেই সন্তানগণ শ্রীকৃষ্ণ বলরামে, পরে বলরাম শ্রীকৃষ্ণে লয় হইলে তিনিও অন্তর্নিত হইলেন। এই দুইয়ের অন্তর্দ্ধান শুনিয়া তাঁহাদের মাতাপিতা ও উগ্রসেনাদি গুরুবর্গ তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের-পত্নীগণ মধ্যে প্রধানারা অন্তর্হিত হইলেন ও কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুন বজ্রকে ও তাহার মাতাকে লইয়া দ্বারকা পরিত্যাগ করা মাত্র, সাগর দ্বারকাপুরীকে জলপ্লাবিত করিয়া গ্রাস করিল। শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যই আবির্ভূত হইয়া লীলা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন জন্যই বুঝি তাঁহার বংশধর এক শিশু ও বধুকে অবশেষ রাখিয়া গিয়াছিলেন; তাই বুঝি তাহার পুরীর স্বর্ণচূড়া আজ পর্য্যন্তও সাগর মধ্যে দৃষ্ট হয়। সেই শিশুই অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্রাঙ্গদেব!

তত্ত্ব—বৎস! যোগমায়া দেবীর অবিদ্যারাজ্যই অসুরত্ব-ধার্ত্তরাষ্ট্রদের দল, আর বিদ্যামায়াই দেবত্ব-যাদবগণ। তাই গীতায় বলিয়াছেন, দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবী আসুর এব চ। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা॥ গীঃ ১৬শ-৬।৫ শ্লোঃ। এইলোকে (সৃষ্টিরাজ্যে) দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার স্বভাবের প্রাণীগণ আছে। ইহার দৈবী-স্বভাব মোক্ষের ও আসুর-স্বভাব বন্ধনের কারণ।" দৈবীপ্রকৃতি স্বাত্ত্বিক ও গুণাতীত আর আসুর-প্রকৃত্তি সাধারণতঃ রজঃ ও তমঃ গুণীয় হয়, তার উপরে কিছু সত্ত্বমিশ্রও হয়। ভগবৎ-ভক্তি না জন্মা পর্য্যন্ত আসুর-প্রকৃতির অধিকার নষ্ট হয় না, তাই বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন, দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তি পরো দৈব আসুর স্ত দ্বপর্য্যয়ঃ॥ (হরিভক্তি বিলাস ধৃত বচন।) বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি-পরই দৈব ও তার বিপরীতই আসুর। ভাগবতেও উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে নিষ্ঠাকেই সম বলিয়াছেন। তাই বলিলাম ধার্ত্তরাষ্ট্র-কুল অবিদ্যার আসুর-মায়া, আর যাদবকুলের ভাবই বিদ্যাময় দৈব-মায়া। খ্রীষ্ট ও ইস্লাম শাস্ত্রের সয়তানই অসুর এই স্বভাব। এই দৈব-রাজ্য আবার দ্বিবিধ,—একটী যোগমায়ার সৃষ্ট সত্ত্বগুণাত্মক, অন্যটা স্বয়ং ভগবানের সৃষ্ট গুণাতীত ব্রহ্মসত্তাত্মক। পূর্ব্বে যে সৌপ্তিকপর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের কর্ম্ম-কারক অহঙ্কারের মূলঃ—প্রথম কর্ম্মাভিমান, আমি করিতে পারি তাহা দেখাইতে কর্ম্মকরা, তাহাতেই ব্রহ্মের দৈবপ্রকৃতির সৃজন। দ্বিতীয়, ক্রোধা-দিতে অভিভূত হইয়া যে বৈকরিক-সৃজন তাহাই আসুর-প্রকৃতি সৃজন। তৃতীয়, কৃপা হইতে জগতের বা কাহারও দুঃখাদিতে কাতর হইয়া, দুঃখনাশ জন্য নিজ প্রকৃতিবর্গ লইয়া স্বয়ং ব্রহ্মসত্তার বিকাশই ব্রহ্মসত্তাসম্পন্ন অবতারাদির সৃজন। জীব যখন বেদোক্ত সাধনাদি দ্বারা সর্ব্বদেব তোষণ করিয়া সৃষ্টরাজ্যের অজেয়ত্ব ও অবধ্যত্ব বর চাহিয়া বসিয়াছে, তখন তাহার বধের

জন্যই নূতন ব্রহ্মসত্তার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপে কৃপা আশ্রয়ে পরমব্রহ্ম জীবের দুঃখ ও পাপতাপ নাশের শক্তি লইয়া দৈবপ্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হওয়াই, যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ বলরামরূপে বংশবিস্তার করিয়া যাদবরাজ্যে লীলা-করা। গুণত্রয় ও অবিদ্যাযোগে যখন যখন কোটী কোটী অসুরত্বের সৃজন করিয়া, অসুর-স্বভাব সয়তান জগত হইতে বিদ্যাময় দৈব-প্রকৃতিকে একেবারে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হয়, দৈব-পন্থী ধার্ম্মিক দিগকে পীড়ন আরম্ভ করে, তখনই পরিত্রাণায় "সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতির বিনাশ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য, ভগবান দেবপ্রকৃতির মধ্যে অবতীর্ণ হন। সেই কোটী কোটী অসুরত্ব নাশের জন্য, তখন ভগবান্‌ও কোটী কোটী দেব-সত্তা লইয়া, কৃপাকরিয়া জীবকে অবিদ্যা মার্জ্জনা শিক্ষা দিতে, নিজে আসিয়া লীলা করতঃ সমস্ত শিক্ষা দান করেন ও অসুর-জীব ও অসুর ভাবকে নষ্ট করেন। তাই যদুবংশে দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, কুন্তি, চেদি আদি নানা বিভেদ দর্শন করিবে। ইহারা কেহ মাত্র তমোগুণ নাশক, কেহ রাজোগুণ, কেহ মিশ্রগুণ, কেহ সত্বগুণ নাশক প্রবৃত্তি। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের বংশই সাত্বত অর্থাৎ গুণাতীত ভগবৎ সত্তা। তাই তাহাদের দ্বারা অন্য সমস্ত যাদবকুল সংহরণ করিয়া, শেষে তাহাদিগকেও নিজেদের মধ্যে লয় করতঃ এই রাজ্যের লয় করিয়া দিলেন, কেননা তখন জগতে ইহাদের কার্য্য শেষ হইয়া ছিল। এখন জীবের কর্ম্মরাজ্য হইতে মহাপ্রস্থান ও মুক্তিলাভ তত্ত্ব পর-পর্ব্বে শ্রবণ কর।

আশ্রমিক ও মৌষল-পর্ব্ব সমাপ্ত

মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব।

কর্ম্মত্যাগ ও মুক্তি সংবাদ।

যস্য প্রাসাদাদ জ্ঞোহপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু॥

মহাপ্রস্থান-পর্ব্ব লীলা—শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান বলিয়া অর্জ্জুন যখন জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকেও শীঘ্র যাইবার জন্য আহ্বান করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ তৎক্ষণাৎ অভিমন্যুর ও অনিরুদ্ধের শিশু পুত্র এই দ্বয়কে ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং সুভদ্রা ও উষাদেবীর হস্তে সমর্পণ করতঃ, শিক্ষা ও রক্ষার জন্য কৃপাচার্য্যকে নিযুক্ত করিয়া, বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ গৃহত্যাগ করিয়া পরলোক উদ্দেশ্যে উত্তরাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীদেবীও কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাত পশ্চাত ধাবিত হইলেন এবং ক্রমে হরিদ্বারের পথে হিমালয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, লোক গতির অন্তরালে প্রস্থান করিলেন।

ভক্ত—বৎস! এই সৃষ্টিরাজ্যের যত কিছু পদার্থ আছে, তাহাদের উপাদান সমস্তই পরব্রহ্মের ইচ্ছারূপ নিরাকারসত্তা হইতে উদ্ভূত হইয়া, তাঁহারই ইচ্ছামত কিয়ৎকাল বস্তু আকারে থাকিয়া, আবার তাঁহার নিরাকার সত্তায়ই লয় হইয়া যায়। যতদিন তাঁহার সাকার অবস্থায় রাখিবার ইচ্ছা থাকে, কার সাধ্য ততদিন সাকারসত্তা গুলিকে নিরাকার করে। আবার

যখন তাঁহার লয়ের ইচ্ছা হইবে, কার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে। তাই ব্রহ্মের ইচ্ছারূপ বাণীর আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত, সৃষ্টিমায়া জীবকে আবরণ করিয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে, দারুণ ভাবে বলপ্রয়োগ করিতে থাকিবে। কিন্তু যখন তাঁহার ইচ্ছারূপ বাণীর আগমন হইবে, জগতে এমন কোনও মায়া বা শক্তি নাই যে আর তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে দূর করিয়া রাখিতে পারে। তাই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে, ভগবানের কৃপার আগমন বিনা কিছুতেই জীবের বিষয় নাশ হয় না বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের সেই কৃপা-বাণীর আগমনেই ভক্তদের সর্ব্বপ্রকার বিষয়-চিন্তার ও কর্ম্মের শেষ হইয়া যায়, তখনই তাঁহারা বিষয়-রাজ্য হইতে মহাপ্রস্থান করেন, এই তত্ত্বই পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান।

স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব লীলা—পাণ্ডবগণ ভূলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকের নিকটবর্ত্তী হইলে, হঠাৎ দ্রৌপদীদেবী চলিতে অশক্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ও দেহত্যাগ করিলেন। কনিষ্ঠগণ ধর্ম্মরাজকে সেই কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "এখন ইহাকে ত্যাগ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হও, পশ্চাতে চাহিবার আমাদের আর প্রয়োজন নাই। তাঁহার যতদূর আসিবার সে আসিয়াছে, আমাদেরও যতদুর অধিকার প্রত্যেকে ততদূর যাইব।" ভীমসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন "দ্রৌপদীর পথে দেহত্যাগ হইল?" ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "দ্রৌপদীদেবী পঞ্চপাণ্ডবকে সমভাবে দেখিতে পারেন নাই, অর্জ্জুনকে একটু অধিক ভালবাসিতেন, সেই দোষেই তাঁহার এই পতন।" আবার কতদূরে যাইয়া, সহদেবেরও সেইরূপ পতন হইল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "সে নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বোধ করিত, তাই তাহার পতন হইল।" এইরূপে ক্রমে নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমেরও পতন হইল। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "সৌন্দর্য্যাভিমান হইতে নকুলের, কৃপাযুক্ত হইয়া পূর্ণবীর্য্য দ্বারা কুরুক্ষেত্র-

যুদ্ধকে শীঘ্র শেষ না করায় অর্জ্জুনের এবং বলের অহঙ্কার জন্য ভীমের এই দেহে স্বর্গ-গমন ঘটীল না। পরে কতদূর যাইতেই ধর্ম্মরাজের সম্মুখে দেবরথ আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে, ধর্ম্মরাজের সঙ্গে গমনশীল একটী কুকুর, তাহার সঙ্গে রথে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সারথি কুকুর লইতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ কুকুর রাখিয়া সেই রথে যাইতে অস্বীকার করিয়া রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "এই স্থানে আসিয়া কুকুরের যেই গতি আমারও সেই গতি হউক, আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গেও যাইতে পারিব না।" তখন সারথি কুকুরকেও রথে লইয়া কত দূরে যাইয়া তাহাদিগকে নামাইয়া দিলেন।

ধর্ম্মরাজ সেইস্থানে নামিয়া তথায় কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যেন তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও দ্রৌপদী আদি তথায় দুঃখ ভোগ করিতেছেন এমন বোধ করিলেন। সেই সময় গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দেবগণ সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মরাজের নানাপ্রকারে প্রশংসা করিতে করিতে, তাহাকে সম্মান ও আদরের সহিত স্বর্গগমনজন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "আমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া আর কোথায়ও গমন করিতে প্রস্তুত নই।" দেবরাজ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "আমি জানিতে পারিতেছি, আমার মাতা, পত্নী, ভ্রাতাগণের এইস্থান লাভ হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেকে চিরকাল ধর্ম্মাচারী ছিলেন, তাহারা কেহই হীনস্থান নরকাদিতে স্থানলাভের যোগ্য নয়। তাঁহারা ধর্ম্মপথে চলিয়া যেই স্থান লাভ করিয়াছেন, আমার সেই স্থানই লাভ হউক, আমি অন্যস্থান কামনা করি না।" অমনি দেবদুন্দুভী বাজিয়া উঠিল, দেবকন্যাগণ ধর্ম্মরাজের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজের সঙ্গী সেই কুকুর হঠাৎ ধর্ম্মদেবের মূর্ত্তিতে প্রকাশিত

হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তোমার অপূর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মফলে বিশ্বাস দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। এমন অভ্রান্ত-জ্ঞান ও ধর্ম্মফলে বিশ্বাস আসিলেই জীব এই দেহেই স্বর্গগমনে সক্ষম হয়; তাইত তুমিই মাত্র এই স্থানে আসিতে সক্ষম হইয়াছ। ধর্ম্মরাজ! সত্যই বলিয়াছ, তোমার মাতা, ভ্রাতা, পত্নী আদি কেহই নরকাদি হীন লোক লাভের যোগ্য নয়। তাহারা ধর্ম্মফলে সকলেই শ্রেষ্ঠলোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এই স্থানে নাই। তোমার ধর্ম্মফলে বিশ্বাস জানিতে, আমরা মায়া দ্বারা তোমাকে এই নরক বোধ করাইয়াছিলাম, এখন চাহিয়া দেখ সেই সব কিছুই নাই। তবে স্বর্গদ্বারে আসিয়া যে তোমার মায়ানরকও দেখিতে হইল তাহার কারণ, দেহ ধারণ করিলেই একেবারে দোষহীন হইতে পারে না, বিশেষ রাজা হইয়া লোকের পালন ও বিচার ভার গ্রহণ করিলে ক্রটী হইবেই। কিন্তু তুমি যে এইস্থান, নরক বোধ করিয়াও, ধর্ম্মদ্বারা যাতনা লাভ দেখিয়াও, সেই ধর্ম্মের প্রাপ্যফলই ভোগ করিতে চাহিয়াছ, তাহাতেই তোমার সর্ব্বদোষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি কুকুর হইয়া তোমার সঙ্গ লইয়াছিলাম, আমায় ফেলিয়া যে তুমি একা রথে উঠিতে চাও নাই, ধর্ম্মের ফল তুমি যেমন পাইয়াছ, সামান্য পশু কুকুরকেও তাহা দিতে প্রস্তুত হইয়াছ, তাহাও তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে; অদ্য তোমার পরীক্ষা দান শেষ হইল। তুমি শীঘ্র স্বর্গগঙ্গায় স্নান কর! তাহাতে তোমার মর্ত্ত্যমোহের নাশ হউক, পরে স্বর্গপুরে প্রস্থান করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ কর।

তখন ধর্ম্মরাজ দেবগণকে প্রণাম ও গঙ্গাস্নান করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করতঃ দেবগণ সহিত স্বর্গধামে প্রবেশ করিলেন। তথায় যাইয়া দুর্য্যোধনাদির স্বর্গসুখ ভোগ দেখিয়া, ধর্ম্মরাজ একটু বিচলিত হইলেন, 'তবে অধর্ম্মের কুফল কোথায়?' কিন্তু দেবরাজ তাঁহার সেই সন্দেহের নাশ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "ইহাদের যুদ্ধমৃত্যু আদি সৎকর্ম্মের ফলে প্রথমে কতকদিন স্বর্গসুখ

ভোগ ঘটিবে,পরে আবার পাপ যন্ত্রণা জন্য মর্ত্তধামে হীন-জন্ম লইতে হইবে। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মধ্যে যেইফল অল্প, তাহাই পূর্ব্বে ভোগ করে। তাই আপনার প্রথমেই মায়ানরক দর্শন হইয়াছে ও তাহাই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রথমে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। এই সুখের পরে দুঃখের যাতনায় তাহারা অধিক পীড়িত হইবে ও সুখের জন্য স্পৃহাশীল হইয়া দুঃখ নাশের চেষ্টা করিবে। তার পরে স্বর্গপুরে ভ্রাতা ও দ্রৌপদী আদির সহিত ধর্ম্মরাজ মিলিত হইলেন। পাণ্ডব কিছুতেই স্বর্গের সুখভোগ করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায়, ভগবান তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে উর্দ্ধে, গুহ্য লোকে তুলিয়া লইলেন; পাণ্ডব জীব-দাস্যতা হইতে দেব-দাস্যতা লাভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মদেবে, ভীম বায়ু-দেবে, অর্জ্জুন ইন্দ্রে, নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারে মিলিয়া গেলেন ও দ্রৌপদীদেবী লক্ষ্মীতে মিলিতা হইলেন। আর ধার্ত্তরাষ্ট্র-কুল স্বর্গ-সুখ ভোগান্তে আবার মর্ত্ত্যধামে আসিয়া অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

ভক্ত—বৎস! স্বর্গধাম দুইপ্রকার, দেবগণও দুইপ্রকার? এইজন্যই হিন্দুগণ পূজা করিবার কালে, প্রথমে লোক-পাল দেবতাদের পূজা করিয়া, পরে ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। একটী স্বর্গ মর্ত্ত্যধামের অন্তর্গত স্বঃলোক, অন্যটী বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত গুহ্যলোক। স্বঃ-লোক-বাসী দেবতাগণ জীবগণের পাপ ও পুণ্যফল ভোগ করাইয়া সৃষ্টি পালন করেন। তাই জীবগণও কর্ম্মফলে দেবতা হইয়া কতক-দিন এইস্বর্গে বাস করেন; কখন দেবরাজপদও লাভ করেন। জীবস্থান এই মর্ত্ত্যলোকের একদিকে অসুরগণ অবিদ্যা-সম্পদ ও প্রবৃত্তি লইয়া পাতালে বাস করেন, অপর দিকে দেবতাগণ বিদ্যাসম্পদ লইয়া স্বঃ-লোকে বাস করেন। মর্ত্ত্যবাসী জীবগণকে কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মফল দান করাই ইহাদের কার্য্য। এই দেবতা ও অসুরগণই প্রজাপতি দক্ষাদি হইতে জাত দেবতা ও

অসুরগণ। আর ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠের দেবতাগণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও সংহারাদি জন্য পরব্রহ্ম হইতে তাহার মত শক্তি লইয়া জাত, ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ক্রিয়াশীল-সত্তা সমূহ, তাঁহারাই লোকপাল দেবতা। সৃষ্টিরাজ্যের করণকারকে ব্রহ্মের দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে জীবকে এই সব দানের জন্য দিক, পবন, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনী কুমার, ধর্ম্ম, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিবদেবের উদ্ভব। কর্ত্তৃকারকে ব্রহ্ম হইতে পুরুষ ও প্রকৃতি বা আত্মা ও স্বভাবদেবীর উদ্ভব। অধিকরণকারকে মহাকাল, অনন্তদেব ও ধরণীদেবীর উদ্ভব। এই সব দেবতা বৈকুণ্ঠের পৃথক পৃথক দেবস্থানে বাস করিয়া, অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক-ব্রহ্মাণ্ডে অংশ-শক্তির প্রেরণা করিয়া ভগবানের সৃষ্টি-ইচ্ছার পূরণ করেন। ইহারা নিত্যদেবতা ভগবানের সৃষ্টি-বাসনার শেষ হইলে, ইহারা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যান। কিন্তু স্বঃ-লোকবাসী দেবতাগণের কল্পে কল্পে জন্ম ও মৃত্যু হয়। বৈকুণ্ঠের এক এক দেবতা স্বঃলোকে আসিয়া কর্ম্ম জন্য বহু অংশে বিভক্ত হন। এক ধর্ম্ম পৃথক পৃথক কর্ম্ম ফল দিতে চতুর্দ্দশ হন, বায়ু ঊনপঞ্চাশত হন, সূর্য্য দ্বাদশ হন ইত্যাদি। পাণ্ডবগণ প্রথমে ধর্ম্মফলে স্বঃ-লোকে যাইয়া, পরে গুহ্যলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের দেবগণের সহিত একতা লাভ করিলেন। আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কতকদিন ভোগ-স্বর্গে সুখাদি ভোগ করিয়া, আবার "ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অসুরত্ব গ্রহণ করতঃ মর্ত্ত্যধামে জন্মিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইবে।

বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণ পরব্রহ্মের অভ্রান্ত নিত্যদাস। পাণ্ডবগণ দাস্য ভক্তির সাধনায় দাস্যের চরম ফল বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিলেন। বৈকুণ্ঠ বীচিত্রবীর্য্য ভগবানের ঐশ্বর্য্যরাজ্যের শেষ-ধাম। ইহার পরে ব্রহ্মের মাধুর্য্যময় রাজ্যের-সংবাদ ও প্রবেশের রহস্য, মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের প্রতিপাদ্য বিষয় এইস্থানেই

শেষ করা হইল। এখন স্বর্গ-গমনকালে অন্য পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী দেবীর পথে দেহত্যাগ-রহস্য শ্রবণ কর।

দ্রৌপদী আদির দেহত্যাগ-রহস্য—ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণের বর্ণিত-বাক্য ব্রহ্মরাজ্যের নানা গুহ্যতত্ত্বে পুর্ণ, ঋষিত্বলাভ না হইলে, তাহার সম্যক তাৎপর্য্য-উপলব্ধি অসম্ভব। তবু এই বিষয়ের সামান্য কয়েকটী সমাধান শ্রবণ কর। এই মায়াক্ষেত্র সৃষ্টি-রাজ্য হইতে মহাপ্রস্থান অর্থাৎ পুনর্জন্ম রহিত হইয়া প্রস্থান করিতে, মাত্র জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, দ্বিবিধ কর্ম্ম-যোগী ও সন্তোষ যোগী এই ছয় সাধকই সক্ষম হয়, তাই পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী দেবীই মাত্র মহাপ্রস্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই মুক্তিপথে যাত্রা করিলে প্রথমই বিষয় ত্যাগ হয়, তাহাই ইহারা অতুল রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়া ধাবিত হইলেন। বিষয় নষ্ট হইলেই সন্তোষ সাধনার প্রয়োজন নষ্ট হয়, তখন যে আর অসন্তোষই নাই, তাহাই দ্রৌপদীদেবীর প্রথমে পতন। পরে পরকালের চিন্তা ও ইহকালের চিন্তাও নাশ পায়, তাই সহদেব ও নকুলও পতিত হইলেন, এরপরে ভক্তি সাধনার জীব-সেবা-ধর্ম্ম নাশ পাইয়া, কেবল যোগ পথের ব্রহ্মযোগ আরম্ভ হয়। তাহাই অর্জ্জুনের পতন হইয়া ভীমসেনের থাকা। পরে ভক্তি করিব আমিত্বেরও নাশ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন এক ব্রহ্মসত্তার জাগরণ হইলেই পুর্ণরূপে বিষয়মায়ার নাশ পাইয়া ব্রহ্মরাজ্যের দ্বার খুলিয়া যাইবে। তাহাই ভীমসেনের পতন হইয়া ধর্ম্মরাজ মাত্র অবশেষ হইলে, স্বর্গের রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। আরও একটী অর্থ—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, দ্বিবিধ কর্ম্মযোগ ও সন্তোষ এই সাধনাগুলি যখন একসত্তায় পরিণত হয়, তখনই জীবের মুক্ত অবস্থা। যতদিন এইগুলিকে পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ থাকিবে, ততদিন মুক্তির অধিকারই জন্মেনা। এই ছয়টী যোগ একত্র সিদ্ধ হইলেই সে এই দেহেই মুক্ত-পুরুষ, তাই আর সকলের ধর্ম্মরাজে লয় হইলে, ধর্ম্মরাজ অমনি এই দেহেই স্বর্গে যাইতে সক্ষম

হইলেন। আর একটী অর্থ—সন্তোষ বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মসাধনায় লয় হইবে। ধর্ম্মসাধন' ইহকালের ও পরকালের সুখ-সন্ধান ছাড়িয়া ভগবান দাস্যতায়, দাস্যতা ব্রহ্মের জগত-সেবা ছাড়িয়া শুধু সেবায় যাইবে, সেই ব্রহ্মসবাও আমিত্ব-বর্জ্জিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন 'ভগবানের আমি' এই বোধ মাত্র অবস্থায় পৌছিলে, মুক্তি-মণ্ডপের দ্বার আপনিই উদ্‌ঘাটীত হইয়া জীবকে তুলিয়া লয়। এইজন্যই যেই ধর্ম্মরাজ অবশেষ হইলেন, অমনি স্বর্গের-রথ আসিয়া ধর্ম্মরাজকে তুলিয়া লইল। এই ছয় সাধনার যেই কোন সাধনা অবলম্বনেই, এই ধর্ম্মরাজের অবস্থায় পৌছিলে জীবের মুক্তির অধিকার জন্মে। এই ছয় জনের মধ্যে কেহই হীন বা ছোট বড় নাই, ইহারা ধর্ম্মদেবের ষড়অঙ্গ বা ধর্ম্মলাভের ছয়টী পথ। নচেৎ পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সখা, তাহারও স্বর্গ গমনে অধিকার নাই, ইহা কি হইতে পারে? তবে, দৈত্য বধের জন্য অর্জ্জুনের স্বর্গগমন, উর্ব্বষীর-শাপ সমস্তই যে মিথ্যা হয়। ভাগবতে বর্ণিত আছে, অসুর বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণই অংশে ভীমার্জ্জুন হন। তাই বলি ইহারা প্রত্যেকেই সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী রহিত দৈবশক্তি, ইহাদের ছোট বড় থাকিলে ছয় জনেরই একই গুহ্যলোক বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইত না। যে স্থানে গেলে জীব আর ফিরিয়া আসে না, তাহাই গুহ্য-লোক। কেবল ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মলাভ করিলেই জীব আর ফিরিয়া আসেন না। তাই বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপার্শদ হওয়াই গুহ্য-লোকে যাওয়া। যথা গীতা "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্ততে তদ্ধাম পরমং মম।" "মামুপেত্যতু কৌন্তের পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

পাণ্ডবগণের দোষ-রহস্য—জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, বিবিধ কর্ম্মযোগী ও সন্তোষযোগী এই ছয় সাধন পথীরই, কয়টী স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্র দিয়া তাহারা সাধনার

পূর্ণফল লাভে বঞ্চিত হয়। সেই ছিদ্রগুলি প্রকাশের জন্যই বুঝি, পাণ্ডবদের পতন ও দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। নচেৎ মহাভারতে পাণ্ডবদের জীবনে বা দ্রৌপদী দেবীর মধ্যে উক্ত দোষ গুলির কথনও কোথায় প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। অর্জ্জুনের যুদ্ধে মৃদুতা দোষ—ভগবান যাঁহার ভার আপনি লইয়াছিলেন, তাহার আবার ত্রুটী কেমনে থাকে? ভগবান যে নিজেই তাহার মুক্তি ভার লইয়াছিলেন। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" তাহার আবার ত্রুটী কেমনে হইল। দ্রৌপদী দেবী পঞ্চপাণ্ডবকে সম দেখিতেন বলিয়া, সত্যভামা তাঁর নিকট স্বামীবশ মন্ত্র শিখিতে গিয়াছিলেন। ভীমাদি সর্ব্বদা দাদা ধর্ম্মরাজের মুখাপেক্ষী ছিলেন, কথনও দর্পাদি জন্য কোন কাজে একা ব্রতী হইয়াছেন বা অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন এমনত পাওয়া যায় না। তাই বোধ হয়, যোগীগণের সাবধানতার জন্যই প্রত্যেকের ত্রুটীগুলি দেখান হইয়াছে। সন্তোষযোগী ভালবাসা-প্রবণ হয়, তাহারাও স্নেহপাত্রদিগের প্রতি অধিক স্নেহশীল হইলে সিদ্ধির বিঘ্ন হয়। শত্রু, মিত্রে, সুখ-দাতা ও দুঃখ-দাতায় সমসন্তোষ না আসিলে সন্তোষযোগের সিদ্ধি অসম্ভব,ইহাই দ্রৌপদীদেবীর সর্ব্বপ্রিয় অর্জ্জুন-প্রীতি দোষ। এইরূপ ভবিষ্যৎদর্শী ও বিশ্বদর্শীদের জ্ঞানাভিমান ও শ্রেষ্ঠা-ভিমানের ভয় স্বাভাবিক, তাহাই সহদেব ও নকুলের নিজকে জ্ঞানী ও সুন্দরাভিমানের কথা। ভক্তিপন্থী স্বাভাবতঃ অতি করুণ হইয়া পড়েন, কঠোর-দণ্ড বা প্রাণ-দণ্ডাদিতে তিনি কাতর হন, ইহাই অর্জ্জুনের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মৃদুতাদোষ। যোগীদের যোগশক্তি-বলে গর্ব্বিত হওয়ার ভয় আছে, তাহাই ভীমসেনের বাহুবলাভিমান। এইরূপ জ্ঞানীরও পতন-ছিদ্র আছে, তাহাই ধর্ম্মরাজের সঙ্গী কুকুর। এই শুধুশুধি ঘেউ ঘেউকারী কুকুরস্বরূপ তর্ক ও বিচারপ্রবৃত্তিই জ্ঞানীর ছিদ্র। এই দোষও নাশ না করিতে পারিলে এই জন্মে মুক্তি অসম্ভব। এই পঞ্চ

পাণ্ডব ও দ্রৌপদী এই ছয়জন সর্ব্বদা একত্র হইয়া থাকায়ই, ইহাদের এইসব দোষে ধরিতে পারে নাই। তাই প্রত্যেকেই মহাপ্রস্থান করিয়া গুহ্যলোকে প্রস্থানে সক্ষম হন। এই প্রত্যেক সাধনপন্থীও তেমন সবগুলি মিলাইতে না পারিলেই পতিত হইবেন। জ্ঞান ও ভক্তিযোগ আদি মাখা চাই, যোগাদিও জ্ঞান ভক্তি আদি মাখা না হইলেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। এখন ধর্ম্মরাজ কুকুরের হস্ত হইতে কেমনে উদ্ধার পান ও কুকুর জন্য তাঁহার কেমন পরীক্ষা দান করিতে হইয়াছিল, তাহাই শ্রবণ কর।

কুকুর রহস্য—ধর্ম্মরাজ সব ত্যাগ করিয়াও যে কুকুরকে লইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কুকুরকে রাখিয়া স্বর্গরথে উঠিতেও স্বীকৃত হন নাই, এই কুকুরকে চিনিলে কি বাবা! ইনি জ্ঞানীদের প্রধান অবলম্বন ও সাহায্যকারী তত্ত্ব-বিচারসত্তা। জ্ঞান-পথিগণের এই সত্তাকে ত্যাগ করিলেই বিপদ, তাই ধর্ম্মরাজ ইহাকে ফেলিয়া স্বর্গের রথেও উঠিলেন না। এই তর্ক ও বিচারশক্তি, ব্রহ্মযোগ, ভক্তি, সন্তোষ ও সাধন-কর্ম্ম হীন শুধু জ্ঞানপথিককে, সর্ব্বত্র সন্দিগ্ধ, ঘোর তার্কিক ও নাস্তিক করিয়া তোলে। তখন জীব সত্যই শুধু শুধি ঘেউ ঘেউকারি পশু কুকুর তুল্য হইয়া পড়ে। আর এই ধর্ম্মরাজের মত যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী সন্তোষীর নিকট, ধর্ম্মদেবকে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই তত্ত্বই কুকুরের ধর্ম্মরাজ হইয়া বরদান। অন্য যোগীগণ ঈশ্বর নির্ভরে, ভগবানের কৃপাশক্তির বলেই মুক্ত হইয়া যান, কিন্তু জ্ঞানযোগী ভীষণ জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, একরূপ স্ববলেই মুক্তি লাভ করেন। তাই ধর্ম্মরাজের স্বর্গদ্বারে যাইয়াও পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। কি দারুণ জ্ঞানের পরীক্ষা! অন্য পাণ্ডব ও দ্রৌপদি দেবীও স্বর্গপথের যতউর্দ্ধে যাইতে পারিলেন না, একটি পশু-কুকুর ধর্ম্মরাজের সঙ্গে সঙ্গে ততদুরে যাইয়া উঠিল; আবার ধর্ম্মরাজের সঙ্গে স্বর্গরথেও উঠিতে চায়! যেই ধর্ম্মরাজ পৃথিবীর সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুধু মুক্তিপদ প্রার্থী, তিনি কুকুরকে

না লইয়া সেই মুক্তিধামে যাইতেও অস্বীকৃত হইলেন। হইবেন না? 'মানব ও কুকুর উভয়েইত একই ভগবানের জীব, ঈশ্বরের কাছে যাইবার ও মুক্তিলাভ করিবার, কুকুরের ও যে আমারই সমান অধিকার আছে। মানব ও কুকুরের মধ্যে কে সাধনায় বড় কে জানে? মানব হইয়াও যদি মানব কর্ত্তব্য না করে, আর কুকুর যদি তাহার কর্ত্তব্য করিয়া থাকে তবে কি কুকুরই বড় নয়? সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মারূপে একইত ভগবানের শক্তি লীলা করিতেছেন। নিশ্চয় কুকুর ধর্ম্মবলেই এত দূরে আগমন করিয়াছে, ফলের বেলায় আমার আর তাঁহার ভোগের তারতম্য হইবে কেন? এই স্থান হইতে রথে যাইতে হয় কুকুরও তাহা লাভকরুক। নচেৎ ধর্ম্মবলে কুকুরের যেইফল আমার ও তাহাই হউক।' ধর্ম্মরাজ বিচার-শক্তি দ্বারা, সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি এই সমতা-সন্তোষের পরীক্ষা দিলেন। এর পরে স্বর্গদ্বারে যাইয়া মায়া-নরকে প্রেত, দ্রৌপদী ও ভ্রাতাগণ যাতনা ভোগ করিতেছেন অনুভব করিয়াও, সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, "ধর্ম্মকরিয়া যদি এই যাতনার স্থানই লাভ হয়, আমারও তাহাই হউক! আমিত সুখলাভ বা স্বর্গলাভ কামনায় ধর্ম্ম সাধনা করি নাই? ধর্ম্মের যাহা ফল আমার তাহাই লাভ হউক।" ধর্ম্মের প্রতি কি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস! কি অপূর্ব্ব বিচার-শক্তি! ধর্ম্ম করিয়া নরক-যাতনা ভোগ করিতে দেখিয়াও, ধর্ম্মে বা ভগবানে অবিশ্বাস আসিল না। তাইত কুকুর ধর্ম্মরাজরূপে প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মরাজের সকল-সংশয় নাশ করিয়া দিলেন এবং তাইত ধর্ম্মরাজ অখণ্ড স্বর্গসুখ হস্তে পাইয়াও তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধলোকে ভগবানের দাসত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই বিচার-শক্তিরূপ কুকুর স্বর্গলোকে যাইয়াও ধর্ম্মরাজকে দংশনে উদ্যোত হইয়াছিল। পাপাচারী ধার্ত্তরাষ্ট্রদের স্বর্গসুখ ভোগ ও নিজের প্রথম নরক দর্শন হইল বলিয়া, "তবে পাপের এত নিন্দা কেন? পাপইত

যেন ভাল।” এই সন্দেহ তর্কের উদয় করিয়াছিল। দেবরাজের মীমাংসা শুনিয়া বুঝিলেন, মানব যতই কেন জ্ঞান বিচার শক্তি লাভ না করুক, ঈশ্বরের [illegible]-উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে জানা তাহার অসম্ভব; ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তিনিই [illegible]। বৃথা জ্ঞানবিচার ছাড়িয়া ঋষিদের পূর্ণজ্ঞান হইতে বিকশিত [illegible] বিশ্বাস করিয়া, ভগবৎকৃপা লাভের চেষ্টাকরাই জীবের কর্ত্তব্য। বুঝিয়া সেই হইতে এই কুকুরকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাই বিচারের অধিকার ছাড়াইয়া গুহ্যলোকে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিসৃত গীতা-ধর্ম্মের স্বরূপ-দৃষ্টান্ত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী দেবী, অষ্টাদশ-পর্ব্বে লীলা করত সেই ধর্ম্মের ফলাফল জীবন্ত ভাবে প্রদর্শন করিয়া লীলা সম্বরণ করিলেন। এই লীলাই ভগবানের ঐশ্বর্য্য-সত্তা বিচিত্র-বীর্য্যের সৃষ্টি-কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কর্ম্মলীলার পূর্ণ পরিচয়। তাহার মায়া নিদ্রার স্বপ্নস্বরূপ এই লীলা কতক সময় ক্রিয়া করিয়া, তাঁহার জাগরণে আবার তাহাতেই যাইয়া লয় পায়। এই তত্ত্বই ভগবানের ঐশ্বর্য্যগোলক বৈকুণ্ঠ-ধামে পাণ্ডবের গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়া মহাভারতের পরিসমাপ্তি হইল। এরপরে ভগবানের অন্তঃপুররূপ মাধুর্য্য-রাজ্য প্রবেশের কথা, দাসের ভয়-সঙ্কোচ-মাখা ভাব হইতে তাঁহার আপনজন সখা, সন্তান আদি ভাব—সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভগবানসেবার অধিকারের সংবাদ, মহাভারতের পরিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরাও অন্ত এই স্থানেই মহাভারত-রহস্যের আলোচনার সমাধা করি। এখন সকলে মহাভারতের অধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণ, তাহার ঋষি **ব্যাসদেব**, আদর্শ **পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীদেবী**, বক্তা **শ্রীবৈশম্পায়ন** শ্রোতা **ঋষিগণ** ও প্রকাশ স্থান **নৈমিষারণ্যকে** কোটী কোটী প্রণাম করিয়া তাহাদের জয়ধ্বনি কর।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

মহাভারত রহস্য সমাপ্তম্।